সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ৮

২০২৩ সালে মিডিয়াতে প্রকাশিত সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ

সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ৮

২০২৩ সালে মিডিয়াতে প্রকাশিত সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন)
ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৫০০১৯৯০, ৫৮১৫৬৯৮৩
ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮১
ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

স্বত্ব
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারগুলোতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবে লেখকদের নিজস্ব। এর সাথে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে।

প্রচ্ছদ
অভ্র ভট্টাচার্য

অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাস
মোঃ সাইফুল হাসান

ISBN 978-984-98096-7-8

মূল্য
৪২০ টাকা

মুদ্রক

লিথোগ্রাফ
৪১/৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

সিপিডি পরিচিতি

১৯৯৩ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) যাত্রা শুরু করে। নীতিনির্ধারণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সহযোগীদের সাথে সংযোগ ও সংলাপের প্রসার এবং নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে একটি নাগরিক উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় সিপিডি। নীতি গবেষণার ফলাফলকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে নিরলস কাজ করছে থিংক ট্যাঙ্কটি।

দীর্ঘ ৩০ বছরের পথ চলায় সিপিডি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি স্বাধীন থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সিপিডির অন্যতম কার্যক্রম হলো দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা এবং গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সংলাপের আয়োজন করা। গবেষণা ও সংলাপ‒এই দুই মূলমন্ত্রের সমন্বয়ে নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্টদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থেকে সিপিডি দেশের উন্নয়ন গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

সিপিডি তার পথপরিক্রমায় ক্রমান্বয়ে একটি স্বনামধন্য থিংক ট্যাঙ্কে পরিণত হয়েছে যা কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় বের করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করছে। সিপিডির গবেষণা ফলাফল বরাবরই সুশাসন, গণতন্ত্র, সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণের উপর গুরুত্ব দেয়। এর গবেষণার বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতি, রাজস্ব নীতি, দারিদ্র্য ও বৈষম্য, বাণিজ্য, আঞ্চলিক যোগাযোগ, ব্যাংকিং খাত, শ্রমবাজার, তৈরি পোশাক শিল্প, সুশাসন, গণতান্ত্রিক উত্তরণ, মানব উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, সামাজিক সুরক্ষা, কৃষি, জলবায়ু ইত্যাদি।

সিপিডিই প্রথম বাংলাদেশে সংলাপের ধারা চালু করেছে যা গঠনমূলক মতবিনিময়কে উৎসাহিত করে। সিপিডি এর গবেষণা ফলাফলগুলোকে কেবল একটি নির্দিষ্ট ছকে সীমাবদ্ধ না রেখে সংলাপের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরে এমনকি প্রান্তজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। সেইসাথে সামগ্রিক নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অংশীদারদেরকে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জনমতকে প্রতিফলিত করে বিভিন্ন প্রস্তাবনা তুলে ধরে।

এর কাজের ধারাবাহিকতা হিসেবে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ), দক্ষিণ এশিয়া অর্থনৈতিক সম্মেলন (সায়েস), বিসিআইএম (বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মায়ানমার) অর্থনৈতিক করিডোর ফোরাম, সাউথ এশিয়ান সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ (সাসেপস) ইত্যাদি বিভিন্ন খ্যাতনামা নেটওয়ার্ক ও পার্টনার-এর সাথে সিপিডি কাজ করছে। সিপিডি একটানা দুইবার

বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থিংক ট্যাঙ্ক ইনিশিয়েটিভ (টিটিআই) পুরস্কার লাভ করেছে।

সিপিডি প্রকাশিত বই, মনোগ্রাফ, সাময়িকপত্র, সংলাপ প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্ত নীতি-পরামর্শের সংখ্যা ইতিমধ্যে ৫০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সিপিডির প্রকাশনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি নিয়মিতভাবে সিপিডির ওয়েবসাইটে (www.cpd.org.bd) প্রকাশ করা হয়।

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান

ড. ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো

অধ্যাপক রওনক জাহান
সম্মাননীয় ফেলো

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
গবেষণা পরিচালক

হেলেন মাশিয়াত প্রিয়তী
গবেষণা সহযোগী

মরিয়ম বিনতে ইসলাম
সাবেক গবেষণা সহযোগী

কাশফিয়া আশরাফ
সাবেক প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট

মুখবন্ধ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) ১৯৯৩ সাল থেকে বাংলাদেশের একটি স্বাধীন চিন্তক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য নানান বিষয় যেমন অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য, অসমতা, সুশাসন, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রভৃতি নিয়ে সিপিডি তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করে আসছে। বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি সেই গবেষণার ফলাফলকে বৃহত্তর পরিমন্ডলে তুলে ধরার জন্য সিপিডি'র গবেষকরা নিরলস কাজ করছেন।

উন্নয়ন ইস্যুতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে সিপিডির গবেষণাধর্মী মতামতসমূহ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়, যা তার তিন দশকের কর্মকাণ্ডের এক ঐতিহ্যবাহী অংশ। এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় নির্বাচিত মতামত ও সাক্ষাৎকারগুলো ২০১৫ সাল থেকে পূর্ণাঙ্গ বই আকারে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। বর্তমান গ্রন্থটি ২০২৩ সালে প্রকাশিত সিপিডি গবেষকদের নির্বাচিত বাংলা মতামত, কলাম ও সাক্ষাৎকারের সংকলন।

এ লেখাগুলোতে জাতীয় বাজেট ও অর্থনীতি, গণতান্ত্রিক উত্তরণ এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতি, শিল্প ও বাণিজ্য, জ্বালানি, জেন্ডার ও নারী সমতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রয়েছে। বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে বর্তমান সংকলনটিকে ৭টি আলাদা আলাদা অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক, সহনশীল ও সমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সিপিডি'র গবেষকরা নিয়তই কাজ করে যাচ্ছেন। বইটির প্রবন্ধগুলো তারই প্রতিফলন। নানামুখী বিষয় নিয়ে অনন্য এই সংকলনটি উৎসুক পাঠকদের আগ্রহ পূরণে সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

প্রকাশনার সময়ানুক্রমে প্রতিটি অধ্যায়ের প্রবন্ধগুলো সাজানো হয়েছে। বিষয় অনুযায়ী অধ্যায়গুলো বিন্যাস করার পর যে প্রবন্ধগুলো আগে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোকে ঐ অধ্যায়ে আগে রাখা হয়েছে। আশা করছি, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে সিপিডি'র গবেষকদের বিশ্লেষণ সংবলিত এই বইটির জন্য বরাবরের মতই গবেষক, তরুণ সমাজ এবং বৃহত্তর জনমানুষের আগ্রহ থাকবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সিপিডি'র গবেষণাকর্মকে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব গণমাধ্যম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, এ গ্রন্থের সকল লেখকের পক্ষ থেকে আমি সেসব গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। উল্লেখ্য যে, মিডিয়ায় প্রকাশিত বক্তব্যসমূহ

গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করে প্রকাশের উপযোগী করতে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্তন করা হয়েছে।

সিপিডি’র সংলাপ ও যোগাযোগ বিভাগের সহকর্মীরা এ সংকলন প্রকাশের জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন। বইটি সংকলন ও সম্পাদনায় সার্বিক নেতৃত্ব দিয়েছেন ডায়লগ বিভাগের যুগ্ম পরিচালক অভ্র ভট্টাচার্য। লেখা ও মন্তব্যসমূহ নির্বাচন ও বাছাই, পাশাপাশি সেগুলোকে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যাস ও পরিমার্জন করে প্রকাশনা উপযোগী করে তুলতে এস এম খালিদ, ইমা আক্তার এবং ফাবিহা ইদ্রিস একনিষ্ঠ পরিশ্রম করেছেন। এজন্য তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাসে ভূমিকা রেখেছেন প্রোগ্রাম সহযোগী (ডিটিপি) মো: সাইফুল হাসান। তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সূচিপত্র

মুখবন্ধ সাত

অধ্যায় ১: বাজেট ও অর্থনীতি

অর্থনীতিতে হলুদ বাতি ৩
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বৈশ্বিক চাপ প্রতিরোধে অর্থনৈতিক সংস্কার জরুরি ২৩
মোস্তাফিজুর রহমান

ইউক্রেন যুদ্ধ না হলে আমার সোনার সংসারে আগুন লাগতো না ২৭
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ভর্তুকি এখন রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার হাতিয়ার ৩৬
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সুখবর স্বস্তি দিবে তবে পূর্ণ সমাধান দেবে না ৩৮
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মানুষ নিরাপদ বোধ না করলে অর্থপাচার ঠেকানো যাবে না ৪০
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মন্দার প্রভাব পড়েছে অর্থনীতির আনাচে কানাচে ৪৪
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অর্জন রক্ষা জরুরি ৫০
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নির্বাচনী বছরের বাজেটের আগে মূল্যস্ফীতি, রাজস্ব ঘাটতি ও ডলার সঙ্কট অর্থনীতির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ৫২
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ত্রিমুখী সংকটে বাংলাদেশ ৫৪
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দুই দশকে সবচেয়ে জটিল প্রেক্ষাপটে বাজেট ৬৮
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অর্থনীতির বর্তমান অস্বস্তিকর অবস্থায় প্রস্তাবিত বাজেট বিশ্বাসযোগ্য নয় ৭৩
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় অগ্রাধিকার ৭৯
মোস্তাফিজুর রহমান

ঈশান কোণে মেঘ ৮৩
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

চলমান সংকট সমাধানের পথরেখা নেই ৮৭
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

উজ্জ্বলতাহীন নির্বাচনি বাজেট ৮৯
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

এর চেয়ে বড় গোঁজামিল আর হতে পারে না ৯১
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

২ হাজার টাকার সর্বজনীন ট্যাক্স বিবেচনাহীন ৯৪
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাজেটে ভালো কাজের প্রশংসা নিতে পারেনি সরকার ৯৬
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

টাকা ছাপানো থেকে বিরত থাকতে হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ১০২
ফাহমিদা খাতুন

নতুন মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরতে পারবে কি? ১০৪
ফাহমিদা খাতুন

অনিশ্চয়তা শব্দটা আমার কপালে লেগে গেছে ১০৮
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আইএমএফের সঙ্গে ঋণচুক্তি ও কাঠামোগত সংস্কার ইতিবাচক সিদ্ধান্ত ১১৭
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

খেলাপি ঋণ কমানো ও বাজার কারসাজি নিয়ন্ত্রণ কোনোটাতেই সাফল্য দেখা যাচ্ছে না ১২৪
ফাহমিদা খাতুন

উর্দি পরা মানুষদের বাজারে পাঠানো মানে অবস্থাকে আরও জটিল করা ১৩২
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

কেন বাংলাদেশ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলেও অন্যরা সফল হয়েছে? ১৪১
ফাহমিদা খাতুন

অর্থনীতি এখন অনিশ্চয়তার ঝুঁকিতে ১৪৪
মোস্তাফিজুর রহমান

খেলাপিদের বিরুদ্ধে শূন্যসহিষ্ণুতা প্রয়োগের এখনি সময় ১৪৭
মোস্তাফিজুর রহমান

অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলাই বড় চ্যালেঞ্জ ১৫১
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অর্থনীতির সমাধান সংস্কারে ১৫৪
মোস্তাফিজুর রহমান

এক দশকের দুর্বলতম ও সমস্যাসংকুল বছর ২০২৩ ১৫৮
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যায় ২: গণতান্ত্রিক উত্তরণ এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতি

অর্থনৈতিক সাফল্যের সাথে আমরা কেন রাজনৈতিক সাফল্য আনতে পারলাম না? ১৬৫
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

উন্নয়নের সুফল কি সবাই সমানভাবে পাচ্ছে? ১৭৩
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দেশে নতুন রাজনৈতিক বোঝাপড়া প্রয়োজন ১৮০
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

গণতন্ত্রহীনভাবে উন্নয়নকে টেকসই করা যায় না ১৮৬
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

পরিকল্পনা ‘আকাশে’ আছে, ’মর্ত্যে’ আনতে হবে ১৯২
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

গণতন্ত্র শুধু পশ্চিমাদের ধারণা নয় ১৯৭
রওনক জাহান

দু'পক্ষেরই ইতিবাচক ফল পাওয়ার সুযোগ আছে ২০৩
মোস্তাফিজুর রহমান

আমরা ইতিহাসের ভেতর রাজনীতি খুঁজি, ইতিহাসের ভেতরে বৈধতা খুঁজি ২০৭
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে জটিল ও অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে ২২৬
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশ একটি সন্ধিক্ষণে আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই ২২৯
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সংকট বাড়লে রাজনীতি রাজনীতিবিদদের নাগালের বাইরে চলে যায় ২৩৩
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

রাজনৈতিক সমাধান না এলে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা চাপ তৈরি করবে ২৩৭
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

রাজনীতিতে বহুমত চর্চার খুব অল্পই অবশিষ্ট আছে ২৪৩
রেহমান সোবহান

উন্নয়নের উত্তরণ গণতান্ত্রিক উত্তরণের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ২৪৭
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সুশাসনের অর্থনীতি, রূপান্তরের বাংলাদেশ ২৫০
মোস্তাফিজুর রহমান

সংঘাত আরও ঘনীভূত হচ্ছে ২৫৮
রওনক জাহান

ইচ্ছে পূরণের নির্বাচন শুভ ফল দেবে না ২৬০
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

রাজনৈতিক ও নৈতিক বৈধতা ফিরে আসবে এমন নির্বাচন দরকার ২৭৬
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

রাজনীতিবিদরা ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীরা রাজনীতিবিদ হয়ে গেছে ২৭৯
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নির্বাচন শব্দটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমার একটু দ্বিধা আছে ২৯৩
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ইতিহাসের কাছে নাগরিকদের দায় বেড়ে গেলো ২৯৮
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রচণ্ড আস্থার সংকটের মধ্যে আছি ৩০০
রওনক জাহান

অধ্যায় ৩: শিল্প, বাণিজ্য এবং বাজার ব্যবস্থাপনা

দেশে চামড়া ফেলে দেওয়া হয় অন্যদিকে আমরা চামড়ায় আমদানি নির্ভর হয়ে পড়ছি ৩০৯
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

চালের বাজার সামলাতে করণীয় ৩১৮
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

পোশাককর্মীদের ব্যয়ের খাত নিয়ে কী ভাববে মজুরি বোর্ড ৩২১
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অভিযানে বাজার ঠিক করা যাবে না ৩২৭
মোস্তাফিজুর রহমান

বড় উদ্যোক্তারা সফল না হলে বাংলাদেশের রফতানি আজকের জায়গায় পৌঁছত না ৩৩২
মোস্তাফিজুর রহমান

সরকার সিন্ডিকেটকে ধরতে চায় কি না, সেটিই প্রশ্ন ৩৩৬
ফাহমিদা খাতুন

গতিশীল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের শিল্পায়ন ৩৪২
ফাহমিদা খাতুন

সস্তা শ্রমের পরিচয় নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে দীর্ঘদিন টিকে থাকা যাবে না ৩৪৭
ফাহমিদা খাতুন

জ্বালানি রূপান্তরে দরকার রাজনৈতিক অঙ্গীকার ৩৫৩
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
হেলেন মাশিয়াত প্রিয়তী

অর্থনীতিতে চ্যালেঞ্জ অনেক, সমন্বয় জরুরি ৩৫৯
মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যায় ৪: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

বাংলাদেশের ভূকৌশলগত অবস্থান বহুমাত্রিক এবং বহুস্তর বিশিষ্ট হতে হবে ৩৬৯
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ব্রিকসে যুক্ত হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হবে ৩৮২
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

ব্রিকসে যোগদানের সিদ্ধান্ত ইতিবাচক ৩৮৪
মোস্তাফিজুর রহমান

অর্থনীতি নয়, ব্রিকসের পেছনে রাজনৈতিক কৌশল ৩৮৬
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দুই দেশের সম্পর্ক কোনো শাসক দলের হাতে জিম্মি হতে পারে না ৩৯১
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যায় ৫: শ্রদ্ধা ও স্মরণে

জাফরউল্লাহ চৌধুরী সৃষ্টিশীলতার একটি চমৎকার উদাহরণ ৩৯৯
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রফেসর নুরুল ইসলামের চিন্তা চেতনাকে আমাদের এগিয়ে নিতে হবে ৪০৬
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

রেহমান সোবহান: ইতিহাসে দায়বদ্ধ বুদ্ধিজীবী ৪০৯
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আব্দুর রাজ্জাক: শিক্ষক, গুরু, পথপ্রদর্শক ৪১৩
রওনক জাহান

মুক্তিযুদ্ধ, চার অধ্যাপক এবং আমাদের সময় ৪১৮
মোস্তাফিজুর রহমান

উনি রাজনৈতিক চাপের কোনো তোয়াক্কা করেননি ৪২৪
ফাহমিদা খাতুন

একই সঙ্গে বিদ্বান, গবেষক ও প্রাজ্ঞ অর্থনীতিবিদ ৪২৭
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সে যা ছিল এবং যা হয়েছে তার জন্য আমি গর্বিত ৪২৯
রেহমান সোবহান

দেশে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে, তাতে ড. মসিউর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন ৪৩২
রওনক জাহান

সেই বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখে আমি চমৎকৃত হই ৪৩৫
মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যায় ৬: জেন্ডার ও নারী সমতা

নারীর কাজের ক্ষেত্র ৪৪১
ফাহমিদা খাতুন

বদলাতে হবে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ৪৪৩
রওনক জাহান

অধ্যায় ৭: অন্যান্য

আমরা মুক্তিযুদ্ধকে সম্মান দিচ্ছি, অথচ দায় শোধ করছি না ৪৪৯
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কে নষ্ট করছে ৪৫২
রওনক জাহান

বায়ুদূষণ শুধু পরিবেশগত দুর্ভাবনা নয় ৪৫৪
ফাহমিদা খাতুন
কাশফিয়া আশরাফ
মরিয়ম বিনতে ইসলাম

অধ্যায় ১

বাজেট ও অর্থনীতি

অর্থনীতিতে হলুদ বাতি

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সঞ্চালক: বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য। প্রিয় দর্শক নতুন বছর ২০২৩ মাত্র সপ্তাহখানেক আমরা পার করলাম। গত বছরটি বাংলাদেশের জন্য নানা কারণে একটি মিশ্র অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে, তবে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলা অদম্য গতিতে এগিয়ে চলা সেখানটাতে ২০২২ এসে বাংলাদেশ অনেকখানি ধাক্কা খেয়েছে। এটি সরকারের কর্তা ব্যক্তিরাও স্বীকার করে নিয়েছেন, যদিও তারা বলেছেন একটি কারণ হচ্ছে কোভিডের যে প্রভাব এবং রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণেও এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে কেউ কেউ আবার মনে করেন যে এর ভিতরে যে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা, সুশাসনের দুর্বলতা সেগুলো একটা কারণ।

নতুন বছর যখন আমরা শুরু করি তার আগের কয়েক মাস থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণকে সতর্ক করেছেন যে, ২০২৩ খুব একটা পৃথিবীর জন্য এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য খুব ভালো যাবে বলে মনে হয় না কাজেই সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করার জন্য তিনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার একটা প্রয়াস চালিয়েছেন ২০২২ এর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। কাজেই মানুষ শুরুই করেছে ২০২৩ হয়তো বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সামগ্রিকভাবে খুব একটা ভালো যাবে না। আবার ২০২৩ সাল রাজনৈতিকভাবে কেমন যাবে সেটি নিয়ে অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন বা শঙ্কা আছে ।কেননা ২০২৩ এর শেষে অথবা ২০২৪ এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন কমিশনের ভাষ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশ দৃশ্যমান রাজনৈতিক তৎপরতা অনুপস্থিত থাকলেও অক্টোবর মাস থেকে ২০২২ এর বিরোধী

রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি তারা বেশ সরব এবং সক্রিয় তারা বেশকিছু সমাবেশ করেছে, গণমিছিল করেছে, গণঅবস্থান কর্মসূচি সামনে ১১ই জানুয়ারিতে আছে এবং তারা তাদের মিত্ররা বিএনপ নিজেরা কোনো জোটের মধ্যে নেই কিন্তু বেশকিছু জোট তাদের সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের তারা আছেন।

১০ দফা কর্মসূচি তাদের পাশাপাশি তারা ২৭ দফা একটি প্রস্তাবনা রাষ্ট্র মেরামতের প্রস্তাবনাও দিয়েছে। অন্যদিক সরকারের দিক থেকে অন্তত সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক বারবার খেলা হবে বলছেন এবং সেই খেলা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অপশাসনের বিরুদ্ধে। নির্বাচনে মাঠে নানা ধরনের খেলা হবে বলছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলও শেষ করেছেন ডিসেম্বরে এসে। সবমিলিয়ে আসলে ২০২৩ এ বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য মানুষের মধ্যে নানা রকমের শঙ্কা আছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে কি সহিংসতা বাড়বে সহিংস হবে দেশ নাকি একটি শান্তিপূর্ণ অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনের হলে কার অধীনে হবে কে নির্বাচন করবে?

বিরোধীদের দাবি এটি নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে বর্তমান সরকার এবং সরকারি দলের বক্তব্য হচ্ছে যে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনটি হতে হবে। আমরা গত কয়েক মাস ধরে লক্ষ্য করছি যে সরকার তার প্রতিপক্ষ হিসেবে বা সরকারি দল প্রতিপক্ষ হিসেবে এতদিন যেমন বিএনপি বা তার মিত্রদেরকে দেখেছে গত কয়েক মাস জুড়ে তারা প্রতিপক্ষ হিসেবে বিদেশি রাষ্ট্রদূত বিশেষ করে পশ্চিমা রাষ্ট্রদূত যারা বাংলাদেশে আছেন যারা মানবাধিকার, গণতন্ত্র, নির্বাচনি নানান ফোরামে কথাবার্তা বলছেন। তাদের বিরুদ্ধেও তাদের এক ধরনের ক্ষোভ এবং অসন্তোষ লক্ষ্য করা গেছে এবং যেসব প্লাটফর্মের তারা কথা বলেছেন সেসব প্লাটফরমের বিরুদ্ধে তাদের এক ধরনের ক্ষোভ লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে সাংবাদিকের প্রতি সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী এই বিষয় নিয়ে অনেকবারই কথা বলেছেন যে, সাংবাদিকদের উচিত না তাদেরকে এসব বিষয়ে কথা বলার সুযোগ করে দেয়া সব মিলিয়ে ২০২৩ কেমন যাবে অর্থনীতির জন্য রাজনীতির জন্য, সামাজিকভাবে মানুষের জন্য কেমন যাবে সেই বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন দেশের অত্যন্ত প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ ড দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য স্বাগত আপনাকে তৃতীয় মাত্রায় এবং নতুন ইংরেজি বছরের শুভেচ্ছাও আপনাকে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জিল্লুর আপনাকে ধন্যবাদ, বছরের প্রথম অনুষ্ঠানে আপনার এখানে এসেছি আপনার মাধ্যমে দেশবাসী যারা দেশের ভেতর এবং দেশের বাইরে যারা আছেন এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের মঙ্গল কামনা করি এবং আপনার মাধ্যমে চ্যানেল আইয়ের

অন্যান্য কর্মকর্তারা যারা আছেন তাদেরও শুভেচ্ছা জানাই এবং সর্বোপরি আপনার প্রতি রইলো।আপনি কেমন আছেন?

সঞ্চালক: আমি, আমি ভালো থাকবার চেষ্টা করছি এবং বেটার দেন আই ডিজার্ভ এবং আমি যা ডিজার্ভ করি আমি মনে করে আমি তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো আছি মনে করি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি ভালো থাকার ক্ষেত্রে আপনি নিশ্চিত থাকুন যে আপনার শুভানুধ্যানের সংখ্যা প্রচুর এবং গুণমুগ্ধ সংখ্যারাও আছেন, দর্শকরা আছেন, শ্রোতা আছেন আমি তাদের পক্ষ থেকে বলতে পারি আপনার ভালো থাকার যথেষ্ট কারণ আছে।

সঞ্চালক: থ্যাংক ইউ, আমি একটু আপনার কাছে বুঝতে চাইবো, মানুষ অধীর আগ্রহে আপনার কথা শুনবার জন্য থাকেন এবং অর্থনীতির মতো জটিল বিষয়কে যেভাবে সহজবোধ্য করে আপনি দীর্ঘকাল ধরে মানুষের সামনে তুলে ধরছেন।

গত বছরটা আসলে বাংলাদেশের জন্য মিশ্রই গেছে এবং আমরা একটা ধারণা নিয়েই গত কয়েক বছর পার করেছি যে বাংলাদেশে উন্নয়ন হয়েছে এবং এ কথা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশে দৃশ্যমান অনেক উন্নয়ন হয়েছে, আমরা পদ্মা সেতুর মতো প্রকল্প শেষ করলাম উদ্বোধন হলো আমরা সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার উৎসব করলাম যদিও শেষ পর্যন্ত সেই সময়টাতে আসলে বিদ্যুতের কিছুটা সংকট তৈরি হলো। মেট্রোরেলের মতো প্রজেক্টের উদ্বোধন হলো অনেক কিছু হলো কিন্তু সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিকতা নানান ক্ষেত্রে একটা সংকট দেখা দিয়েছে। ডলার বাজারের অচল ব্যবস্থা লক্ষ্য করলাম আমরা ব্যাংকিং খাতে সংকট পড়লাম। এদিকে প্রচুর টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে এটা সরকারের কর্তাব্যক্তিরাও স্বীকার করেছেন। সব মিলিয়ে আসলে কোন জায়গা থেকে আমরা নতুন বছর শুরু করলাম? অর্থনীতি দিয়ে যদি শুরু করি অর্থনীতিবিদ হিসেবে আমি জানি আর আপনার সাথে রাজনৈতিক অর্থনীতি আলোচনা করবো এবং নাগরিক সমাজের হয়ে দীর্ঘদিন ধরে আপনি কথা বলছেন এবং কাজ করছেন। সেটিও বোঝার চেষ্টা করবো অর্থনীতি দিয়েই একটু শুরু করতে চাই।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি প্রথমে এবং দ্বিতীয় যে প্রেক্ষিত এবং যে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করলেন এটাতে আপনি মোটামুটি প্রায় সব ধরনের বিষয় উপস্থাপন করেছেন। ঐগুলোতে আমি পুনরাবৃত্তি করবো না। আমি শুধু দু'একটা বিষয় একটু সামনে নিয়ে যাই— সেটা হলো যে গত বছর থেকে আমরা এ বছরে যে পদার্পণ করেছি এখানে একটি বড় বিষয় হলো, যে সংকটে আছে অথবা চাপে আছে বা সমস্যায় আছে অর্থনীতি এটা মোটামুটিভাবে

সকলের স্বীকার করেছে। রাজনীতিবিদরা, শাসক দল এবং প্রশাসকরা যারা আছেন তারা এখন স্বীকার করেন। আপনার হয়তো স্মরণ আছে এ কথাগুলো আপনার এই অনুষ্ঠানে আসতে যাচ্ছে এ সমস্যাটা যে আসবে এটা অনেক বার বলেছি। আমাদের মতো দুর্মুখরা এটা বলে থাকে কিন্তু তখন সর্বদাই এটা অস্বীকার করার মনোভাব ছিলো। অস্বীকারের মনোভাব পুরোটা কেটে গেছে এটা আমি বলবো না তবু আগের চেয়ে এখন বাস্তবতার নিরিখে মানুষের বাজারের প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এটা স্বীকারোক্তির ভিতরে এসেছে। তো ওই পরিস্থিতিটা নিয়েই আমরা কিন্তু নতুন বছরে পদার্পণ করেছি। এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো কি?

উল্লেখযোগ্য দিক হলো সবচেয়ে বড় যে, সকলের আলোচনা করছে যে মজুদ কমে যাচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার এবং টাকার মূল্যমান পতন হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা যা আয় করছি রেমিট্যান্স বলেন বা রপ্তানি বলেন বা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, বৈদেশিক বিনিয়োগ বলেন অথবা বৈদেশিক সাহায্য বলেন এর মাধ্যমে এটা দিয়ে আমাদের যা বিদেশ থেকে আনতে হয় সেটাকে আমরা দাম মিটিয়ে উঠতে পারছি না। এই পার্থক্যটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এখন এটার কারণ বলা হচ্ছে যে বৈশ্বিক বাজারে জিনিসের দাম বেড়েছে। কথাটা আংশিক সত্য, কথাটা আংশিক সত্য এই কারণে যে, এই সময়কালে তো সেই অর্থে রেমিট্যান্স যে খুব কমেছে তাও না, উঠানামার ভিতরে আছে। মানুষ তো এবার গেছে অনেক বেশি— দুগুণ প্রায়। তারপরও কেন সেইভাবে এবার রেমিট্যান্স আসলো না। বৈদেশিক বিনিয়োগ এত চেষ্টার পরেও আমরা দুই বিলিয়ন ডলারের উপরে উঠতে পারলাম না যেখানে আশপাশের দেশে ১৫–১৬ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হয়। বৈদেশিক সাহায্য প্রভাব ও আগের তুলনায় প্রথম ছয় মাসে কমে গেছে এটার ভিতরে।

টাকা আছে কিন্তু আমরা ছাড় করতে পারছি না। একই এরকমভাবে রপ্তানির ক্ষেত্রে বলছি যে সর্বোচ্চ রেকর্ড রপ্তানি হচ্ছে অথচ বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমদানি ব্যয়ও কিন্তু সেই তুলনায় বাড়ছে। অর্থাৎ রপ্তানির ভিতরে একটা বড় অংশ বৃদ্ধিটাই হলো আমদানিকৃত পণ্যের কাঁচামালের দামের বৃদ্ধির কারণে আপনার রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে সেই অর্থে। সেগুলি বোঝার ব্যাপার। সেহেতু আপনার যেই মজুদ আছে সেই মজুদের হিসাব নিয়েও বিতর্ক আছে আপনারা সকলেই জানেন। তো এটা প্রকৃত মজুদ এখন চার মাসের মতো হয়তো আমরা চালাতে পারার মতো অবস্থায় আছি। এটা বিপদ সীমাতে নাই কিন্তু হলুদ বাতি জ্বালানোর মতো সময় হয়ে গেছে হলুদ বাতি। এখন আইএমএফ এর টাকা আসবে কবে, ফেব্রুয়ারি– মার্চ পুরোটা আনার জন্য আমরা সব ধরনের পূর্বশর্ত মিলাতে পারবো কিনা এগুলো আলোচনার ভিতরে আছে।

এটাতে যে জিনিসটা আমাদের বলার বিষয় সেটা হলো যে, সরকারের মধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। পদক্ষেপটা প্রথমে বাণিজ্যের দিক থেকে যেটা হয়েছে সেটা হলো যেহেতু মজুদের পরিমাণ কম সরকার সেহেতু প্রাধিকারের ভিত্তিতে খাদ্য আমদানিতে দিতে চাচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রাকে অন্যান্য প্রকল্পে টাকা ছাড় করছে না। যেহেতু আপনি শুনবেন বড় বড় উদ্যোক্তাদের মুখে ব্যাংকে ঘুরে আমরা এলসি করতে পারছি না। আমদানি করার, প্রয়োজনের আমদানি করতে পারছি না প্রকল্প স্থির হয়ে যাচ্ছে এই সমস্ত বিষয়গুলো আছে এখন সরকারের ক্ষেত্রে বড় জায়গাটা ছিল সেটা হলো টাকার মূল্যমানকে সে কিভাবে স্থিতিশীল রাখবে আবার একই সাথে সে বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখবে। যেমন রেমিট্যান্সের যারা আয় করছেন তারা তো আর সরকারিভাবে টাকা কম পাঠাচ্ছেন। তারা হুন্ডির মাধ্যমে পাঠাচ্ছে সেখানে বেশি টাকা পাচ্ছে। তাহলে কি টাকার মূল্যমানটা কি ঠিক করা উচিত ছিল কিনা? ১০১ টাকা করেছে ও বাজারে হচ্ছে ১১২ টাকা। তাহলে কি এক ডলার প্রতি তাহলে কি বাড়ানো উচিত ছিল কি ৫/৬। সরকার ভয় পাচ্ছে যে, এইটা যদি বাড়াই তাহলে আমার এটাতে আমদানিকৃত পণ্যের দাম বাড়বে মূল্য স্মৃতি বাড়বে কিনা। এটা হলো একটা দিক। কিন্তু আরেকটা দিক যেটা আছে সেটা হলো সরকারের রাজস্ব তো সবচেয়ে কম। পৃথিবীর ভিতরে এত কম রাজস্ব আয় পৃথিবীতে যে কোনো দেশে তুলনায় প্রায় বলতে গেলে এখন কম। নেপালের চেয়ে আমাদের রাজস্ব আয় জিডিপির ১০% এর নিচে। এটা যদি বাড়ানো না যায় তাহলে এরকম একটা পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য সরকারের যে ব্যয় করা দরকার। ধরুন আপনি টিসিবির চাল আনবেন, আরো কতকগুলো ট্রাক নামাবেন। আপনি জেলা উপজেলা পর্যায়ে যেখানে পৌরসভা পর্যায়ের আপনি মধ্যবিত্তকে সাশ্রয় দেওয়ার জন্য ওটা দিয়ে আরও যাতে মধ্যবিত্তদের সারিবদ্ধভাবে কম লাইন ধরতে হয়। মধ্যবিত্ত যাতে সুযোগটা পায় এবং আপনি যদি বিনামূল্যে দিতে চান তাহলে তো কথাই নেই। অথবা মূল্যস্ফীতি হয়েছে সেহেতু যাদের ভাতা দিচ্ছেন ১০০ টাকা ২০০ টাকা ৮০ টাকা এগুলোকে আপনি কিভাবে বাড়াবেন। তার জন্য তো অর্থ দরকার এবং একই রকমভাবে বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করতে হলেও তো আপনার পরিপূরক তহবিল রাখবে সাথে। দুই ডলার খরচ করতে হলে চার ডলার বাংলাদেশি টাকায় লাগবে সেটা করার মতো অবস্থা এটার ভিতর আছে কিনা এইটা হলো বিষয়। আসলে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, সরকারের যতখানি না বৈদেশিক মুদ্রা আপনার এই অনুষ্ঠানের বলেছে আসলে এটা যতখানি না বৈদেশিক খাতের সমস্যা তার চেয়ে অনেক বেশি হলো অভ্যন্তরীণ আয়ব্যয় এর ক্ষেত্রে আমাদের রাজস্ব আয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা। এখন এই জায়গাটাতেই আমি আপনাকে নিয়ে আসি সেটা হলো– ওই যে বলেছি স্বীকারোক্তি কিছু এসেছে কিন্তু পুরোটা আসেনি। অর্থাৎ আমরা এখন কি বলছি আমাদের এখন ব্যাখ্যা হলো এইরকম যদি ইউক্রেন যুদ্ধ না হতো তাহলে আমাদের সোনার সংসার ভালোই থাকতো। যদি ইউক্রেন যুদ্ধ না হতো তাহলে কি ব্যাংক ব্যবস্থা খেলাফি ঋণ কমে যেতো? যদি ইউক্রেন যুদ্ধ না

হতো তাহলে কি আমার ব্যাংকে তারল্য সংকট থাকতো না? যদি ইউক্রেন যুদ্ধ না হতো তাহলে এই বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থাপনা আমরা দেখতাম সেগুলো কি থাকত না?

আমরা যদি এই মুহূর্তে যে রাজস্ব আদায় হওয়ার কথা এত প্রভৃতির ভিতর ওই আয়গুলো থেকে যে টাকা তুলতে পারলাম না রাজস্ব সেগুলো কি তাহলে ঠিক হয়ে যেতো? এইটাই স্বীকারোক্তির ভিতরে নেই। অর্থাৎ আমাদের যেই উত্তরাধিকার সূত্র ইংরেজিতে বলা হয় লিগেসি ইস্যুস উত্তরাধিকার সূত্রে সমস্যাগুলো রয়ে গেছে এই যে সংস্কারগুলো আমরা করি নাই সেইটার বড় কারণে এখন আমরা যে ঠেকাটা দেওয়া দরকার সেই ঠেকাটা দিতে পারছি না। এটা আমি আপনাদের বলার চেষ্টা করি যে দেখুন কোভিড তো সবারই হয়, ইউক্রেন যুদ্ধ সবার জন্য সত্য। কিন্তু একেক কোভিডের তো সহ্যশক্তি একেকটা মানুষের একেক রকম। আমার ইউক্রেন যুগের সহ্যশক্তিতে আমরা প্রস্তুত না। এই জায়গাটাতে একটা সমস্যার রয়ে গেছে এখনো এবং এইটার ক্ষেত্রে সরকার আসলে খুবই জটিল একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। সময় থাকতে যদি না করেন তাহলে কেমন করে আপনি পরিস্থিতি সামাল দেবেন। যেমন আপনি এখন ডলারে ১০০ টাকাকে নিতে হবে ১১৫ তে কি ১১২ তে কিন্তু আপনি একবারও তো নিতে পারলেন না। কিন্তু গত বছরগুলোতে আপনি এক টাকা দু টাকা করে যদি সমন্বয় করতেন তাহলে আজকে এই অবস্থা হতো না।

আপনার আয়ের ক্ষেত্রেও যদি আপনি সময়মত, যারা বিদেশে টাকা নিয়ে গেছে তাদের তাদের সাড়ে শতাংশ করের হার দিয়ে আপনি তাদের প্রলুব্ধ করতে চাচ্ছেন অথচ দেশের ভিতরে আমরা যারা ৩০ শতাংশ কর দিয়ে আয় করি তাদের কোনো ধরনের সাশ্রয় না দিয়ে তাদের আপনি উদ্যোগ ছাড়া যারা ন্যূনতম করের সুবিধাতে আছে তাদের ন্যূনতম করমাত্রাকে তিন লক্ষ পাঁচ লক্ষ করলেন না সুবিধা দিলেন না, কম কর কিন্তু অনেক বেশি মানুষ দিবে সেরকম একটা পদ্ধতি গেলেন না। সেটা এখন আপনি সালামি দিচ্ছেন এবং এটার ফলে আপনি এর পরে যেটা করেছেন সেটা হলো গিয়ে আপনি এ বিনিয়োগ বাড়াবেন বলে উদ্যোক্তাদের কথায় আপনি নয়-ছয় থেকেছেন অর্থাৎ ৯ শতাংশের ধার দিবেন না ৬ শতাংশ আমানত নিবেন। আপনার মূল্যস্ফীতি হলো ৯ শতাংশ উপরে ব্যাংকে টাকা রাখার চেয়ে তোষকের নিচে টাকা রাখা আমার জন্য লাভজনক কারণ ওখানে তো লেভিটিভিটি আরো কেটে নিয়ে চলে যাবে আমার মূল্যস্ফীতি কম। আর ৯ শতাংশ হারে যে আপনি সুদে টাকা দিলেন তাতে কি বিনিয়োগ বাড়লো? আপনার তো বিনিয়োগ তো বাড়ে নাই কারণ বাংলাদেশি বিনিয়োগ বাড়ার জন্য সুদের হার মানে একটি ক্ষুদ্র অংশ তার খরচে। জাহাজ ভাড়া থেকে রাস্তাঘাটে আপনার চাঁদা আদায় থেকে বিদ্যুৎ থেকে, গ্যাসের দাম থেকে আরো দশ রকমের সমস্যা আছে। ওইগুলি সমাধান না করে শুধু আপনি নাগরিকদের উপরে বা ভোক্তাদের উপরে অথবা সঞ্চয়কারীদের উপর আপনি

এটা করলেন এই যে সমস্যাটার ফলে এই সমস্যাটার পূর্ণ স্বীকৃতি না থাকাতে এটাকে একটা সমন্বিত, সুষম ও মধ্যমেয়াদি কর্মসূচির ভিতরে সরকার আনতে পারেনি। সরকার বিচ্ছিন্নভাবে অপর্যাপ্তভাবে অগোছালোভাবে দেরি করে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে অনেক সময় ঠিক পদক্ষেপে নিচ্ছে। পদক্ষেপ যেগুলি নিয়েছে সরকারি পর্যন্ত সরকারি ব্যয় এবং সরকারি আমদানির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা সেটার সাথে আমি দ্বিমত করছি না। সমাজকর্ম সমাজকল্যাণমূলক কাজ হচ্ছিল সেগুলির কাজ হয়েছে এটাতো আমি দ্বিমত পোষণ করছি না। কিন্তু বাজার কিন্তু এটাতে কোনো সংকেত পাচ্ছে না। অর্থাৎ, বাজার এটাতে নিশ্চয়তা পাচ্ছে না এবং রোজা আসছে সেই সময় রমজান মাসে কি হবে এটা নিয়ে আতঙ্ক যে কেটে গেছে তা না।

এটার জন্য আমি যেটা আপনাকে যেটা বলে শেষ করছি এবং এর ভিতরে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে। পরিস্থিতি কি জটিল হয়েছে দেখুন, আপনি রাজস্ব টাকা নেই দেখে আপনি সমস্ত রাজস্ব ব্যয় যত জায়গায় ছিলো আপনি ৫০ শতাংশ বন্ধ করে দিয়েছেন। বিভিন্ন জায়গাতে স্কুল হচ্ছিল রাস্তা হচ্ছিল অন্যান্য সমাজ কল্যাণমূলক কাজ হচ্ছিল সেগুলির কাজ হয়েছে যারা ঠিকাদার তারা টাকা পাচ্ছে না পরে বাকি বছর টুকুদের কাজ কি হবে সেটা নিঃস্বতা নেই কর্মসংস্থান ইত্যাদির ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা হয়েছে এটা একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। আর আমদানি যদি না হয় ঠিক মতো এই যে দেখুন এখন বলছে যে এল সি লাগবে না আমরা অন্য কোনোভাবে করব– কিভাবে করবো কেমন ভাবে করব এটার কোনো আলোচনা নেই শুধু নেতৃত্বে দিয়ে যে বাজারকে আপনি দিবেন একটা সংকেত এবং সেখানে আশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে। আবার গতানুগতিকভাবে ছয় মাস পরে একটা বাজেট আসবে এই ছয় মাসে যে কি হবে এইটার ব্যাপারে আতঙ্ক কিন্তু কাটছে না। টাকার অভাব আছে আবার বৈদেশিক মুদ্রারও কিন্তু অভাব রয়েছে। এর ভিতরে যুদ্ধ পরিস্থিত এই অবস্থাকে কোন বিশেষ দিক নিবে না এর সাথে যুক্ত হয়েছে যুদ্ধ হয়েছিল ইউক্রেনে আর এখন তো রাশিয়া আমেরিকার যুদ্ধ— ঢাকার শহরে হচ্ছে এটাতো আরেক নতুন মাত্রায় চলে এসেছে। এটাই আমি আপনাকে বলতে চাই।

সঞ্চালক: আপনি ব্যাংক খাত নিয়ে বলছিলেন এবং ব্যাংকিং খাতের অচল ব্যবস্থা আমরা দীর্ঘদিন ধরে জানি। যারা সাধারণ গ্রাহক তাদের হয়ে আমি প্রশ্নটা করি। অনেকের মধ্যেই আমরা এটা শুনতে পাই যে তাদের মধ্যে একটা শঙ্কা যার যেটুকু পুঁজি ব্যাংকে জমা আছে, সেটা শেষ পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকবে কিনা এই শঙ্কা আছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মনে করি এত বড় আশঙ্কাটা অমূলক নয় তবে হয়তো অবাস্তব। কারণ শেষ বিচারে সরকার এই ব্যাংকগুলোকে ঠেকা দিতে বাধ্য। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে এই দায়িত্বটা তারা এড়াতে পারবেন না।

ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে তো এটা তো এক অর্থে আধা সরকারি করে ফেলেছে আধার সরকারিকরণ হয়েছে দুটাই ব্যবহার করলাম। তো সেই ক্ষেত্রে যেটা বোঝার ব্যাপার সেটা হলো, এর আগেও বাংলাদেশে যেই দুই তিনটি ব্যাংক বন্ধ হয়েছে। কে যেন বলেছেন বাংলাদেশের কোন ব্যাংক এটা ঠিক না কথাটা এর আগে হয়েছে এবং সেই ব্যাংক গুলোকে পরবর্তী সময়ে অন্য ব্যাংকের সাথে একীভূত করা হয়েছে অন্যদের টাকাগুলোকে ফেরত দেওয়া হয়েছে ধাপে ধাপে একবারে না হলেও। সেটা সরকার করবে বলে আমি মনে করি। এটা সরকার করতে বাধ্য। প্রত্যেকটার বিপরীতে এক লক্ষ টাকা করে কি বিমা আছে ইত্যাদি এগুলি বড় ব্যাপার না এটা সরকার তার রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে এটা করবে। কিন্তু আস্থার সংকট যে সৃষ্টি হয়েছে এইটিই হলো বড় বিষয়। কারণ এই যে আমি আপনাকে বললাম বাজার কি সংকেত পাচ্ছে, একটা নির্ভরশীল করার মতো একটা শেষ বিচারের আপনার এখন নির্ভর করার জায়গাটা পাচ্ছে না। মানে আপনি যদি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয় আর আপনি যদি আস্থা না পান যে পুলিশ আমার ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে না, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আমার ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবে না তাহলে কিন্তু একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। আপনার যদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বৈপরীত্য বা বৈষম্য বা বিভিন্ন ধরনের বিচ্যুতি দেখা দেয় তখন যদি আমি মনে না করি যে, যে সমস্ত দেখভাল করার প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তারা ক্ষুদ্রসঞ্চয়ী, গ্রাহক, আমানতকারী করদাতার পক্ষে দাঁড়াবে এবং ন্যায়ের পক্ষে কথা বলবে এই আস্থাটা যদি না থাকে তাহলে বড় মুশকিল। কারণ অর্থনীতি চলে ও বাজার ব্যবস্থা চলে আস্থার উপর, এবং এই আস্থার বড় জায়গাটা হচ্ছে দুটো একটা হলো তথ্য আপনি কতখানি তথ্য দিচ্ছেন এবং তথ্যের ক্ষেত্রে বড় বিভ্রান্তি আছে আপনার এখানে আমি বলে গেছি, এবং তথ্যের ক্ষেত্রে নৈরাজ্য আছে আরেকটা যেটা হয় সেটা হলো তারা আচরণ দেখে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর আচরণ দেখে সে নিজের অভিজ্ঞতা সেখানে নিতে চায়। এই দুই জায়গাতে সমস্যা রয়ে গেছে।

আপনি এখন দেখুন এখন যেই পরিস্থিতি চলছে সার্বিক অর্থনৈতিক মূল্যায়ন পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কে বলছে? একমাত্র প্রধান প্রধানমন্ত্রী বলছে। অথচ উনার এত বড় মন্ত্রিসভা আছে, ওনার মন্ত্রিসভার ভিতরে অর্থনৈতিক উপকমিটি আছে, এবং ওনার এরপরে সংসদ আছে সংসদে অর্থনৈতিক বিষয়ে স্থায়ী কমিটিগুলো আছে অনুমতি কমিটি আছে অন্যান্য পরিকল্পনা কমিটি আছে। তারা কিন্তু কোনো আলোচনার ভিতর নাই। এটা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি একটা অন্যায্য আচরণ হচ্ছে বলে আমি মনে করি। কারণ এটা একটা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রযন্ত্র তো কাঠামোগতভাবে একটা সুষম আচরণ করবে। তার যে যার দায়িত্বগুলো পালন করবে। সেহেতু আমরা এখন লক্ষ্য করছি অনেক ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতার অভাবই শুধু নয় নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও অনেক ক্ষেত্রে দেরি বা বিলম্ব হচ্ছে। সমন্বয়ের অভাব খুবই পরিষ্কার আপনি বিভিন্ন মন্ত্রীর কথা বিভিন্নভাবে শুনবেন। এবং

একটা কথাতেই সবাই আসছে যে তিন মাস গেলেই ভালো হয়ে যাবে। এক মাস গেলে বলে আবার তিন মাস গেলে ঠিক হয়ে যাবে।

সঞ্চালক: প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একটু বরং তিনি প্রস্তুতই করার চেষ্টা করছেন অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছেন যে এক ইঞ্চি জমি ও কাজে লাগাতে হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রধানমন্ত্রী বরঞ্চ তিনি জোর দিয়ে বাস্তবসম্মত কথা বলছেন, তাতে অন্যরা আবার মনে করছেন তিনি কেন এত কথা বলে ভয়-ভীতির সৃষ্টি করছেন। উনি হয়তো উদ্দীপনা সৃষ্টি করার জন্য বলছেন। যে উৎপাদনশীল ব্যবস্থার দিকে যাওয়া যেখানে জমি পড়ে আছে সেখানে চাষবাস করা। কিন্তু বিষয়টা হলো উনি সর্বোচ্চ পর্যায়ের সেহেতু একটা সংসদীয় গণতন্ত্রের তো বিভিন্ন অঙ্গ থাকে সেই কাজগুলো তো করার কথা। দেখুন যেই নীতিটা যার কাছ থেকে আসার কথা সেটা যদি তার কাছ থেকে না আসে ধরুন বাণিজ্যমন্ত্রী যদি এখন করব্যবস্থা নিয়ে কথা বলে। আর যিনি পশুপালন মন্ত্রী আছেন তিনি যদি আমদানি নিয়ে কথা বলেন আর যিনি বৈদেশিক মন্ত্রী আছেন তিনি যদি আমদানি রপ্তানির কথা ছেড়ে দিয়ে দেশে মাথা মাথাপিছু আয় কত সেটা নিয়ে কথা বলেন তাহলে এখানে সংসদীয় গণতন্ত্রে নীতি কাঠামোর ভিতরে কার্যপ্রণালীর ভিতরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মানুষের কাছে এই জিনিসগুলো মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সেজন্য আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাকে তিনটি জায়গাতে সেটা হলো পৃথিবীতে সমস্যা আছে ঠিকই কিন্তু তারচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমাদের দেশে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু কাঠামোগত সমস্যা রয়েছে যেমন আমাদের দেশে উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে সেতু, রাস্তা, টানেল, পদ্মা, মেট্রো এগুলো তো আছে কিন্তু এর পাশাপাশি যেটা আছে এগুলোকে ঠেকা দেওয়ার জন্য মানব সম্পদ, মানসম্মত শিক্ষা, মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা ও সামাজিক সুরক্ষার বলয়কে আরও বড় করা। এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অর্থ বিনিয়োগ করতে পারি নাই।

আমি এর আগে আপনাকে বলেছি যদি আমার হিসাব থেকে বলি ২০ টা মেগা প্রকল্পের যে টাকা দেই প্রতিবছর আমরা পুরো শিক্ষা খাতে সেই টাকা দিচ্ছি আর তার অর্ধেক টাকা দিচ্ছি ২০ টা মেগা প্রকল্পের অর্ধেক টাকা দিচ্ছি স্বাস্থ্যখাতে একটা প্রতিক্রিয়া থাকবেই। এটা হলো দ্বিতীয় সমস্যা তার মানে দ্বিতীয় সমস্যা হলো যেই প্রোজেক্টগুলো নিচ্ছেন সেগুলো আধখাচড়াভাবে আসছে বিলম্বিতভাবে আসছে এবং সমন্বয়হীনভাবে আসছে। তৃতীয় যে সমস্যা হলো এইটাকে যেটুকু করছেন এটাকে যে মানুষের কাছে বোধগম্য করে নিয়ে যাবেন আমি নিজের বাড়ির এলাকা থেকে আমার বাড়ি টাঙ্গাইলে আমি দেখে আসতেছি যে বিভিন্ন ঠিকাদার এসে বলছে টাকা পাচ্ছি না সামনের ছয় মাস কিভাবে হবে বুঝতে পারছি না। কেউতো ব্যাখ্যা করছে না— এটার তো ব্যাখ্যা করতে

হবে একজনকে। এই সমস্ত কিছু যেয়ে কিন্তু শেষ বিচার প্রধানমন্ত্রী বলছে হয়তো অন্য কাউকে মানুষ আর মানুষ আর আস্থা রাখছে না এমনও তো হতে পারে হয়তো ওনার কথাতেই আস্থা রাখছে। এই দুই তিন ধাপে আমাদের সমস্যাটা হয়েছে এর ফলে এক ধরনের অনিশ্চয়তাবোধ কিন্তু অনেক বেশি আছে যতটুকু না প্রকৃত সম্পত্তি ওই যে বললাম অমূলক নয় কিন্তু অবাস্তব, অবাস্তব অমূলক চিন্তা আসলেই সেটা সবচেয়ে ক্ষতি হয় কিন্তু সরকার এবং রাষ্ট্রের যে সমস্ত নীতি আছে সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। এটাই আমি বলতে চাই।

সঞ্চালক: আমি জানি যে আপনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গত বেশ কয়েক মাস ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং নাগরিক সমাজের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন এ সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ে আপনার ঘুরে কি মনে হচ্ছে, মানুষের ভাবনা টা কি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জিল্লুর ধন্যবাদ আপনাকে। আমি আপনাকে বলি সাম্প্রতিককালে গত বছরেই আমি বিভিন্ন জায়গাতে নাগরিক সমাজের সাথে কথা হয়েছে। কারণ এটা তো বোঝার ব্যাপার। কারণ হলো মাঝেমধ্যেই তো রাজনীতিবিদদের মুখের থেকে শোনেন না যে আপনারা কি মানুষের সাথে চলেন মানুষের কথা শুনেন আপনারা শুধু জিলুর রহমানের সাথে টক শো করেন তো আমি সেই দুর্নামের থেকে সর্বদাই দূরে থাকার চেষ্টা করেছি। সময় সময়ে বাস্তবতা নিরিখে সাথে আলাপ আলোচনা ভিতরে যুক্ত থাকার চেষ্টা করা মাটির সাথে ভূমিপুত্র হিসেবে থাকার চেষ্টা করা। আমি আপনাকে খুব ছোট্টভাবে চুম্বক আকারে বলি এত বড় কথার সারমর্ম যেটুকু কথা যেটা বের হয়েছে নতুন ধরনের উদ্যোগ আমি দেখি যুবসমাজের ভিতরে কিন্তু শিক্ষিত যুব সমাজের শোভন কর্মসংস্থান এটা একটা বড় সমস্যা চারপাশ। এবং এই শিক্ষিত যুব সমাজের শোভন কর্মসংস্থান নিয়ে বলেন অথবা আপনি মজুরিভিত্তিক নিয়োজন বলেন এইটা বড় ধরনের সমস্যা।

যেই চাকরিবাকরি হচ্ছে তারা বলছেন এখনো জমাদারের চাকরি পেতে হলে তিন লক্ষ টাকার উপরে তারা ঘুষ নিতে হচ্ছে এবং যাদের আদিবাসী বলেন বা দলিত শ্রেণী বলেন তাদের কোটার জায়গাতেও অন্যরা অনুপ্রবেশ করছে। কর্মসংস্থান একটা বড় সমস্যা এবং এটার ফলে যে জিনিসটার লক্ষ্য করছি একটা মানুষিক সেই অর্থে বৈকল্যতার দিকে থাকে বিষণ্নতার ভিতরে আছে। যুব সমাজের ভিতরে কেউ কেউ উগ্রতার দিকে যাচ্ছে মাদকাসক্ত হচ্ছে যারা অন্য আছে তারা রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন ধরনের ক্যাডারে পরিণত হয়েছে। এবং তাদের ভিতর একটি বিরাট বিভাজন আছে যে ও না আমরা এরকমভাবে এটা ভালো না দেশের জন্য। দ্বিতীয় যেই জিনিসটা এইবার আমি প্রথম লক্ষ্য করলাম পরিবেশগত বিপর্যয় এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয় এটা কোনো আঞ্চলিক ব্যাপার নয় এটা সব জায়গাতেই কোনো না কোনো পরিবেশগত দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে

কারোতে আপনি পৌনঃপুনিক বন্যা দেখবেন আবার আরেক জায়গায় পৌনঃ অনেক খরা দেখবেন, কোন জায়গায় জলোচ্ছ্বাস এবং লবণাক্ততা দেখবেন, কোন কোন জায়গায় আপনি ভূমিধস দেখবেন, অথবা কোন জায়গার নদী ভাঙন দেখবেন কোন না কোন জায়গায় বাংলাদেশের এখন পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সেটা হলো শিক্ষার মান। সবাই বলছেন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলা হয়। অথচ আমাদের শিক্ষার মান প্রাথমিক পর্যায়ে। এই গোল্ডেন এ প্লাস এর সাথে প্রকৃত শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু শিক্ষকরা বলেছেন যদি খাতাতে যদি ও আঁচড় দেয় তাহলে ওকে পাস করে দিতে হবে। সেরকম নাকি নির্দেশনা আছে এগুলো বলা হচ্ছে যে সমস্ত নতুন শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা হচ্ছে সেগুলো সম্বন্ধে শিক্ষকরা কোনোভাবেই অবহিত নয় প্রশিক্ষণও নাই। এখানে শিক্ষা একটা বড় সমস্যা।

নারীদের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশে নারীরা প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে এই স্বীকৃতি তো নিঃসন্দেহে সরকারকে দিতে হবে, প্রধানমন্ত্রীকে দিতে হবে। কিন্তু নারী নির্যাতন, নারীর প্রতি বৈষম্য এটা একটা ব্যাপকভাবে এসেছে। আপনার বাল্যবিবাহ শুধু কোভিডের কারণে বেড়েছে এই নয়। উনারা বলছেন বাল্যবিবাহ তো ভুয়া সার্টিফিকেট দিয়ে বিবাহকে বৈধ করা হচ্ছে সেই সার্টিফিকেট তো প্রশাসন দিচ্ছে এগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে। একটা বড় জিনিস এসেছে সেটা হলো সংস্কৃতিক মানের পতন। বিভিন্ন জায়গাতে উনারা বলছেন আগে মধ্যবিত্ত মানে শিক্ষা সংস্কৃতি আপনার এই বিভিন্ন ধরনের শিল্পচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে ভূমিকা রাখতো। এই ভূমিকা এখন কমে গেছে এটা যদি ষাটের দশকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে চেতনার যে প্রেক্ষিত তৈরি করেছে এবং তার পরবর্তী সময়ে যেটা ছিল সেটা ক্রমান্বয়ে আপনার এক ধরনের ধর্মীয় মতান্ধতা এটাকে চাপিয়ে দিচ্ছে কোন জায়গায়। ওনারা অভিযোগ করেছে শিল্পকলা একাডেমিতে সরকার তৈরি করে সব জায়গায় করছে। তো বলে যে ওনারা শুধু দিবস পালন করে ওনারা দিবস পালনের বাইরে আর কোনো কিছু কাজের ভিতর সেটা যায় না। আমি দীর্ঘ না করি আরেকটা বলে আমি শেষ করি, একটা ভয়ের সংস্কৃতি এসেছে দেশের ভিতরে। সব ভয়ের সংস্কৃতি এসেছে, কথা বলতে ভয় পাই। পরিবার এটাতে বিপন্ন না হয়ে যায়, আমার কাজকর্ম চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে এটা যাতে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না হয়, এই বিপন্নতা বলতে এসেছে। তখন আমি জিজ্ঞেস করি, এই যে এত কিছু বলছেন এটা হলো কেন? উনাদের একই কথা সেটা হলো জবাবদিহিতা নাই কারো। যারা এমনকি নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আছেন উনাদের কথা বলেন কিনা এটা নিয়ে সন্দেহ আছে। সবচেয়ে বেশি এটা বলেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকেরা। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি ইত্যাদি মিলিয়ে বড় আলোচনা রয়েছে। সেহেতু উনারা জবাবদিহিতার প্রশ্নটাকে বারবার তুলেছে। উনাদেরকে বলেছি যে এটা আসবে কেমন করে। তারা উত্তর খুব সাদামাটাভাবে দিয়েছে, বলেছেন ভোট দিতে চাই ভোট দিতে চাই, আমি বলেছি ভোটের ফলে তো আরো অনেক পচা সরকারও আসতে পারে

তখন কি করবেন? তারা বলে যে তা আমরা বুঝি না। না আমরা বুঝি আমি একটা জবাবদিহি তার ভিতরে থাকতে চাই। এখানে আনু কিন্তু আমার কথা বলিনি নাগরিক সমাজে যা শুনে এসেছি তাই বলেছি।

সঞ্চালক: আমি একটু আপনার কথাটা শুনতে চাই, ভোটের বছর এবং নানারকম সম্ভাবনা এবং আশঙ্কা দিয়ে বছরটা শুরু হয়েছে। সম্ভাবনা এই অর্থে যে পলিটিক্যাল পার্টিগুলো যেই পলিটিক্যাল স্পেস পাচ্ছিল না সেই অভিযোগটা অনেকখানি কমে এসেছে। এরপরেও তাদের অভিযোগ আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তারা শান্তিপূর্ণভাবে করতে পারছেন। যদিও সেগুলো নিয়ে নানা রকমের মতভিন্নতা রয়েছে কিন্তু শঙ্কাও একটা আছে, অনেকে মনে করেন যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ গত কয়েক বছরে সেখানে এক ধরনের সংঘাত সংঘর্ষ এবং সবচাইতে বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে যে নির্বাচনটা আসলে কিভাবে হবে। কারণ বিরোধিতা বলছে যে কোনো অবস্থাতেই বর্তমান সরকারের অধীন অথবা রাজনৈতিক সরকারের অধীনে নির্বাচন করা হবে না। সরকার বলছে সংবিধানের বাইরে যাওয়ার তাদের কোনো সুযোগ নেই। এই সেটেলটমেন্টটা কিভাবে হবে বলে আপনি মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জিল্লুর, আপনার মনে আছে যে গত বছর বোধহয় এরকম একটা সময় আপনার এখানে এসেছিলাম। তখন আমি বলেছিলাম যে এই বছরটা হবে রাজনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক উত্তরণের ভিত্তিবছর আংশিক হলেও কিন্তু তা সত্য হয়েছে। অনেক অগ্রগতি হয়েছে আমরা রাজনৈতিক শক্তির চাঞ্চল লক্ষ্য করছি। বিভিন্ন বাধা-বিপত্তিসহ বা সরকারের বিভিন্ন কথার পরে তারা তা করতে সক্ষম হয়েছেন এবং এটা অব্যাহত আছে আমি দেখতে পাচ্ছি এবং সরকারও আগের চেয়ে অনেক বেশি এ সমস্ত বিষয়ে কথা বলছেন এমনকি প্রধানমন্ত্রী আমাদের বলেছেন গতকাল কি পরশু যে সংবিধান পরিবর্তন করতে হয় এরকম কোনো কথা বলা উচিত না আমাদের ইত্যাদি। তার মানে হলো আমরা একটি আমি ইতিবাচকভাবে বলি গত বছর থেকে আমরা ওই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক উত্তরণের ভিত্তি হিসেবে একটা সংলাপ সমাবেশের সূচনা করতে পেরেছি এটা একটা বড় ধরনের ইতিবাচক বিষয় এবং এটাকে রাষ্ট্রক্ষমতার অদৃশ্য শক্তির বাইরে থেকে দৃশ্যমান করা জনগণকে এটা একটা বড় ইয়ের ব্যাপার এবং সাফল্যের ব্যাপার এবং সরকারি দলও একই রকমভাবে বিভিন্ন রকম সম্মেলন করে। আপনি নিজেই উল্লেখ করেছেন এটাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। এখন আপনি যদি দেখেন আপনি এই যে নির্বাচনের কথা যে অনিশ্চয়তার কথা বা আশঙ্কার কথা বা প্রত্যাশার কথা বলছেন আমি সব সময় ইতিহাসে ফিরে যাওয়ার পক্ষপাতী, পিছন ফিরে দেখি শিখতে পারি কিনা তো। বোকা মানুষ তো ঠেকে শিখেছি কিনা এটা বুঝতে চাই বোকারা ঠেকে শিখে আবার যারা চালাক তারা দেখে শেখে তো আমি দেখে শেখা এবং ঠেকে

শেখার দুটি উদাহরণই আপনাকে বলি। ঠেকে শিখেছি এইভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস এইরকম সংকট প্রথম না। এইরকমের সংকটে বাংলাদেশের মানুষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব নাগরিক সমাজ যৌথভাবে উদ্ভাবনীমূলকভাবে, সৃষ্টিশীলভাবে, কার্যকরভাবে সমাধান বের করেছেন। দুটো তো চোখের সামনেই আছে। প্রথমটা আছে আপনার ১৯৮৮ তে ৮৯ তে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ত্রিদলীয় ঐক্য জোটের যে রূপরেখা আসলো তিন জোটের মাফ করবেন তিন তিন জোটে যে রূপরেখা আসলো এবং তার মাধ্যমে আমরা যে বের করতে সক্ষম হলাম আমরা উপরাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করবে সেই জায়গায় নতুন জন সেখানে যাবেন তারপর রাষ্ট্রপতি নতুন উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হবেন করে নির্বাচন হবে। একটা সমাধান বের করেছিলাম না? সেই সমাধান তো কার্যকর হয়েছিল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আপনি বলতে পারবেন কি কি পূর্ব শর্ত ছিল সেগুলো নিয়ে আবার আলোচনা করা যাবে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে উদ্ভাবনী শক্তি যদি থাকে যদি নিয়তের ঐক্যমত্য হয় তাহলে এটা সম্ভব। আবার দেখেন আপনি যদি অন্যভাবে দেখেন ৯৬তে তো একটি নির্বাচন হয়েছিল আমরা জানি ১৫ই ফেব্রুয়ারিতে। মন্দ নির্বাচন হয়েছিল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে আলোচনা নিয়ে আলোচনা করার কোন দরকারই নেই। কিন্তু ওই মন্দ নির্বাচনটা সবচেয়ে ভালো কাজটা করেছিল কি আমার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তাকে আমরা সংবিধানে যুক্ত করেছি ওইটা দাবি ছিল? ওইটা কিন্তু বর্তমান শাসকদের দাবি ছিল এটাও ভুলে গেলে হবে না তখন তারা এটা দাবী করেছিল এবং এবং এটা গৃহীত হয়েছিল। এবং তার ভিত্তিতে নির্বাচন হয়েছিল আপনাদের স্মরণ আছে। সেহেতু এটাও একটা বড় বিষয় এবং সে নির্বাচনে কিন্তু বর্তমান শাসক দলই নির্বাচিত হয়েছিল— তো সেইক্ষেত্রে দুটো উদাহরণ আমার আছে আবার আমার অন্যদিকে একটি খারাপ উদাহরণও আছে যখন আমি সংবিধান কি নিজের পক্ষে রাখার জন্য তসরুফ করলাম। আমি বিচারপতি প্রধান বিচারপতি বয়সকে বাড়িয়ে দেই যাতে নিজের পছন্দমতো প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক হয়। এবং তারপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে কালিমালেপন করে নিজের একটু দলীয় লোকজন দিয়ে করে এবং যেনতেনও প্রকারে আমি ক্ষমতায় থাকবো এই চেষ্টা করবার ফলে আমরা তো দেখেছি ২০০৬ এ কি পরিণতি হয়েছে সেই সরকারের। এবং তার পরের দুই বছর আমাদের কি একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এবং তারপর সেই সরকারের মাধ্যমে আমরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বর্তমান শাসক দল ক্ষমতায় এসেছে।

তাহলে আপনি দেখেন আমি একটা ভালো উদাহরণ দিলাম একটা পচা উদাহরণ দিলাম। আমি আস্থা রাখতে চাই যে বাংলাদেশে এই রকমের সৃষ্টিশীল, কার্যকর, ইতিবাচক সমাধান কাঠামোর মধ্যে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কাঠামোর মধ্যে আমি মনে করি কাঠামোর মধ্যে সকলকে আশ্বস্ত করার জন্য সুযোগ আছে। একটি সুযোগ কিন্তু উনি নিজেই দিয়েছিলেন ২০১৪ সালে। ২০১৪ সালে আপনার মনে আছে একটি খুবই অবাঞ্ছিত একটি

টেলিফোন সংলাপ হয়েছিল। এবং সেই ঠিক সেখানে উনি তার আগেই কিন্তু সে সময় বলেছিলেন যে সংসদে যারা বিরোধী দল আছে তাদের নিয়ে আমরা একটা সরকার করে দরকার হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গেছে সেটা সুযোগটা তো এখন কমে গেছে এখন কারণ বিএনপি সংসদ থেকে চলে গেছে কিন্তু আমরা যদি ওই ধারণাটাকে ধারণ করি যে আমি নতুন কোনো কিছু মানে সংশোধন সেই অর্থে মৌলিক না করে এই সংসদীয় কাঠামোর ভিতর আমি সমাধান বের করতে চাই যে এই সমাধানটা জন মানুষকে আস্থা দিবে এবং সেই আস্থার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন কাজ করবে আমার প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে আমার বিচার ব্যবস্থা সুরক্ষা দিবে সেরকম একটা যে করা যায় না ওই রাস্তার শেষ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে, এটা আমার কাছে মনে হয় না কিন্তু সেই ইঙ্গিত উভয় পক্ষ থেকে আসতে হবে। উভয় পক্ষ থেকে আসতে হবে যে সেই রাস্তাটা সৃষ্টি করার মতো পরিস্থিতি হবে তো ওইটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে তো অবশ্যই আমরা খারাপ উদাহরণে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন করবেন না।

সঞ্চালক: এখন এখানে দুইটি প্রশ্ন একটি হলো, একাটি হচ্ছে যে আপনি মনে করেন কিনা সেই জায়গায় বাংলাদেশ যাবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যদি যায় ও একটা নির্বাচন যদি হয়ও!

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশ নয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ।

সঞ্চালক: হ্যা, বাংলাদেশ আর রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যদি যায়ও, ধরেই নিচ্ছি একটা ভালো নির্বাচন হলো তাহলে নির্বাচনের পর কি হবে নির্বাচনের পর কি হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনার অনুষ্ঠানে আসতে পারেন আমি এক ধাপের আলোচনা চিন্তা করে তারপর আপনি আরেক ধাপে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন এর আগে ২০২২ নিয়ে আলোচনা করলাম এরপর ২০২৩ দিলেন এরপর আপনি রাজনীতিতে নির্বাচন নিলেন নির্বাচনের একটা সমাধানের পথ বললাম এখন আপনি বলছেন ওইটা হলেও তো সমাধান হবে না। ঠিকই তো বলেছেন, দেখুন নির্বাচনে যেই জিতুক যেই হারুক

সঞ্চালক: এবং আমরা তো দেখেছি যেটা আওয়ামী লীগ যখন জিতেছে, বিএনপি যখন জিতেছে উইনার্স কখনো কেউ কাউকে ছাড় দেয় না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এখন আমাদের বুঝতে হবে বাংলাদেশের উন্নয়নটা এখন কোন অবস্থায় এসেছে। গত সময়কালে মানে গত দেড় দশকে বাংলাদেশের যে উন্নয়নটা হয়েছে এটা

তো সবাই স্বীকার করে। কিন্তু এই উন্নয়নের ভিতরে কিছু বড় ধরনের বিচ্যুতি আছে। এখন এই উন্নয়নকে যদি আমার টেকসই করতে হয় ওই বিচ্যুতিগুলোকে যদি আমি না শুধরাতে পারি তাহলে আমার উন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হওয়া বা উচ্চ মাধ্যম আয়ের দেশে যাওয়া বা আমার বৈশ্বিক উন্নয়নের কর্মসূচি এসডিজি বাস্তবায়ন করা এই সম্পূর্ণ কিন্তু অসম্ভব না হোক কষ্টকর হয়ে যাবে। এমনকি আমি যে সাফল্যগুলো এনেছি যেটা এই সময়কালে এসেছে সেগুলোর টিকে রাখা কষ্টকর হবে অর্থাৎ এগুলোকে টিকে রাখার জন্য আপনার একটি কার্যকর রাষ্ট্র দরকার যেই কার্যকর রাষ্ট্রের ভিতরে গুণমান উন্নত পর্যায়ের হতে হবে এবং এই সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র কার্যকর করতে হলে সেটা শুধুমাত্র আমলারা না এটার সাথে আপনার যে ধরনের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের আমরা চিন্তা করি তার সাথে বিচার ব্যবস্থা তার সাথে আমার জবাবদিহির জায়গাগুলো দেখবার করার জন্য যে ন্যায়পালগুলো আমার আছে ন্যায়পাল নামে না থাকুক আছে। এগুলোর একটা স্থানীয় সরকার এবং এগুলোর সাথে যে মিডিয়া যে নাগরিক জগত তাদের একটা বড় ধরনের পরিবর্তন দরকার এবং এই পরিবর্তনটা যদি না আসে তাহলে এই যে রাজনৈতিক বাহ্যিকভাবে যে রাজনৈতিক ক্ষমতার যে মারামারিটা যেটা নিচে হয়তো আদর্শগত পার্থক্য মানে স্বাধীনতার কথা আমরা বলি ঠিকই কিন্তু চেতনার কথা বলতে কিন্তু চেতনার ব্যাখ্যার ভিতরে যদি যাই তাহলে কিন্তু ব্যাখ্যা প্রকৃত কার্যকর পদক্ষেপ যদি তাকায় তাহলে পার্থক্য বেশি পাওয়া যাবে বলে আমার কাছে মনে হয় না। আমি ওই ব্যাখ্যায় এখন আর গেলাম না। তাহলে এক্ষেত্রে আপনার একটি ভালো প্রয়োজনীয় শর্ত হলো একটি সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উত্তরণ।

এটা ঠিক কিন্তু ওই উত্তোলনকে কার্যকরভাবে ফলদায়ক করতে হলে আপনার দরকার নতুন রাজনৈতিক সমাধান একটা মীমাংসা বা সমঝোতা এই রাজনৈতিক মীমাংসা ইংরেজিতে সেটেলমেন্ট বলে বা পলিটিকাল সেটেলমেন্ট। ওইটা যদি না আসে, তাহলে একক প্রাধান্যের দলের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপরিচালিত হয়ে এই যে আমি গুণমান সম্পন্ন পরবর্তী বাংলাদেশের ২০ বছর দেখতে চাচ্ছি, সেই ২০ বছর এইটাতে নিরাপদ নাও হতে পারে এবং এই সমাধানটা পৃথিবীতে আপনি যদি চারপাশে তাকিয়ে দেখেন তাহলে লক্ষ্য করে দেখবেন যে এটা কারা করে এটা করে হলো যাদের এই সমাজে হারাবার সবচেয়ে বেশি দেখুন যদি আপনার আইন যদি ব্যাংকিং ব্যবস্থা এরকম অবস্থায় থাকে যেমন আছে মানে এখন তো লুটপাটের ব্যাপার না এখন ডাকাতের ব্যাপার হয়ে গেছে তাহলে ডাকাতি যদি ব্যাংকিং খেতে হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি কার অসুবিধা তাহলে আমার উদ্যোক্তা বিনিয়োগ উৎপাদনশীল গোষ্ঠী বিনিয়োগ তাহলে তাকে এই ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে যেই লোকটাকে জমা রেখেছে টাকা চিন্তা করছে যে তুলে নিব কিনা গত ৫০০ কোটি টাকা করে নিয়ে গেছে গত কয়েক দিনের ভিতর ইসলামী ব্যাংকের থেকে ওনার ওই বিষয় হবে একই রকমভাবে হবে যারা আমরা কর দেই, তারা করের

টাকা যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট চিকিৎসা ঠিকমতো আমরা না পাই তাহলে আমাদের তো চিন্তা করতে হবে। একই রকমভাবে যারা ক্ষমতাশীল দেশে এবং বিদেশে দেশের স্বাধীনতা এবং দেশের ভাবমূর্তি রক্ষা করার দায়িত্ব পেয়েছেন যারা বিশ্বের বুকে শান্তি রক্ষা করছে যখন অসুস্থ সৃষ্টি হয় ইন্টারভিউ এটা আসতে হবে। তাহলে তখন একটা নতুন ধরনের এই গোষ্ঠীকে এক ধরনের চিন্তা করে এক জায়গাতে ঐক্যমত্যে আসতে হবে যে দেখো রাজনীতি এই জায়গায় হবে কিন্তু এর কতকগুলো মৌলিক চলনবিধি হলো এইটা আইনের দৃষ্টিতে সবাইকে সমান ভাবে দেখতে হবে। বিচারে যেয়ে উপর থেকে কোনো বিচারকে রাজনৈতিকভাবে প্রণোদিত না করে। দেখতে হবে যে আমার ঋণ খেলাপি সবাইকে সমান ভাবে হচ্ছে ট্যাক্সের একজনের পিছনে দৌড়াবেন হয়রানি করবেন না এটা যেন না হয়। বিদেশে টাকা নিয়ে যাচ্ছে কে আমরা সবাই জানি, কিন্তু কাউকে ধরবেন কাউকে ধরবেন না এটা যেন না হয়। এই একটা ঐক্যমত্য দরকার করে। কারণ তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা নির্ভর মানে এক ধরনের নিশ্চয়তার কারণ। ধরুন কোনো কারণে কোন দেশে বাংলাদেশ ও সে অভিজ্ঞতা আছে, যদি সরকার বদল হয় তাহলে একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এই সরকারের কাছে সুবিধা পেয়েছে কিন্তু সে হয়তো অনেক উৎপাদনমূলক কাজও করেছে তার ওখানে লক্ষ কোটি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজও করতে পারে। তাহলে অন্য একটা রাজনৈতিক শক্তি এসে তার উপরে বিভিন্ন রকমের বৈষম্যমূলক আচরণ করল ঠিক বেঠিকভাবে যা, তাহলে এক ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে।

আমরা কি ওয়ান-ইলেভেনের পরে এইরকম পরিস্থিতি দেখি নাই? দেখেছি তো, এজন্যই বললাম বোকারা ঠেকে শিখে চালাকরা দেখে শিখে। আমি কি দেখে শিখব কিনা এখন ঠেকে শিখে এসেছি দুইবার এখন দেখে শিখবো কিনা যে, পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় কি হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতে আপনি আফ্রিকা বলেন বা অন্যান্য দেশে বলেন বিভিন্ন জায়গাতে যেটা হচ্ছে যে এবং আমার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও যদি আপনি মালয়েশিয়া, ফিলিপিন বা ইন্দোনেশিয়াতে, সিঙ্গাপুর দেখেন সেটা হলো এক ধরনের রাজনৈতিক ঐক্যমত্যের সমঝোতা আছে। যেটাকে আপনাকে এক ধরনের সুরক্ষা এবং নিশ্চয়তা দিবে যাতে বা যেটা বাংলাদেশের মানুষ বিদেশে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ না করে। ছেলেমেয়েগুলো এই মেধাবী ছেলেমেয়েগুলো দেশে ফিরে আসতে যেন আপনার উৎসাহবোধ করে। তো ওই জায়গাটাতে নিয়ে যাওয়াটা প্রয়োজন করবে। সেহেতু আমি মনে করি এই আমাদের রাজনৈতিকবিদদের থেকে রাষ্ট্রনায়করা যদি বের হন তাহলে এই রাষ্ট্রনায়করা এই চিন্তাটা করে আমাদের দিবেন। সমস্যা হয়ে গেছে আমাদের সমাজে এখন মুরুব্বির অভাব হয়ে গেছে। আগে এই সমস্ত মুরুব্বীরা বলতো গাছ তলায় বসে হ্যাঁ, এখন সেই মুরুব্বীদের আমরা দেখতে পাই না। এখন তো সব ফেসবুক, ব্লগ, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ তার ভেতরে মুরুব্বীরা হারিয়ে গেছে। এটা হলো

আমার ধারণা মুরুব্বীরা থাকলে হয়তো আমাদের এটা বুঝিয়ে বলতেন। আমাদের মুরুব্বীরা বলতেন যে, এই কাজটা কেন বাংলাদেশে হতে পারবে না এখানে তো গত ৫০ বছরে উৎপাদক শ্রেণী, আমাদের পুঁজিপতিরা উদ্যোক্তারা ব্যবসায়ীরাতো অনেক বিকশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানে গেছে। তারা কেনো নিজেদের কথা নিজেরা ঠিকমতো বলতে পারছে না। নিজের শ্রেণীর কথাটা কেন ঠিকমতো বলতে পারছি না। উনারা কি করেছেন দেখেন।। ওনারা কি করেছে দেখেন, উনারা শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করার জন্য ওনারা এমপি হয়ে গেছেন উনারা এমপি হয়ে গেছেন।

কিন্তু ওনারা যে কাঠামোটা তৈরি করেছেন, উনাদের প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানো নির্বাচন হয় না। নির্বাচন যেহেতু হয় না সেহেতু উনাদের জবাবদিহিতার জায়গাটা উনাদের নিজস্ব সদস্যদের কাছে না থেকে যাদের আনুকূল্যে ওনারা হন তাদের প্রতি চলে যায়। তখন আর উনারা কিন্তু ব্যবসায়িক স্বার্থগুলোর রক্ষা করতে পারেন না অর্থাৎ উনি শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়েও তিনি শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা করতে পারছেন না। এটাই হয়ে গেছে সমস্যা।

আমাদের ওই জায়গাতে ফিরে আসতে হবে। আমাদের ধ্রুপদী ধারণাতে ফিরে আসতে হবে। রাজনীতিবিদ রাজনীতি করবে, এবং ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে এবং তার ভিতরে সে তার শ্রেণিস্বার্থকে সামনে নিয়ে যাবে, খেটে খাওয়া মজুর শ্রেণি তাদের কথাগুলো বলবে। এই জায়গাটাতে আমাদের পৌঁছাতে হবে। এই জায়গাটাতে আমি এটা বলে শেষ করি, এটা কিন্তু অসম্ভব নয়। এটার প্রথম ধাক্কাটাই হলো একটা ভালো নির্বাচন। আমি শুধু আপনাকে বলি, বাংলাদেশে মিডিয়ার ভেতরে খুব বেশি আলোচনা হয়নি, যে নেপালে কি হয়ে গেল। এক সপ্তাহ আগে। নেপালে তো এক সরকারের জোট ভেঙে আরেক সরকারের প্রধানমন্ত্রী হলো, নির্বাচন হলো যে সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিলো সে সবচেয়ে বেশি ভোট পেলো। সব সিট পেয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠে একক হয়েও সে দল করতে পারল না সরকার করতে পারল না। দেখুন কিন্তু নির্বাচন খারাপ হয়েছে এই কথা কিন্তু কেউ বলে নাই। তার আগেও কিন্তু নেপালে দু-তিনটা নির্বাচন হয়ে গেছে। কেউ কিন্তু বলে নাই!

আপনি দেখেন পাকিস্তান, কোনো ভালো উদাহরণ নয় কিন্তু পাকিস্তানের বিচারব্যবস্থা এবং পাকিস্তানের নির্বাচন ব্যবস্থা এবং ওটার পিছনে হয়তো সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিল একসময় হয়তো ইমরান খানের সাথে প্রচারে। আমি জানি না, তো নির্বাচনের মৌলিক ফলাফল নিয়ে কেউ বিতর্ক করে নাই। আপনি দেখেন শ্রীলংকার মতো জায়গায় যেখানে আপনার জাতিগত সহিংসতা হয়েছে সেখানে নির্বাচন হয়েছে কিন্তু সেখানে তামিলরা সংখ্যালঘু বা মুসলিমরা সংখ্যালঘু তারাও কিন্তু বলেনি যে নির্বাচনে ভোট দিতে পারিনি বা আগের রাত্রে হয়েছে বা ওই যন্ত্রটা বসিয়েছিলো যে যন্ত্রটা ভোট নিয়ে গেছে। আপনি

দেখেন মালদ্বীপের মতো জায়গাতে যেখানেও আপনার গাইয়ুমের মতো লোক এত বছর বিভিন্ন ধরনের করেছে তারপর দু তিনটে নির্বাচন হলো সেখানেও কিন্তু বদল হচ্ছে। আপনি আমাকে বুঝি বলেন জিল্লুর, আপনি এত লোকের সাথে এত আলোচনা করেন মালদ্বীপ না পাকিস্তান না নেপাল না বা ভারত তো আছেই তারা করছে নির্বাচন। আমরা কি ভিন্ন জাতি হলাম যে সাধারণ নির্বাচনটা নিয়ে আমার এত কষ্ট কেন! এই প্রশ্ন কিন্তু আমার সমাধান আমার জনগণকে দিতে হবে। এই যে আমি ঘুরে আসলাম সকলেই এই কথাটাই বলছে স্থানীয় সরকার বলেন উপজেলা বলেন জেলা পরিষদ বলেন এবং সংসদ নির্বাচন সকলেই মনে করেন যে মানে ইংরেজিতে বলে me Deserve it মানে আমাদের এইটুকু আমাদের প্রতি নাগরিক হিসেবে সম্মান করেন আমাকে ভোট দেয়ার অধিকারটা দিন। এবং আমার উপর আস্থা রাখেন আমরা নিঃসন্দেহে ভালো মানুষকে নির্বাচন করে সামনে নিয়ে আসব। ভালো কাজ করেছে তাকে সামনে নিয়ে আসবো

সঞ্চালক: এবং আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই সাত আট মিনিট সময় আছে। এই যে নির্বাচন নিয়ে আপনি কথা বলছেন রাজনীতি, অর্থনীতি বা সিভিক স্পেইস নানা বিষয় নিয়ে কথা বলছেন। এর মধ্যে আপনি প্রসঙ্গক্রমে বলছিলেন যে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধে এখন রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ঢাকাও ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আমরা যেখানে চীন-ভারতের বৈরিতা সেটি জানি, আমরা চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যেই সম্পর্কের সংকট সেটি জানি আপনার ভূরাজনীতি কতটা প্রভাব ফেলবে ২০২৩ এ বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে। আপনার কাছে একটু বুঝতে চাই করছি যে আপনি সূচনায় উল্লেখ করেছিলাম যে সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের কারো কারো বক্তব্য এটি মনে হচ্ছে যে, তারা আসলে এখন আর প্রতিপক্ষ হিসেবে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকেও দেখতে চাইছেন না। তারা মূলত প্রতিপক্ষ হিসেবে কূটনৈতিক ব্যক্তির বর্গকে, মাঝেমধ্যে নাগরিক শক্তিকে দেখেন। জাস্ট এই জায়গা থেকে একটু জানতে চাই!

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি আপনাকে জিল্লুর ক্ষুদ্র ভাবে বলি। আপনার মনে আছে কিনা আপনার এখানে বসেই আপনাকে তিন চারটির নতুন বিষয় আসছে এবার নির্বাচনে গত বছরই বলেছিলাম ওই ভিত্তি বছরের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেটা হলো যে প্রথমবারের মতো ভূরাজনীতি ভূ-অর্থনীতি বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে একটি চলক হিসেবে আসছে। এটা আগে আমাদের এক ধরনের ভারত সম্পর্কিত ব্যাপার ছিল ভারত বৈরিতা ভারতের পক্ষে ইত্যাদি করেছিল কিন্তু এবার এটার সাথে রোহিঙ্গাদের বিষয়টিও একসাথে এই প্যাকেজের মধ্যে আপনি দেখতে পারেন। আমাদের বুঝার ব্যাপার আছে যে একাতি যুগে বসবাস করছি। মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে পরিবর্তনগুলো হয়েছে। তাদের রাজনৈতিক পরিবর্তন একই রকমভাবে ইউরোপের ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তনগুলো এবং যেই জিনিসটা বের হচ্ছে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতি থেকে সেটা হলো যে যদি কোনো দেশে নির্বাচনী বা

গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা ক্ষেত্রে ঘাটতি ঘটে তাহলে সেই সমস্ত দেশে শুধু উন্নয়নও না শুধু মানবাধিকার না সার্বিক বিশ্ব শান্তির ক্ষেত্রেও এগুলো অসুবিধা সৃষ্টি করে। আপনার চরম বিচার এ গিয়ে হয়তো তারা বলবে পুতিনের যদি আরেকটু বেশি রশিয়াতে যদি গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার জায়গাটা শক্তিশালী হতো তাহলে ওপেন আক্রমণ করার মতো উক্ষেপটা হয়তো তারা নিতো না। এর সাথে নিঃসন্দেহে যুক্ত হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের যে সমস্যাগুলো ইত্যাদি ইদানিংকালে দেখছেন এবং ভারত এখানে দ্বৈত ভূমিকার মধ্যে থাকে। ভারত একদিকে চীনের সাথে মিলে রোহিঙ্গাদের পক্ষে রাশিয়াকে নিয়ে আমাদের বাংলাদেশের প্রস্তাবের সাথে তারা কোনো পক্ষ না নিয়ে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেন। আবার অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্মিলিতভাবে তারা হয়তো চীনের সাথে বৈরীতার ক্ষেত্রে এর বাইরে তো আরেকটি বলয়, আরো দুটো আছে সেটা মধ্যপ্রাচ্য, সৌদি আরব আর ওইখানে আছে। যারা খুব আলোচনার ভেতর নাই কিন্তু নিঃসন্দেহে তারা একটি নিরব চলক তারা এটা একটা সাইলেন্ট একটার হিসেবে নিঃসন্দেহে আছে আরো পাশে জাপানি ইত্যাদি ইত্যাদি মিলে আছে। যেই জিনিসটা বোঝার ব্যাপার সেটা হলো যে সামগ্রিকভাবে আমাদের রাজনৈতিক এই পরিবেশের পরিবেশের ক্ষেত্রে আমরা যে আলোচনাটা করি তা হলো যে তারা যখন এই বিষয়গুলোর দিকে গুরুত্ব দিয়ে মানবাধিকার শোভনমূলক নির্বাচনের বিষয়টি বলে যেই প্রতিক্রিয়া টি দেখাই এই প্রতিক্রিয়াটি অসহিষ্ণু অথবা সেই অর্থে খুব বেশি আস্থাবান রাষ্ট্রের মতো হয় না অনেক সময়। এটার একটা বড় কারণ হলো যারা এই কথাগুলো বলে তারাও এই ব্যাপারে কতখানি পারদর্শী এই ব্যাপারে ভিন্ন ব্যাপার নাম ধরলাম না। কিন্তু এই জিনিসটা বড় ভাবে থাকবে থাকাটার বিষয়টা হলো আমাদের এই আগামীতে প্রতিবেশী দেশের কথা তো বড় করে বলা হয় বাংলাদেশ ওনাদের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ত যদি থাকেও ওনারাও শেষ বিচারে কতখানি ওনাদেরকে আন্তর্জাতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র বলেন ইউরোপ বলেন এগুলোর বাইরে কতখানি করতে পারবে আর দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশে এই পর্যন্ত এরকম বিভিন্ন ধরনের শক্তিকে, অদ্ভুত এক ধরনের ভারসাম্যর ভেতর দিয়ে কিন্তু আমরা এই ১৪ বছর এসেছি এই প্রশংসাটা দিতে হবে এই সরকারকে তারপরেও এখন একটি এমন একটি অবস্থায় আসছে তখন তার কিছু খুব বড় ধরনের মৌলিক সিদ্ধান্তের জায়গায় যাবে এবং নিজের যেমন ধরুন এখন বিদেশি পর্যবেক্ষক আসার বিষয়ে আসছে আসলেই কি এটা কথার কথা নাকি সত্যিকার অর্থে আসবে, এসে কি তারা তিন মাস আগে থেকে পর্যবেক্ষণ শুরু করবে?

এখন পর্যন্ত দেখেন অদ্ভুত একটি ব্যাপার আপনাকে বলি বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনোদিন আমার জানা মতে বুঝতে হয় নাই যেখানে স্থান নাগরিকদের পক্ষ থেকে সমন্বিতভাবে দেশব্যাপী নির্বাচন পর্যবেক্ষণের কোনো উদ্যোগ এবার নাই কেন, কেন সাহস করে ওই জায়গাটাতে এগোচ্ছে না। এরপর পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি হলে পরে

তারা কি ধরনের হবে কিনা এগুলো নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা এখানে রয়ে গেছে। এখন সেক্ষেত্রে নির্দিষ্টি পর্যবেক্ষকরা যদি আসে তার কদিন থাকবে কিভাবে থাকবে নির্বাচনের পরে কতদিন থাকবে কারণ নির্বাচন উত্তর সহিংসতার আশঙ্কাটা থেকে যায় সেটার ক্ষেত্রে কি করবে এই বিষয়গুলো দেখার বিষয়। এইতো আমার বেশকিছু বড় বড় উচ্চপর্যায়ের এখন আসা যাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন দেশ থেকে হচ্ছে একটি দেশ থেকে হচ্ছে না বিভিন্ন দেশ থেকে হচ্ছে। এগুলো হবে কারণ বাংলাদেশ এখন মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে এটা শুধু বাংলাদেশের কারণে না যদি ভূ অর্থনৈতিক কারণে আমরা এক আকর্ষণের জায়গায় বলা আছে উন্নয়নটাকে ধরে রাখা এবং বিশেষ স্বার্থে সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং এটাকে দেশের স্বার্থে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য যে যে পরিস্থিতি পরিবেশ দরকার যে জাতীয় ঐক্যমত্ত দরকার সেই জাতীয় ঐক্যমত্য কিন্তু এই মুহূর্তে দেশে বিরাজ করছে না। সেইটাকে আমাদের বিরাজ করতে হবে। বিদেশীদের সম্বন্ধে যদি আমরা ঠ্যাকা দিতে চাই আমাদের তাহলে আমাদের দেশের ভেতরে ঐক্যবদ্ধ হইতে হবে আমি বিদেশে যে কোনো বিষয়ে কথা বলব আর নিজের দেশের নাগরিকের কথা শুনবো না এটা তো হবে না।

সঞ্চালক: অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ড দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

তৃতীয় মাত্রা, চ্যানেল আই
সঞ্চালনায়: জনাব জিল্লুর রহমান
৮ জানুয়ারি, ২০২৩

বৈশ্বিক চাপ প্রতিরোধে অর্থনৈতিক সংস্কার জরুরি

মোস্তাফিজুর রহমান

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি মোটাদাগে দ্বিবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি— একটি হলো কোভিড থেকে উত্তরণকালীন অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ, অন্যটি হচ্ছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাতপ্রসূত বৈশ্বিক অর্থনীতির বিকাশমান অভিঘাত মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ। বিশ্বের প্রধানতম অর্থনীতিসমূহে মন্দাজনিত প্রলম্বিত কালো ছায়াও এই দ্বৈত চাপ সামলানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য একটি বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি করেছে, বিশেষত রপ্তানি চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে। এই ত্রিমুখী সংকটের কারণে ২০২২ সালের দ্বিতীয় ভাগ ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি ব্যতিক্রমী সময়, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে এককথায় ছিল অভূতপূর্ব। আর এসব সংকট থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই বাংলাদেশকে অগ্রসর হতে হবে ২০২৩ সালে, যার মূলে থাকতে হবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুণগত মান ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। আর এই লক্ষ্যে একদিকে চলমান সমস্যাগুলো দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিতে হবে, অন্যদিকে কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা ও দুর্বলতা অতিক্রম করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কর্মসূচিকে ২০২৩ সালে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিগত সময়ে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতির সম্পৃক্ততা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অর্থনীতির শক্তি ও সক্ষমতার পরিচয় বহন করে। এই সম্পৃক্ততা জোরদার হয়েছে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করে বৈদেশিক পণ্য

ও সেবা বাণিজ্যের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণের মাধ্যমে, বৈশ্বিক শ্রমবাজারে ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে, বড় আকারে বৈদেশিক সহায়তা আকর্ষণ এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সম্পর্কের বহুধাকরণের মাধ্যমে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী অবস্থান থেকে অংশগ্রহণের এই সক্ষমতা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বহুমাত্রিক ও ইতিবাচক অবদান রেখেছে।

তবে বর্তমানের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলার পরিপ্রেক্ষিতে একই সঙ্গে এটাও স্বীকার্য, যেসব দেশের অর্থনীতি বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছে সেসব দেশের সবার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অভিঘাত এক রকম নয়। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, যেসব দেশের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত তারা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সুফল যেমন নিচ্ছে, তার কারণে উদ্ভূত ঝুঁকিও তুলনামূলকভাবে বেশি সফলতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম হচ্ছে।

বাংলাদেশ যে বিগত সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক সূচকের নিরিখে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জন করেছে তা আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। কিন্তু এসব অর্জন বাংলাদেশের জন্য নতুন নতুন চ্যালেঞ্জেরও জন্ম দিচ্ছে, যেগুলোকে 'দ্বিতীয় প্রজন্মের চ্যালেঞ্জ' বলা যেতে পারে। বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততার প্রেক্ষাপটে এই দ্বিতীয় প্রজন্মের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতার ওপর আগামী দিনে বিগত সময়ে অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও টেকসই করা অনেকাংশে নির্ভর করবে। আর চলমান অর্থনৈতিক সংকট এটাই দেখাচ্ছে যে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনেক কিছু করার আছে। তথ্য-উপাত্ত-গবেষণাভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাভিত্তিক বাস্তবায়ন ও সুশাসনভিত্তিক উন্নয়ন দর্শন— এই তিনটি হতে হবে উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রজন্মের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মূল অস্ত্র। আর এই তিন করণীয়কেই আগামী দিনে প্রাধান্য দিতে হবে বাংলাদেশকে।

উদাহরণস্বরূপ, চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির নিরিখে বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিময় হার ব্যবস্থাপনার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। দেশের অর্থনীতিবিদরা বেশ কয়েক বছর ধরে বলে আসছিলেন যে বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার মান অতিমূল্যায়িত অবস্থানে আছে, যার কারণে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য প্রতিযোগিতাসক্ষমতা হারাচ্ছে এবং রেমিট্যান্সের একটি অংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলে চলে যাচ্ছে। এই আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক ছিল তা বলা যাবে না। আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি মোকাবিলার জন্য মুদ্রা সরবরাহসহ আর্থিক নীতির অন্যান্য হাতিয়ার, এবং তার সঙ্গে আমদানি শুল্ক, রাজস্বনীতি, ভর্তুকি ও সামাজিক সুরক্ষা নীতির সমন্বয়ে মূল্যস্ফীতির চাপ হ্রাস এবং প্রান্তিক ও স্থির আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে যখন মূলত বৈশ্বিক মূল্যবৃদ্ধির

কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ সৃষ্টি হলো, তখন কিন্তু টাকার একটা বড় ধরনের অবমূল্যায়নের সিদ্ধান্তই গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হলো। যে আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতির চাপের ভয় করা হচ্ছিল সেটা ভর করল দ্বিবিধ শক্তি নিয়ে বৈশ্বিক বাজারে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধজনিত মূল্যবৃদ্ধির চাপ, যার সঙ্গে যুক্ত হলো টাকার বিনিময় হারের অবমূল্যায়নজনিত মূল্যবৃদ্ধির চাপ। খাপ খাইয়ে নেওয়ার যে সুযোগ ও সময় অর্থনীতির প্রয়োজন ছিল তার অনুপস্থিতিতে মূল্যস্ফীতির চাপ ভোক্তাস্বার্থ ও বিনিয়োগ— দুটির ওপরই নেতিবাচক প্রভাব ফেলল।

দ্বিতীয় বিচার্য বিষয় হলো, এ ধরনের প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের উচ্চহার হতে পারত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার অন্যতম হাতিয়ার। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বৃদ্ধির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ এবং রাজস্ব-জিডিপি ও কর-জিডিপি হার বৃদ্ধির জন্য যে সক্রিয় উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল সেক্ষেত্রে দুর্বলতার কারণে তা লক্ষ্যমাত্রার অনেক নিচে থেকে গেছে। সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১৪ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও প্রকৃত হার ৯ শতাংশের আশপাশেই বেশ কয়েক বছর ঘুরপাক খাচ্ছে। মনে রাখা দরকার, দক্ষিণ এশিয়ায় এই গড় হার বাংলাদেশের প্রায় দ্বিগুণ। পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে বাজেট ঘাটতি রাখা যেত শূন্যে, অথবা সরকারি ব্যয় যা জিডিপির ১৫ শতাংশের কাছাকাছি এবং প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, সেটা অনেকাংশে বৃদ্ধি করা যেত। বৈশ্বিক অর্থনীতির টানাপোড়েন এবং আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতির চাপ সামাল দিতে যে বর্ধিত অর্থায়ন, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত ভর্তুকির চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেও সম্পদ যোগান সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হতো।

তৃতীয় বিষয়টি বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত। বাজার ব্যবস্থাপনা ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে দুর্বলতার কারণে আমদানি স্তর থেকে ভোক্তা স্তর ও উৎপাদন স্তর থেকে ভোক্তা স্তরে দামের যে বৃদ্ধি তা মূল্যস্ফীতির চাপ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর প্রতিকারে বাজার ব্যবস্থাপনা আরো দক্ষ করতে হবে, মুক্তবাজার ব্যবস্থার পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও কম্পিটিশন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নজরদারি ও খবরদারি বৃদ্ধি করতে হবে। এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে ‘গুড ভ্যালু্য ফর মানি’ নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ও কর্মকাণ্ডে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুর্নীতি, অপচয়, বিলম্বিত বাস্তবায়ন ও বিনিয়োগ প্রকল্পের অযৌক্তিক ব্যয় বৃদ্ধির দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে ঘোষিত রাজনৈতিক অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন।

দেশের অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা অনেক দিন ধরেই স্বাধীন ব্যাংকিং কমিশন গঠন, রাজস্বক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা, ব্যাংকের সঞ্চয়

ও ঋণ-সুদ হার ও টাকার বিনিময় হারের বাজারমুখী সমন্বয়, সরকারি ব্যয় সংস্কার, ভর্তুকি ও প্রণোদনা পর্যালোচনা ও পুনর্বিন্যাসসহ বেশকিছু পদক্ষেপের কথা বলে আসছেন। আইএমএফের শর্তের কারণে নয়, আমাদের সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে আমাদেরই প্রয়োজনে এবং আগামী দিনের অর্থনীতির চাহিদার নিরিখে। ২০২২ সালের অভিজ্ঞতার আলোকে ২০২৩ সালকে অর্থনৈতিক সংস্কার, সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির বছর হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। সরকার প্রণীত 'রূপকল্প ২০৪১'-এ বাংলাদেশকে আগামী দুই দশকের মধ্যে একটি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব দেশ হিসেবে রূপান্তরের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে দ্বিতীয় প্রজন্মের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের এখনই সময়।

কালের কণ্ঠ
১০ জানুয়ারি, ২০২৩

ইউক্রেন যুদ্ধ না হলে আমার সোনার সংসারে আগুন লাগতো না

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন ইনসাইডে। আজকে আমরা আলোচনা করবো ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসের বিষয়াদি নিয়ে। আমরা জানি যে, এই ছয় মাসের মধ্যে রেকর্ড মূল্যস্ফীতি হয়েছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে খানিকটা সুবাতাস ছিল কিন্তু রেমিট্যান্স প্রবাহ প্রত্যাশা অনুযায়ী ধরে রাখা যায়নি। সবকিছু মিলিয়ে আমরা দেখেছি যে, প্রবৃদ্ধির যে প্রক্ষেপণ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, দেশীয় যারা প্রক্ষেপণ করে থাকেন তারাও কমিয়ে দিয়েছেন। একই সাথে দেখেছি ২০২৩ এ বৈশ্বিক অর্থনীতি কেমন যাবে— তারও কিছু আভাস দিয়েছে আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক। তার প্রেক্ষিতে আসলে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জগুলো কি কি? ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মানীয় ফেলো সিপিডি এবং অর্থনীতিবিদ আমাদের আজকের অতিথি।

সঞ্চালক: আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা খাতভিত্তিক মূল্যায়নে যাবো। প্রথম ছ'মাসের পরিস্থিতি যদি দেখি তাহলে, সাধারণভাবে আমরা যে প্রক্ষেপণগুলো করেছি, সেগুলো পুরোপুরি অ্যাচিভড হয়নি। তারপরও, অন্য বছরের সাথে এ বছরের পার্থক্যটাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ আপনাকে। ২২-২৩ অর্থবছর একটি জটিল বছর হবে এটা বাজেট উপস্থাপন প্রাক্কালেই আমরা অনুমান করেছিলাম। এবং পরবর্তীতে বৈশ্বিক পরিস্থিতি আরো সেই অর্থে মন্দামুখী হওয়ার কারণে এবং ইউক্রেন যুদ্ধ অব্যাহত থাকার পরিস্থিতিতে এই অর্থনৈতিক প্রবাহ যে আরো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে, এটা আন্দাজ

করা গেছিল। কিন্তু যেটা বোঝা যায় নি প্রথমে যে, অর্থবছরের প্রথম ছয় মাস যে এতখানি আমাদের সমস্যার মধ্যে ফেলবে। গত ছয় মাসে যদি আমরা উত্তরে-পর সময়টুকু দেখি, জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত, তাহলে আমাদের অর্থনীতির মূল যে সমস্ত সমীকরণ আছে, সেসবগুলোর ক্ষেত্রেই কিন্তু নেতিবাচক পরিস্থিতি বিদ্যমান। আমি বাকি ছ'মাসের আলোচনা এখন না করি। কিন্তু পিছনে যদি ফিরে যাই, তাহলে আমরা দেখি যে এই সময়কালে রাজস্ব প্রবাহ কিছুটা বাড়লেও যে পরিমাণে এই মুহূর্তে সরকারের অর্থের চাহিদা সেই চাহিদা মেটানোর মতো তার পরিস্থিতি নাই। সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভ্যাট আহরণের ভেতর দিয়ে এটাকে পূরণের চেষ্টা চলছে। আয়কর কিছুটা বাড়লেও, আগের বছরের মতো বাড়েনি। এটাই স্বাভাবিক, বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি না থাকলে আয়করের ক্ষেত্রে এটা আসবে। যারা চাকরিজীবী, যারা স্বচ্ছ আয়ের ভেতরে আছে, তাদের ওপরেই এটার মূল ভার বর্তেছে। মধ্যবিত্তের যে এই মুহূর্তের বিশেষ চাপ, সেটার আরেকটা প্রতিফলন হিসেবে এটা এসেছে। রাজস্বের ক্ষেত্রে যেটা আরো বোঝার ব্যাপার সেটা হলো, সরকারের তো এই সময়ে ব্যয়ের চাহিদা প্রচুর বেড়েছে।

যখন কোনো অর্থনীতিতে মন্দা থাকে, তখন যে কোনো সরকার ব্যয় করার মাধ্যমে বাজারকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করে এবং বিভিন্ন ধরনের লক্ষ্যনির্দিষ্ট ব্যয়ের মাধ্যমে যারা অসুবিধাগ্রস্ত, তাদেরকে বিভিন্ন সহায়তা দিয়ে থাকে। তো সেই লক্ষ্য থেকে সরকারের এই পরিস্থিতি। সরকারকে অবধারিতভাবে ব্যয় সংকোচন নীতিতে যেতে হয়েছে। এবং এই নীতিগুলো শুধু যে উন্নয়ন প্রকল্পে হয়েছে; আমরা জানি গুরুত্বে বিচারে বিভিন্ন স্ল্যাব করা হয়েছে, এবং যেগুলোকে এই মুহূর্তে স্থগিত করা যায় সেগুলো করা হয়েছে। তারপরও, উন্নয়ন ব্যয়ের চাপটা রয়েই গেছে কিছুটা। বিশেষ করে যদি আমাদের বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করতে হয়, তার পরিপূরক হিসেবে স্থানীয় মুদ্রাও দিতে হয়। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আমাদের পরিচালন ও রাজস্ব ব্যয় অনেক বেড়েছে। কারণ হলো, একদিকে ভর্তুকির ব্যয় বেড়েছে, অন্যদিকে, সুদ ও বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ ঋণের জন্য এবং বৈদেশিক ঋণের প্রবাহটাও বেড়েছে। এর ফলে, যেটা হলো, যে উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রেও যেটা দেয়ার ছিল, সেটাও আমরা দিতে পারিনি। শেষ বিচারে গিয়ে, আমাদের আর্থিক খাতের যে ঘাটতি, সেটা বাড়লো। আপনি সুযোগ দিলে আমি আরেকটা বিষয় উল্লেখ করবো, এই যে ঘাটতি বৃদ্ধি পেলো, সেটা জেনে খুব দুশ্চিন্তা করার মতো তা না। কিন্তু দুশ্চিন্তা হলো, আর্থিক ঘাটতির যে অর্থায়ন করা হলো, সেটার জন্য প্রথমে ব্যাংক থেকে নিলো টাকা। এখন নেয়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে; যেটাকে বলি হাই পাওয়ারড মানি। সে কারণে, ব্যাংকে ব্যক্তিখাতে ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে তারল্যে টান পড়ে গেলো। সেটা আবার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো।

সঞ্চালক: মূল্যস্ফীতি যেটা গরিব মানুষের জন্য সবচেয়ে সমস্যার ছিল। দ্বিতীয়টা হলো ব্যাংক খাতের সমস্যা, যেটা এই ছয় মাসে আরো প্রকট হয়েছে। আপনার কি মনে হয়, দীর্ঘদিন ধরে যে সংস্কার, সুশাসনের কথা আপনারা বলছেন, সরকার কি এদিকে মনোযোগ দেয়নি বা কম দিচ্ছে? যে কারণে আমাদের এ ধরনের অপ্রত্যাশিত খবর দেখতে হচ্ছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মূল্যস্ফীতির বিষয়ে বলতে গেলে, পুরো মূল্যস্ফীতির কারণটা কি? পুরোটাই কি আমদানিজনিত কিনা বা টাকার মূল্যমানের কারণে কি না দেখতে হবে। আমাদের বিচারে, সেটা দিয়ে পুরোটা ব্যাখ্যা করা যাবে না। বাজার ব্যবস্থার ভেতরে সুশাসনের অভাব, অব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন সময়ের তথ্য প্রবাহ ঠিকমতো না হওয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রাক্কলন ঠিক না হওয়া; এ সমস্ত কারণে মূল্যস্ফীতি বড়ভাবে হয়েছে। আমরা যেটা বলি না, মূল্যস্ফীতিটা খাদ্য মূল্যস্ফীতিতে হয়েছে এবং বেশি হয়েছে গ্রামে। এটা বাংলাদেশের জন্য একটা ভিন্ন অভিজ্ঞতা যে, গ্রামে বেশি হচ্ছে; খাদ্য এবং খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের বেলায়ও বাড়ছে। এটা কেনো হবে এবং এটার প্রভাবও আমরা দেখি। সরকারের সংগ্রহ অভিযানের সময়ও আমরা দেখি চালের দাম, ধানের দাম খুব ওঠানামা করছে, সেখানে কোনো স্থিতিশীলতা নেই। সরকারের মজুদ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী থাকার পরও আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। অন্য বিষয় যেটা এসেছে, ব্যাংকিং খাতের কথা। আগে তো আমরা চুরির আলাপ করতাম, এই ছয় মাসে ডাকাতি হয়েছে! ডাকাতির পরিমাণ এতো লক্ষ কোটি টাকার মাধ্য বিভিন্ন ভুয়া প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এটা হয়েছে। এই খাতের সংস্কারের জন্য যে সমস্ত কথা বলা হয়, আমার ধারণা এটা কার্যকর হবে না। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিষয়ে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে রাজনৈতিকভাবে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার ব্যাংকের যারা পরিচালনায় থাকেন তাদেরও ক্ষমতা সীমিত এবং যারা এখানে পরিচালক হিসেবে মালিক আছেন, তাদেরও অসীম বিভিন্ন ক্ষুধা এখানে আছে। সেগুলো ব্যবহারে এটা হয়। এখানে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই বড় বিষয়। আর কোনো টেকনিক্যাল সমাধান এখানে আছে বলে মনে হয় না।

সঞ্চালক: নিজেও তো ব্যাংকিং পরিচালনা বোর্ডে ছিলেন। আপনার সময় এবং এখনকার সময় মেলাতে গেলে, পার্থক্যটা কোথায়? কেনো এ ধরনের অনিয়মগুলো হচ্ছে বা বাড়ছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন আমি তো আওয়ামী লীগ আমলে ১৯৯৬ থেকে ২০০০ চার বছর ব্যাংকিং বোর্ডে ছিলাম। সে সময় কিবরিয়া সাহেব যখন মনোনয়ন দিতে উনি পেশাদারিত্বের দিকে মনোযোগ দিতেন, তাদের সততার দিকে মনোযোগ দিতেন। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের কোনো ব্যবসায়িক স্বার্থ আছে কি না, সেটা মনোযোগ দিয়ে

দেখতেন। কারণ, আপনার যদি ব্যবসায়িক স্বার্থ থাকে আর আপনি যদি ব্যাংকিং খাতের ভেতরে যুক্ত থাকেন; আমরা বলি কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট অর্থাৎ স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। এই যে মনোনয়নগুলো হয়েছে ব্যাংকিং খাতে, যারা এসেছেন তারা যে ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষক দিতে হয়েছে। সেখানে স্বাধীন পরিচালককে দিতে হয়। সেটার নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন আছে। আমি আপনার কাছে ফিরে আসি, শেষ প্রশ্ন নিয়ে, সেটা হলো যে সরকারের পক্ষ থেকে বা সাধারণভাবে সংস্কারের দিকে যাওয়ার কোনো ইচ্ছা আছে কি না। আমি মনে করি না। কারণ কি, আপনি সরকারের এই মুহূর্তের অর্থনৈতিক সঙ্কট বলেন, সমস্যা বলেন, চাপ বলেন, সেটাকে কিভাবে সরকার ব্যাখ্যা করে? সরকার সর্বদাই বলে, বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে। সরকারের মূল ব্যাখ্যাটাই হলো যে, ইউক্রেন যুদ্ধ যদি না হতো, তাহলে আমার সোনার সংসারে আগুন লাগতো না। আর যদি ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে যেনো আমার সোনার সংসার আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। এটা তো একটা ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, আপনি যদি লক্ষ্য করে দেখেন, যে সমস্ত সমস্যা এখন আছে, সেগুলোর সবই শুরু হয়েছে ইউক্রেন যুদ্ধের অনেক আগে। ব্যাংক খাতের তছরুপ-এ তো ইউক্রেন যুদ্ধের আগে। পুঁজিবাজারের অন্যায্য আচরণ— এটাও যুদ্ধের আগে। কর আদায়ের হার যে এতো নিচে, এটাও যুদ্ধের অনেক আগের। আপনি যে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা, এটাও যুদ্ধের আগের। আর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ পড়ে যাওয়ার প্রবণতা শুরু হয়েছে অক্টোবরে, অথচ যুদ্ধ ফেব্রুয়ারিতে।

ফলে, এই ব্যাখ্যা দিয়ে আপনার অস্বীকারের মনোভাবই রয়ে গেলো। এখন আমাদের মতো অভ্যন্তরীণ দেশের মানুষের দেশের কথা যদি না শুনে সরকার, তাহলে শেষ বিচারে সে এমন একটা সঙ্কটের মুখোমুখি হয় তাহলে বিদেশিদের কথা তাদের শুনতে হবে। এখন আইএমএফের কথাও সরকারের শুনতে হবে। বিশ্বব্যাংকের কথাও উনার শুনতে হবে। সে কথা শুনে উনি কর-জিডিপির হার বাড়াতে চাইবেন, বিভিন্ন ধরনের বিনিময় হারকে একীভূত করার চেষ্টা করবেন। উনি যেখানে নয় শতাংশ মূল্যস্ফীতি সেখানে আপনি আমানতের হার ছয় শতাংশ রেখেছেন। এতো বড় অন্যায় সঞ্চয়কারীদের বিরুদ্ধে' সেটা আপনি এখন সংশোধন করবেন। একইভাবে বিভিন্ন ব্যাংকে স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা করবেন। এটাই হলো দুর্ভাগ্য আমাদের। অর্থনৈতিক সংস্কারের বিষয়টি, যেটা আমাদের জাতীয় বিষয় হওয়ার কথা ছিল আমাদের, সেটা এখন বৈদেশিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে জিম্মি করে দিলাম।

সঞ্চালক: এর মধ্যেও আমরা দেখলাম, একক মাস হিসেবে রপ্তানিতে রেকর্ড হয়েছে। রেমিট্যান্সের প্রবাহও বলা যায় মন্দের ভালো। তাহলে কি খারাপের মধ্যেও ভালো কিছু দেখা যাচ্ছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন, আমরা অর্থনীতিবিদরা যে কোনো একটা সূচককে যখন বিশ্লেষণ করি, তখন অন্যান্য সূচকের সম্পর্কও আমরা বিশ্লেষণ করি। যদি রপ্তানি এতো ভালো হবে, তাহলে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ছে কেনো? রপ্তানির টাকা তাহলে গেলো কোথায়?

সঞ্চালক: আমার তো আমদানিও বাড়ছে...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটাই হলো বোঝার বিষয়। আপনি যে রপ্তানি দেখছেন, ওটার মধ্যে তো আমদানিকৃত পণ্য বেশি। ওগুলোর দাম বাড়ার কারণেই আপনার রপ্তানির পরিমাণ বড় হয়েছে। প্রকৃত উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা বা মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে আপনার রপ্তানি বাড়েনি। মজুরি বাড়ার ক্ষেত্রেও এটা হয়নি। সেহেতু, যারা শুধুমাত্র রপ্তানির অংশটা দেখে, কিন্তু নিট রপ্তানিটা দেখে না; আমদানিটা বাদ দিয়ে, সেহেতু এই সময়ে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে। একইভাবে রেমিট্যান্সের কথা বলি। বহু আগে বলেছিলাম যে, রেমিট্যান্স আয়ের যাদু শেষ হয়ে যাচ্ছে। এটা এখন বিভিন্নভাবে বাড়বে, কমবে ইত্যাদি। এটার ওপর স্থায়ীভাবে নির্ভর করতে হলে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন করতে হবে। উচ্চমান সম্পন্ন শ্রমিক পাঠাতে হবে এবং নতুন বাজারে যেতে হবে। কিন্তু যেটা লক্ষ্যণীয় বিষয়, রেমিট্যান্স বাড়লো আমাদের, কিন্তু চলতি হিসাবে ঋণাত্মক আরো বেশি হয়ে গেলো। এতো যদি রেমিট্যান্স বাড়বে, তাহলে চলতি হিসাবে ঘাটতি কেনো? সেহেতু যে দুইটা সুখবর ছিল, সেটা এতো বেশি সুখবর হয়নি যেটা আমার পুরোনো দুঃখতে অবলোপন করে দিবে। রবং সেটা রয়েই গেছে। এই সময়ে আমার রাজস্ব ঘাটতিও বেড়েছে, বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও ঘাটতি বেড়েছে। যার প্রমাণ হলো মুদ্রার মজুদ পড়ে যাচ্ছে এবং টাকার মূল্যমান ২৫ শতাংশের বেশি কমে গেছে।

সঞ্চালক: আপনি আগে উল্লেখ করেছেন যে, আমরা বাস্তবায়নে আরো বেশি গতি আনতে বা সময়মতো কাজ শেষ করার জন্য স্ল্যাব করে দিয়েছি। যাতে ব্যয়ও কমে। কিন্তু এখন যদি আমরা প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা দেখি, আমি নিজে বলতে চাই না, আপনার পর্যবেক্ষণ জানতে চাই।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি তো একটু বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নিয়ে আলোচনা করলেন। গত অর্থবছর ধরে অর্থনীতিবিদরা, উদ্যোক্তারা এলসি খোলা যাচ্ছে, ইত্যাদি বিষয়ে অনুযোগ এসেছে। আপনারাও এটা নিয়ে অনেক বড় করে সামনে নিয়ে এসেছেন। এটা ঠিক। কিন্তু আমি সবসময়ই বলেছি, এটা যতখানি না ডলারের সঙ্কট, তার চেয়ে অনেক বেশি টাকার সঙ্কট। কারণ, সরকারের এ রকম একটি মন্দামুখী বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে সংস্কারহীন জাতীয় অর্থনীতিতে আপনাকে এই সময়ে, খরচ করার ক্ষমতাই আপনাকে নিরূপণ করে দিবে, আপনি এটা টেকসই করতে পারবেন কি না। এই মুহূর্তে যে

ঝড়ঝঞ্ঝা আছে, আমি পাড়ি দিতে পারবো না। লক্ষ্য করে দেখেন, যে সকল প্রকল্পগুলো রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেগুলো টাকার সংস্থান এই মুহূর্তে সরকার করতে পারছে না। বাংলাদেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ছিল, এগুলোর ঠিকাদারদের টাকা এখন শোধ করা যাচ্ছে না। সরকার রাজস্ব অর্থায়নে যেসব প্রকল্প ছিল সেগুলোর অর্থায়ন ৫০ শতাংশ বন্ধ করে দিয়েছে। ওই টাকা যদি ঠিকাদাররা না পায় তাহলে আগামী যে ছয় মাসের কাজ, সেটা করতে পারবে না। কারণ তাদেরও তো ঘাটতি রয়েছে। সঞ্চয় দিয়ে তো আর কেউ ব্যবসা করবে না। ব্যাংক থেকেও অর্থায়ন হচ্ছে না কারণ, তাদের পরিস্থিও নাজুক। সেক্ষেত্রে এটা যে আগামী ছয় মাসে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান বা সংযোগ শিল্পের ওপরে আঘাত হানবে। সরকার এখন হয়তো যেটা করতে পারে বা করছে, সেটা হলো টাকা ছাপানো। টাকা ছাপিয়ে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে টাকা নিলে, আজ হোক বা কাল হোক, তা মূল্যস্ফীতির ওপর আরো চাপ তৈরি করবে। এখন সরকার হয়তো এটাকে রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করছে। আমরা তো অর্থনৈতিক বিষয়গুলো আলোচনা করছি। কিন্তু এটা তো একটা অব্যয় ব্যাপার না, এটার কোনো শূন্যতা ভেতরে হয় না। এটা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতার ভেতরে হচ্ছে। আমরা নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। একটা প্রাক-নির্বাচনী বছরে আছি। তাই সরকারের একটা হিসাব থাকবে, এই মুহূর্তে স্থিতিশীলতাটাকে ন্যূনতম পর্যায়ে রক্ষা করে আগামী নির্বাচনে যাবে।

এই প্ল্যাটফর্ম থেকে তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেগুলো তারা সঠিকভাবেই করেছে। ব্যয় সঙ্কোচন, আমদানি নিয়ন্ত্রণ, সরকারি ব্যবস্থাপনা- সবকিছুতেই রাশ টানা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো, এই সঙ্কোচনের ফলে যেটুকু সাশ্রয় হবে, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। কারণ, ঘাটতিটা অনেক বড়। উল্টো যে সমস্যাটা হচ্ছে তা হলো, এই সঙ্কটের মধ্যে সুরক্ষা দিতে পারছি না। কারণ, টাকার পরিমাণ বাড়ানো যায়নি, আওতাও বাড়েনি। সরকারের পক্ষ থেকে তিন কোটি মানুষকে যে অর্থায়ন করা হবে বলা হয়েছিল, সেটারও কোনো তথ্য উপাত্ত এবং মূল্যায়ন নাই। এই ধরনের সমস্যার ভেতরে সরকার আছে। আমি যেটা বলতে চাই, এই মুহূর্তে সরকারের যে আকাঙ্ক্ষা, যে পদক্ষেপ আমি মনে করি সঠিক। এটার কোনো সমালোচনা আমি করছি না। দেরিতে হলেও কিছুটা হচ্ছে। কিন্তু যেটা হচ্ছে, সেটা খাপছাড়াভাবে এবং সমন্বয়হীনভাবে হচ্ছে। এবং আগামী দিনের সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টি করতে পারছে না। এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে এমনভাবে স্বচ্ছতার সাথে দিতে হয়, যাতে বাজার আপনার কথা শুনে। রাষ্ট্র বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করবে, বাজার রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে না। কিন্তু সেজন্য যে উপাদানগুলো লাগে তা সরকার ঠিকমতো দিতে পারছে না। তার একটা বড় কারণ হলো, ব্যবস্থাপনা, প্রণয়ন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নেতৃত্ব দেখছি না। আপনি দেখেন, পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার নেতৃত্ব কে দিচ্ছেন? এটা প্রধানমন্ত্রী দিচ্ছেন। এটা উনার কাছ থেকে

আসছে। অথচ, একটি সংসদীয় গণতন্ত্রে একজন অর্থমন্ত্রী থাকেন, পরিকল্পনামন্ত্রী থাকেন, বিদ্যুৎমন্ত্রী থাকেন; আমি সে আলোচনা তো করলামই না এটার ভেতরে। এই সমন্বিত চিত্রটা আমাদের সামনে আসছে না। এটার জন্য আস্থা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে না। সরকারের পদক্ষেপ দিকমুখী আছে। চেষ্টাও ঠিক আছে। আইএমএফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা নেয়াটাও খারাপ কিছু না। কিন্তু এটাকে সম্পূর্ণভাবে, সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য যে ধরনের সমন্বিত পদক্ষেপ দরকার, যে ধরনের আলোচনা দরকার সেই সম্পৃক্তিটা এই মুহূর্তে নেই।

সঞ্চালক: আমি দুটো বিষয় আপনার নজরে আনতে চাই। প্রথমত, নির্বাচনী বছরে স্বাভাবিকভাবে অর্থনীতিতে একটা ঝুঁকি, চ্যালেঞ্জ থাকে। সেটা উদ্যোক্তাদেরকে কিভাবে চিন্তায় ফেলে। দ্বিতীয়ত, আইএমএফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেছে ২০২৩ সালে বৈশ্বিক পরিস্থিতি খুব বেশি ভালো যাবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের রপ্তানি-রেমিট্যান্স, যতটুকু প্রত্যাশা করছি, ততটুকু আসবে কি আসবে না?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রথম কথা হলো, দেশের ভেতরে নির্বাচনী বছর যখন আসে, আমাদের অভিজ্ঞতা বলে সে সময় টাকা পাচার বৃদ্ধি পায়। সে সময়ে যদি দেশের ভেতরে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির আশঙ্কা আরো বাড়ে, সেক্ষেত্রে অনেক বেশি এই প্রবাহ শক্তিশালী হয়। এর সাথে যদি নীতিমালার সমন্বয় না থাকে, তাহলে আরো বেড়ে যায়। সে সময় যদি নীতিকৌশলও ঠিক না থাকে, মানে টাকার মান যদি ঠিকভাবে রাখা না যায়; তখন সেটা আরো বেড়ে যায়। বাংলাদেশে এখন সেই সমস্যার তিনটিই বিদ্যমান। তার ফলে আমরা দেখছি যে, বিনিয়োগকারীরা যারা দেশের ভেতরে করছেন তারা সে প্রকল্পগুলো শেষ করার ক্ষেত্রে আর্থিক অসুবিধায় আছেন। তারা সকলেই আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার কোটার মধ্যে পড়ে গেছেন। তার মানে এখানে এক ধরনের সীমিতভাব আছে। সীমাবদ্ধতা আছে। একদিকে অর্থপাচারের আশঙ্কা করছি, অন্যদিকে আমরা দেখছি যে এই সমস্ত প্রকল্প শেষ করার ক্ষেত্রে তাদের যে বিনিয়োগটা বৈদেশিক মুদ্রায় করার কথা সেটা তারা পারছেন না। লক্ষ্য করে দেখবেন, এই সময়ে যে সমস্ত দেশীয় উদ্যোক্তারা বিদেশি টাকা এনেছিলেন অর্থাৎ, বিদেশি মুদ্রায় ঋণ করেছিলেন, তাদের অবস্থা আরো খারাপ। আপনার সাথেই আমি বহুবার বলেছিলাম, বিনিময় হারের বড় ধরনের ঝুঁকি থাকে। আবার সেই সোনার সংসারের গল্প। টাকা সবসময়ই একই রকম থাকবে, এর কোনো ওঠানামানা হবে না— এটার কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নাই। এখন যা হয়েছে, আপনি নিয়েছেন হয়তো ৬০ টাকা ডলারে, এখন আপনাকে দিতে হবে ১১০ টাকা। তো সেই সামর্থ্য তো আপনার নাই। এজন্য অনেক ক্ষেত্রেই অনাদায়ী হয়ে যাবে। ব্যক্তিখাতে যদি থাকে তাহলে, ক্রেডিট রেটিংয়ে সমস্যা হয়। সেহেতু এটার একটা সমস্যা হলো যে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটা বড় প্রভাব থাকবে। বিশেষ করে যারা মজুরি শ্রমিক

আছেন, তাদের ক্ষেত্রে বেশি হবে। আর আপনি যে বলছেন, বৈশ্বিক মন্দার যে কারণ, একটা সুবিধা যে ছিল, পণ্যমূ্যলের পতন যদি হয়। তেলের দাম কমলে আমাদের ব্যয় কিছুটা কমে। সেটার উল্টো হিসাবও আছে। তাহলে আবার মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমার আয় কমবে, কাজ হারাবেন অনেকে। কিন্তু ঘটনা হলো, এ বছর তো গত বছরের চেয়ে দ্বিগুণ শ্রমিক গেছে বিদেশে। তাদের আয় কিন্তু আসছে না। এটা আবার বোঝার ব্যাপার।

বিনিময় হারের যে দ্বৈততা, আমদানি, রপ্তানি এবং রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে; আবার প্রণোদনাও দেয়া হলো। কিন্তু এটা যে টেকসই না, সেটাও তো প্রমাণিত হয়েছে। আসলে এই প্রক্রিয়া আমরা কিন্তু পাকিস্তান আমলে পাট রপ্তানির ক্ষেত্রেও দেখেছিলাম। বাজারের সাথে এখন এতো পার্থক্য হয়ে গেছে যে, আড়াই শতাংশ দিয়ে তাদের মন ভরবে না। ওই যে এতো মানুষ গেছে, তাদের টাকা আসছে কি না আমরা জানি না। ওই টাকা যদি না আসে, এটা যতখানি মজুদের সমস্যা তার চেয়ে বেশি হলো দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়। কারণ ওই টাকাটা যাদের কাছে আসে গৃহস্থালিতে, সেই খরচের ফলে বাংলাদেশের ভোগ চাহিদাটা চাঙ্গা হয়। যেই বছরে বিনিয়োগের অবস্থা স্তিমিত হয়, সেই বছরগুলোতে ভোগ চাহিদাকে আরো বেশি চাঙ্গা করতে হয়। সেটা সরকারি ব্যয়, বিদেশি আয় কিংবা বিদেশি অর্থায়নের প্রকল্প দিয়ে। সেটা হচ্ছে কি না, আমাদের বোঝার ব্যাপার। সেজন্য সরকারের হাতে তো তথ্য নেই। এই রকম একটি নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশ্বের সব দেশেই সর্বশেষ তথ্য যাচাই করা হয়। সেটা আমাদের হাতে নেই বলে, যেসব পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তার কাঙ্ক্ষিত ফল আসছে না। সরকারের তথ্য-উপাত্তের প্রতি এক বছরের অন্ধত্ব আছে। নৈরাজ্যও আছে। কারণ হলো, ওই তথ্য উপাত্ত থাকলে দেশের ভেতরে আবার স্বচ্ছতা চলে আসে। যা তারা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করলে, এক সময় তাদেরই শিকারে পরিণত হতে পারেন। বাংলাদেশ এই মুহূর্তে দ্বৈত উত্তরণের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। প্রথম হলো উন্নয়নের উত্তরণ। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হতে হবে, উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে এবং একই সাথে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য ৫/৬ বছর দিতে হবে। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে উত্তরণের যে ধারাবাহিকতা দরকার এবং অর্জনগুলো টেকসই করতে হলে, বড় ধরনের নেতৃত্বমূলক ধাক্কা দেয়া প্রয়োজন। আবারও বলছি, আকাঙ্ক্ষার অভাব নেই। কিন্তু সামর্থ্যটা হচ্ছে না। কারণ হলো, সময়মতো সংস্কারগুলো করা হয়নি। সময়মতো আমার দেশের মানুষ, যারা বিশ্লেষণ করেন তাদের কথাগুলোতে মনোযোগ দেইনি। একটা অস্বীকারের মনোভাবে ছিলাম আমরা। আমরা তো বীরের জাতি, আমাদের সমস্যা হবে না। কিন্তু দেখুন, সমস্যায় তো উপনীত হয়েছি। আর এর সাথে এখন যুক্ত হয়েছে গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রশ্ন। কেউ বলে নির্বাচনী উত্তরণ। আমি গণতান্ত্রিক উত্তরণ বলি। এই গণতান্ত্রিক এবং উন্নয়নের উত্তরণ— এই দুটোকে সমন্বিতভাবে এই অর্থবছরের ভেতরে আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজন পড়বে। অনেক বেশি সুস্থভাবে, স্থিরভাবে, রাজনীতির

ঊর্ধ্বে থেকে সমাধানগুলোকে চিন্তা করতে হবে। কী ঝুঁকি আছে তা আমলে নিতে হবে। কিন্তু স্থিতিশীলতা যদি না থাকে, তাহলে রাজনৈতিক ঝুঁকি আরো বাড়বে। যদি বৈদেশিক মন্দার কারণে রপ্তানি যদি পতন হয় আর পোশাক শ্রমিকরা যদি কাজে থাকতে না পারেন, যদি কারখানা বন্ধ হয় তাহলে চিন্তা করেন কী ধরনের অর্থনৈতিক দুর্যোগ হবে? একই রকমভাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি শৃঙ্খলার বিষয়ও থাকবে। রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা সবই সতর্কতার সাথে দিতে হবে। এটা একটা জাতি হিসেবে, সামগ্রিক সমাজের ভেতরে একটা ঐক্যমত্য লাগবে। এটা বারবার বলার চেষ্টা করেছি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আমাদের সবার প্রয়োজন। কারণ, এতে শুধু সরকার বিপদে পড়ে না, সাধারণ মানুষও পড়েন। জাতীয় অভিন্ন স্বার্থ এখানে যুক্ত। সেটাকে মাথায় রেখে, আগামীতে আমরা দেখতে চাই, রাজনীতি এবং অর্থনীতির সংশ্লেষটা যেনো খুব সতর্কতার সাথে, বুদ্ধিমত্তার সাথে, প্রজ্ঞা দিয়ে যেনো সামনে আনা হয়।

সঞ্চালক: বলছিলেন, একটা ধাক্কা দেয়ার দরকার। সেটা কোথা থেকে আসবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যে কোনো দেশের ধাক্কাটা আসে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। এটা অনেক বেশি টেকসই এবং সুষম হয়। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ধাক্কার নেতৃত্ব হলো একটি জাতীয় নির্বাচন। স্থানীয় নির্বাচনের গুরুত্বও অনেক। সকলেই বলেন, এই সরকারের আমলে প্রভুত উন্নতি হয়েছে। চোখে দেখা জিনিস, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সুফলটা সবাই সমানভাবে পায়নি। তারা একটা কথাই বলেছে, জবাবদিহিতার অভাব। কারণ, নেতারা ভোটে হননি। তারা আমাদের কথা শোনেন না। তারা ভিন্নভাবে চিন্তা করেন। এই জায়গাটাই হলো জবাবদিহিতার জায়গা। আমি একটি সুষম, বিকাশমান বাজার অর্থনীতি পরিচালনা করবো, আমি অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চাইবো কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই পুরোপুরি প্রতিযোগিতা যদি না থাকে, তাহলে অর্থনীতি কিন্তু সেইভাবে মেধা, শ্রম এদের প্রতি নিষ্ঠা দিয়ে নতুন বিকাশে যেতে পারে না। আমি প্রত্যাশা করে আছি, বাংলাদেশে এই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাকে শক্তিশালী করার জন্য একটি সুষ্ঠু, স্বচ্ছ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি আমরা পাবো।

সঞ্চালক: অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনাকেও ধন্যবাদ।

চ্যানেল টুয়েন্টিফোরে প্রচারিত
১৩ জানুয়ারি, ২০২৩

ভর্তুকি এখন রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার হাতিয়ার

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বিদ্যমান ব্যবস্থায় ভালো ও খারাপ— দুই ধরনের ভর্তুকি আছে। কিন্তু এখন ভর্তুকি নিয়ে বাছবিচার হয় না। সাম্প্রতিক সময়ে ভর্তুকির অর্থনৈতিক দিক নিয়ে যতটা আলোচনা হয়েছে, তার চেয়ে রাজনৈতিক ইস্যুই আলোচনায় বেশি এসেছে।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভর্তুকির পরিমাণের চেয়ে এর কাঠামো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা দেশের অর্থনীতিতে নানা সমস্যা আছে। এই মুহূর্তে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করায় শ্লথগতি আছে। মূল্যস্ফীতির হার অনেক বেশি, যা গরিব ও সীমিত আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এছাড়া কর্মসংস্থানের গতিও অনেক কমে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে ভর্তুকির খাত নির্বাচন, বরাদ্দ ও সুবিধাভোগী চিহ্নিত করাসহ সার্বিকভাবে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সঙ্গে ভর্তুকি ব্যবস্থাপনা করা উচিত। কিন্তু সরকার এখন যেসব খাতকে ভর্তুকির জন্য বেছে নিচ্ছে, যা নির্দেশ দিয়েই বাস্তবায়ন করা যায়— এমন খাত নির্বাচন করা হচ্ছে। এতে অর্থনৈতিক গুরুত্ব কমছে।

তাই আমি মনে করি, সার্বিকভাবে ভর্তুকি ব্যবস্থাপনায় সংস্কার আনা প্রয়োজন। কারণ, শেষ বিচারে ভর্তুকি এখন উন্নয়নের হাতিয়ারের চেয়ে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার হাতিয়ার হয়ে গেছে। আমরা পরিষ্কার দেখেছি, বিদ্যুৎ খাতের ক্যাপাসিটি চার্জ থেকে বের হয়ে আসতে পারলাম না। আমরা দেখেছি, কীভাবে এলএনজি লবির কাছে হেরে গেলাম।

এসব কারণে এখন যেখানে ভর্তুকি প্রয়োজন, সেখানে বরাদ্দ দিতে পারছি না। সামাজিক সুরক্ষায় পর্যাপ্ত টাকা বরাদ্দ করতে পারছি না। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের

(টিসিবি) মাধ্যমে এক কোটি পরিবারকে সুরক্ষা দিতে অর্থের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। এখন নতুন করে আরও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনার কথা শোনা গেলেও তাতে বরাদ্দ দেওয়া যাচ্ছে না। এর পরিণামে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে গেছে।

এবার আসি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ভর্তুকির মনোভাব নিয়ে আলোচনায়। আইএমএফ ভালো ভর্তুকির বিষয়টি বিবেচনায় আনে না। তাদের কাছে ভর্তুকি মানেই অপচয় ও অকার্যকর ব্যয়। তাদের কাছে ভর্তুকি এভাবেই বিবেচিত হয়। কিন্তু আমরা মনে করি ভর্তুকি রাখতে হবে। কিন্তু কাকে দিচ্ছেন, কীভাবে দিচ্ছেন, সেটাও দেখতে হবে।

এখন সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে ভর্তুকির আলোচনা নেই। মূল্যস্ফীতি নিয়ে এক জায়গায় আলোচনা হচ্ছে। টাকার অবমূল্যায়ন নিয়ে আরেক জায়গায় আলোচনা হচ্ছে। সার্বিকভাবে ভর্তুকির কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন।

প্রথম আলো
৩০ জানুয়ারি, ২০২৩

সুখবর স্বস্তি দেবে তবে পূর্ণ সমাধান দেবে না

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আইএমএফের ঋণ অনুমোদন— সুখবর, এটা স্বস্তি দেবে। তবে পূর্ণ সমাধান দেবে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে সংস্কারগুলো জমে থাকা সংস্কার, আমরা এতদিন বলেছি— করে নাই, কিন্তু আইএমএফের কাছে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে। সেই সামষ্টিক অর্থনীতির নীতি ব্যবস্থাপনায় যদি উন্নতি না হয়, তাহলে এ টাকাকে টেকসইভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সমস্যা থেকেই যাবে। আইএমএফের সঙ্গে আলোচনা, চুক্তি ও শর্তাবলিতে আমাদের আর্থিক খাত গুরুত্ব পেয়েছে। কর-জিডিপি বাড়াতে হবে, এটা আমরাও বলতাম, সেটা এসেছে। সাম্প্রতিককালে আয়কর আইনও পাস করা হয়েছে। বিনিময় হারগুলো এখনো সেভাবে সমন্বিত হয়নি। সরকার এখনো ভীতিতে আছে যে বিনিময় হার সমন্বিত করলে টাকার দরপতন হবে। তাতে মূল্যস্ফীতি হতে পারে, সেই আশঙ্কা রয়েছে। একই রকমভাবে সুদের হারও সমন্বয় হয়নি।

আমি আশ্চর্য হয়েছি পুরো কাজের ভেতরে ব্যাংক খাতের সংস্কারের ব্যাপারে কোনো জোরালো বক্তব্য এখন পর্যন্ত দেখিনি। এক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে যে নন-পারফর্মিং লোন কমাতে হবে। করপোরেট গভর্ন্যান্স থেকে ইনসাইডার লেন্ডারদের বাদ দিতে হবে। এগুলো কোনো কিছু বলা হয়েছে, এমনটা আমরা জানি না। ব্যাংক খাতের সংস্কারের বিষয়টি যদি গুরুত্ব না পায়, তাহলে এ রকম একটা মন্দাক্রান্ত পরিস্থিতিতে সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ভোগ তিন জায়গায়ই দুর্বলতার সৃষ্টি হবে। বিনিয়োগ সচল রাখা যাবে না। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে তারল্যের সমস্যা হবে। শেষ বিচারে গিয়ে ভোগ এবং কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য পরিস্থিতিতে আঘাত করবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো আগামী দিনে সংস্কার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা এখন আইএমএফ-নির্ভর হয়ে গেল। যেটা আমাদের জাতীয়ভাবে

ঠিক করার কথা ছিল। এত বড় জিনিস হচ্ছে, এটার জন্য আমাদের জনপ্রতিনিধিরা আদৌ ওয়াকিবহাল কিনা সন্দেহ আছে। আমাদের সংসদ আছে, পুরো সংসদে আলোচনা না হোক অর্থবিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি তো ছিল। কী কী সংস্কার করতে হবে, এ বিষয়ে কেন সেখানে আলোচনা হলো না? এ ঋণ নেয়ার ফলে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ করার ক্ষেত্রে এবং নবম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু করার ক্ষেত্রে কী কী তাৎপর্য আছে, সেই আলোচনার প্রয়োজন ছিল। নীতি সার্বভৌমত্ব পুরোটাই হেফাজত করে দিলাম। টাকা দিয়েছে যখন, এখন সেটা একটু ভালো করে যেন ব্যবহার করি।

বণিক বার্তা
২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

মানুষ নিরাপদ বোধ না করলে অর্থপাচার ঠেকানো যাবে না

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রথম আলো: দেশ থেকে বাণিজ্যের নামে ৮৫ শতাংশ অর্থ বিদেশে পাচার হচ্ছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে। এসব তথ্য জানার পরও কেন বাণিজ্যের আড়ালে অর্থপাচার ঠেকাতে পারছে না সরকার?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেশ থেকে বিদেশে টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক সুশাসনের জন্য এটা খারাপ। এই স্বীকারোক্তি আমাদের মনের ভেতরে আসতে হবে। এই সমস্যার রাজনৈতিক স্বীকৃতি আমাদের দেশে নেই। এটাকে আমরা মুখের কথা হিসেবে বলছি অথবা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে নানাভাবে ব্যবহার করছি। কিন্তু সমস্যাটাকে সততার সঙ্গে, নির্ভীকভাবে আমরা সামনে নিয়ে আসতে চাইনি বা পারিনি। রাজনৈতিক সমর্থন ছাড়া অর্থপাচারের মতো এমন একটি সংবেদনশীল বিষয়ে কোনো পেশাজীবী, কোনো সরকারি কর্মকর্তা সামনে এগোবেন, এটা আশা করা কল্পনাতীত।

প্রথম আলো: অর্থপাচার ঠেকাতে সরকারের ঘাটতি কোথায় বলে আপনি মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আফ্রিকার বহু দেশ পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে এনেছে। সেখানে দেখা যায়, সরকার বদল হলে তাদের পূর্বসূরির কৃতকর্ম উন্মোচন করে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনছে। সুইজারল্যান্ড থেকেও আফ্রিকার অনেক দেশ অর্থ ফেরত নিয়েছে। নাইজেরিয়ার মতো দেশও সুইস ব্যাংক থেকে প্রচুর অর্থ ফিরিয়ে নিয়েছে। বাংলাদেশে যেমন রপ্তানি করেও অনেক ব্যবসায়ী অর্থ ফিরিয়ে আনেন না, ঠিক তেমনই নাইজেরিয়াতেও অনেকে তেলের টাকা ফেরত আনেননি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, খুচরা প্রতিষ্ঠানের পেছনে সময় ব্যয় না করে বড় বড় ও প্রভাশালী ব্যক্তি

যাঁরা ব্যবসার নামে অর্থপাচার করেছেন, তাদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে অর্থপাচার ঠেকানো যাবে না।

প্রথম আলো: কর্মকর্তারা বলছেন, বিদেশে অর্থপাচারের তথ্য সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণে তদন্ত শেষ করা যায় না। বিষয়টিকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিদেশিরা ভালো করে চিন্তা করে দেখেন, একটা ঘটনাকে শেষ পর্যন্ত নিতে হলে তদন্ত ও বিচারের পেছনে কত ব্যয় হবে। এই ব্যয়ের ফলাফল কী হবে? তারা সব সময় যৌক্তিকভাবে ব্যয় করেন। সে জন্য তারা বড় বড় অর্থপাচারের বিষয়ে যুক্ত হন, মনোযোগী হন। কিন্তু বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির অভাব রয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, মানি লন্ডারিংয়ের ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে একাধিক প্রতিষ্ঠান যুক্ত। তাদের সক্ষমতা বাড়ানো দরকার। একই সঙ্গে তাদের সুরক্ষা দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আজকাল কেউ আর কাগজে-কলমে যোগ-বিয়োগ করে কিংবা ক্যালকুলেটরে এই কাজ করে না। এজন্য আলাদা সফটওয়্যার আছে। দেশে দেশে নানা সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়। একটা সফটওয়্যার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত থাকে।

এই প্রক্রিয়ায় মানুষের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ থাকে না। এই প্রক্রিয়া আমাদের দেশে নেই। এই কাজ করার জন্য দক্ষতাসম্পন্ন লোকবল দরকার। আবার তাদের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সুরক্ষার অভাব রয়েছে।

প্রথম আলো: বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে অর্থপাচার বেড়ে যায়। এটি বন্ধে করণীয় কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সব জায়গায় যদি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা না যায়, রাজনীতিবিদদের ওপর চাপ সৃষ্টি না করা যায়, তাহলে ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের ওপর চাপ তৈরি করা যাবে না। এক বছর পর দেশে জাতীয় নির্বাচন হবে। নির্বাচনী প্রচারে অর্থপাচার ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির বিষয়টি একটি জাতীয় অঙ্গীকারে পরিণত করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রথম আলো: সব সংস্থাই বলছে, হুন্ডিতে দেশ থেকে অর্থপাচার হচ্ছে। এটি কেন বন্ধ হচ্ছে না?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি উপায়ে অর্থ বিনিয়োগ করে অন্য দেশে আমরা নিয়ে যাচ্ছি, যেটাকে আমরা হুন্ডি বলে থাকি। হুন্ডি অনেক সময় প্রত্যক্ষ

হয়, দ্বিপক্ষীয়ভাবে হয়, অনেক সময় ত্রিপক্ষীয়ও হয়। যেমন সোনা চোরাচালান দিয়ে সেটা প্রকাশ পায়। একটা পণ্যের মাধ্যমে অন্য পণ্যের চোরাচালান হয়। বিষয়টি হচ্ছে, যারা এভাবে অর্থপাচার করেন, তাদের স্বার্থে আঘাত লাগলে তাঁরা রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে নড়াচড়া করিয়ে দিতে পারেন।

প্রথম আলো: মানুষ বিদেশমুখী। একটা শ্রেণি অর্থপাচারকে কোনো অপরাধই মনে করছে না। নাগরিকের এমন মনোভাবের কারণ কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যার হাতে অর্থ আছে, তাকে যদি রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে না পারে যে তার সম্পত্তি ও উত্তরসূরিরা এ দেশে নিরাপদ, তাহলে অর্থপাচার কোনোভাবেই ঠেকানো যাবে না। আমরা এক পদ্ধতি আটকালে অন্য পদ্ধতিতে পাচার হবে। তিনি যেখানে নিরাপদ বোধ করবেন, সেখানে যাবেন। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে আশাবাদী করে তোলা, উচ্চবর্গের মানুষকে এ দেশে তাদের বিনিয়োগ বাড়াতে উৎসাহিত করা জরুরি। এ জন্য প্রয়োজন সুশাসন, প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রয়োজন নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করা। যে দেশে বিচারব্যবস্থা ঠিকমতো কাজ করে না, আইনি কাঠামো কোনো চুক্তিকে কার্যকর করতে পারে না, সেই দেশে শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থা দিয়ে টাকা পাচার আটকানো যাবে না। বিষয়টি বহুমাত্রিক।

প্রথম আলো: ব্যাংকিং খাতের অনেকে মানি লন্ডারিংয়ের মামলার আসামি। কেন এই খাতের এত মানুষ অপরাধে জড়াচ্ছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মানি লন্ডারিংয়ের যেসব ঘটনা ঘটে, তার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে ব্যাংকিং ব্যবস্থা যুক্ত। পাচারের অর্থপ্রাপ্তি অথবা চালান অথবা রক্ষণাবেক্ষণ অথবা কোথাও বিনিয়োগের সঙ্গে ব্যাংকিং ব্যবস্থা যুক্ত থাকে। বেসরকারি মালিকানাধীন যেসব ব্যাংক আছে, বর্তমানে যে ব্যাংকিং কোম্পানি আইন আছে, সেখানে সুরক্ষার যে বিষয়গুলো, তা এখন দুর্বল। একটি পরিবার থেকে পরিচালকের সর্বোচ্চ সংখ্যা, পরিচালক হিসেবে মেয়াদকাল আগের চেয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুশাসন নিশ্চিত করার বড় একটা দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। তাদের নজরদারি যে কত দুর্বল, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তার চেয়েও একজন ঋণখেলাপি ব্যাংকমালিক কতটা শক্তিশালী– তার প্রমাণ তো আমরা বিভিন্ন সময় পেয়েছি। তাঁরা সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। রাজনৈতিক অঙ্গীকার না থাকলে এসব জটিল আর্থিক দুর্নীতির সমাধান আরও কঠিন।

প্রথম আলো: মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধ দমনে বিএফআইইউর দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। আপনিও কি তা–ই মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যে আইনের বলে বিএফআইইউ কাজ করে, সেখানে তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের ক্ষেত্রে সরকারের ভেতরে কী ধরনের বিধিনিষেধ আছে, সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখার বিষয়। বিদেশে এগুলো আলাপ-আলোচনার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম থাকে। সেই প্ল্যাটফর্মে একধরনের গোপনীয়তা থাকে। আস্থার সম্পর্ক থাকে।

সেগুলোর ভিত্তিতে কাজ হয়। এর ওপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব কাজ করে। আমাদের দেশে সেসব কাজে আস্থার পরিবেশ খুবই দুর্বল। যেহেতু আস্থার পরিবেশ দুর্বল এবং পরে কোনো ধরনের রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিলে এসব পেশাজীবী সরকারি কর্মকর্তা ভিকটিম হয়ে যেতে পারেন, তারা এই ভয়ে থাকেন। এই অবস্থার উন্নতি না হলে বিএফআইইউর সক্ষমতা সঠিকভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দেবে।

প্রথম আলো: বিদেশ থেকে মানি-লন্ডারিংয়ের তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে ব্যর্থ হচ্ছে তদন্ত সংস্থা। এ থেকে উত্তোরণের উপায় কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমরা তথ্য-উপাত্ত চাইলে কেউ দিয়ে দেবে, সেটি মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রতিটি দেশের নিজস্ব আইন আছে, প্রক্রিয়া আছে।

আন্তর্জাতিকভাবে কর ফাঁকি দেওয়া থেকে শুরু করে অসৎ উদ্দেশ্যে পাচারের অর্থ চিহ্নিত করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। আমরা সেই মেধা ও সময় দিয়ে এই কাজগুলো করি না। অযথা অনেক কথা বলি। এটা কোনো কাজে আসে না। এখানে মেধাসম্পন্ন মানুষ আনা উচিত। তাদের সুরক্ষা দেওয়া উচিত। পুলিশি ব্যবস্থায় হোক কিংবা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় হোক বা দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে হোক, এসব সংস্থাকে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে, সেটি তারা কার্যকরভাবে ব্যবহার করে কি না, তাতে আমার সন্দেহ আছে।

প্রথম আলো
৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

মন্দার প্রভাব পড়েছে অর্থনীতির আনাচে কানাচে

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

মহামারি করোনা দেশের অর্থনীতিকে বেশ নাড়া দিয়ে গেছে। তবে ২০২২ সালে করোনার ধাক্কা সামলে বাংলাদেশের অর্থনীতি বেশ শক্তিশালীভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এবং বেশ ইতিবাচক পরিবর্তন আমরা লক্ষ করছিলাম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। সেই ভালো পরিস্থিতিটি অনেকটা হঠাৎ করেই পাল্টে গেল যখন রাশিয়া ইউক্রেনের ওপর হামলা শুরু করল। প্রথমে আমাদের কাছে মনে হয়েছিল যুদ্ধটি শুধু ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। এ জন্য মনে হয়েছিল ওইসব দেশেই যুদ্ধের প্রভাব পড়বে, বাংলাদেশের ওপর তেমন একটি প্রভাব পড়বে না।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল যুদ্ধের কারণে নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা-নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে দেশগুলো। বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলো যখন বিভিন্নভাবে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছিল, একই সঙ্গে পণ্য সরবরাহ বাধাগ্রস্ত-এমনকি অর্থের লেনদেনও বাধাগ্রস্ত হতে লাগল। তখন আমরা অনুধাবন করতে লাগলাম যে, যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞার কারণে শুধু এই দুটি দেশ বা ওই অঞ্চলের দেশগুলোই নয়, এর বহুমাত্রিক প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও পড়তে যাচ্ছে। ঠিক সেভাবেই গত এক বছরে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এই প্রভাবটি শুধু বাংলাদেশকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক প্রভাব হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা নয়। যুদ্ধের এই প্রভাব উন্নয়নশীল অনেক দেশের ওপরই কম-বেশি পড়েছে। মূলত যুদ্ধের প্রভাব সেই দেশগুলোতেই বেশি পড়েছে, যারা জ্বালানি আমদানিকারক দেশ এবং খাদ্যপণ্য আমদানিকারক দেশ। বাংলাদেশ এই উভয় ক্যাটাগরিরই আমদানিকারক দেশ। এ কারণে যুদ্ধের প্রভাব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেশ ভালোভাবেই পড়েছে। এর তাৎক্ষণিক প্রভাব হিসেবে আমরা দেখেছি, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানির প্রাপ্যতা সংকট, একই সঙ্গে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি। এই সংকটগুলোর তাৎক্ষণিক প্রভাব আমরা দেখেছি। বাংলাদেশের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স যেটি রয়েছে-যা দিয়ে আমরা পণ্য আমদানি-রফতানির ব্যয় মিটিয়ে থাকি। সেই জায়গায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

রফতানির ক্ষেত্রে হয়তো আমরা এখনও ইতিবাচক ধারায় রয়েছি এবং চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রফতানির যে তথ্য এসেছে তাতে রফতানি আয় এখনও বেশ ভালোই বলা যায়। এই সংকটময় সময়ে এটি খুবই আশাব্যাঞ্জক। ঠিক একইভাবে রেমিট্যান্সেও ওঠানামা রয়েছে। কখনো ভালো প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, কখনো একটু খারাপ হচ্ছে। তারপরও রেমিট্যান্সে ফরমাল চ্যানেলে দেশে অর্থ কম ঢুকলেও রেমিট্যান্স নির্ভরশীল পরিবারগুলো ঠিকই টাকা হাতে পাচ্ছে। সেটা ফরমাল চ্যানেল হোক বা ইনফরমাল চ্যানেল হোক-অর্থ তো আসছে। তবে এই সংকটময় পরিস্থিতির কারণে অর্থনীতির একেবারে ছোট বা ক্ষুদ্র থেকে বড় কর্মকাণ্ডে প্রভাবে পড়েছে। এটা যেমন টুথপেস্ট, বিস্কিট বা ওষুধ থেকে শুরু করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো বড় প্রকল্পের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়েছে।

সুতরাং বলা যেতে পারে অর্থনীতির আনাচে-কানাচে বা সর্বক্ষেত্রে এই নেতিবাচক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে বাংলাদেশ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যেটি বলার বিষয়-সেটি হচ্ছে এই যুদ্ধের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো সম্পর্ক নেই বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ বাংলাদেশ এই যুদ্ধের অন্যতম বড় ভিকটিম। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে— যে বাংলাদেশকে সবাই উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে দেখত এবং বিভিন্ন সময় বলা হয়ে থাকে দাতাগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সেই পরিচয়টি যুদ্ধের কারণে কমতে শুরু করেছে। যদিও দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য হলো— এর দায় বাংলাদেশের নয়।

যুদ্ধের কারণে এই নেতিবাচক প্রভাবগুলোকে যদি আমরা ভাগ করি তা হলে ব্যক্তি পর্যায়ে বা ভোক্তা পর্যায়ে সবচেয়ে বড় যে প্রভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো মূল্যস্ফীতি। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ৮ থেকে সাড়ে ৮ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যস্ফীতি। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মানুষের জন্য এই উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ সহ্য করা কঠিন। এখন মানুষের প্রকৃত আয় কমছে। তাছাড়া এই উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে দরিদ্র মানুষের একদিকে পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে, অন্যদিকে খাদ্য নিরাপত্তাতে ঝুঁকি তৈরি করেছে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে আমরা এখন রিপোর্ট দেখছি— ব্রয়লার মুরগিও এখন

ভাগায় বিক্রি হচ্ছে। তার মানে গরিব মানুষের পক্ষে এখন একটি আস্ত ব্রয়লার মুরগি কেনার মতোও অর্থ নেই। গরিবের পুষ্টির আধার এই ব্রয়লার মুরগিরও এখন উচ্চমূল্য।

এর পাশাপাশি বিগত কয়েক মাসে ধাপে ধাপে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। এটিও যুদ্ধের ও মন্দার প্রভাবের ফল। যদিও বিদ্যুৎ খাতের মূল্যবৃদ্ধির আরও অভ্যন্তরীণ অনেক বড় কারণ রয়েছে, তবুও মন্দার প্রভাব বেশি। বিদ্যুতের এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে পণ্যের যে বাড়তি ব্যয় সেটিও কিন্তু এখন দেশের মানুষকে বহন করতে হচ্ছে। সেটি গ্যাসের ক্ষেত্রে এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে। এভাবে দফায় দফায় খাদ্যমূল্য এবং গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির কারণে দেশে দারিদ্র্যের হার আরও বেড়ে যাবে। শুধু তা-ই নয়, আগামীদিনে হয়তো দেশে কর্মহীনতার হারও বেড়ে যেতে পারে।

মন্দার প্রভাব হাউসহোল্ডের পাশাপাশি শিল্পের উৎপাদন ও শিল্প খাতে কেমন পড়েছে সেদিকে যদি আমরা নজর দিই তাহলে দেখতে পাব— শিল্প খাতও এই যুদ্ধ ও মন্দার একটি বড় ভিকটিম। এই মুহূর্তে ব্যাংকগুলো খুবই সীমিত আকারে এলসি খুলছে। এতে কিন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা-যারা আমদানিকৃত কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল তারা কিন্তু তাদের শিল্পের কাঁচামাল পর্যাপ্ত পাচ্ছেন না। পেলেও তাকে অনেক উচ্চমূল্য দিতে হচ্ছে। ফলে অনেককেই হয় উপাদন কমিয়ে দিতে হচ্ছে, নতুবা অনেককে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হচ্ছে। সুতরাং দেশের শিল্পখাতও এ মন্দার একটি বড় ভিকটিম হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন যেসব উদ্যোগ রয়েছে সেগুলো হয়তো রফতানিমুখী খাতের জন্য কিছুটা সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আমরা যদি কৃষিখাতের দিকে তাকাই তা হলে দেখতে পাব, গবেষণা পরিচালক-সিপিডিকৃষি খাতে সাম্প্রতিক সময়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সারের অপ্রাপ্যতা বা সারের সীমিত প্রাপ্যতা। অনেক কৃষক কিন্তু চাহিদামতো সার পাচ্ছেন না। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ যে সার কারখানাগুলো রয়েছে, বিশেষ করে কর্ণফুলী ও শাহজালাল সার কারখানা। এসব কারখানায় এখন প্রকট গ্যাস সংকট রয়েছে। সম্ভবত এখন কর্ণফুলী সার কারখানা গ্যাস সংকটের কারণে বন্ধ রয়েছে। যেহেতু গ্যাসের সংকট এতদিন মেটানো হয়েছে আমদানিকৃত এলএনজি দিয়ে কিন্তু এলএনজি আমদানি করার মতো এখন অর্থ যেহেতু সরকারের হাতে নেই সেহেতু সরকারকে বাধ্য হয়ে গ্যাস সরবরাহ কমিয়ে দিয়ে এই সার কারখানাগুলো বন্ধ করতে হয়েছে। এর বিকল্প হিসেবে সরকার এখন যেটি করছে-সেটি হলো, সরকার সার আমদানি করছে। আমদানিকৃত সার দিয়েই চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করছে।

এভাবে আমদানি করে কৃষককে ভর্তুকি মূল্যে দিতে গিয়ে সরকারকে প্রচুর পরিমাণে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। আমরাও মনে করি, খাদ্য উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখতে এবং স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে কৃষককে সব ধরনের সাপোর্ট এখন দিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে যা যা করার দরকার সেটি সরকারকে করতে হবে। এর জন্য পর্যাপ্ত সার যদি আমদানি করতে হয় তা হলে সেটি অব্যাহত রাখতে হবে। কোনোভাবে কৃষিতে বিঘ্ন ঘটানো যাবে না, বিঘ্ন ঘটলে খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি বেড়ে যাবে। আমরা যদি কৃষিখাতের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব— কৃষিখাতে সাম্প্রতিক সময়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সারের অপ্রাপ্যতা বা সারের সীমিত প্রাপ্যতা। অনেক কৃষক কিন্তু চাহিদামতো সার পাচ্ছেন না। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ যে সার কারখানাগুলো রয়েছে, বিশেষ করে কর্ণফুলী ও শাহজালাল সার কারখানা। এসব কারখানায় এখন প্রকট গ্যাস সংকট রয়েছে। সম্ভবত এখন কর্ণফুলী সার কারখানা গ্যাস সংকটের কারণে বন্ধ রয়েছে।

যেহেতু গ্যাসের সংকট এতদিন মেটানো হয়েছে আমদানিকৃত এলএনজি দিয়ে কিন্তু এলএনজি আমদানি করার মতো এখন অর্থ যেহেতু সরকারের হাতে নেই সেহেতু সরকারকে বাধ্য হয়ে গ্যাস সরবরাহ কমিয়ে দিয়ে এই সার কারখানাগুলো বন্ধ করতে হয়েছে। এর বিকল্প হিসেবে সরকার এখন যেটি করছে— সেটি হলো, সরকার সার আমদানি করছে। আমদানিকৃত সার দিয়েই চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করছে। এভাবে আমদানি করে কৃষককে ভর্তুকি মূল্যে দিতে গিয়ে সরকারকে প্রচুর পরিমাণে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। আমরাও মনে করি, খাদ্য উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখতে এবং স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে কৃষককে সব ধরনের সাপোর্ট এখন দিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে যা যা করার দরকার সেটি সরকারকে করতে হবে। এর জন্য পর্যাপ্ত সার যদি আমদানি করতে হয় তা হলে সেটি অব্যাহত রাখতে হবে। কোনোভাবে কৃষিতে বিঘ্ন ঘটানো যাবে না, বিঘ্ন ঘটলে খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি বেড়ে যাবে।

এখন নজর দেওয়া যাক— এসব সংকট মোকাবিলায় সরকার যেসব উদ্যোগ নিয়েছে বা নিচ্ছে সেগুলো কি যথার্থ। এক্ষেত্রে বলতে হয় এই সংকটকালের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে অব্যাহত রাখার জন্য যে টাকা দরকার বা যে ধরনের আয়-ব্যয় বা আমদানি-রফতানি, বিনিয়োগ, পণ্য সরবরাহ থাকা দরকার সেটি নেই— এটা একটা চরম বাস্তবতা। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্বল্পতা রয়েছে। এ জন্য সীমিত আকারেই সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে হচ্ছে। সুতরাং ভিন্ন একটি অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে মাথায় নিয়েই এই মুহূর্তে সরকাকে চলতে হচ্ছে। এ অবস্থায় স্বাভাবিক যে পরিণতি সেটি হলো-পণ্য সরবরাহ পরিস্থিতি কিছুটা কম থাকবে, পণ্যমূল্য স্বাভাবিক সময়ের চেয়েও বেশি থাকবে এবং মানুষকে স্বাভাবিক সময়ে তার যে পণ্য চাহিদা থাকে

সেটি কমিয়ে আনতে হবে অথবা বিকল্প কোনো উৎস থেকে সে তার খাদ্যের চাহিদা মেটাবে। সুতরাং এই সংকটময় অবস্থায় মানুষকেও কিছুটা ছাড় দিয়ে চলতে হচ্ছে— এটাই চরম বাস্তবতা। এই জায়গায় সরকারের যে উদ্যোগগুলো রয়েছে তার মধ্যে আমরা দুই রকমের উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটি হচ্ছে— বাজারে পণ্য সরবরাহ ঠিক রাখতে প্রয়োজনীয় এলসি খুলতে দেওয়া, বাজারের ডলারের সরবরাহ বাড়ানো। এক্ষেত্রে সরকার যেসব উদ্যোগ নিচ্ছে সেগুলো ডিরেকশন হিসেবে ঠিক আছে তবে, যদি বলা হয় উদ্যোগগুলো পর্যাপ্ত কি না, তা হলে বলব না, পর্যাপ্ত না। যেমন অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ করে বিলাসী পণ্য বা এ ধরনের পণ্য সরকার কম আমদানির কথা বলছে কিন্তু আসলে কি কম আমদানি হচ্ছে। অথচ যে ধরনের পণ্য আমদানি সরকার নিরুৎসাহিত করছে সেগুলো আমদানি ঠেকানো যাচ্ছে কি না। এ বিষয়গুলো ঠিকমতো মনিটরিং হচ্ছে না।

সরকার মাঝে বলেছিল জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হতে হবে, এখনও বলা হচ্ছে এ ধরনের কথা। কিন্তু এ উদ্যোগ কি আদৌ বাস্তবায়ন করা গেছে, যায়নি। এ ধরনের অনেক ভালো ভালো ঘোষণা কিন্তু এসেছিল, তার সঠিক বাস্তবায়ন হয়নি। তা ছাড়া বিষয়গুলো সরকারের তরফ থেকে সেভাবে মনিটরিংও করা হয়নি। সুতরাং জ্বালানি সাশ্রয় করা যায়নি বরং উল্টো কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-জ্বালানির ব্যবহার আরও বেড়েছে। সুতরাং সরকারি উদ্যোগের এই অংশের ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে— নির্দেশনার দিক থেকে হয়তো ঠিক আছে কিন্তু উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়ন ঠিকমতো করা যায়নি। এই জায়গাগুলোতে এখনও অনেক ঘাটতি রয়েছে।

সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের জায়গা হচ্ছে— এই সংকটকালে দেশের দরিদ্র মানুষের জন্য কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নেওয়া। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি— সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে, খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি, বিজিডি, ওএমএস, ফ্যামিলি কার্ড প্রোগ্রাম— এগুলো বেশ ভালো ভূমিকা রাখছে। তবে এই কার্যক্রমগুলো আরও বর্ধিত আকারে করা দরকার এবং প্রকৃত অসহায়-দুস্থরা যেন এ সুবিধা পায়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। কেননা আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি— এমন অনেকেই এসব সরকারি সুবিধা ভোগ করছেন, যারা এই সুবিধা ভোগ করার যোগ্য না। অর্থাৎ অনেক সচ্ছল পরিবারও গরিবের এই খাদ্যে ভাগ বসাচ্ছে— এটা কাম্য নয়। অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক বিবেচনায় কার্ড দেওয়া হচ্ছে। আবার কখনো সরকারের সঙ্গে সংশ্লেষের বিবেচনায় কার্ড দেওয়া হচ্ছে বা ওএমএসের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই জায়গায় সরকারের নজরদারি বাড়ানো দরকার, যাতে প্রকৃত ভুক্তভোগীরা সরকারের এসব উদ্যোগের সুফল পায়। একই সঙ্গে এ বিষয়ে আরও বলা প্রয়োজন, সেটি হলো— সরকারের এ ধরনের উদ্যোগ কিন্তু এখনও প্রায় পুরোটাই শহরকেন্দ্রিক। কিন্তু মনে রাখা দরকার মূল্যস্ফীতির অভিঘাতের বড় একটি

অংশ কিন্তু গ্রামীণ মানুষের জীবনেও পড়েছে। এমনকি খাদ্য মূল্যস্ফীতি যেটা দেখা যাচ্ছে শহরের চেয়ে গ্রামে বেশি। অর্থাৎ গ্রামীণ মানুষ বা কৃষক পণ্য উৎপাদন করছেন ঠিকই কিন্তু সে পণ্য তিনি ঘরে রাখতে পারছেন না। ফলে কৃষককে পরে আবার সেই পণ্য কিনে খেতে হচ্ছে বেশি দামে। সুতরাং সরকারের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে আওতা শহরের পাশাপাশি গ্রামেও বাড়ানোর দরকার আছে।

সময়ের আলো
৭ মার্চ, ২০২৩

অর্জন রক্ষা জরুরি

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

৫২ বছরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অর্জন নিঃসন্দেহে নজর কাড়ার মতো। স্বাধীনতা যুদ্ধের ভেতর দিয়ে আসা রাষ্ট্রকে কার্যকর ও টেকসই হিসেবে দাঁড়ানোর জন্য রাষ্ট্রের সব অনুষঙ্গ, যেমন– মুদ্রাব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থা, করব্যবস্থা থেকে শুরু করে বৈদেশিক সম্পর্ক— সবই নতুনভাবে দাঁড় করাতে হয়েছে। এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। মিত্র সেনাবাহিনীকেও দ্রুত বিদায় জানাতে পেরেছি। সেহেতু অর্জনগুলো কম না। এখানে এক ধরনের জাতীয় ঐক্য হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি নাগরিক সমাজও স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে উৎসারিত স্বেচ্ছাপ্রণোদনায় পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় জড়িয়েছে। এর মধ্য দিয়ে যেমন ব্র্যাক ও গণস্বাস্থ্যের মতো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি বহু বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সেই সময়ে এসেছে।

পরে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক নীতিমালায়ও পরিবর্তন এসেছে। আশির দশক থেকে বিরাষ্ট্রীয়করণ, বাজার অবমুক্তকরণ, বৈশ্বিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আরও বেশি যুক্ত হওয়া ইত্যাদি ঘটে। আশি, নব্বই দশকের পর দেখা যায়, যে-ই ক্ষমতায় থাকুক, এক ধরনের নীতি-ঐক্য গড়ে উঠেছে। এ জন্য দুই দলের অর্থনৈতিক চিন্তায় খুব বেশি তারতম্য দেখা যায় না। এর সুফলের দিক হলো, নীতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা এসেছে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দেশীয় ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে।

দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর থেকে আমরা শিখেছি, খাদ্যনিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা শিখেছি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেহেতু আমাদের রপ্তানিতে জোর দিতে হবে, রেমিট্যান্সে জোর দিতে হবে। আমরা বুঝেছি, আমাদের দেশে সেই অর্থে প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, তাই মানবসম্পদের ওপর জোর দিতে হবে এবং সে জন্য শিক্ষার

গুণগত মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানবসম্পদ বিকাশের অন্য দিক হলো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা; সর্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। বুঝেছি যে দারিদ্র্য শুধু প্রবৃদ্ধি দিয়ে দূর করা সম্ভব না, এ জন্য সামাজিক সুরক্ষার দরকার পড়বে। প্রয়োজনে সর্বজনীন পেনশন স্কিম দরকার হবে।

কিন্তু নীতিগুলো বাস্তবায়নের বেলায় বিভিন্ন ধরনের বিকৃতির সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী প্রাতিষ্ঠানিক বিকৃতির সুযোগ নিয়ে নীতিগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে জনমানুষের পক্ষে কাজ করতে দেয়নি। বাংলাদেশ এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি বৈষম্যপূর্ণ দেশ। হয়তো মাথাপিছু গড় আয় ইত্যাদি বেড়েছে, তবে গড়ে-গড়ে পার্থক্যও অনেক বড় হয়ে গেছে। সেটা শুধু আয়ের ক্ষেত্রে না, ভোগের ক্ষেত্রেও হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বৈষম্য হয়েছে সুযোগ এবং অধিকার বাস্তবায়নের বেলায়। মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় যে দায়িত্ব, তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। এটা শুধু গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে কথা বলার অধিকার, ভোট অর্জন রক্ষা জরুরি দেওয়ার অধিকার না; সেবা পাওয়ার অধিকার, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার। যে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার কথা, শিক্ষা পাওয়ার কথা, সে বিষয়গুলো বাকি রয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে শিখেছি কিন্তু সামাজিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে পারছি না।

বিচারব্যবস্থা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলেন, অধিকার সুরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর না থাকলে, রাজনৈতিক প্রভাব বড় হয়ে দাঁড়ালে সমস্যা দেখা দেয়। তাই আমরা যখন মুক্তিসংগ্রামের কথা বলি, তখন কিন্তু চেতনার কোন অংশ নিয়ে বলি তা পরিষ্কার হয় না। আমরা জাতীয়তাবাদের কথাও বলি। ব্যক্তি মানুষকে বাদ দিয়ে, পিছিয়ে পড়া মানুষকে বাদ দিয়ে জাতি বাড়তে পারে কিনা? এখন তো আর ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয় না। আমরা যে অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলি, তার মধ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু ঠিকমতো অধিকার পেল কিনা, তা বোঝা যায় না। আমরা নারীর ক্ষমতায়নে অনুপ্রাণিত। কিন্তু পোশাক শ্রমিক, খেটে খাওয়া নির্মাণ শ্রমিক, মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া নির্যাতিত মেয়েদের কথা এবং গার্হস্থ্য নিপীড়নের শিকারদের কথা কতটা বলা হয়? চিত্রটি আরেকটু সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। যারা এই বিশ্লেষণ করেন, যারা এই মানবতাবাদী চিন্তা থেকে, নাগরিকদের দায়িত্ববোধ থেকে কথাগুলো বলেন, তারা কিন্তু কোনোভাবে বাংলাদেশের অর্জনকে খাটো করে দেখেন না। বরং বাংলাদেশের অর্জনকে প্রকৃতভাবে টেকসই, সর্বজনীন করার জন্যই তারা এসব কথা বলা দায়িত্ব বলে মনে করেন।

সমকাল
২৬ মার্চ, ২০২৩

নির্বাচনী বছরের বাজেটের আগে মূল্যস্ফীতি, রাজস্ব ঘাটতি ও ডলার সঙ্কট অর্থনীতির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি নিঃসন্দেহে সংকটে না হোক একটা বড় ধরনের সমস্যার মধ্যে রয়েছে। সরকারের আয়-ব্যয় ও ঘাটতি, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য এবং চলতি, বাণিজ্য ও সামগ্রিক— সব হিসাবেই সমস্যা রয়েছে। সময়মতো মোকাবিলা করা না গেলে এ দুই ধরনের সমস্যা বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। আমদানি ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে সাময়িক কিছুটা স্বস্তি পাওয়া গেছে। ঈদকে কেন্দ্র করে রেমিট্যান্স বাড়ায় কিছুটা স্বস্তি আসবে। কিন্তু আমাদের যে মৌলিক সমস্যা ছিল সেগুলো তো দূর হয়নি। এজন্য যে ধরনের সংস্কার করা দরকার ছিল, সেটা করা হচ্ছে না। এমনটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে অঙ্গীকার করেও সরকার পুরোটা করছে না। এর একটি হলো সুদহারকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা এবং টাকার বিনিময় হারকে শিথিল করা। ব্যাংক খাতের সংস্কারের মতো কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার এটি সত্য। কিন্তু যে ধরনের দ্রুততার সঙ্গে ও গভীরভাবে এসব সংস্কার করার কথা ছিল সেটা হচ্ছে না। সমস্যা মোকাবিলার জন্য সরকার যে ধরনের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছে, তাতে পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটেনি। ফলে ঝুঁকিগুলো রয়ে গেছে। সরকারের এ মুহূর্তে টাকার অভাব রয়েছে। ব্যাংক খাতে তারল্য ঘাটতি রয়েছে। এ অবস্থায় সরকারের প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি টাকা সরবরাহ করে তাহলে মূল্যস্ফীতি আরো বাড়বে। এ ঝুঁকি কিন্তু ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সমস্যা হচ্ছে এগুলো মোকাবিলায় সরকার যেভাবে সংকোচ নিয়ে এগোচ্ছে তাতে ঝুঁকি আরো বাড়ছে। নির্বাচন সামনে রেখে সরকারকে রাজনৈতিক বিবেচনায় পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। কিন্তু রাজনৈতিক বিবেচনায় যা করছে, তাতে হিতে

বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। নীতি সংস্কারের দুর্বলতার পাশাপাশি নীতি সমন্বয়হীনতাও আমাদের আরো একটি বড় সমস্যা।'

বাংলাদেশের ভেতরে অর্থনীতি বিভিন্ন ধরনের চাপের মধ্যে ছিল। আমরা একটা প্রবৃদ্ধির গল্প রচনা করেছিলাম। কাঠামোগত দুর্বলতার বিষয়গুলো আমরা স্বীকার করতে চাইনি। এর ফলেই আজকে এ পরিস্থিতি হয়েছে।

এবার সন্তোষজনক বাজেট পেশ করার সুযোগ খুবই সীমিত। নির্বাচনের আগে সব সরকারই জনগণকে সন্তুষ্ট করে এমন বাজেট দিতে চায়। কিন্তু আর্থিক পরিস্থিতি, রাজস্ব ঘাটতি ও বাণিজ্য ঘাটতির কারণে সরকারের জন্য সেই সুযোগ খুবই সীমিত। যদি এ বিষয়ে বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেয়াও হয়, তা সামগ্রিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে দুটি সরকার এই বাজেট বাস্তবায়ন করবে। এই বাজেটে নমনীয়তাও রক্ষা করতে হবে। কারণ, সরকার যদি বড় কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে তারা কতটা বাস্তবায়ন করতে পারবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। দেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সময়ে বাজেট আসছে। এছাড়াও এলডিসি থেকে উত্তরণ এবং কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলোও বাজেটের ওপর চাপ বাড়িয়েছে।

অন্য যে কোনো বছরের তুলনায় এবারের বাজেট খুবই জটিল পরিস্থিতিতে তৈরি করতে হয়েছে। কারণ আগে দেশে আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকলেও, বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক স্বস্তি থাকত। কিন্তু এবার তা নয়।

প্রবৃদ্ধির হারে বড় ধরনের ব্যাঘাত ঘটেছে। টাকা ও ডলার না থাকায় পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। উভয় ক্ষেত্রেই বড় ঘাটতি রয়েছে, যা একসাথে মোকাবিলা করতে হবে। তাই সরকারকে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং বিনিয়োগ কর্মসূচি সীমিত করতে হবে। ফলে আগামী বছরের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাও পরিমিত হওয়া উচিত।

বণিক বার্তা, এপ্রিল ৫ ২০২৩ এবং
নয়া দিগন্ত, ২২ মে ২০২৩

ত্রিমুখী সংকটে বাংলাদেশ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সঞ্চালক: বাংলাদেশী এবং বাংলাদেশের বাইরের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে দেখছেন আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য। প্রিয় দর্শক আমরা এই কথা কারো কারো কাছে থেকে শুনছি যে বাংলাদেশ নানা ক্ষেত্রে এখন পৃথিবীর রোল মডেল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক অর্থেও, নির্বাচনী ব্যবস্থার অর্থে এবং ভূরাজনীতিতেও প্রায় বাংলাদেশ একটা নেতৃত্বের পর্যায়ে আছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বাংলাদেশের দিক তাকিয়ে আছে। আবার কারো কারো কাছে থেকে এটিও আমরা শুনছি যে, বাংলাদেশ রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, ভূরাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে এক গভীর সংকটে নিপতিত হচ্ছে। কি হচ্ছে বাংলাদেশে? সেটি জানার ও বোঝার জন্যে আমার সাথে স্টুডিওতে রয়েছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ সিপিডির ডিস্টিংগুইশড ফেলো ড: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্বাগত আপনাকে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ জিল্লুর আমাকে ডাকার জন্য।

সঞ্চালক: অর্থনীতিবিদ হিসেবে যদি অর্থনীতি দিয়েই আমরা শুরু করতে চাই যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার কথা আমরা শুনেছি। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং নানা দৃশ্যমান উন্নয়নও আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখেছি। আমাদের রিজার্ভ একসময় সমৃদ্ধ হচ্ছিলো। কিন্তু হঠাৎ করেই দেখা যাচ্ছে পরিস্থিতি নিম্নগতির দিকে যাচ্ছে। আমাদের এক্সপোর্ট কমে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবন অনেক কষ্টে আছে। ইতোমধ্যেই আমরা আইএমএফের স্মরণাপন্ন হয়েছি। প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছি, আইএমএফ প্রতিনিধি বাংলাদেশ সফরও করে গেলেন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য সফর করলেন। যুক্তরাষ্ট্রে তিনি আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের

সাথে কথাবার্তা বলেছেন। সেখান থেকে লোনও পাওয়া যাচ্ছে এবং জাপানের সঙ্গে কিছু চুক্তি ও এমওউ ও সাইন হয়েছে। আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, অর্থনৈতিক চিত্রটা কি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অর্থনীতির এ আলোচনা আপনার এখানে আমি ধারাবাহিকভাবে করেছি। বাজেটের আগে, পরে এবং বছরের মধ্যেখানে এবং বিভিন্ন সময় আমি বিভিন্ন যেমন আমি প্রবৃদ্ধি, উন্নতি, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষাস্বাস্থ্য সম্প্রসারণ, অবকাঠামো উন্নয়নে যে ইতিবাচক পরিবর্তন আছে সেগুলোর স্বীকৃতি আমি সর্বদাই দিয়েছি কিন্তু পাশাপাশি এই উন্নয়নের ভিতরে যে ফাঁকগুলো রয়ে যাচ্ছে, এটার ভিতরে যে নতুন ধরনের দ্বন্দ্বগুলো সৃষ্টি হচ্ছে, নতুন বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলোর কথাও আপনাকে বলেছি এবং সেই সময় আমি প্রথম যে জিনিসটা আপনাকে বলার চেষ্টা করেছি যে মূল্যায়ন করার জন্য যথাযথ তথ্য উপাত্ত আছে কিনা এবং আরেকটা জিনিস আলোচনায় সর্বদাই এসেছে যে, আমরা যারা দেশীয় অর্থনীতির চর্চা করি বা বিশ্লেষক আছি এমনকি সংবাদ মাধ্যমও অনেকসময় সমালোচনামূলক বক্তব্য দেয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো কত ভালো বলে এটাও আমাদের প্রেক্ষিতে এসেছে। তারপর বিভিন্ন সময়ে আমরা তথ্য উপাত্ত, মূল্যায়ন, অর্থনৈতিক কৌশল নিয়ে বিভিন্ন সময় বলেছি যে প্রবৃদ্ধি হলেও গড়ে হচ্ছে, সবার কি হচ্ছে ইত্যাদি। এই কৌশলগত আলোচনাতেও আমাদের সর্বদা বলা হয়েছে এগুলো নিয়ে আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। দেখুন, এক দেড় বছরের মধ্যে কিভাবে পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং আমি যখন বছরখানেক আগে প্রথম সাংবাদিকদের সম্মেলনে বলেছিলাম যে ২০২৪ নাগাদ বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণের বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে চলেছে এবং তখন অনেকেই এটাকে অতিরঞ্জন বলে মনে করেছে। আমার সেই মূল্যায়ন এখন সত্য হতে চলেছে বলে আমি আদৌ খুশি না বরং এটা নাহলেই আমি নাগরিক হিসেবে বেশি খুশি হতাম। তথ্য-উপাত্তের কথা এখন পত্রিকার মাধ্যেমে সবাই জানে। তাই আমি একটা একটা করে বলি।

প্রথমত, তথ্য উপাত্তের ব্যাপারে। আমরা বলেছিলাম যে, প্রবৃদ্ধির যে হিসাব হচ্ছে, সে হিসাব অন্য কোনো হিসাবের সাথে মেলে না। আপনি সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধির হার বলবেন আর তেইশ শতাংশের বেশি বিনিয়োগ হচ্ছেনা বছরের পর বছর অথচ প্রবৃদ্ধি হচ্ছে না, বিনিয়োগ হচ্ছেনা, পুঁজিপণ্য আমদানি হচ্ছে না, ব্যাক্তিগত খাতে ঋণের সম্প্রসারণ হচ্ছেনা, গ্যাস-বিদ্যুৎ এর ব্যবহার শিল্পখাতে বাড়ছেনা এটাতো মেলে না। ব্যাখা করার মতো অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, একটা বিরাট প্রযুক্তিগত উৎক্রমণ হচ্ছে। উৎপাদনশীলতা এমন বেড়েছে যে বিনিয়োগ ছাড়াই উৎপাদন হচ্ছে। এরকম কথা আমরা সেইসময় শুনেছি। আজকে ওনাদের সাথে আপনি আলাপ করলে ওনারা বলতে পারবেন যে, ওনারা কি এটা নিয়ে বিব্রতবোধ করেন কিনা। তখন আমরা বলেছি আপনারা যে বৈদেশিক ঋণের হিসাব দিচ্ছেন, ওই হিসাবে গড়মিল আছে। আমরা বলেছি সব বৈদেশিক ঋণের

হিসাব এখানে আসছে না। আপনি যে ধরনের সাপ্লাইএর ক্রেডিট নেন উচ্চমূল্যের সেইটাই হিসাবের ভিতরে আসে না। যে সমস্ত ঋণ আপনার আছে যেগুলো ব্যক্তিখাতে দিয়েছেন অথচ ফেরত পাচ্ছেন না। সেগুলো আপনি হিসাবের ভিতরে নেননি। এগুলোকে মূল্যায়ন করে আপনাকে সঠিক হিসাবে আসতে হবে। তখন এটা কানে নেয়া হয়নি। আমরা বলেছি আপনাদের রিজার্ভের হিসাবেও ঠিক নাই। টাকা অন্য জায়গায় স্থানান্তর হয়েছে তাকে দেখাচ্ছেন রিজার্ভে আছে, যেটা নিষ্কণ্টক বৈদেশিক মুদ্রা না তাকেও আপনি দেখাচ্ছেন। এটা আন্তর্জাতিক হিসাবে হয়না এবং এখন এটাকে মানতে হচ্ছে।

একইভাবে রপ্তানি আয়ের এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন ও সরকারের রাজস্ব বোর্ড-এর তথ্য মিলছে না। এখন পরিষ্কার হয়েছে, রপ্তানি আয়ের ভিতর এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনের হিসাবকে ধরা হয়েছে যেটা বাংলাদেশের ভূখণ্ডের ভিতরেই উৎপাদিত হচ্ছে এবং কত বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার রপ্তানি হয়েছে তার হিসাব আসেনি এটা আমরা বলেছি কিন্তু কেউ স্বীকার করেনি এখন সেটা হচ্ছে। একই রকমভাবে রাজস্বের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে বাংলাদেশে মাত্র বারো চৌদ্দ লক্ষ মানুষ শুধুমাত্র ট্যাক্স দেয় এবং এতো প্রবৃদ্ধি যদি হয় তাহলে তো কোটি কোটি মানুষের ট্যাক্স দেয়ার কথা তাহলে মানুষগুলো গেলো কোথায়? আয় হয়নি অথবা তারা করের টাকা দিচ্ছে না। অর্থাৎ করের টাকা গেলো কোথায়? আমরা বলেছি করের সাথে পাচারের সম্পর্ক গভীরভাবে আছে। সেই পাচারের বিষয় এখন ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ট্যালিজ্যান্স কি বলেন এবং কোর্টের থেকে নজরদারির কথা বলাতে এটা ক্রমান্বয়ে স্বীকৃত হচ্ছে যে এটার ভিতরে সমস্যা আছে। দেখুন, তথ্য-উপাত্ত নিয়ে একটা বড় ঘাটতি আমাদের ছিলো এবং যা আমরা ভালোবাসি, আমরা ভ্রান্ত বা কৃত্রিম তথ্য বা তথ্যের অভাবে আমরা আমাদের বক্তব্যকে স্থাপন করার চেষ্টা করতাম। এখন এটা ধরা পড়ে গেছে। ধরাটা পড়লো কোথায়? যখন আমরা নাগরিকরা দেশের ভিতরে থেকে, তৃণমূলের সাথে থেকে যারা বিশ্লেষণ করে তাদেরকে আপনি মূল্যায়ন করেন নি। আপনি মূল্যায়ন করেছেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা আইএমএফ কি বলেছে এবং বিভিন্ন সময় পত্রিকায় তাদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে তারা যে কথাগুলো বলেছে তাদেরকে আপনারা দেশের মূল্যায়নের চেয়ে বিদেশের মূল্যায়নকে বেশি দাম দিয়েছেন। যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছ থেকে আপনি চার বিলিয়ন ডলারের উপরে ধার চাইলেন এই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গত অক্টোবর মাসে আপনাকে এমন একটা সার্টিফিকেট দিয়েছে তাতে মনে হবে বাংলাদেশটা এখানে নয় ভেনাস বা মার্সে অবস্থিত। আমার সাথে এই নিয়ে ওনাদের তর্ক হয়েছে যে এটার দায়িত্ব কে নিবে? যখন আপনাকে বলা হয় যে আপনাদের চেয়ে উদীয়মান তারকা আর নেই, এখন এসে তাকে বলে বাজেট সমর্থন দিতে হবে চার বিলিয়ন ডলার তাহলে হঠাৎ করে এই অমানিশা কই থেকে নেমে এলো? একইভাবে যদি বিশ্বব্যাংকের কথা বলেন, তাদের উত্তেজনা আইএমএফ বা এশিয়ান ব্যাংকের চেয়ে কম ছিলো কিন্তু তারাও আজকে.....

সঞ্চালক: আপনি তো একই সঙ্গে অর্থনীতিবিদ ও কূটনীতিক দায়িত্ব পালন করেছেন। এইযে মাল্টিল্যাটারাল অরগানাইজেশানগুলো বা ডিপ্লোম্যাটরা বা বৈদেশিক নানা শক্তি না সময়ে যারা কথা বলে বোঝা যায় না কখন তারা প্রশংসা বা বিরোধিতা করে....

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এরা কোনো স্বাধীন সংস্থা না। এরা বহুপাক্ষিক সরকারি সংস্থা। অর্থাৎ বাংলাদেশও তার একটি সদস্য মালিক। যদিও ছোটো মালিক। তার চেয়েও বড় সমস্যা আছে তা হলো কোভিডের সময়ে পৃথিবী জুড়ে একটা উন্নয়ন হতাশা বিরাজ করেছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশেষ করে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এমনকি দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতেও বিভিন্ন কারণে সবাই একটা উন্নয়নের সাফল্যগাথা খুঁজে বেড়ায়। এর ইংরেজি শব্দ হলো ডোনার ডার্লিং। তারা ডার্লিং খুঁজে বেড়ায়। ওই প্রিয়তমা তাদের কখন কে হবে তা বলা যায় না। তারজন্য মনে রাখতে হবে এই প্রেমের কোনো স্থায়িত্ব নাই এবং এই প্রেম এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। তাদের বড় কারণটা কি? এই সংস্থা গুলো পুঁজিবাজার থেকে অর্থ তোলে। পুঁজিবাজার থেকে তখনই তারা অর্থ তুলতে পারে যখন এই অর্থ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে তারা এক ধরনের নিশ্চয়তা পায়। সেহেতু বৈদেশিক সংস্থাগুলো যখন এই কথাগুলো বলে, এটা আত্মপ্রতারণার মতো হয়। দ্বিতীয় যেটা বলতে চাচ্ছি, দেশের মূল্যায়নকে আপনি না দেখে বিদেশের মূল্যায়নকে আপনি দেখলেন এবং আপনি অক্টোবর নভেম্বর পর্যন্ত যা পেয়েছেন সেই লোকগুলোই এখন আপনাকে কি বলে যাচ্ছে সেটা একটু দেখুন। কিন্তু তারা তো কোনো দায়িত্ব নেবে না। এই দায়িত্ব সরকার, আপনার আর আমার মতো নাগরিকদের হবে। সেহেতু মনে রাখতে হবে, আপনার জবাবদিহিতা এবং চিন্তার উৎসটা কার সাথে সম্পর্কিত। জনগণদের সাথে সম্পর্ক নাকি দাতাগ্রহীতার সাথে সম্পর্ক। আর তৃতীয়ত, কৌশল ঠিক হচ্ছে কিনা। প্রবৃদ্ধির কথা বলবেন কিন্তু প্রবৃদ্ধি সকলে পেলো কি পেলো না সেটা বলবেন না। উদাহরণ হিসাবে বলি, ছয় বছর পরে আমাদের খানা জরিপ বের হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে আমাদের আয় ও ভোগ দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু কোন আয়ের মানুষ কতটা বেড়েছে এটা কিন্তু তারা প্রকাশ করেননি।

সেদিন আমি সাংবাদিকদেরও বলেছি। ওটার ভিত্তিতেই তো গড়টা বের হয়েছে। তাহলে এই বিভাজিত আয়টা যে নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের কত বাড়লো। প্রথম এক শতাংশের ভিতরে কিভাবে আয়ের পুঁজি হলো আর সবচেয়ে গরীব ৫% এর কি হলো। সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বলেছি সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মেগা প্রজেক্ট এ যা টাকা আপনি দেন সেটা পুরো শিক্ষাখাতের টাকার সমান। আর স্বাস্থ্যখাতে যা দেন তার দ্বিগুণ। গুণমান, অবকাঠামো ও শিক্ষার মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কি ধরনের বিনিয়োগ আমরা করছি সেটা জানছি না। একই সাথে তথ্যের বিভ্রান্তি, বিদেশিদের কথায়, কৌশলের সমস্যা এই তিনটি নিয়ে বলছি। কৌশলের সমস্যা হলো, সুরক্ষার খাতে যে টাকা আমি দুই শতাংশ

জিডিপি দেই এখন দেখা যাচ্ছে, ওখানে এক শতাংশ হলো পেনশন। এটার ভিতরে জাতীয় সঞ্চয়পত্রের সুদকে দেখাচ্ছেন সামাজিক সুরক্ষা হিসেবে। অন্যান্য হিসাবে এটার ভিতরে রয়েছে। তাহলে, সামাজিক সুরক্ষা খাতের দুই শতাংশ তো আসলে এক শতাংশ। এটাকে বাড়ানো একটা বড় বিষয় বলে মনে করছি। অর্থাৎ খাতপ্রতি ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভৌত অবকাঠামোর সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ, সামাজিক সুরক্ষার খাতেও এই প্রবৃদ্ধির সময় উচ্চমূল্যে দিলেন। অর্থাৎ যখন একটা ধাক্কা আসলো তখন এটাকে মোকাবিলা করার জন্য আমি কিন্তু শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারলামনা এক ধাক্কার পিছনে। কোভিডের পর যখন বৈশ্বিক উচ্চমূল্য ও ইউক্রেনের যুদ্ধ আসলো তাকে মোকাবিলা করার জন্য আমার যা দরকার তা আসলো না। এর জন্য দায়ী কৌশলের বিপর্যয়। আপনি যদি গত পনেরো বছরের হিসাব দেখেন, কৌশলের বিপর্যয়জনিত সবচেয়ে বড় জায়গা বিদ্যুৎ খাত। যেই বিদ্যুৎ খাত সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের জায়গা ছিলো বিএনপির সেখানে গত পাঁচ দশ বছরে বড় ধরনের সাফল্য আমরা অর্জন করেছিলাম বলে মনে করেছিলাম, সেইটাই এখন সবচেয়ে বড় গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইশ হাজার মেগা ওয়াট স্থাপন করে, দশ হাজার আপনি ব্যবহার করতে পারেন না। তাহলে ওই বিনিয়োগ টা আপনি শিক্ষা স্বাস্থ্য খাতে করতেন তাহলে প্রবৃদ্ধির জন্য মানবসম্পদের অবদান বাড়তো। দেশের ভিতরে আপনি বিদ্যুৎ এর উৎস না খুঁজে পুরোপুরি আমদানি নির্ভর পরিস্থিতিতে গেছেন সেটা কয়লা, তেল, গ্যাস সবকিছুতে। একইরকমভাবে, আপনি এমন সব চুক্তি করেছেন, তখন মনে হতে পারে যে আপনি মরিয়া হয়ে করেছেন। কিন্তু এখন মনে হবে স্বার্থসংশ্লিষ্টভাবে করেছেন। আপনি কিনছেন ডলার দিয়ে, বিক্রি করছেন টাকায়। আবার ওই টাকা আপনি অনেক জায়গায় ডলারে দিচ্ছেন। এই জায়গা কোনোভাবেই টেকসই হওয়ার কথা না এবং আপনি এমনভাবে তাদের সুরক্ষা দিলেন যে তাদের বিরুদ্ধে অনন্তকালের জন্য মামলা করা যাবে না। একটা সাংবিধানিক মানবিক অধিকার পরিপন্থী কাজ করলেন। এই বিদ্যুৎ এখন যখন তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রির উপরে উঠে তখন গ্রামাঞ্চলের মানুষের লোডশেডিং কল্পনাতীত ব্যাপার। ওখানে ক্যাপাসিটি সক্ষমতা তৈরি করে বসে আছেন কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা নাই এর চেয়ে বড় কৌশলের বিপর্যয় আর কি হতে পারে? আপনি ধারাবাহিকতা রক্ষা করলেন না কিন্তু মানুষকে বুঝিয়েছেন সবই মানুষের জন্য কিন্তু মানুষ তো শেষ বিচারে পেলো না। এইযে আমি তিনটি জিনিস বলতে চাচ্ছি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্ত ঘাটতি, বিদেশ নির্ভরতা এবং বিভিন্ন কৌশল যা নেয়া হয়েছে সেগুলো এখন গলার কাঁটা।

সঞ্চালক: আপনার কাছে তিনটা ছোটো প্রশ্ন। ভিতরেই হয়তো অনেকে এই সমস্যাগুলোকে ফুলিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। প্রথমত, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা ইতিবাচক কথা কয়েকবছর ধরে বলেছেন আজকে তারা কি করছেন? দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক ঋণ শোধ করবার সময়ে টাকা দিতে হচ্ছে কিছুটা চাইনিজ, কিছুটা ভারতীয়

মুদ্রায়। এই ঋণ পরিশোধের চিত্রটা বাংলাদেশে কেমন? তৃতীয়ত, আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে সহায়তা, ঋণ ও আশ্বাস পাচ্ছি এগুলো কতটা শেষবিচারে সহায়তা করবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রথমে বৈদেশিক ঋণের কথা বলি। বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ গত দুই তিন বছরে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এর ফলে অনেকে বলে আমরা খুবই স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলাম কারণ জিডিপির ৩০/৩৫ শতাংশ ঋণের মাত্রা ছিলো এজন্য এটা দুশ্চিন্তার কিছু না। তাদের এই হিসাবটা যে ঠিক না। সেটার সমালোচনা এখন পৃথিবীব্যাপী যে ওটার ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণে অভ্যন্তরীণ ঋণের হিসাব আনা হয়নি। দ্বিতীয়ত, সরকারের অনেক ছদ্ম ঋণ আছে, বিভিন্ন জায়গায় ওনারা আমদানি দিয়েছেন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য যেগুলোর কোনো হিসাব নেই। তার চেয়ে বড় কথা জিডিপির অংশ হিসেবে ঋণের মাত্রা প্রয়োজন বিবেচনা করা যথেষ্ট নয়। তাহলে ২২৬% জাপানের ঋণ। ২০০% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ। সেই অর্থে কি আমরা বলবো তারা ঋণ দেউলিয়া দেশ? কারণ তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা আছে ওই ঋণ পরিশোধ করার। আমার তো যেই বিনিয়োগগুলো নিয়েছেন সেগুলো চটজলদি কোনো রাজস্ব উৎপাদন করে না। সেটা হলো দীর্ঘমেয়াদে দুইবছরের প্রকল্পকে পাঁচ বছর করে আপনি সমস্যা করেছেন। দুই টাকার প্রকল্পকে দু'শো টাকা করে আপনি জটিল করেছেন। সেই জায়গাটি একটি বড় বিষয়। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ঋণগ্রস্ত দেশের তালিকায় যায়নি কিন্তু এক-দুই বছরের ভিতরে এই ঋণের হিসাব যদি আমরা পূর্ণভাবে করি তাহলে একটা ভয়ংকর চিত্র আসার বড় আশংকা রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, এই ঋণ যারা নিলেন তারা শোধ করবেন না। এই ঋণ শোধ করবে আগামী প্রজন্ম। আপনি ঋণ নিয়ে ঘি খেয়েছেন সেই অর্থে উদরাময় যে কষ্ট সেইটা পরবর্তী প্রজন্ম ভোগ করবে। এইটা আমরা উত্তরাধিকার রেখে যাচ্ছি। এজন্য আমরা যখন টেকসই উন্নয়নের কথা বলি তখন আমরা আন্ত প্রজন্মের ভিতরে সুষম হওয়ার কথা বলি। অর্থাৎ, আমি এমন কিছু করবো না যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বোঝা হয়ে দাড়ায় একইরকমভাবে আমরা অর্থনৈতিক বোঝাও তার কাছে দিয়ে যাবো না। এটি আগামীতে আরো প্রকট হবে। আইএমএফেএ যে স্বচ্ছতা পরিষ্কার হলে আরো ভালো করে দেখবেন এবং অনেক ঋণের হিসাব বৈদেশিক ঋণের হিসেবে ঢুকছে না বা কোনটাকে আমরা ঋণ বলবো বা বলবো না সেটাও। যেমন পদ্মা সেতুর কথা। পদ্মা ব্রিজ বলা হয় নিজের টাকায় করেছি। কিন্তু সরকারের তো ঘাটতি আছে তাহলে সরকার ঋণ নিয়েছে। তাহলে সে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে বা জাতীয় সঞ্চয়পত্র বিক্রি করেছে বা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মুদ্রা ধার করেছে। সরকারের টাকা বলে তো কিছু নেই। সব নাগরিকদের টাকা। দ্বিতীয়ত, এখন যে রেললাইন হয়েছে এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে উচ্চমূল্যর ঋণের মধ্যে এটা পড়বে। এটা তো বিবেচনার বিষয়। এটা আমরা অহংকারের প্রকল্পের অংশ হিসেবে দেখবো নাকি সুষম উন্নয়নের প্রজন্মের আন্তঃপ্রজন্মের অংশ হিসেবে দেখবো। পদ্মাপ্রকল্প নিয়ে আমি কয়েকবার আলোচনা করে এসেছি। ওটার আশপাশে জমির দাম

বেড়েছে কিন্তু বিনিয়োগ নাই। এটার সাথে যদি মংলার যোগাযোগের রাস্তা না করতে পারেন, তাহলে সুষম প্রকল্প হবে না। তাহলে যে প্রকল্প তৈরি করছেন সেটার সুষম সম্পদ না থাকে তাহলে আপনি বিবেচনা করবেন রেললাইন আগে নাকি ওটা আগে। কিন্তু প্রাধিকারগুলো অনেক দৃশ্যমান উন্নয়নের জন্য। ওই রাস্তা তো তেমন দৃশ্যমান না যতটা রেললাইন টা করতে পারবেন। তৃতীয়ত মুদ্রা। এটা এখন বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে। এখন বিকল্প মুদ্রার চিন্তা হচ্ছে। একবার রাশিয়াকে বললেন ভারত দিয়ে একবার বললেন ইইউওয়ান দিয়ে। কিন্তু আপনার কত টাকার ইউওয়ান আছে? আপনি যা ওখানে বিক্রি করেন তার একশতাংশ রপ্তানি করেন। চিন্তাগুলো অদ্ভুত মনে হয়। এমনকি ভারতের সাথেও যদি করবেন তাহলে ওইদেশের টাকা তো আমার কম। রাশিয়া বলেছে, আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ভারতীয় মুদ্রা নিয়ে বসে আছি কি করবো বুঝতে পারছি না। কারণ তার দেশেই ওটার চাহিদা কম। সেও চায় যেন তার থেকে এগুলো কেউ নিতে পারে। এগুলো করার জন্য যে ধরনের আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক, দক্ষতার ব্যবস্থাপনা দরকার সেই হিসেবে ব্যাংক ব্যবস্থাই তো ভঙ্গুর অবস্থায় আছে।

সঞ্চালক: বাংলাদেশের আর্থিক খাতের নেতৃত্ব কে দিচ্ছে? সেটাই তো স্পষ্ট...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আর্থিক খাতে বা ফাইনানসিয়াল বলেন এটা জটিল।

সঞ্চালক: ওভারওল ইকোনমিক।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা অনেক কম হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কিংবা আইএমএফ এর যে বসন্তকালীন সভা হয় অথবা যে হেমন্তকালীন সভা হয় সেখানে সাধারণত বাংলাদেশ অর্থমন্ত্রী নেতৃত্ব দিয়ে থাকে এবং সবদেশেরই অর্থমন্ত্রী সেখানে নেতৃত্ব দেয়। এবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক দিয়েছে। এক্ষেত্রে আচরণ দিয়েই আপনারা বুঝতে পারছেন।

সঞ্চালক: আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর ঋণ যে বলা হচ্ছে যে বর্তমান যে সংকট ...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন, এটা সাময়িক স্বস্তি দেবে সমাধান দেবে না।

সঞ্চালক: আরেকটা প্রশ্ন ছিলো, নাগরিক সমাজের বা অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ....

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ইদানীং ওনাদের ক্ষেত্রে আমি একধরনের বিনম্র আচরণ লক্ষ্য করি। এটা আমাদের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে যতখানি না তারচেয়ে বেশি একধরনের আদর্শিক

অবস্থান থেকে সরকারের বিভিন্ন অপকর্ম বা দুর্নীতি যদি থেকে থাকে সেইজন্য লজ্জা পান বলে মনে হয়। ওনারা ক্রমান্বয়ে স্বীকার করতে চাচ্ছেন অসুবিধাগুলো। ওনাদের একটা কথা হলো 'আমি কিন্তু বলেছিলাম'। কিন্তু তারপরে যে জায়গায় ওনারা আসেন না সেটা হলো এটা কেন সৃষ্টি হলো? আমি যেটা বাংলাদেশ ঘুরে ও মানুষের সাথে কথা বলে বুঝেছি একটা জবাবদিহিতার বড় ঘাটতি রয়ে গেছে। একটা গণতান্ত্রিক বড় জবাবদিহিতার ঘাটতি হয়ে যাওয়াতে যেই প্রতিষ্ঠানে যে কাজকর্ম হওয়ার কথা সেগুলো তারা করে না এবং অন্য প্রতিষ্ঠানে যে সমন্বয় করার দরকার তা তারা করেন না। তৃতীয়ত, যে মানুষগুলোর জন্য কাজ করার কথা তাদের কে আমলে নেন না। এই যে একটা গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার অসুবিধা ও স্বচ্ছতার অভাব এবং এটার দুর্বলতাটা হঠাৎ করে প্রকাশ্য হয়ে গেছে।

সঞ্চালক: আমরা তিনটা বিষয় নিয়ে আলোয়না করতে চাই বলেছিলাম। এখন আমরা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও নির্বাচনের বিষয় আরেকটি হলো ভূরাজনীতি ও অর্থনীতি। আপনি কোন জায়গা নিয়ে এখন আলোচনা করতে চাই।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: রাজনৈতিক আলোচনা আমি এভাবেই শেষ করে অন্য আলোচনায় যাবো যে এই মুহূর্তে মূল্যস্ফীতি মানুষের জীবনযাপনে যে বড় সমস্যা, আয়-ব্যয়ের সরকারের সামঞ্জস্যহীনতা, আমদানির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার যে ঘাটতি। এইটা একটা বিপর্যয়ের বড় ধরনের চলক হয়ে এসেছে। এটা যেনো রাজনীতির উপরে প্রভাব না নিয়ে আসে এটাই লক্ষ্য করার বিষয়। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে দেখেছি, আআইএমএফ যখন বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাচ্ছে তখন এর বিধান হলো সরকারের সামঞ্জস্য বিধান ও কর আদায় করা। সেখানে ভর্তুকি একটা বড় জায়গা এবং বিনিময় হার শিথিল করা একটা বড় জায়গা। এর ফলে বিদ্যুৎ, সারের, জ্বালানির, আমদানিকৃত পণ্যের দামও বাড়বে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে কে? এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে তো রাজনৈতিক নেতৃত্বকে পরিকল্পনাটা নাগরিকদের সামনে তুলে ধরতে হয় যে আপনি

কষ্ট করবেন এবং এই কষ্টটা সাময়িক। এই আশ্বাস দেয়ার মতো রাজনৈতিক মুখপাত্র নেই। আছেন যিনি তারা অদৃশ্য আমলা। যারা এই টাকাগুলো নিয়েছে এই সময়গুলো পার করার জন্য। খুবই স্বল্পমেয়াদি চিন্তার ভিতরে কিছু কাঠামোগত মধ্যেমেয়াদি সমাধান খোজার চেষ্টা হয়েছে যেটা টিকবেনা। সেখানে যদি বড় ধরনের সমস্যা হয়, টাকা বা ডলার বলেন তাহলে এটা রাজনীতিতে বড় ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলবে। রাজনীতি যখন ইতোমধ্যে একধরনের বড় ধরনের অনিশ্চিতার মধ্যে বসবাস করছে তার মধ্যে এটা একটা বড় ধরনের দাহ্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। মানুষগুলো একদিকে যদি মতামত প্রকাশের জায়গা খুঁজে না পায় অপরদিকে যদি অর্থনৈতিক কষ্টের ভিতরে পড়ে এই দুটো

একসাথে কোনোসময় কোনো দেশে হয়নি। আপনার তাকে প্রকাশের জায়গা দিতে হবে এবং রাজনীতিবিদরা যদি এটি ধারণ না করেন তাহলে সামাজিক অসন্তোষ বিভিন্ন দিকে প্রকাশ পায় এবং দুই তৃতীয়াংশ যুবসমাজের এবং এক তৃতীয়াংশ যুবসমাজের চাকরি নেই। এরকম পরিস্থিতি কোনোভাবেই ঈর্ষণীয় অবস্থা হতে পারে না। এটা বড় ধরনের নির্ণায়ক হিসেবে আসছে বলে মনে করি।

সঞ্চালক: কেউ কেউ মনে করেন যে এখন প্রধান সমস্যা যা সমাধানের দিকে সবচেয়ে বেশি নজর দেয়া উচিত তা হলো আগামী নির্বাচন এবং সেটাকে মাথায় রেখে একটা পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট খুবই জরুরি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা তো বলা বাহুল্য। রাজনীতি তো আর্ট অফ দি ফিজিবেল। যেটা যখন সম্ভব সেটাই করছি। যখন আমরা ক্ষমতায় থাকি তখন আমাদের মনে হয় সবই সম্ভব। এটা একটা বিচারের বিষয়। অভিজ্ঞ রাজনৈতিকবৃন্দদের মধ্যে তথ্য-উপাত্ত, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ ও আপনাদের মতো মিডিয়ারাও তাদের সাথে থাকে। তখন তারা একরকমভাবে চিন্তা করে। শেষ দিন পর্যন্ত সবাই তাই চিন্তা করে। কিন্তু এটাকে সম্ভাবনার জায়গায় বা বোঝাপড়ার জায়গায় যেতে পারে তখন এটা করা সহজ হয়। এতে অর্থনীতির ক্লেশটা অনেক কম হয়। বিষয়টি অন্য জায়গায়। বিষয়টি হলো, এই যে সমঝোতাটা করবে কে? বিবাদমান রাজনৈতিক গোষ্ঠী নাকি বাংলাদেশের উন্নয়নের পক্ষে যে উৎপাদনশীল শক্তি আছে যারা বাংলাদেশ থেকে বিদেশে টাকা পাচার করেনি, এইদেশে থেকে এইদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সামাজিক সমঝোতাটা হতে হয় নতুন বিকাশমান যে উচ্চবর্গের মানুষ থাকে, তারা এটা করে। তারা এটা পিছনে থেকে করে এবং সেই ক্রিয়াটা আমরা বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছি কিনা। এটা থাকে সমাজের, অর্থনীতির, রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের, নাগরিক সমাজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, মিডিয়ার ভিতরে। বাংলাদেশে বিকাশমান আগামী দিনের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল শক্তিরা এখানে এটা অনুধাবন করেন কি না যে তাদের এখানে কোনো করণীয় আছে। আর যদি তারা মনে করেন রাজনৈতিক বিবাদমান গোষ্ঠীর তারা অংশ হয়ে গেছেন তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের বিপর্যয় অনিবার্য। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সাথে প্রতিশ্রুতিশীল বিকাশমান শক্তিগুলোও আক্রান্ত হয়ে যাবে। এইটা কোনোভাবেই হওয়া উচিত না বলে আমি মনে করি। কারণ বহুমানুষের ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এটা শুধু রাষ্ট্র করেনি। এটা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা করেছে, ব্যক্তিখাতের ব্যক্তিরা, পেশাজীবীরা, নাগরিকরা করেছে। সেহেতু সমঝোতার কথা বললেই জনগণ অনেকেই মনে করেন এটা আওয়ামিলীগ বিএনপির বিষয়। এটা বাংলাদেশের বিকাশমান শক্তি ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এ যারা বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে যারা দায় স্বীকার

করে সেই দায়বদ্ধতা থেকে যারা এটা করবে সেটা। এখন এটার প্রক্রিয়া কি হবে, এটাকে কিভাবে সামনে আনবেন সেটা ভাবতে হবে একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

কিন্তু আমি মনে করি, এটা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বড় দুর্বলতা যেখানে কর্তৃত্ববাদী হাইব্রিড অর্থনীতি যেখানে আছে সেখানে দেখি রাজনৈতিক উচ্চপর্যায়ের মানুষরা কোনো স্বাধীন মতামতের জায়গা রাখতে চায় না। তখন তারা পেশাজীবীসহ অন্যান্য নাগরিক সংগঠনগুলোকে তাদের ভিতরে আত্মস্থ করে নেয়। তখন সেখানে তারা নির্বাচনও করতে দেয়না। তখন তারা তাদের নিজেদের মানুষকে ওখানে বসাতে চেষ্টা করে। এটা স্থানীয় সরকার, পাড়ার ক্লাব, বাণিজ্যিক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠনেও একইরকমভাবে হয়। তখন স্বাধীন সক্রিয় ভূমিকা পালন করার তাদের শক্তি নাই। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বার এ্যাসোসিয়েশনের কি ভূমিকা ছিলো? শামসুল হক সাহেবের নাম তো এখন কেউ নেন না। উনি কালো কোট পরে রাস্তায় নামলেই পুলিশরা সরে দাঁড়াতো। একইভাবে বিএমএ, অর্থনৈতিক সমিতি, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা, সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচার এ্যাসোসিয়েশন কিভাবে করতো আপনি ওগুলো দেখেন। কিন্তু ওই ভূমিকা তো নাই সেহেতু দায়বদ্ধতার জায়গাটা কোথাও আলগা হয়ে গেছে। এই জায়গাটা আমি দুর্বলতার অংশ বলে মনে করি। কিন্তু আনি শক্তির জায়গা কোথায় দেখি? বাংলাদেশে গত ১৫/২০ বছরে একটা নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গড়ে উঠেছে। যাদের জীবনমান আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে হয়তো কিন্তু তারা ন্যায্যতা পায়নি। তাদের যতটা পাওয়া উচিত ততটা পায়নি। তারচেয়ে বড় বিষয় হলো যতটা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটা কেউ কেউ নষ্ট করে দিচ্ছে। তারা দেখছে তারা বাসস্থানের জন্য কি কষ্টে আছে কিন্তু একই সাথে কানাডায় বেগমপাড়া গড়ে উঠছে। তারা ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দিতে খুবই কষ্ট করছে কিন্তু তারা দেখছে উচ্চবিত্তরা কিভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাচ্ছে এবং এখান থেকে পাচার করা টাকা নিয়ে যাচ্ছে। তারা অপারেশনের জন্য টাকা খুঁজে বেড়াচ্ছে আর তারা দেখছে প্রতিনিয়ত আপনার আমার বন্ধুরা প্লেন নিয়ে এসে রোগী নিয়ে যাচ্ছে। এরা বিশ্বায়িত মধ্যবিত্ত। তারা দেখে পরিবর্তনটা কিভাবে হয়। তারা দেখে সুদানে, থাইল্যান্ডে, মিয়ানমারে কি হচ্ছে, সেহেতু তারা চোখ কান খোলা রাখে। নাইজেরিয়া বুলগেরিয়ার কথা পরে আমি বলছি। আমি এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যারা এই সরকারের আমলে সৃষ্টি তাদের উপর ভরসা রাখি। এরা কিন্তু নতুন সমঝোতার নিয়ামক হিসাবে কাজ করতে পারে।

সঞ্চালক: আমি রাজনৈতিক প্রসঙ্গে আবার আসবো শেষ দিকে। তার আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক প্রক্রিয়া ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এখন একটা টানাপোড়েনে আছে। অনেকেই প্রশংসা করছিলেন যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এই অঞ্চলের রাজনীতির যে বৈরিতা সেটিকে ভালোভাবেই ব্যালেন্স করে আসছিলেন

কিন্তু এখন সংকটটা পশ্চিম বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অনেকটা বেশি। চীন, ভারতের সাথে কিভাবে ব্যালেন্স করবে। প্রধানমন্ত্রী জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য যাবার আগে ইন্দো প্যাসিফিক আউটলুক ঘোষণা করা হলো সেটাও অনেকে বলছেন এটাও একধরনের পশ্চিমাদের ম্যানেজ করবার কথা। কোনো কোনো পত্রিকায় নিউজ বের হলো যে, একধরনের কাজ দেয়া হবে গ্যাস উত্তলনের জন্য। এইসব নানা ইস্যু আলোচনার মধ্যে আছে কিন্তু অনেকেই মনে করেন বৈশ্বিক চাপটা বাংলাদেশের উপরে আছে এবং এটা আরো তীব্রতর হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নীতি নিয়ে আমরা অনেকেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমালোচনা করেছি। আমরা যে সতর্কতা দিয়েছি সেটাকে গ্রহণ না করার জন্য সমালোচনা করেছি। কিন্তু অর্থনীতি নিয়ে যতটা করেছি বিদেশি নীতি নিয়ে কিন্তু ততটা করিনাই। কারণ সরকারের পক্ষ থেকে একটা বিকাশমান অর্থনীতি পৃথিবীর বিভিন্ন টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একধরনের খুবই সূক্ষ্ম তারের উপর নাচতে হচ্ছে সেটা তারা খুব নৈপুণ্যের সাথে করছিলেন (বিশেষ করে মিয়ানমারের ক্ষেত্রে) সেইটার প্রশংসা নেত্রীকেও আমরা অনেকে দিয়েছি। তখনকার বিষয়ের সাথে এখনকার বিষয়ের একটা মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। তখন বিষয়টা ছিলো যে জাতীয় স্বার্থে আমরা কাজগুলো করছি। এখন অনেক সময় মনে হচ্ছে এটা জাতীয় স্বার্থে না এটা সরকারের স্বার্থ টেকসই করতে করা হয়েছে। দেখুন দেশ ও রেজিম ইন্টারেস্ট কিন্তু ভিন্ন জিনিস। এই বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবটা আমার মনে হয় আরেকটু বেশি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এইটা যখনই হয় তখন আপনি আগে যেই কাঠামোর ভিতরে থাকতেন তখন ওইটা থেকে বের হয়ে গিয়ে আপনি চটজলদি একটা কাজ করছেন। অর্থাৎ আপনি জাপানে যেয়ে বলছেন সাউথ চায়না সি আমাকে সবচেয়ে নিরাপদ অঞ্চল করতে হবে। কারো ওখানে হস্তক্ষেপ দিবো না। আবার আপনি পরের দিন বলছেন বঙ্গোপসাগরে টেণ্ডার ছাড়া মার্কিনদের বিনিয়োগ করতে দিবো। চীনকে বলছেন আপমি এখন কৌশলগত অংশীদার। আপনি শুধুমাত্র উন্নয়ন সহযোগী না। ভারতকে বলছেন যুগযুগান্তরের সম্পর্ক আছে ও থাকবে। এগুলোর ভিতর আপনি কিন্তু সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না। সামঞ্জস্য বিধান করার জায়গাটা ছিলো নৈতিক অবস্থান। এটা হলো দেশের স্বার্থে যা এখন আমি পারবো না।

এই জায়গায় আরো দ্বিতীয় সমস্যা যেটা রয়েছে অন্যান্য দেশেও কিন্তু সরকার টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন কৌশল যে করে না তা না। কিন্তু সেসমস্ত দেশের যে গণতান্ত্রিক বৈধতার সংকট যদি না থাকে তাহলে আপনি জোর দিয়ে কথা গুলাও বলতে পারেন আর যদি আপনার বৈধতার সংকট থাকে, যদি তারা মনে করে সরকার দুর্বল তাহলে তারা অনেক বেশিকিছু আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে। এই জায়গা নিয়ে শঙ্কা আমার

আছে। আগে জাতীয় স্বার্থ ছিলো এখন ক্ষমতায় থাকার স্বার্থ উঠছে। এটি হলো বৈদেশিক শক্তিরা আমাদের উপরে অনেক মাতব্বরি করতে পারবেন যদি তারা সরকার হিসেবে আমাদের দুর্বল মনে করেন।

ভূকৌশলগত ব্যাপার ছাড়াও পৃথিবীতে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। একটা দুই কেন্দ্রীয় আদর্শিক যুদ্ধের মতো চলছে। এখানে উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশের সাথে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন মডেলকে আধিপত্যর চিন্তা থেকে অনেক সময় করছেন। আমার প্রতিবেশী দেশ তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন দাঁড়ায় তখন হলো আপনি সংখ্যালঘুদের মতামত নিয়ে আপনি জাতীয় ঐক্য করছেন বাইরে সেটা তো তখন হয় না। তখন বৈশ্বিক যে পরিবর্তন হয়েছে যেমন গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নাগরিক সমাজের মুক্ত অধিকার এর পক্ষে সেই জায়গাগুলো আমরা ভুলে যাই। বাংলাদেশ এইটার ভুক্তভোগী হয়েছেই যেমন র‌্যাব এবং আরো ছয় জনের উপরে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আমরা আগে নিষেধগুলো মনে করতাম যে এটা রাষ্ট্র প্রতি আসে, তারপর দেখছি সংস্থা প্রতি আছে, তারপর আমরা দেখছি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রতি আসে। এই জায়গাটা বোঝার ব্যাপার। আগে হয়তো আমরা প্রথাগত মানবাধিকারের কথা বলতাম। যেমন আপনি মনে করতেন গুম খুন এটার জন্য। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে নাইজেরিয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাগুলো এসেছে ব্যক্তিবিশেষ রূপে সেইটা নির্বাচনকে বাঞ্চাল করার জন্য। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কেউ যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে তাহলে ব্যক্তিবিশেষে একধরনের নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। আপনি যদি বুলগেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখেন, যদি আপনি কর্তৃত্ববাদী সরকার রাখেন সেইটা যদি গণতন্ত্রের কারণ থেকে হয় এবং এইটা যদি কোনো কারণে দুর্নীতির সাথে যুক্ত হয় তাহলে ওই শাসকগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের উপর আপনি নিষেধাজ্ঞা দেবেন। রাশিয়া ও বুলগেরিয়ার ক্ষেত্রে এটা হয়েছে এবং এটা ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে সরকার সমর্থক ও ব্যবসায়ীদের ভিতর। এই জিনিসগুলো আগামীতে খুব পরিষ্কার ভাবে আসে। এখন সাম্প্রতিককালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটা আইন করার চেষ্টা করেছে যেই আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির মাধ্যমে আপনি কোনো টাকা সেই দেশে আনতে পারবেন না। সেই দেশে যদি আনেন তারা দেখেছে সংসদীয় সদস্যদের পার্লামেন্ট মেম্বারদের উপরে প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছে তাহলে অন্য দেশের দুর্নীতি আমার দেশের সুশাসনকে নষ্ট করছে। এজন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। সবচেয়ে প্রথম, আপনার ভিসা বন্ধ করে দিতে পারে। দ্বিতীয়, আপনার ওইদেশে ব্যবসা থাকলে তার উপর নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে। এই লোকগুলো শাসন প্রক্রিয়ায় যদি কোনোভাবে সামনে আসে তাহলে তাদের উপরে এই ধারাগুলো বর্তায়। তখন সরকারের যে কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাদের ভিতরে একধরনের ফারাক সৃষ্টি হয়। এর ফলে আপাত স্থিতিশীলতা ভেঙে যায়।

সঞ্চালক: আপনি যখন রেজিম স্টেবিলিটি বা স্থিতিশীলতার কথা বলছেন, অনেকেই মনে করেন সরকারের কন্টিনিউটিই একটা স্ট্যাবিলিটি এবং বৈদেশিক শক্তির মধ্যেও বাংলাদেশের রাজনীতি প্রভাবশালী। কেউ কেউ মনে করেন এটা খুবই জরুরি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা একটা সংকীর্ণ ধারণা। একটা গণতান্ত্রিক সমাজে, ধরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের কথা বলেন। তাহলে ভারতের সরকার তো বদল হয়েছে তাতে কি স্ট্যাবিলিটি নষ্ট হয়েছে? আজকে যদি নির্বাচন করে মোদি সরকারের জায়গায় অন্য সরকার আসে তাহলে কি ভারতের স্ট্যাবিলিটি নষ্ট হবে? তাহলে গণতান্ত্রিক আচরণ পরিবর্তন করলেই স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। এটা একটা সংকীর্ণ ধারণা। স্থিতিশীলতা নির্ভর করে আপনার যে সমস্ত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো কার্যকরভাবে থাকে কি থাকে না তার উপরে। সংসদ নির্বাচন করে সংসদ কার্যকর করতে পারেন কি না তার উপরে। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে বিচার ব্যবস্থা কোনো সুরাহা করে কিনা। বিচার ব্যবস্থা সুরাহা দিলে সেইটা কার্যকর করার অবস্থা প্রশাসনের আছে কিনা তার উপরে নির্ভর করে। প্রশাসনের কথা যদি না শোনে তাহলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শৃঙ্খলা স্থাপন করতে পারে কিনা। সেহেতু আমি স্থিতিশীলতাকে দেখি আমাদের দেশের রাষ্ট্রের যে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে সেগুলোর কার্যকর দক্ষ ও সময় উপযোগী আচরণের ভিতরে। সেহেতু ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ অব্যাহতভাবে ক্ষমতায় থাকাটাই স্থিতিশীলতার লক্ষণ না।

সঞ্চালক: নির্বাচন দেখেন আপনি ২০২৩ এর ডিসেম্বর বা ২০২৪ এর জানুয়ারিতে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি তারিখ দিচ্ছেন কেন? আমি অবশ্যই নির্বাচন দেখি। আগে একটা প্রশ্ন হতো এ না হলে বি, বি না হলে সি না ডি। এখন আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে এসে বুঝেছি এই প্রশ্নটা অবান্তর। সবাই বলে আমার ভোটটা আমি দিতে চাই। কাকে দিবে, কিভাবে দিবে এইটাই বড় কথা। অনেকেই বলে এটা থেকে এটা থেকে যদি খারাপ কিছু হয়। তাহলে আমি বলি মানুষের প্রতি আস্থা রাখেন। বাংলাদেশের যে আদর্শে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, বঙ্গবন্ধুর ডাকে যে দেশ স্বাধীন হয়েছে সেই দেশের মানুষের মূল্যবোধের প্রতি যদি আমি আস্থা না রাখতে পারি তাহল বাংলাদেশ তৈরি করাই বৃথা হয়ে গেলো। যেহেতু ভোট দেয়ার আগ্রহ মানুষের ভিতর আছে এজন্য আমি মনে করি নির্বাচন হবে এবং এই নির্বাচনের ভিতর দিয়েই সামাজিক সমঝোতার উত্তরণ হবে।

সঞ্চালক: কেমন নির্বাচন হবে? এটা তো একটা প্রশ্ন

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি এখনো বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আস্থা রাখি।

সঞ্চালক: বাংলাদেশের মানুষ কি নির্বাচন নির্ধারণ করে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মনে করি করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখেছি।

সঞ্চালক: তাহলে মানুষ বিগত নির্বাচনগুলোকে করেনি কেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তার মানে কোনো জায়গায় রাজনৈতিক শক্তির ব্যর্থতা ছিলো। বাংলাদেশের চাওয়া-পাওয়া তারা সঠিকভাবে ধারণ করতে পারেনি অথবা বাংলাদেশের মানুষ এটিকে গ্রহণযোগ্য ব্যতয় হিসাবে মেনে নিয়েছে। ২০১৪ তে যেটুকু ব্যতয়কে হয়তো সে গ্রহণযোগ্য মনে করেছে ২০২৩/২০২৪ এ সেটাকে মনে করবে কিনা। ২০১৮ তে দিনে হোক রাতে হোক যেটা মেনে নিয়েছে সেটা ২০২৩ এ মেনে নিবে কিনা। আমার কাছে মনে হয় গণতান্ত্রিক চেতনার দিক থেকে মানুষ আরো বেশি পরিপক্ক রয়েছে। আমি মনে করি, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল ও প্রগতিশীল এবং সত্যিকার অর্থে পৃথিবীর বুকে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে এবং গরীব মানুষের পক্ষে থাকবে।

সঞ্চালক: অনেক ধন্যবাদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য কে। শুরু যেখান থেকে করেছিলাম, ত্রিমুখী সংকটে বাংলাদেশ। এই সংকটের প্রধান কারণ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলছিলেন গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার ঘাটতি এবং তার সাথে আরো অনেকগুলো বিষয় আছে। এখন দেখবার বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশ এই ঘাটতি কিভাবে পূরণ করবে। আমরা সবাই এই নিয়ে আশাবাদী। এই আশা নিয়েই শেষ করতে চাই। সবাইকে শুভকামনা।

তৃতীয় মাত্রা, চ্যানেল আই
সঞ্চালনায়: জনাব জিল্লুর রহমান
১২ মে, ২০২৩

দুই দশকে সবচেয়ে জটিল প্রেক্ষাপটে বাজেট

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

গত দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে জটিল প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হচ্ছে ২০২৩–২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট। এখানে বহুমাত্রিক ও বহুস্তর বিশিষ্ট সমস্যা। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে আমরা। বর্তমান পরিস্থিতি-জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে খুব জটিল। ফলে বাজেট ঘোষণার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, রাজস্ব পরিস্থিতি, রাজনীতি, কূটনীতি এবং ভূকৌশলগত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে। তবে মনে হচ্ছে, এবারও একটি গতানুগতিক বাজেট ঘোষিত হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রভাবে কার্যকর বাজেট হবে আরেকটি। যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন। তার মতে, সরকারি কর্মকর্তাদের আয় নিয়ে সরকার যতটা চিন্তিত, বেসরকারি এবং অন্যান্য খাত নিয়ে সে চিন্তা একেবারেই নেই। এছাড়াও রাজনৈতিক উত্তরণ প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দেন দেশের শীর্ষস্থানীয় এ অর্থনীতিবিদ। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যুগান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার মনির হোসেন।

যুগান্তর: এবারের বাজেটে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ কী?

ড. দেবপ্রিয়: গত দুই দশকের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে জটিল প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবারের বাজেট। এখানে বহুমাত্রিক ও বহুস্তর বিশিষ্ট সমস্যা সামনে আসছে। জটিল পরিস্থিতির একটি দিক হলো, দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি,

বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, রাজস্ব আয় কম এবং বাজেট বাস্তবায়নে বিভিন্ন অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। বিশ্ব অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের উত্থান-পতন হচ্ছে। পণ্যমূল্যে বড় ধরনের উল্লম্ফন, সরবরাহ ব্যবস্থায় বিভিন্ন বাধা এবং করোনার সংকট কাটিয়ে অর্থনীতি এখনও আগের অবস্থানে যেতে পারেনি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ভূকৌশলগত দ্বন্দ্ব, ভূরাজনীতি এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। এ পরিস্থিতি পরাশক্তিগুলোকে নতুন ধরনের শীতল যুদ্ধের দিকে নিয়ে গেছে। এসব কিছু বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রকাশ্যভাবেই প্রভাব ফেলছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শুধু মিয়ানমারকে কেন্দ্র করে জড়িয়েছে, তা নয়। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাও এর সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশও এখানে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে সামগ্রিক পরিস্থিতি-জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে খুব জটিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে ইতোমধ্যে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। খাতগুলো হলো— বৈদেশিক সাহায্য, বিদেশি বিনিয়োগ, বিশ্বে বাজার সুবিধা এবং প্রযুক্তির লভ্যতা অন্যতম। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখছি, সেটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বড় ধরনের প্রশ্ন তৈরি করছে।

সম্প্রতি সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিদেশি নিষেধাজ্ঞার (স্যাংশন) সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে যুক্ত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, স্যাংশন দেওয়া দেশের কাছ থেকে পণ্য কিনব না। অর্থাৎ আমাদের ওপর স্যাংশন আছে এটি যেমন সত্য, এর বিপরীতে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় অর্থনৈতিক পদক্ষেপের কথা বলা হচ্ছে, এটিও সত্য। এসব বিষয়ের মধ্য দিয়েই বর্তমান জটিল প্রেক্ষাপটের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

যুগান্তর: বৈদেশিক মুদ্রার সংকট মোকাবিলায় আইএমএফ'র কাছ ঋণ নিয়েছে সরকার। এটি বাজেটে কীভাবে প্রভাব ফেলবে?

ড. দেবপ্রিয়: এমন সময় বাজেট ঘোষণা হতে যাচ্ছে, যখন বাংলাদেশ আইএমএফ'র কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি মোকাবিলায় আইএমএফ'র কাছ থেকে আমরা ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা চেয়েছি। ইতোমধ্যে প্রথম কিস্তির টাকা চলে এসেছে। একইভাবে সরকারি আয়-ব্যয়, আর্থিক খাত ও রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কাছ থেকে সাশ্রয়ী সুদে ৪ বিলিয়ন ডলারের মতো বাজেট সাহায্য প্রত্যাশা করা হচ্ছে। যেহেতু আইএমএফ'র সঙ্গে আমাদের চুক্তি রয়েছে, তাই বিশ্বব্যাংকসহ অন্য সংস্থাগুলো

কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে হয়তো সাহায্য দেবে। তবে এর সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি জড়িত। এসব সংস্কার এক দশক আগে করা উচিত ছিল। দীর্ঘদিন থেকে আমরা এসব বিষয়ে বলে আসছি। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি। এখন আইএমএফ'র কাছে নীতি সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করে রাজনৈতিক মূল্যে তা বাস্তবায়ন করছে। ফলে এই বাজেটে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, চলমান অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও কৌশলে এবার কতটুকু জোর দেওয়া হবে এবং দ্বিতীয়ত, স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ হিসাবে আইএমএফ'র শর্তের বিষয়ে কতটুকু জোর দেওয়া হবে। আমি মনে করি লক্ষ্যমাত্রা যাই হোক, আইএমএফ'র কাছে দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে রচিত হবে এবারের বাজেট। আরও সহজ করে বললে, হয়তো ঘোষিত বাজেট একটা থাকবে। কিন্তু কার্যকর বাজেট থাকবে আরেকটা। ঘোষিত বাজেট হবে গতানুগতিক। কিন্তু ভেতরে কার্যকর বাজেটে গুরুত্বপূর্ণ হবে— কর আদায়, বিভিন্ন কর সুবিধা তুলে দেওয়া, ভর্তুকি কমানো, সুদের হার শিথিলকরণ ও মুদ্রা বিনিময় হার একীভূতকরণ। এছাড়া ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের বিষয় এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যুগান্তর: বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাজেটে কী ধরনের কৌশল নেওয়া উচিত?

ড. দেবপ্রিয়: এবার এমন একটি বাজেট তৈরি হচ্ছে, তা বাস্তবায়ন করবে দুটি সরকার। বর্তমান সরকার অর্ধেক বাস্তবায়ন করবে। বাকিটা বাস্তবায়ন করবে নির্বাচন পরবর্তী সরকার। যদিও এই সরকার বাজেট তৈরি করে ফেলেছে, পরে তা বাস্তবায়নে-ধারাবাহিকতা ধরে রাখা ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে উন্নয়ন যাতে ব্যাহত না হয়, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ জীবন মানের অবক্ষয়ের কারণে আমাদের অর্জন যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাজেটের আর্থিক কাঠামোর চেয়ে গুরুত্বত্বপূর্ণ হলো কোনো আর্থ-রাজনৈতিক পরিবেশে আগামীতে আমরা বাজেট বাস্তবায়ন করব। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সামাজিক-রাজনৈতিক, ভূরাজনৈতিক এবং ভূঅর্থনৈতিক সংযোগগুলো আগামী এক বছরে খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে সামনে আসবে। যা বাজেট বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করবে। এসব বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বাজেট বাস্তবায়নে প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রত্যাশা করব।

যুগান্তর: সামনে নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আসছে। এছাড়াও স্মার্ট বাংলাদেশসহ সরকার বেশকিছু পরিকল্পনার কথা বলেছে, এক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ আশা করছেন?

ড. দেবপ্রিয়: ২০২৪-২৫ সাল হচ্ছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছর। ২০২৩-২৪ থেকেই তাই এই পরিকল্পনার মূল্যায়ন শুরু হবে। অথচ করোনা পরবর্তী সময়কালে এই মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলো পূরণ করা নিয়ে কোনো উদ্যোগ দেখছি

না। উপরন্তু চলমান বছরে (২০২২–২৩) অর্থনীতির অবস্থা দুর্বল হয়ে যাওয়ায় সংশ্লিষ্ট সরকারি ব্যক্তিরা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রাগুলো নিয়ে নীরব হয়ে গেছে। অপরদিকে এলডিসি থেকে মসৃণ-উত্তরণের জন্য কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা কমে গেছে। বরঞ্চ এর বদলে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছি। স্মরণ করছি দূরবর্তী ২০৪১-এর কথা।

যুগান্তর: নির্বাচনি বছরে অর্থপাচার বাড়ে। পাচার বন্ধে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

ড. দেবপ্রিয়: চলতি অর্থবছরে সবচেয়ে সমালোচিত বিষয় মাত্র সাড়ে ৭ শতাংশ কর দিয়ে পাচার করা অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার সুযোগ দেওয়া। নীতিগতভাবে আমি এর বিরুদ্ধে বলেছি। আমরা তখন বলেছিলাম, এটি রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য, অর্থনৈতিকভাবে অযৌক্তিক এবং সামাজিকভাবে অন্যায় পদক্ষেপ। এ বছরও এরূপ ব্যবস্থা বহাল রাখতে একটি গোষ্ঠী চাপ দিচ্ছে। অন্যদিকে এবার রাজনৈতিকভাবে অনিশ্চিত পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং ডলারের বিপরীতে টাকা দুর্বল অবস্থানে। সে কারণে এবার পাচারের আশঙ্কা আরও বেশি। যারা আগামীতে নির্বাচনে অংশ নেবে, সেখানে যাতে কালো টাকার মালিক, ঋণখেলাপি এবং বিদেশে সম্পদ থাকলে, ওইসব ব্যক্তি যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজন জনপ্রতিনিধিত্ব আইন সংস্কার করে বিষয়টি যুক্ত করতে হবে।

যুগান্তর: উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মধ্যবিত্তরা বিপদে। বাজেটে তাদের ব্যাপারে সুপারিশ কী?

ড. দেবপ্রিয়: নির্ধারিত বেতনের মধ্যবিত্তরা সমস্যায় রয়েছেন। সেক্ষেত্রে নিত্যপণ্য আমদানিতে যেসব জায়গায় শুল্ক আছে, কোথাও দুবার করে কর নেওয়া হয়, ভ্যাটের ইস্যু রয়েছে, এগুলো সমন্বয় করা উচিত। আর কোনো পণ্যের দাম বাজার ব্যবস্থার ওপর ছেড়ে দিলে তার ওপর থেকে উৎস করা প্রত্যাহার করা উচিত। যেমন বর্তমানে জ্বালানি তেল, বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে চাচ্ছে সরকার। এক্ষেত্রে কথা হলো-কর নেবেন, এরপর দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেবেন, দুটি একসঙ্গে চলে না। দ্বিতীয় বিষয় হলো, একদিকে বিদ্যুৎ কোম্পানি বসিয়ে রেখে ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া হবে, অপরদিকে বিদ্যুতের দাম বাড়বে, এটিও অন্যায়। আর আয়ের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের বেতনভাতা নিয়ে সরকার মনে হয় বেশ চিন্তিত, কিন্তু বেসরকারি খাতের কর্মজীবীদের কথা সেভাবে আলোচনায় আনেইনি। এটা আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগে। এছাড়াও বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ মানুষ, অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। সেখানে যিনি উদ্যোক্তা, তিনি শ্রমিক।

তাদের কাছে ব্যাংকিং, কর, ভ্যাট কোনো সুবিধা নেই। তাদের জন্যও সরকারের কোনো চিন্তা দেখছি না। ফলে সুবিধাভোগী সরকারি কর্মকর্তাভিত্তিক এক ধরনের বাজার চিন্তা সরকারকে ব্যস্ত রাখে। করযোগ্য আয়ের ন্যূনতম পরিমাণ অবশ্যই বাড়াতে হবে।

যুগান্তর: দেশের অর্থনীতিতে সম্ভাবনার দিক কী আছে?

ড. দেবপ্রিয়: বাংলাদেশের অর্থনীতির সম্ভাবনা হলো কৃষি খাত। খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে এ কৃষিই আমাদের রক্ষা করছে। তাই এ খাতের যত্ন নিতে হবে। মনে রাখতে হবে কৃষকের কথা। বর্তমান বাজার ব্যবস্থা কৃষকের বিরুদ্ধে কাজ করছে। উৎপাদিত পণ্য এবং নিজের চাহিদার জন্যও কৃষক বাজার থেকে সুবিধা পায় না। তাই আগামী বাজেটে কৃষিতে শর্তহীন সমর্থন প্রত্যাশা করছি। আর আছে প্রবাসী কর্মজীবীদের কথা। দেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্স আয়ের গুরুত্ব সম্প্রতি আরও বেড়েছে। তাই তাদেরও যত্ন নিতে হবে, সহায়তা দিতে হবে।

যুগান্তর
২৫ মে, ২০২৩

অর্থনীতির বর্তমান অস্বস্তিকর অবস্থায় প্রস্তাবিত বাজেট বিশ্বাসযোগ্য নয়

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আওয়ামীলীগ সরকারের ১৫ বছর ধরে এরকম জটিল পরিস্থিতিতে, অর্থনীতির এরকম নাজুক অবস্থার ভেতরে এবং একটি উত্তরণের প্রাক্কালে এরকম বাজেট রাজনৈতিকভাবে কাম্য ছিলো না। এর বড় কারণ হচ্ছে নির্বাচনের প্রাক্কালে আমরা দেখি যে সরকারের পক্ষ থেকে প্রচুর খরচ করার প্রবণতা থাকে। পুরানো সময়ে আমরা দেখেছি যে এখানে মধ্য বরাদ্দ রাখা হয় যেনো এটাকে ইচ্ছামতো খরচ করা যায় অথবা গ্রামীণ অবকাঠামোতে বরাদ্দ রাখা হয় যেনো সেগুলোকে খরচ করা যায়। সে সমস্ত সুযোগ আর্থিক কারণে সরকারের অনেক কম। এটি বাড়ানোর জন্য সরকারের যেটি প্রয়োজন পড়বে তা হলো রাজস্ব আদায় বাড়ানো। কিন্তু নির্বাচনের প্রাক্কালে নতুন কর আরোপ করাও সরকারের পক্ষে কষ্টকর। অর্থাৎ দুইদিকেই ব্যয় করার দিকেও এবং কর আদায় করার ক্ষেত্রেও তার প্রতিবন্ধকতা আছে। আরো যেটা সমস্যা হয়েছে যে শুধু রাজস্ব আয়-ব্যয়ের ঘাটতি মেটানোর বিষয় না, এখানে বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এটা শুধু এজন্য না যে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে, এটা আরো এজন্য যে আমাদের যে রেমিট্যান্স আয় হয় পুরোটা এখনো সরকারের কোষাগারে আসছে না আমার বিনিময় হারের যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে সেটার কারণে। তবে আমাদের রপ্তানির ক্ষেত্রে আগামী ছ'মাসের বাজার খুব একটা সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না আন্তর্জাতিক চাহিদা যেখানে একটু ম্রিয়মাণ অবস্থায় আছে। বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ সময়কালে আমরা বড় ধরনের ঘটনা লক্ষ্য করছি না। সেক্ষেত্রে সরকারের বড় নির্ভরশীলতার জায়গাটা হয়ে দাঁড়ায় বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করা বিশেষ করে বাজেট সমর্থনের জন্য। সরকার এটি চেষ্টা করছে কয়েক বিলিয়ন ডলার বিশ্বব্যাংক, এডিবি বা জাপান, কোরিয়া এদের কাছ থেকে আনার জন্য। সেটা কত দ্রুত আসবে

সেটার উপর নির্ভর করবে বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি কতখানি মেটাবে। কারণ ওটা মেটাতে না পারলে আপনার টাকার মূল্যমান ধরে রাখা আরো মুশকিল হবে যদিও এ টাকার বিনিময় হারের একটি সমন্বয় খুব দ্রুতই করতে হবে সরকারকে। এটা যদি করে আর তাতে যদি টাকার মূল্যমানের পতন ঘটে তাহলে অবশ্যই এটার ক্ষেত্রে আমদানিকৃত জিনিসপত্রের দাম বাড়বে এবং এটা বাংলাদেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার উপর চাপ সৃষ্টি করবে।

এ বাজেটের আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যেহেতু এটা আইএমএফের পরিকল্পনার অধীনে আছে, সেখানে আমাদের এ সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলো আছে যেমন আয় বাড়াতে হবে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে বিশেষ করে ভর্তুকির ক্ষেত্রে সেগুলো খুব কঠিন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। কিন্তু তারচেয়েও যে জিনিসটা বড় বিষয় সেটা হলো যে সুদের হারের ক্ষেত্রে এখনো আমরা যেভাবে ধরে রেখেছি নিচুতে সে সুদের হার বাড়বে। সুদের হার বাড়লে অবধারিতভাবে বিনিয়োগের উপর চাপ আসবে। অর্থাৎ, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চাপ আসবে সুদের হারের দিক থেকে এবং টাকার বিনিময়ের হারের দিক থেকে।

আইএমএফের কাছে প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে আমাদের তেল, গ্যাস এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ভর্তুকি কমাতে হবে এবং সেটা সরকার ধারাবাহিকভাবে করছে। এটা যদি আগামী ছয়মাসে আরো করে তাহলে তা উৎপাদনের উপর চাপ সৃষ্টি করবে এবং তা মূল্যস্ফীতির উপর প্রভাব ফেলবে। আসলে এই মুহূর্তে সরকারের কোনোখানেই স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গাটা নাই। এই স্বাচ্ছন্দ্য যেখানে থাকে না সেখানে আমরা অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে বলি যে এসব পরিস্থিতিতে আপনি উচ্চাশাকে নামিয়ে নিয়ে এসে আপনি নিম্ন পর্যায়ে স্থিত অবস্থায় নয় অর্থাৎ এমন একটি পরিস্থিতিতে যান যেখানে হঠাৎ করে দাম বৃদ্ধি হবে না, হঠাৎ করে টাকার মূল্যমানের পতন হবে না বা হঠাৎ করে সুদের হার বৃদ্ধি পাবে না এরকম জায়গাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমন্বয় দরকার হয় অর্থাৎ আর্থিক নীতির সাথে মুদ্রানীতির, মুদ্রানীতির সাথে বাণিজ্যনীতির সে সমন্বয়টার ও ঘাটতি রয়ে গেছে। অর্থাৎ যতখানি না আমাদের বাস্তব সমস্যা আছে তার চেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে নীতি সমন্বয়ের অভাবের কারণে এবং যথোপযুক্ত সময়ে আমরা পদক্ষেপগুলো নিতে পারছি না দেখে।

কিন্তু উচ্চাশা যে নামিয়ে নিয়ে আসবে সরকার, নির্বাচনের বছরে এটা খুবই অসুবিধাজনক। আপনি দেখুন কি ধরনের বাজেটটা হতে যাবে যে একদিকে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কথা বলবো, আবার অপরদিকে আমরা দেখবো যে আপনার এই প্রবৃদ্ধিকে কার্যকর করার জন্য যে বিনিয়োগ দরকার পড়ে সে বিনিয়োগের জন্য যে আমদানি করার পড়ে আবার

তার জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রার দরকার পড়ে সেটা আবার নেই। লক্ষ্য রাখার বিষয় হবে, প্রবৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হবে আর যে রাজস্ব কাঠামো বলা হবে তার ভেতর কোনো পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে কিনা, আর রাজস্ব যে কাঠামো ঘোষণা করা হবে এবং বাস্তবে যে কাঠামো আসলেই কার্যকর হবে সেটার ভেতরেও কোনো পার্থক্য আছে কিনা। তাই বাজেটের বিশ্বাসযোগ্যতাটাও এবার একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করি।

যখন কোভিড আসলো তখন আমরা বলেছিলাম যে অতিমারির ফলাফলকে মনে রেখে এবং একটি দুই-তিন বছরের উত্তরণকালীন বাজেট তৈরি করা উচিত। এর জন্য যে সংস্কারগুলো দরকার ছিলো রাজস্ব বা বৈদেশিক খাতে বা আমাদের শিল্পখাতে বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাতে এবং জ্বালানি খাতে সেগুলোকে মনোযোগ দিয়ে করা দরকার ছিলো কিন্তু সেটা করেনি। সরকার গতানুগতিকভাবে কোভিড টিকা দেবার সাফল্যের উপর ভিত্তি করে ভেবেছে অর্থনীতিতে আর কোনো সমস্যা নেই। তখন কিন্তু আমরা জানতাম না আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কি হবে। সেজন্য গত বছরে যখন ইউক্রেন যুদ্ধ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, সেটাকে বিবেচনায় নিয়ে আমরা বলেছিলাম আপনি স্বল্পকালীন একটি উত্তরণকালীন অর্থনীতি তৈরি করেন। এখন সেটা তো করা হয়নি। তাই এই অবস্থায় এসে আমি খুব বেশি নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা দেখি না। শুধুমাত্র এটিই দেখি যে সরকার হয়ত ঋণ করে বের হয়ে যাবার চেষ্টা করবে এবং এটা হয়ত আন্তঃপ্রজন্মের উপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে যাবে। এটিই একমাত্র তার জন্য সম্ভাবনার জায়গা বলে আমি দেখছি। কিন্তু সেটাও অন্য যেকোনো সময় থেকে কঠিন হবে কারণ আইএমএফ তো নজরদারিতে আছে।

খাদ্য নিরাপত্তাকে জোরদার করতে সরকারের পক্ষ থেকে কৃষির ক্ষেত্রে যে জোর দেয়া হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে এটা সঠিক। কারণ এই শস্য উৎপাদনের জায়গাটা যদি দুর্বল হয়ে যেতো তাহলে আমরা আরো বড় ধরনের সমস্যায় পড়তাম। ইতিবাচক দিক থেকে এটি বলা যায়। কিন্তু খাদ্যশস্যের বাইরেও তো ভোগ্যপণ্য আছে আর এর বেশিরভাগই আমাদের আমদানিকৃত। তাই টাকার মূল্যমানের পরিবর্তন হলে সেটারও দাম বাড়ে আন্তর্জাতিক বাজারে। এ সমস্ত জায়গায় আমি মনে করি সরকারের যেসব আমদানি শুল্ক আছে, এগুলোকে কমানো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানেও বলছি যে এটা করলে উনি যে রাজস্ব হারাবেন তা আইএমএফের কাছে জবাবদিহিতা করতে অসুবিধায় পড়বেন। আরেকটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে তেল, জ্বালানি বিশেষ করে বিদ্যুৎ ইত্যাদি আমরা যে দামে দিচ্ছি এখন তা বাড়বে এবং এটি এখন আবার উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে নিয়ে মূল্যস্ফীতির দিকে নিয়ে যাবে। সীমিত আয়ের মানুষের উপরে এটার চাপ আসবে। তেল এবং ডিজেলের ক্ষেত্রে উৎসে যে সমস্ত কর আছে এগুলোকে সরকার কমাতে পারে। সেটা কমালে বাড়তিটুকু যে হয়েছে সেটার দামটুকুকে সাশ্রয় করতে পারে অর্থাৎ যেখানে

সে ভর্তুকি কমাচ্ছে সে ভর্তুকি কমানোর সাথে সাথে যদি সে শুল্ক সমন্বয় করে তাহলে দামের ক্ষেত্রে একটি স্থিতিশীল অবস্থা থাকে ভোক্তাদের জন্য। সে জায়গাতেও নজর দেয়ার জায়গা আছে বলে আমি মনে করি। আর যেটা আছে সেটা হলো এ সমস্ত ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে যে এক কোটি পরিবারকে সাহায্য দেয়ার কথা বলা হচ্ছে তা কিন্তু কার্যকরভাবে আমরা বাজারে বা মাঠে দেখতে পাচ্ছি না। আরেকটা জিনিস মনে রাখা দরকার সরকারের কিন্তু বাংলাদেশে এখন যারা অতি দরিদ্র্য তাদের জন্য কিছু সুরক্ষা কর্মসূচি আছে। যারা উচ্চবিত্ত তারা কিনা খেতে পারে। কিন্তু মধ্যখানে যারা সীমিত আয়ের মানুষ আছে, যারা হয়ত ৪০/৫০ শতাংশ মানুষ, যারা হয়ত ৪০-৫০ হাজার থেকে দেড় দুই লাখ টাকা পরিবার প্রতি মাসে উপার্জন করে তাদের জন্য জীবনধারণ কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।

আমরা যেটা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি যে এটার ফলে তারা দারিদ্র্যসীমার খুব কাছাকাছি এসে যায়। তারা হয়ত হতদরিদ্র হয় না কিন্তু জীবনের মান তাদের ক্ষয় হয়। অর্থাৎ শিক্ষায় যেটুকু ব্যয় করতে পারতো তা পারছে না, স্বাস্থ্যের জন্য যেটুকু পারতো তা পারছে না। তাদের অন্যান্য বিনোদনের জায়গাগুলো খুব কমে যাচ্ছে। এই জায়গাতেও আমি মনে করি সরকারের করার জায়গা ছিলো। অর্থাৎ যে সমস্ত জায়গায় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তার বরাদ্দগুলো আছে সে সমস্ত বরাদ্দগুলো আরো উপবৃত্তির মাধ্যমে অর্থাৎ শিক্ষায় তো শুধু পাঠ্যপুস্তক দিলে হয় না অন্যান্য ব্যয় আছে। যেমন দুপুর বেলা যদি স্কুলগুলোতে খাবার দাবারের ব্যবস্থাগুলো হতো, মিড-ডে মিলের কথা এগুলোতে আরো দ্রুততার সাথে যেতে পারলে ভালো হতো বলে মনে করি। একেবারে সরকারের হাতে করণীয় নেই এই দুঃসময়ে এটা আবার আমি মনে করি না।

সরকারকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন থাকতে হবে। এক তো নির্বাচনের বিষয় আছে, আরেকটা জিনিস নিয়ে সরকারের সচেতন হতে হবে যে সাম্প্রতিককালে দেশের ভেতরে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে, আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সম্পদের বৈষম্য তো আকাশচুম্বী হয়েছে। এমনকি ভোগের বৈষম্যও বেড়েছে। সরকারের নতুন যে বাজেট আসবে, যে করনীতি হবে, ব্যয় নীতি হবে সেটা যেনো এই বৈষম্যকে বাড়িয়ে না দেয়। তাহলে সেখানে কি করণীয়? সেখানে করণীয় আছে আপনি একদিকে যেমন প্রত্যক্ষ কর ন্যূনতম বাড়ানোর জন্য চিন্তা করলেও মানুষ যেনো কমে না যায় কর দেয়ার সংখ্যা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ আপনি কর প্রদানকারী মানুষের সংখ্যা না কমিয়ে কোথায় করের সুরাহা দিতে পারেন সেটা বিবেচনার জায়গা থাকতে হবে। আমার মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশে মূলত এক-তৃতীয়াংশ প্রত্যক্ষ কর এবং দুই-তৃতীয়াংশ পরোক্ষ কর যেটা সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকলে দিয়ে থাকে। কর আহরণের ক্ষেত্রে

প্রত্যক্ষ করের দিকে যদি আপনি নজর না দেন তাহলে এটা আপনার জন্য জটিল হয়ে যাবে। তো প্রত্যক্ষ করের জায়গাটা কোথায়?

আপনি এখন পর্যন্ত শুধু আয়ের উপর নির্ভর করে আয়কর করেন। কিন্তু বৈষম্যের ভিত্তিতে যে এত বড় সম্পদ হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে, আপনি তো কোনো ধরনের সম্পদ করের দিকে যাচ্ছেন না। এতগুলো অ্যাপার্টমেন্ট যারা কিনেছেন তারা কি সকলে করদাতার তালিকায় আছেন? তো এই জিনিসগুলো তো আপনাদের বিবেচনার ভেতরে আসতে হবে। তাই প্রত্যক্ষ করের উপর জোর দেয়ার বিষয় রয়ে গেছে। তারপরেও একটা জিনিস মানুষ মনে করবে সামাজিকভাবে সেটা হলো আমি যে এই কর দিবো এর প্রতিদানে আমি কি পাবো? সুতরাং, গণসেবা বা সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সেবা যেগুলো আছে সেটা শিক্ষা বলেন, স্বাস্থ্য বলেন, সামাজিক সুরক্ষা বলেন, পরিবহন বলেন, নাগরিক অধিকারের কথা বলেন এমনকি নিরাপত্তার কথা বলেন এগুলোর গুণমান যদি না বাড়ে তাহলে কর দেয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা যায় না। আর কর ব্যবস্থার ভেতরেও দুর্নীতি প্রচণ্ড। সেটাকে এক ধরনের হয়রানি হিসেবে মানুষ দেখে। ভাবমূর্তিটা যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে এটা খুব বেশি গ্রহণযোগ্য হবে না। আমার দুঃখটা হলো এই যে করণীয় সম্পর্কে আমরা সবাই মোটামুটি ওয়াকিবহাল। কিন্তু সময়টা খারাপ যখন আমরা এটা করতে এসেছি। এগুলো সবই সরকারের করার কথা ছিলো নির্বাচনের পরের বছরে। এখন নির্বাচনের আগের বছরে এসে যদি আমরা এটি করতে চাই, তা সরকারের জন্য খুবই জটিল একটি পরিস্থিতি হবে। আর মনে রাখতে হবে এ বাজেট এই সরকার যেমন করবে, এর পরের সরকার সে যেই হোক তাকেও বাকিটুকু নিতে হবে। এক ধরনের নমনীয়তা সেখানে থাকতে হবে যেটা অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে হতে পারে। সেটার দিকে নজর দেয়ারও ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু সেই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি বা বাস্তবতা আমাদের দেশে আছে কিনা সেটা আমি নিশ্চিত না।

স্বপ্ন তো মানুষ ঘুমের মধ্যে দেখে কিন্তু জেগে উঠলে পড়ে তো স্বপ্ন বন্ধ হয়ে যায়। তাই পুরো জিনিসটায় স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার একটি মিলন দরকার পড়ে। সরকার যে উন্নয়ন আলেখ্য তৈরি করেছিলো এক দিক থেকে সেটি অনেক অনুপ্রেরণামূলক ছিলো। কিন্তু সে উন্নয়ন আলেখ্যকে বাস্তবতায় নিয়ে যাবার জন্য যে রাজনৈতিক পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বা প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ সেগুলোর প্রতি সে অর্থ নজর দেয়া হয়নি। মনে হয় সরকার নিজেই নিজের কাহিনীতে এত বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলো যে সেগুলোকে পরখ করে দেখার আর তার সুযোগ হয়নি। একটা দেশের ভেতরে যদি গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার জায়গাটা দুর্বল হয়ে যায় তাহলে সরকার ভালো চাইলেও তার

অঙ্গীকারগুলোকে ঠিক মতো কার্যকর করতে পারে না। বাংলাদেশ কি সেরকম একটা উদাহরণ হয়ে যাচ্ছে কিনা সেটাই চিন্তা করি।

ডিবিসি নিউজে প্রচারিত সাক্ষাৎকার থেকে গৃহীত
৩১ মে, ২০২৩

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় অগ্রাধিকার

মোস্তাফিজুর রহমান

বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক কর্মসূচি বিস্তৃত করার বিষয়সহ বড় পাঁচটি চ্যালেঞ্জ দেখছেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মাসুদ রুমী।

কালের কণ্ঠ: আসন্ন বাজেটে বড় ধরনের কী কী চ্যালেঞ্জ দেখছেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: ২০২৩–২৪ অর্থবছরের বাজেটে মূল চ্যালেঞ্জ হবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হবে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বিস্তৃত করা, তৃতীয় চ্যালেঞ্জ ঘাটতি অর্থায়ন কিভাবে করা হবে সেটা ঠিক করা। চতুর্থ চ্যালেঞ্জ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য প্রকল্প বাছাই। এবার তো কিছুটা আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেই করতে হবে।

পঞ্চমত সংস্কার কর্মসূচি। বিশেষত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) শক্তিশালী করে সম্পদ আহরণ বাড়ানো। এনবিআরকে যে টার্গেট দেওয়া হবে, প্রকৃত সম্পদ আহরণের পরিপ্রেক্ষিতে তা বেশ বড় টার্গেটই হবে মনে হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বড় চ্যালেঞ্জ হবে।

বেশকিছু সংস্কার কর্মসূচি আছে, যেগুলো এবারের বাজেটে করতে হবে। সুদের হার, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার— এগুলোকে বাজারভিত্তিক করতে হবে। সেই বিষয়গুলোও বাজেটে থাকবে।

সেটা করতে গেলে অর্থনীতিতে যে অভিঘাত হবে, সেটাকে সামাল দেওয়া কঠিন হবে।

বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করতে গেলে হয়তো কিছুটা মূল্যস্ফীতি বেড়ে যেতে পারে। আর সুদহার বাজারভিত্তিক করলে বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। সেগুলো সামাল দেওয়া এবারের বাজেটে বড় চ্যালেঞ্জ।

কালের কণ্ঠ: বাজেটের চ্যালেঞ্জগুলো কিভাবে সামাল দেওয়া যায়?

মোস্তাফিজুর রহমান: সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির যে সমস্যাগুলো, তার মূলে রয়েছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা। এছাড়া কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নে সঠিক যে তথ্য-উপাত্ত দরকার, তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

সঠিকভাবে সুবিধাভোগী নির্বাচনে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কর্মসূচির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণেও আমাদের দুর্বলতা আছে।

এবারের বাজেটে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবে, তাতে সীমিত আয়ের মানুষের ওপর প্রভাব পড়বে। এসব চ্যালেঞ্জ সামাল দিতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কিছুটা বিস্তৃতি লাগবে। একই সঙ্গে এর ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে হবে। বাস্তবায়ন শক্তিশালী করতে হবে। যারা পাচ্ছে, তাদের পাশাপাশি আরো নতুন মানুষকে পুনর্বিবেচনা করতে হবে বলে মনে হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ: অন্য বছরের বাজেটের চেয়ে এবারের বাজেটটি নির্বাচনপূর্ব বাজেট। নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও তা কি জনতুষ্টিমূলক হবে বলে আপনি মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমাদের রাজস্ব আহরণের যে ব্যবস্থা রয়েছে, সেটাকে শক্তিশালী করতে হবে। নির্বাচনী বছরে জনতুষ্টিমূলক প্রকল্প হাতে নেওয়ার খুব একটা সুযোগ নেই। অর্থনীতি যে রকম চাপের মধ্যে আছে, সেই বাস্তবতা মাথায় রাখলে এটা কঠিন হবে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি হয়তো কিছুটা বাড়তে পারে। এটাকে পপুলিস্ট একটা পদক্ষেপ বলে মনে করা হতে পারে। কিন্তু অন্যান্য বার প্রকল্প বাড়ানো, এমপিদের বাড়তি প্রকল্প দেওয়া— সেই পথে না গিয়ে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায়, প্রবৃদ্ধির আগের ধারা সেটাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। নির্বাচনী বছর বলে এমন উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা নেওয়া ঠিক হবে না। বর্তমানে অর্থনীতি নানা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ব্যালান্স অব পেমেন্ট, মূল্যস্ফীতি, রিজার্ভসহ বিভিন্ন সূচক স্থিতিশীল

নয়। বর্তমানে যে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে, তা বিবেচনায় নিয়ে সরকার সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেবে বলে আশা করি।

কালের কণ্ঠ: আইএমএফের ঋণের কিছু শর্ত আছে, যেগুলো পূরণ করে মানুষকে স্বস্তি দেওয়া কতটা সম্ভব?

মোস্তাফিজুর রহমান: আর্থিক ও রাজস্ব খাতের সংস্কার, ভর্তুকি ব্যবস্থাপনাসহ আইএমএফের বেশকিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ আছে। এটার একটা চাপ তো থাকবেই। যেমন আইএমএফ বলেছে, পয়েন্ট ৫ শতাংশ করে রাজস্ব বাড়াতে হবে। সেটা করতে গেলে আমাদের লক্ষ্যমাত্রাও বাড়বে। বাস্তবে এই বছরে যে রাজস্ব সংগ্রহ করা হচ্ছে, তার চেয়ে একটা বড় জাম্প দিতে হবে।

কালের কণ্ঠ: বর্তমান পরিস্থিতিতে রিজার্ভ নিয়ে আইএমএফের লক্ষ্যমাত্রা কিভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমরা মার্চ মাসেও লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারিনি। রিজার্ভের যে প্রবণতা, তাতে জুনের মধ্যে নিট রিজার্ভ ২৪.৪৬ বিলিয়ন ডলার নিশ্চিত করা খুবই কঠিন হবে। সরকারের নানা পদক্ষেপে আমদানি কমেছে। কিন্তু বর্তমানে জ্বালানি খাত নিরবচ্ছিন্ন রাখতে এবং ঈদের ভোগ্য পণ্য আমদানিতে ডলার লাগবে। আমদানি আরো কমিয়ে কিংবা রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল কমিয়ে হয়তো সেটা করতে পারে। কিন্তু অর্থনীতির ওপর কী চাপ সৃষ্টি করবে, সেটা বিবেচনায় নিতে হবে। আমাদের দুটিই করতে হবে।

কালের কণ্ঠ: অনেক সক্ষম মানুষ আয়কর দিচ্ছেন না। আবার যারা কর দিচ্ছেন, তাদের ওপর চাপ বাড়ছে। এই বাস্তবতায় এনবিআরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর চাপ বাড়বে কি?

মোস্তাফিজুর রহমান: যার করসীমা পর্যন্ত আয় নেই, তার ওপর তো কর বসানো যৌক্তিক হবে না। যারা রিটার্ন দাখিল করবেন, তাদের ওপর এনবিআর হয়তো কোনো ধরনের ফি বা চার্জ রাখতে পারে। টিআইএন নাম্বার যাদের আছে, তাদের কর দেওয়া উচিত। করখেলাপ যেখানে আছে, সেখানে যাঁরা দিচ্ছেন, তাদের ওপর চাপ না বাড়িয়ে নতুন করদাতা সন্ধান করতে হবে। ভিত্তি আরো বিস্তৃত করে এটা করতে হবে। যেমন আমরা বলি আড়াই কোটি মানুষ হোল্ডিং ট্যাক্স দেন। কিন্তু সেখানে টিআইএন নাম্বার আছে ৮৭ লাখ মানুষের। তার মধ্যে ৫০ লাখ মানুষও আয়কর দাখিল করেন না। যারা দিচ্ছেন,

তাদের অনেকেই শূন্য আয় দেখান। সেই হিসাবে মাত্র ২০ লাখ মানুষ আয়কর দিচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে এনবিআরের সক্ষমতা বাড়াতে ডিজিটাইজেশনসহ বেশকিছু শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

কালের কণ্ঠ
১ জুন, ২০২৩

ঈশান কোণে মেঘ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সরকারের বার্ষিক জাতীয় বাজেটকে উপলক্ষ করে আমরা সর্বদাই দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটা সালতামামি করে থাকি। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে অন্যান্য সাম্প্রতিক বছরের তুলনায় নানাবিধ কারণে এ আলোচনায় বেশকিছু ভিন্নমাত্রা যোগ হয়েছে।

আয়-ব্যয়

এরই মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির সর্বশেষ মূল্যায়ন তথা বিভিন্ন প্রাক্-বাজেট বিশ্লেষণ চলমান অর্থবছরের সংকটজনক পরিস্থিতি তুলে ধরেছে। প্রথমত, রাজস্ব আয়, ব্যয় ও ঘাটতি। ২০২২–২৩ সালে সরকারি আয়-ব্যয় কাঠামো ছিল দুর্বল। রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বড় পরিমাণে অসাধিত থেকে যাবে। দ্বিতীয়ত, যে কর আদায় হবে, তার ব্যাপক অংশ আসবে পরোক্ষ কর; যেমন ভ্যাট থেকে। অর্থাৎ ধনী-গরিব নির্বিশেষে এই কর দিয়েছে। অন্যদিকে, প্রত্যক্ষ কর বিশেষ করে আয়কর আদায়ে প্রবৃদ্ধির হার ছিল পরোক্ষ করের চেয়ে কম। মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশে আয়ের ওপর যেভাবে কর আদায় করা হয়, সেভাবে সম্পদের ওপর কর নেওয়া হয় না।

সমাপ্য অর্থবছরে সরকারি ব্যয় প্রবাহও ছিল বেশ সীমিত। প্রথম ৯ মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার ছিল বিগত ১০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। অন্যদিকে, রাজস্ব ব্যয়ের মাঝে সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ পরিশোধ এবং ভর্তুকিই তো রাজস্ব ব্যয়ের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ নিয়ে নেয়। তবে বিগত সময়ে প্রাক্কলনের চেয়ে কম আয় ও কম ব্যয় হওয়ায় বাজেট ঘাটতি বেশি বাড়বে না। যেটুকু বাজেট ঘাটতি হচ্ছে, তার বেশিটাই সরকারের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিয়ে

মেটাতে হবে। বৈদেশিক ঋণ বেশি নেওয়ার কথা থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না। জাতীয় সঞ্চয়পত্র বিক্রি করেও আয় বেশি হচ্ছে না।

বৈদেশিক খাত

অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারের বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে। আগে রাজস্ব খাত দুর্বল থাকলেও বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি খুব বেশি ছিল না। তবে এ বছর তা বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে সীমিত নিট রপ্তানি আয়, আমদানি পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি, রেমিট্যান্স আয়ের খাপছাড়া প্রবাহ, অতি সামান্য নিট বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং ক্রমবর্ধমানভাবে বৈদেশিক দায়-দেনা পরিশোধ ব্যয় বেড়ে যাওয়া। এর প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে, বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের পতন এবং বৈদেশিক মুদ্রার মজুত দ্রুত হ্রাস পাওয়া।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের হ্রাস আটকানো, একই সঙ্গে রাজস্ব ঘাটতিকে সীমিত রাখতে সরকারি ব্যয় এবং আমদানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু এর ফলে আবার রাজস্ব আয় আশানুরূপ হয়নি। ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ থমকে গেছে। যুবসমাজের জন্য বাড়তি কর্মসংস্থান হয়নি। মূল্যস্ফীতি, রাজস্ব আয়-ব্যয় এবং বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতির অবনতি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসে প্রতিফলিত হচ্ছে।

সরকারি নীতিনির্ধারকরা মূল্যস্ফীতিকে ইউক্রেনের যুদ্ধ তথা আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সময়মতো অর্থনৈতিক সংস্কার না করা, নীতি সমন্বয়ের অভাব এবং ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থাপনা এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য মূলত দায়ী। তাই নিম্ন আয় এবং সীমিত আয়ের মানুষের জীবনমান রক্ষার জন্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এখন একটি মৌল চাহিদায় পরিণত হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় বলা যায়, অর্থনীতির ঈশান কোণে মেঘ জমেছে। কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে এই মেঘ ঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

উন্নয়ন কৌশলের বিপর্যয়

বিগত দেড় দশকে উন্নয়নকে দৃশ্যমান করার জন্য সরকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে প্রভূত ব্যয় করেছে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক ভিত কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে, এটি সত্য। কিন্তু একই সময়ে আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষায় প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ দিতে পারিনি। এর ফলে একটা আন্তঃখাত ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। মনে হচ্ছে, ২০২৩–২৪ সালের বাজেটের অর্থ বরাদ্দে এই মেগা প্রকল্পের আধিপত্য থেকেই যাবে।

তবে সরকারের উন্নয়ন চিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ খাতে। আগের এক সরকার খাম্বা লাগিয়ে তাতে বিদ্যুৎ দিতে পারেনি। বর্তমান সরকার ২৪ হাজার মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা স্থাপন করেও জ্বালানি আমদানি করার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে তার অর্ধেকও ব্যবহার করতে পারে না। লোডশেডিং চলছে ব্যাপকভাবে।

চলমান অর্থবছরে আরেক উন্নয়ন বিপর্যয় প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। তা হলো ব্যাংক খাতের দুর্দশা। বর্তমান সরকারের প্রায় ১৫ বছর সময়ে খেলাপি ঋণ ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ৩২ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম শক্তিশালী ব্যাংককে ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ পরিস্থিতির উন্নতির জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব সর্বজনসম্মত।

অন্যদিকে সাম্প্রতিককালে অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলেছে বিদেশে টাকা পাচারের হার। প্রতি বছর বাংলাদেশ যে পরিমাণ বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ পেয়ে থাকে, তার চেয়ে বেশি অর্থ প্রতি বছর দেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়ে যায়। এর পরিমাণ ৮০০ কোটি ডলার। আবার এই বেআইনি কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে গত বছর বাজেটে বিশেষ কর সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। তবে এ সুবিধা কেউ নেয়নি।

এমন কেন হলো

শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে যে উন্নয়ন আলেখ্য প্রচার করা হয়, তাতে কিছু সত্যতা আছে, এটি ঠিক। কিন্তু পূর্ণ সত্য নেই। বিগত সময়ে অর্জিত উন্নয়নের চিত্র বিভাজিতভাবে দেখলে আমরা বুঝব, দেশে দারিদ্র্য কমলেও বৈষম্য বেড়েছে। বর্তমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চুম্বক পর্যালোচনা এবং বিনিয়োগ বিপর্যয়ের কতিপয় চিত্র বলে যে, এই উন্নয়ন সর্বজনীন ও টেকসই করা কঠিন। আসন্ন এক বছর মেয়াদি বাজেটের কাছে অর্থনীতির এই কাঠামোগত এবং উন্নয়ন নীতিসংক্রান্ত সমস্যার সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ সমাধান আশা করা অন্যায়।

তবে আইএমএফের কাছে অর্থনৈতিক সংস্কারের শর্তযুক্ত ঋণ পাওয়ার জন্য কিছু পদক্ষেপ সরকারকে নিতে হবে ক্রমান্বয়ে। টাকার বিনিময় হারকে একীভূত করা, ব্যাংকের সুদহারের সীমা তুলে দেওয়া, ভর্তুকির সামঞ্জস্য বিধান করা, রাজস্ব আয়ের বিভিন্ন ছাড়কে যৌক্তিকীকরণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। ঘোষণা করতে হবে ব্যাংক খাত ও পুঁজিবাজার সংস্কারের অভিপ্রায়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই বাজেট হবে জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে সর্বশেষ বাজেট। অভিজ্ঞতা বলে, নির্বাচনের প্রাক্কালে সরকার তদারকি ছাড়া টাকা খরচ করতে চায়। এ জন্য আসছে বাজেটে বড় ব্যয় থেকে কিছু এরূপ বরাদ্দ থাকবে। তবে রাজস্বের অভাব এবং আইএমএফের নজরদারিতে এটি করা কঠিন হবে।

অন্যদিকে বিভিন্ন কারণে রাজস্ব আহরণের তাগিদ থাকবে অন্যান্য বছরের চেয়ে বেশি। তাই আসন্ন বাজেটে করের পরিধি বাড়ানোর জন্য যদি নির্দিষ্ট আয় না থাকলেও ন্যূনতম কর আরোপ করা হয়, তবে সামাজিক অসন্তোষ বাড়বে। সরকারি বেতন বৃদ্ধির ফলে যদি বাজারের পণ্যমূল্য আরও স্ফীত হয়, তাহলে মধ্যবিত্তরা আরও বেজার হবে।

তবে জাতীয় নির্বাচনের আগে এটি শেষ বাজেট হওয়ায় সরকার চাইবে তার তিন পর্যায়ের ১৫ বছরের সাফল্যগাঁথা তুলে ধরতে। উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে পুনর্ব্যক্ত করতে। তার সঙ্গে সংগতি রেখে হয়তো ঘোষিত হবে বছরের দেশজ আয়ের প্রবৃদ্ধির একটি উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা। তবে মনে রাখতে হবে, সেটা হবে রাজনৈতিক অভিলাষের প্রতিফলন, যা অর্থনৈতিক বাস্তবতার পরিচায়ক নয়।

সমকাল
১ জুন, ২০২৩

চলমান সংকট সমাধানের পথরেখা নেই

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নির্বাচনকালীন বাজেট হিসেবে এটি কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারবে বলে মনে হয় না। অর্থনীতিতে চলমান সংকট সমাধানের জন্য কোনো সুস্পষ্ট পথরেখা এই বাজেটে দেয়া হয়নি। আমদানি নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পদক্ষেপের চলমান পদক্ষেপগুলোর বাইরে নতুন করে তেমন কোনো ব্যবস্থা দেখা যায়নি। আমদানিকৃত ভোগ্যপণ্যের উৎসে কর, ভ্যাট ইত্যাদির কোনো ব্যবস্থা সেভাবে করা হয়নি। তেলের দামের ক্ষেত্রে উৎসে কর, আগাম আয়কর ১৫ শতাংশ ছাড় দেয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে স্পেসিফিক ডিউটি আরোপ করার ফলে বাজারে তেল ও জ্বালানির মূল্য বাড়বে। এ ছাড়া বিদ্যুতের মূল্য কমবে বলে মনে হচ্ছে না। বিশ্ববাজারে আমদানিকৃত পণ্যের দাম কমলে সেটির সুফল দেশের ভোক্তারা পাবেন, সেই বিষয়টিও সুস্পষ্ট নয়। আগামীতে টাকার মূল্যমান আরও পতন হলে সেটিকে আটকানোর জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হবে সেই বিষয়টিও পরিষ্কার না। সরকারি চাকরিজীবীদের পাশাপাশি বেসরকারি চাকরিজীবীদের বেতনের ব্যাপারে কোনো কিছু আলোকপাত করা হয়নি।

সবচেয়ে বিচলিত করার বিষয়টি হলো দুই হাজার টাকার তথাকথিত ন্যূনতম কর ধরা হয়েছে, এটা অন্যায়।

যে যুক্তিতে এটা করা হয়েছে সেটি আমার কাছে খুব একটা গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। বাজেটে কোনো নতুনত্ব নাই। একটা সরকার ১৫ বছর শাসন করার শেষ অবস্থায়

দুর্বলতম অর্থবছর নিয়ে নির্বাচনে যাচ্ছে। সেটিকে কাটিয়ে ওঠার জন্য যে অভিনবত্ব, সৃষ্টিশীলতা দরকার, সেটি না দেখে কিছুটা হতাশ হয়েছি।

মানবজমিন
১ জুন, ২০২৩

উজ্জ্বলতাহীন নির্বাচনি বাজেট

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জটিল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবারের বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ও ভূকৌশলগত পরিস্থিতি এবং জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থাসহ সব জায়গায়ই বর্তমানে টানাপড়েন চলছে। ফলে এসব জটিলতাকে স্বীকার করেই এবারের বাজেটকে বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া এই বাজেট বর্তমান সরকারের ১৫ বছর মেয়াদের সর্বশেষ বাজেট। সে কারণে এবারের বাজেটে বিগত দিনের অর্জনের কথা থাকবে, এটা আমাদের প্রত্যাশায় ছিল।

তবে একই সঙ্গে প্রত্যাশা করেছিলাম, বর্তমান বাস্তবতা জনমানুষের জীবনে যে কষ্ট দিচ্ছে, সেটাকে সুরাহা করার জন্য সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ থাকবে। কিন্তু সেই পথনির্দেশ খুঁজে না পাওয়ায় কিছুটা হতাশ হয়েছি। এবার যে ধরনের রাজস্ব ও ব্যয় কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে, সেখানেও ওই ধরনের সুচিন্তার প্রতিফলন দেখিনি। অর্থাৎ যে ধারাতে সাধারণভাবে আমাদের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়, সে রকমভাবেই বাড়ছে। এ বছরও পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীলতা রয়েছে। এর মানে হলো আগামী অর্থবছরে বাড়তি আয়টুকু আসবে, সেগুলো ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সবাই মিলেই দেবে। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কর আদায়ে বড় মনোযোগ দেখিনি। উপরন্তু, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে জিডিপির অনুপাতে বরাদ্দের পরিমাণ অনেক কমেছে।

অন্য দিকে সামষ্টিক অর্থনীতির কাঠামো খুব জোরদার নয়। জিডিপি এবং ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগসহ যেসব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তাও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বর্তমানে যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি রয়েছে, তা খুব দ্রুত কমবে বলে মনে হয় না। এই মূল্যস্ফীতি কমানোর পথরেখাও বাজেটে নেই।

এক্ষেত্রে বিভিন্ন জিনিসপত্রের দামে উৎসে কর কমানোর সুযোগ ছিল। কিন্তু সেই সুযোগও কাজে লাগানো হয়নি। উলটো উৎসে করের সুযোগকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে পণ্যের দাম আরও বেড়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তেলে উৎসে কর কমিয়ে আবার শুল্ক দেওয়া হয়েছে, এতে বাজারে তেলের দাম বেড়ে যেতে পারে। আর এবারের বাজেটে যে পদক্ষেপটি সবচেয়ে সমস্যার সৃষ্টি করবে, তা হলো করযোগ্য আয় না থাকলেও দুই হাজার টাকা কর দিতে হবে। এ ধরনের পদক্ষেপ অন্যায়। কারণ দেশে ইতোমধ্যে ন্যূনতম করের একটি বিধান রয়েছে। সেটি তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত। সরকারি বিভিন্ন পরিষেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে এই কর দিতে হয়। ফলে যার করযোগ্য আয় নেই, তারও যদি দুই হাজার টাকা কর দিতে হয়, তাহলে করযোগ্য আয়ের ধারণাটা বাতিল করতে হবে। এছাড়াও সবাই কর দেয় না, এটিও মনে করার কারণ নেই। কারণ নিম্ন আয়ের মানুষও ভ্যাট থেকে শুরু করে অনেক ধরনের কর দিয়ে থাকে।

ফলে নির্বাচনের আগে এই দুই হাজার টাকার কর আরোপের পদক্ষেপ কোনো সুচিন্তিত বা বিবেচনাপ্রসূত কাজ হয়েছে বলে আমি মনে করি না।

এবারের বাজেটের আরেকটি আলোচিত বিষয় ছিল আইএমএফের শর্ত। এক্ষেত্রে আইএমএফ যেসব শর্ত দিয়েছিল, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় তার সবগুলোরই নীতিগত স্বীকৃতি রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই শর্তের প্রতিফলনও দেখা গেছে। দুই হাজার টাকা কর নেওয়ার উদ্যোগ তার মধ্যে অন্যতম। এটি আইএমএফের শর্ত পালনে কর আদায় বাড়ানোর জন্য মরিয়া চেষ্টার অংশ।

আইএমএফকে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে প্রতি বছর জিডিপির ০.৫০ শতাংশ পর্যন্ত কর আদায় বাড়ানো হবে। কিন্তু রাজস্ব আয়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতেও আইএমএফকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা যাবে না। এর পরও নীতিগভাবে সংস্থাটির শর্ত পালনে নানা ধরনের চেষ্টা বাজেট বক্তৃতায় রয়েছে।

এছাড়াও সাধারণভাবে এই বাজেটের ভেতর দিয়ে রাজস্বনীতির সঙ্গে মুদ্রানীতি, বাণিজ্যনীতি, ব্যাংকিং খাত ও বৈদেশিক লেনদেন খাতের সমন্বয় হয়েছে বলে মনে হয় না। আমরা বর্তমানে যে মধ্যমেয়াদি কাঠামোতে রয়েছি, তার লক্ষ্যমাত্রা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সেখানে অনেক বৈপরীত্ব রয়েছে। এক কথায় বললে নির্বাচনি বছরে এই বাজেট নতুন কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে বলে হয় না।

যুগান্তর
২ জুন, ২০২৩

এর চেয়ে বড় গোঁজামিল আর হতে পারে না

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

তিন মেয়াদে ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা সরকার বর্তমান মেয়াদের শেষ বাজেটে তার অর্জনগুলোকে তুলে ধরবে তা প্রত্যাশিত, কিন্তু সেই সঙ্গে দেশে চলমান অর্থনৈতিক সংকটের স্বীকৃতি থাকবে বলে প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু সংকট ও সমস্যার স্বীকৃতি বা উপলব্ধি যেহেতু নেই, তাই সমস্যা সমাধানের পথ অস্পষ্ট এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

একটি উদাহরণ হলো মূল্যস্ফীতি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, স্বল্প মেয়াদে মূল্যস্ফীতির সুরাহা হবে না। কিন্তু মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যেসব কথা বাজেট বক্তৃতায় বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে বলা হয়েছে, তা থেকে একটি সুচিন্তিত সুগ্রথিত কার্যকাঠামো বের হয়ে আসে না। আমদানি নিয়ন্ত্রণ, কৃচ্ছ্রসাধন, কৃষিঋণ বৃদ্ধি, নীতি সুদহার বৃদ্ধি, মুদ্রা বিনিময় হার সমন্বয় ইত্যাদি বিষয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু এসব পদক্ষেপের কারণে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার ব্যয়ে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে কি না, তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি। কারণ হলো, মুদ্রানীতি, বাণিজ্যনীতি, রাজস্বনীতি বা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ— এসব কিছুর সমন্বিত সমহারভিত্তিক পথ রেখায় নেই। অনেক ক্ষেত্রে এসব পদক্ষেপ যে একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষিত, সেই বিবেচনাও নেই। এর বাস্তবায়নে অর্থ মন্ত্রণালয়ের যে সমন্বয়ক ও নেতৃত্বমূলক ভূমিকা থাকতে হয়, সেটাও নেই।

আয়-ব্যয়ের যে কাঠামো তৈরি করা হয়েছে দেশে, তাতে সব সময় দুর্বলতা থাকবে। কিন্তু এবারের বাজেটের দুর্বলতাটা শুধু কাঠামোতে নয়। কারণ, বাজেট ঘাটতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে, কাঙ্ক্ষিত ব্যয় মেটাতে গিয়ে কর আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে,

সেটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কিন্তু তারপরও আইএমএফকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে প্রতিবছর যে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ হারে রাজস্ব বৃদ্ধির কথা আছে, সেই লক্ষ্যমাত্রা চেষ্টা করেও এই প্রাক্কলনে প্রতিফলিত হয়নি।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামোর প্রাধান্য রয়ে গেল। জাতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতের জন্য বরাদ্দে কোনো ধরনের পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন হয়নি। সামাজিক সুরক্ষা খাতের বরাদ্দও জিডিপির হিসাবে ও টাকার অঙ্কে কমে যাবে। এটা নিয়ে বিতর্ক হবে। যদিও কতিপয় ভাতা সামান্য বাড়ানো হয়েছে।

তবে বাজেট ঘাটতি নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। ঘাটতি পূরণে বিদেশি ঋণনির্ভরতা ও দেশীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া আরও বাড়বে। সরকারের এই ব্যাংক নির্ভরতার প্রতিফলন নিঃসন্দেহে বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যাবে। বলা দরকার, বিদায়ী অর্থবছরে দেশে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপির অংশের হিসাবে প্রায় ২ শতাংশ কমে গেছে, ২৩ শতাংশ থেকে কমে ২১ শতাংশের ঘরে চলে এসেছে। লক্ষণীয় হলো, সেই ব্যক্তি বিনিয়োগ আগামী অর্থবছরে এক লাফে ২৭ দশমিক ৮ শতাংশ হয়ে যাবে বলা হয়েছে। এর চেয়ে বড় গোঁজামিল আর হতে পারে না।

প্রবৃদ্ধির যে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা আগামী বছরের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটাকে ঠেকা দেওয়ার জন্য ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের এই অবাস্তব হিসাব করা হয়েছে। কারণ, রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ তো ইচ্ছামাফিক বাড়িয়ে দেখানো যায় না। ব্যক্তি বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির এই হিসাব যারা করেছেন, তারা ভুলে গেছেন যে অর্থনীতির অন্যান্য সূচক এর সঙ্গে সম্পর্কিত। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাড়লে ঋণপ্রবাহ বাড়বে, কিন্তু ঋণপ্রবাহের যে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে, তা এত বিনিয়োগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আবার বাজেট ঘাটতি পূরণে সরকার ব্যাংক খাত থেকে ব্যাপকভাবে ঋণ নিলে, ব্যক্তি খাতের ঋণের প্রবাহে টান পড়ে। টাকা আসবে কী করে? আবার ব্যক্তি খাতের ঋণ বাড়লে আমদানি বাড়বে, আমদানি বাড়লে আমদানি শুল্ক আদায় বাড়বে, কিন্তু শুল্ক বৃদ্ধির যে পরিসংখ্যান, তার সঙ্গে ব্যক্তি খাতের ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধির সামঞ্জস্য নেই।

এককথায় রাজস্ব কাঠামো তথা প্রবৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রাক্কলনে পেশাদারির অভাব দেখা যায়। অথচ রাজস্ব ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে আছে, কিন্তু ব্যয়মুখী বাজেট দেওয়ার চেষ্টা নেই। তাই এর কারণ বোধ হয় অর্থ জোগাড় হলেও কার্যকরভাবে ব্যয় করার সক্ষমতা নেই। যারা নির্বাচনী বাজেট দেখার অপেক্ষায় ছিলেন, তারা হতাশ হবেন। এ বাজেটে মনকাড়া জনতুষ্টিমূলক কাজ নেই, যদিও পরিবেশ সম্পর্কিত বেশকিছু ভালো প্রস্তাবনা রয়েছে।

আবার দেখি, যাদের করযোগ্য আয় নেই, তাদের ওপর দুই হাজার টাকা করে কর প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যদিকে সম্পদশালীদের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে সারচার্জের ওপর রেয়াত। এটা করনীতির ন্যায্যতার বরখেলাপ। ফলে মনে হয় না, এই বাজেট প্রণয়নে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তা যথাযথভাবে কাজ করেছে।

এই সরকার তিন ধাপে গত ১৫ বছরে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে ভালো-মন্দ মিলিয়ে অনেক কিছুই করেছে। এই অর্জন ও অভিজ্ঞতার প্রতি এই রেখাটানা বাজেট সুবিচার করতে পারল না। আর বাজেট উপস্থাপনা বিশ্বব্যাপী যে প্রথা ও গাম্ভীর্য, তা তো আগেই ক্ষুণ্ন হয়েছে।

প্রথম আলো
২ জুন, ২০২৩

২ হাজার টাকার সর্বজনীন ট্যাক্স বিবেচনাহীন

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নতুন বাজেটে ন্যূনতম করযোগ্য আয়ের নিচের নাগরিকদের ২ হাজার টাকার কর প্রস্তাব অযৌক্তিক ও বিবেচনাহীন। আমাদের কর-জিডিপির অনুপাত সমমানের দেশের তুলনায় অনেক কম। তাই সরকার তার উচ্চাভিলাষী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে কর আহরণের চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। এর ওপর আছে আইএমএফের কাছে এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যার করযোগ্য আয় নেই তাকেও কর দিতে হবে। এটা কর ব্যবস্থাপনায় ন্যায্যতার-নীতির পরিপন্থী। সরকার একদিকে ব্যক্তি পর্যায়ের করযোগ্য আয়ের সীমা ৩ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে সাড়ে ৩ লাখ করেছে। বিগত সময়কালের মূল্যস্ফীতির নিরিখে এটা প্রয়োজন ছিল। আবার এর সঙ্গে করযোগ্য আয় না থাকলেও কর দিতে হবে সে প্রস্তাবও করেছে। এ দুটি সাংঘর্ষিক।

বলা হচ্ছে সরকারি সেবা নিতে হলে তাকে ন্যূনতম করদাতা হতে হবে। কিন্তু তার জন্য তো আবাসস্থলভিত্তিক ন্যূনতম বাৎসরিক কর নাগরিকদের দিতে হয়। ঢাকার জন্য ৫ হাজার টাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য সিটি করপোরেশনের জন্য ৪ হাজার টাকা এবং তার বাইরের এলাকার জন্য ৩ হাজার টাকা কর দেওয়ার ব্যবস্থা তো আগে থেকে চালু আছে। আর করযোগ্য ব্যক্তি আয়ের নিচের মানুষরা কোনো কর দেয় না— এটা নির্জলা অসত্য। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক কোনো না কোনোভাবে পরোক্ষ করের আওতায় আছে। যে কোনো খাদ্যপণ্য ক্রয় করলে ভিখারি থেকে কোটিপতি নির্বিশেষে ভ্যাট দিয়ে থাকে। কিন্তু উল্টো বিবেচনা দেখি সম্পদশালীদের জন্য। লক্ষ করি ব্যক্তি করদাতাদের পরিসম্পদের ওপর সরকার আরোপের ভিত্তি ও হার দুটিতেই সুবিধা বাড়ানো হলো। এখন করযোগ্য

পরিসম্পদ হবে ৩ কোটি টাকার বিপরীতে ৪ কোটি টাকা। ৪ কোটি থেকে ৫০ কোটি পর্যন্ত ওই ১০ শতাংশই বলবৎ থাকবে। আর ৫০ কোটি টাকা অতিক্রম করলে ৩৫ শতাংশ সারচার্জ।

আমাদের কর ব্যবস্থা ভীষণভাবে পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীল। মোট করের দুই-তৃতীয়াংশ আসে এখান থেকে। একই হারে কর দেয় ধনী গরিব নির্বিশেষে। এই ন্যূনতম করের ধারণাটি প্রত্যক্ষ কর বাড়ানোর চেষ্টার অংশ। তবে সেই চেষ্টা হতে হবে ন্যায্য, স্বচ্ছ ও দক্ষ। সে জন্য আয়ের চেয়ে সম্পদের ওপর করধার্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারি হিসাবে দেশে দারিদ্র্য কমার সঙ্গে আরও বেশি বৈষম্যপূর্ণ হয়ে উঠছে। আর সম্পদ বৈষম্য বাড়ছে সবচেয়ে বেশি। করব্যবস্থা সংস্কার এক্ষেত্রে সরকার অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের পক্ষে আরও বেশি উন্নয়ন ব্যয় করার সুযোগ করে দিতে পারত। পরিতাপের বিষয় ২০২৩–২৪ এর বাজেট জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে যে সুযোগটা যথেষ্টভাবে ব্যবহার করল না।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
২ জুন, ২০২৩

বাজেটে ভালো কাজের প্রশংসা নিতে পারেনি সরকার

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দেশ রূপান্তর: আওয়ামী লীগ সরকারের টানা তিনবারের শাসনামলের মধ্যে এবারই বাজেটের আলাদা গুরুত্ব কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই বাজেটের গুরুত্ব অনেকগুলো। প্রথম কথা হলো যেহেতু তিন ধাপে এই সরকার প্রায় ১৫ বছর দেশ চালিয়েছে, তো এই দেড় দশকে তার অর্জনকে এই বাজেটের ভেতর দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। তো, সেই চেষ্টাটা হয়েছে। দ্বিতীয়ত হলো যেহেতু এইটা নির্বাচনের আগে সরকারের শেষ বাজেট সেহেতু নির্বাচনকে মাথায় রেখে, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে বিবেচনায় নিয়ে সে কিছু কথা বলবে, কিছু পদক্ষেপ নেবে এটাও প্রত্যাশিত, স্বাভাবিক। আর এই বাজেটের গুরুত্বের জায়গা হলো আইএমএফের সঙ্গে চুক্তি করার পরে সরকারের এটা প্রথম বাজেট। ফলে এক ধরনের অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতির কাঠামোর ভেতরে সে বাজেট প্রস্তুত করেছে বা করতে বাধ্য হচ্ছে। সেইটা হলো নতুনত্ব।

তো সর্বোপরি হলো দেশের ভেতরে এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুবই জটিল। যা আমরা সবাই জানি। মূল্যস্ফীতি মানুষকে বিপর্যস্ত করছে। দেশে যথেষ্ট পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা না থাকায় আমরা জালানি আমদানি করতে পারছি না। সেজন্য আমাদের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো চালু থাকতে পারছে না। লোডশেডিং হচ্ছে ব্যাপকভাবে। আমাদের দেশের ব্যাংকব্যবস্থা একেবারেই ভঙ্গুর এবং সেখান থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ হওয়ার মতো অর্থ ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তারা পাচ্ছে না। দেশের বৈদেশিক লেনদেনের

পরিস্থিতি খুবই চাপের মধ্যে থাকায় টাকায় মূল্যমান পড়ে যাচ্ছে... ইত্যাদি। তো অর্থনৈতিক এই পরিস্থিতি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভূ-কৌশলগত ব্যাপার। বিভিন্ন দেশের মধ্যকার আন্তর্জাতিক রেষারেষির প্রতিফলন এখন আমরা বাংলাদেশের মধ্যেও দেখতে পাই। অর্থনীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এটাও বিবেচনায় নিতে হয়। এ ধরনের বেশকিছু গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিত এবারের বাজেটে আমি দেখতে পাচ্ছি।

দেশ রূপান্তর: বাজেট প্রস্তাব পেশের আগে থেকেই আইএমএফের শর্তেও বিষয়গুলো আলোচনায় ছিল। প্রস্তাবিত বাজেটে সেসব শর্তের প্রতিফলন কেমন দেখছেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সবচেয়ে বড় প্রতিফলন হলো হঠাৎ করে সরকার কর আহরণের জন্য জেগে উঠেছে। বাংলাদেশের কর জিডিপির অনুপাত তুলনীয় দেশের চাইতে অন্যতমভাবে কম। এটা আমরা বহুদিন ধরে বলে আসছি। কিন্তু এবার আমরা প্রথম লক্ষ করলাম সরকার কর আহরণের জন্য বেশ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এমন বেপরোয়া হয়েছে যে আপনার করযোগ্য আয় না থাকলেও তাদের ওপর ২০০০ টাকা করে কর আরোপের চিন্তা করেছে। এইটা একটা যেমন।

দ্বিতীয়ত, অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতার ভেতরে বেশকিছু কথা আছে, যেটাতে দেখা যায় যে আইএমএফের সঙ্গে আমাদের যে সমস্ত শর্ত বা প্রতিশ্রুতি আছে তার প্রতিফলন রয়েছে। যেমন, টাকার মূল্যমানের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের সামঞ্জস্যকরণ, একীভূতকরণ। আমাদের ব্যাংকের যে নয়-ছয় সুদের হার বেঁধে দেওয়া আছে তাকে সুদের করিডরে নিয়ে আসা। নতুনভাবে মুদ্রানীতির চিন্তা করার প্রতিশ্রুতি। যেখানে আগে আমরা ঋণপ্রবাহের ওপর মনোযোগ দিতাম, এখন মূল্যস্ফীতির ওপর মনোযোগ দেব।

এছাড়া আমাদের দায়দেনা পরিস্থিতি সম্বন্ধে মূল্যায়ন, ব্যয় কাঠামোর খাত নিয়ে আমাদের যেখানে করের বিভিন্ন রেয়াত আছে সেগুলোকে কীভাবে সামঞ্জস্যকরণ করা যায় ইত্যাদি বহু বিষয় আছে যেটাকে আইএমএফের শর্তের প্রতিফলন হিসেবে দেখা যায়।

দেশ রূপান্তর: রিটার্ন জমা দিলেই ২০০০ টাকা কর দিতে হবে। আবার সাড়ে ৩ লাখ টাকা করমুক্ত আয়ের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তাহলে ন্যূনতম করমুক্ত আয়ের সীমা কোনটি?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা তো প্রত্যক্ষভাবেই বৈপরীত্য আর কি। আইন অনুযায়ী সাড়ে তিন লাখ টাকার যে করমুক্ত সীমা সেটাই কার্যকর হওয়ার কথা। আর ওনারা যেটা বলছেন, সেটা হলো যে সরকারের বেশকিছু পরিষেবা যিনি পাবেন তার সাড়ে তিন লাখ টাকা আয় আছে তা মনে করতে হবে। সেটাও ঠিক আছে।

কিন্তু... কেউ যদি পরিষেবা নাও নেয়, শুধু মাত্র এলাকাতে থাকবে এজন্যও সে বাধ্য হতে পারে রিটার্ন দিতে...

দেশ রূপান্তর: বিষয়টা তো খুবই বিস্তৃত। ব্যবসা বা যে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে এই ৪৪ সেবা যে কারোর লাগতে পারে। ট্রেড লাইসেন্স করা থেকে শুরু করে সঞ্চয়পত্র কেনা, ১০ লাখ টাকার বেশি আমানত, জমি-ফ্ল্যাট কেনাবেচা, সন্তানকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি পর্যন্ত। এছাড়া রয়েছে, গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ, মোটরসাইকেলের নিবন্ধন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কেনাবেচা...।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ওই যে বললাম, কর আদায়ের জন্য সরকার হঠাৎ করে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এবং যেটা আইএমএফের কাছে জিডিপির আড়াই শতাংশ করে কর বাড়ানোর যে প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি সেটা পালনের চেষ্টা থেকে এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। এই পদক্ষেপগুলোকে আরও বৈপরীত্যমূলক এজন্য যে, ধনী ও সম্পদশালীদের সম্পদের যে সারচার্জ থাকে সেখানে কিন্তু রেয়াত দেওয়া হয়েছে। তিন কোটি থেকে বাড়িয়ে চার কোটি করা হয়েছে। নিম্ন আয়ের মানুষের আয়ের ওপরে যেভাবে আমরা চাপ দিলাম, সেখানে আমরা সম্পদশালীদের সম্পদের ওপর থেকে আবার সেই চাপটা তুলে নিলাম।

দেশ রূপান্তর: একটার বেশি গাড়ি থাকলে যে দ্বিগুণ করের ব্যাপারটা...?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি এটার বিরুদ্ধে না।

দেশ রূপান্তর: যদি এমন হয় যে, পরিবারে স্বামী-স্ত্রীসহ ছেলেমেয়ে মিলিয়ে চারজন রয়েছে। তো একেকজনের নামে একটা করে গাড়ি থাকলেও তো চারটা গাড়ি...?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ওনারা বলতে পারবেন যে— পরিবার হিসেবে না যেহেতু আলাদা আলাদা হিসেবে ওনারা কর দেন সেহেতু ওনাদের আলাদা হিসেবে এটা বিবেচিত হবে। আমি তো তাই আন্দাজ করি। ব্যক্তিগত গাড়িতে আপনি যতই কর ধরেন না কেন

বিষয়টা হলো অন্য জায়গায়, যদি দেশের ভেতরে গণপরিবহন সুলভ ও শোভন না হয় তাহলে তো মানুষ গাড়ি কিনেই চলার চেষ্টা করবে।

সেহেতু যেটা মনে রাখতে হবে, যখন আমরা প্রত্যেক সময়ে করের কথা বলি তখন একইসঙ্গে সরকারের ব্যয়ের গুণমান সম্পর্কেও আমাদের কথা বলতে হবে।

একটি বাড়তি করের টাকা দিলে প্রত্যেক করদাতা চিন্তা করে যে, এর বিপরীতে সরকারের কাছ থেকে সে কী পেতে যাচ্ছে। তো বাজেট বক্তৃতায় সেই জায়গায় আমি কোনো গুরুত্ব দেখি না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, সামাজিক সুরক্ষা, নাগরিক নিরাপত্তা এ সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষের যে অভিযোগ, অসন্তোষ আছে, সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে সেবা-পরিষেবার গুণমানকে ভালো করার মাধ্যমে কর আহরণের জন্য প্রণোদিত করা এমন কোনো কৌশল তো আমি লক্ষ করি না।

দেশ রূপান্তর: এখন তো বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা একটা বড় ইস্যু। তো আইএমএফের শর্তের কারণেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক কৃষকের ভর্তুকি কমানো কি ঠিক হয়েছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের অর্থনীতির এখন পর্যন্ত শক্তির একটা জায়গা তো আমাদের শস্য উৎপাদন। এখানে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। লক্ষ রাখার বিষয় যে এই অর্থনৈতিক সংকটের সময় এই খাত যেন দুর্বল হয়ে না যায়।

তাই সরকারের পক্ষ থেকে যতই বিভিন্ন জায়গা থেকে ভর্তুকি কমানোর কথা হোক না কেন সেচের বিদ্যুৎ, ডিজেল, উৎপাদনের জন্য সার, কীটনাশক, বীজ এসবের যেন কোনো টান না পড়ে এটা লক্ষ রাখা উচিত। বাজেটের ভেতরে এই কথাগুলো খুব স্পষ্টভাবে নেই, যে কৃষককে আমরা যেসব সমর্থন দিই সেটা তো কমাবই না বরং এই সময়ে সেগুলো বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে।

আরেকটা বড় জায়গা যেটা আছে, সেটা হলো কৃষকের কাছ থেকে আমরা যে ধান-চাল, শস্য সংগ্রহ করি সেটার লক্ষ্যমাত্রা আমাদের কোনো সময়ই পূরণ হয় না। এখানে কৃষককে হয়রানি করা হয়, মধ্যস্বত্বভোগীরা থাকে, মিলাররা থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো বাজারকে সুসম বা আরও মসৃণ করা বা কার্যকর করার ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু কোনো ধরনের পদক্ষেপের কথা শুনি না।

দেশ রূপান্তর: জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির যে অঙ্ক অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবে পেশ করেছেন তা অর্জন কি সম্ভব বলে মনে করেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: একটিও বাস্তবসম্মত না। প্রথম কথা হলো উনি জিডিপি সাড়ে ৭ শতাংশ বলেছেন, সেটা বাস্তবতার নিরিখে মেলে না। এবং এটা মেলাতে গিয়ে উনি ব্যক্তি বিনিয়োগের একটা অবাস্তব সংখ্যা দিয়েছেন। এটাও মেলে না। সবচেয়ে বড় কথা মূল্যস্ফীতিকে ৬ শতাংশে আনতে হলে এখন যে ৮ বা ৯ শতাংশ যে মূল্যস্ফীতি চলছে সেটার খুব দ্রুত তিন মাসের মধ্যে নিচে নেমে আসতে হবে। এটা তো বাস্তব না। সেহেতু উনি এই অর্থবছরের যে গড় মূল্যস্ফীতি বলেছেন— সেটা মোটেও বাস্তবসম্মত না।

আগামী বছরের প্রবৃদ্ধিও যে প্রাক্কলন করেছেন সেটাও অত্যন্ত উচ্চাশার। এটার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু সেই অবাস্তবভিত্তিকে স্থাপন করার জন্য যে বিনিয়োগের সংখ্যা বলেছেন ব্যক্তিখাতের, ওইটা কেউ কল্পনার মধ্যেও আনতে পারবে না। আর ওই বিনিয়োগকে কার্যকর করার জন্য যে ধরনের ঋণ প্রবাহ থাকা দরকার, যে ধরনের আমদানি ইত্যাদি করতে হতে পারে সেটা সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের ব্যাংকগুলোর নেই, কেন্দ্রীয় ব্যাংকেরও নেই।

দেশ রূপান্তর: বৈশ্বিক বাস্তবতা, মূল্যস্ফীতি, বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভসহ নানামুখী চাপের মধ্যে সরকারের ‘স্মার্ট বাজেট’ কতটুকু স্মার্টনেস দেখাতে পেরেছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি তো মনে করি যে স্মার্ট হওয়ার জন্য যে ন্যূনতম প্রসাধন দরকার পড়ে, ওনারা সেই প্রসাধনটাও ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারেনি। আমার অত্যন্ত দুঃখ লাগে, পরিতাপ হয় যে সরকার গত ১৫ বছরে অনেক ভালো কাজ করেছে, সেই ভালো কাজগুলোর সম্মিলিত যে প্রশংসা যেটা পাওয়ার কথা ছিল এই বাজেটের মাধ্যমে, এই নির্বাচনের প্রাক্কালে সেটা সরকার নিতে পারল না।

দেশ রূপান্তর: নির্বাচনী বাজেটের যে প্রবণতা আমরা দেখে আসছি, সামনে তো নির্বাচন যার কথা আপনিও উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি, জনতুষ্টির বিষয় থাকে। তো আগের নির্বাচনী বাজেটের সফলতা বা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের যে ফলাফল তার সাথে এবারের বাজেটের তুলনা কীভাবে করবেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এক কথায় বললে এইবারের বাজেট, নির্বাচনী বাজেট হয়নি। প্রথম কথা হলো আগের দুই নির্বাচনী বাজেট, ২০১৪ এবং ২০১৮ এর, তার ভালো-মন্দ বিচারে আমি যাচ্ছি না। ওই সময় অর্থনীতির যে শক্তি ছিল, প্রবৃদ্ধিও হারের যে গতি ছিল,

বিনিয়োগ ছিল, মূল্যস্ফীতি নিচে ছিল, বৈদেশিক লেনদেনের যে শক্তি ছিল— সেগুলোর কিছুই এখন নেই। সেহেতু এই বছরের নির্বাচনের প্রাক্কালে আগের দুই নির্বাচনের আগের বাজেটের মতো আচরণ করার পরিস্থিতিও সরকারের ছিল না।

তা সত্ত্বেও যতটুকু ছিল, সেইটুকুও করার মতো সাহস বা উদ্যোগ আমরা দেখিনি। কারণ, যেহেতু বাজেট ঘাটতি এখনো নিয়ন্ত্রণে আছে, জিডিপির সাড়ে ৫ শতাংশের আশপাশে, সেহেতু টাকা ঋণ করে হলেও একটু চেষ্টা করতে পারত সরকার। দুঃখের বিষয় হলো টাকা ঋণ করে নেওয়ার জায়গাটাও সেই অর্থে সীমিত। আমদানি-রপ্তানি পরিস্থিতিতেও সরকার টাকা না ডলার কোনোটাই সে মেলাতে পারেনি। আর তারপরও যেটুকু যা আছে, সেটুকুও যে খুব ভালোমতো খরচ করতে পারবে সেই বিশ্বাসও বোধহয় সরকারের নেই। সেজন্য এটা কোনো নির্বাচনী বাজেট হয়নি।

নির্বাচনী বাজেট করার জন্য যে ধরনের জনতুষ্টিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যে মনকাড়া বিভিন্ন চিন্তা থাকে— বাজেটে সে ধরনের কোনো চিন্তাও নেই। কারণ হলো আমি সন্দেহ করি যে এই বাজেট কোনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দিয়ে তৈরি হয়নি। রাজনীতি অংশের মানুষরা যদি যুক্ত থাকতেন তাহলে আমি নিশ্চিত যে ওনারা সেই সমস্ত বিষয় ও চিন্তা এই বাজেটে সন্নিবেশিত করতেন। এটা আমার ধারণা।

দেশ রূপান্তর
৪ জুন, ২০২৩

টাকা ছাপানো থেকে বিরত থাকতে হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে

ফাহমিদা খাতুন

মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা করা। এখন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নেই। তাহলে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি কীভাবে হবে। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি। কিন্তু মূল্যস্ফীতি, ডলার ও তারল্যসংকট, আমদানি কমে যাওয়া ইত্যাদি কারণে বিনিয়োগ কমে গেছে। ফলে বর্তমান সময়ে মুদ্রানীতিতে সবচেয়ে গুরুত্ব পাওয়া উচিত মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার বিষয়টি।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হারের ব্যবহার এখনো আমরা দেখিনি। এছাড়া ব্যাংকের তারল্য কমে যাওয়া, খেলাপি ঋণের বেড়ে যাওয়া, মুদ্রার বিনিময় হারের অস্থিতিশীলতা, প্রবাসী আয় কমে যাওয়া ইত্যাদি চ্যালেঞ্জও রয়েছে। ফলে এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই নতুন মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

বর্তমানে মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৯ শতাংশের মতো, আর সুদের হার ৯ শতাংশ। তাহলে দুটি তো প্রায় সমান হয়ে গেছে। আবার মুদ্রার বিনিময় হার কয়েকটি হওয়ার কারণে বাজারে ভুল বার্তা যাচ্ছে এবং ডলারের বাজার স্থিতিশীল হচ্ছে না। আবার বড় বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়ার জন্য সুদের হার কমানো হচ্ছে না। বর্তমান বাস্তবতায় সুদের হার ও বিনিময় হার— উভয়ই বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং মাধ্যমে প্রবাসী আয় পাঠানো কীভাবে বাড়ানো যায়, সে উদ্যোগও নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডলারের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দিলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হতে পারে।

বাজেটে দেখলাম, সরকার প্রক্ষেপণ করেছে বিনিময় হার ১০৪ টাকা হবে। কিন্তু এখনই তো ১০৮–১০৯ টাকা হয়ে আছে। এ রকম প্রক্ষেপণগুলো বাস্তবসম্মত হওয়া প্রয়োজন।

আমরা দেখি, সরকার এমনভাবে নীতি প্রণয়ন করে, যাতে ঋণখেলাপিরা পার পেয়ে যায়। অথচ খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির কারণে তারল্যের ওপর প্রভাব পড়ছে। এ কারণে খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনতে শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ করে ব্যাংক খাতের নীতি সংস্কার করা প্রয়োজন।

এ বছর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের টাকা ছাপানো থেকে বিরত থাকতে হবে। গতবার যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকার ঋণ নেয়, তখন তারা ডলার বিক্রি করে বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়েছিল। কিন্তু এখন তো আর ডলার বিক্রি করার অবস্থা নেই। ফলে সরকারকে ঋণ দিতে গিয়ে টাকা ছাপালে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাবে।

আমাদের তো আমদানিনির্ভর অর্থনীতি। উৎপাদন ও বিনিয়োগের জন্য কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। কিন্তু এ জন্য প্রয়োজনীয় ডলার তো নেই। সুতরাং ডলারের সরবরাহ কীভাবে বাড়ানো যায়, সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। মুদ্রানীতি এককভাবে কাজ করবে না। তাই এর সঙ্গে আর্থিক নীতি, বাণিজ্যনীতি ইত্যাদি সমন্বয় করে কাজ করতে হবে।

প্রথম আলো
১৮ জুন, ২০২৩

নতুন মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরতে পারবে কি?

ফাহমিদা খাতুন

পহেলা জুলাইয়ে শুরু হওয়া নতুন অর্থবছরের প্রথম অর্ধের জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি প্রণয়ন করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মুদ্রানীতি বিবৃতিতে সমষ্টিগত চাহিদাকে হ্রাসপূর্বক ঋণপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখার কথা বলা হয়েছে।

নতুন মুদ্রানীতিতে চারটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলো— ক) নীতি সুদহার করিডোর প্রতিষ্ঠা; খ) ঋণ বিতরণে রেফারেন্স সুদের হার প্রবর্তন; গ) বিনিময় হারের একীকরণ; এবং ঘ) আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল প্রণীত পেমেন্ট ব্যালান্স ও ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়ালে (Balance of Payment and International Investment Position Manual) বর্ণিত নির্দেশনাগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সর্বমোট আন্তর্জাতিক রিজার্ভ গণনা করার পদ্ধতি সংশোধন।

সুদহারের মতো মুদ্রানীতির গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কৌশলগত অবস্থান পরিবর্তন নিঃসন্দেহ প্রশংসনীয়। দীর্ঘদিন ধরে সুদহারের মতো বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে অনিচ্ছুক ছিল এ যুক্তিতে যে এসব আর্থিক হার নির্ধারণ বেসরকারি খাতে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিরুৎসাহিত করবে এবং তা প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

কিন্তু বিবেচ্য যে কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান থাকলে ও সুশাসনের অভাব হলে সুদের নিম্ন হার অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টির জন্য তেমন সহায়ক হয় না। নতুন

মুদ্রানীতিতে সব শ্রেণীর ব্যাংকঋণ বিতরণে রেফারেন্স সুদহার বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ফলে ২০২০ সালের এপ্রিলে প্রবর্তিত ঋণের হারের সীমা আর থাকছে না। ঋণের হারের সীমা না থাকলে ব্যাংক খাতে প্রতিযোগিতা বাড়বে। ফলে ঋণপ্রবাহের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। ব্যক্তি উদ্যোক্তা লাভবান হবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হবে।

নতুন মুদ্রানীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাগত লক্ষ্যমাত্রার (monitory target) চেয়ে সুদের হারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। যার ফলে আন্তঃব্যাংক কল মানি হারের সঙ্গে নীতি হারের (policy rate) সামঞ্জস্য তৈরি হবে, যা বাজারে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে।

আন্তঃব্যাংক কল মানি মার্কেট একটি স্বল্পমেয়াদি আর্থিক বাজার হিসেবে কাজ করে যেখানে ব্যাংক, মিউচুয়াল ফান্ড ও করপোরেশনের মতো বড় প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তঃব্যাংক হারে (যে হারে ব্যাংকগুলো একে অন্যের থেকে তহবিল ধার করে) ঋণ আদান-প্রদান করতে পারবে।

যথাযথ মুদ্রানৈতিক পন্থা অবলম্বনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি হার বাড়ানোর সিদ্ধান্তও নিয়েছে। এ পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ভোক্তা মূল্য সূচক মূল্যস্ফীতির প্রভাব রোধের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহণে ব্যয় বৃদ্ধি।

এখন থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব ওয়েবসাইটে মাসিক ভিত্তিতে ঋণের রেফারেন্স সুদহার ঘোষণা করবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তরফ থেকে সুদহার নির্ধারণের এ করিডোর পদ্ধতিকে 'স্মার্ট' (শর্ট টার্ম মুভিং অ্যাভারেজ) নামকরণ করা হয়েছে। ট্রেজারি বিলের ছয় মাসের চলমান গড় হারের ভিত্তিতে এ হার নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ ঋণের রেফারেন্স সুদহারের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ যোগ করতে পারবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারিত রেফারেন্স হার থেকে ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ সুদ হার বৃদ্ধির সীমা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ আর নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ।

কুটির, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে এবং ভোক্তা ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের খরচ মেটাতে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ১ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত ফি ধার্য করার এখতিয়ার দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ক্রেডিট কার্ড ঋণের সুদহার অপরিবর্তিত থাকবে।

ব্যাংকগুলো অনেক দিন ধরে মূল্যস্ফীতির হারের চেয়ে কম সুদে ঋণ বিতরণ করছিল। মে মাসে মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৯৪ শতাংশে পৌঁছেছিল। মূল্যস্ফীতিকে হিসাবে নিলে প্রকৃত সুদের হার আসলে ঋণাত্মক ছিল। এখন সুদ হারের সীমা তুলে নেয়ার কারণে ঋণের হারে খুব বেশি পার্থক্য থাকবে না। বর্তমানে ছয় মাসের ট্রেজারি বিলের হার দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ১ শতাংশ। সদ্য বাস্তবায়িত নীতি অনুসারে, ব্যাংকগুলোর জন্য সর্বোচ্চ ঋণের হার হবে ১০ দশমিক ১ শতাংশ, যেখানে নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বোচ্চ ঋণের হার হবে ১২ দশমিক ১ শতাংশ। তবে মূল্যস্ফীতির হার এখনো অনেক বেশি।

মুদ্রানীতিতে নতুন অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। যদিও এ লক্ষ্য অর্জন চ্যালেঞ্জিং হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ ১১ শতাংশ অনুমিত হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় কম। কিন্তু নতুন অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে বেসরকারি খাতে ১৫ শতাংশ ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো হার ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ করেছে এবং রিভার্স রেপো রেট ৪ দশমিক ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ করেছে।

পলিসি রেট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ, কারণ এটি সুদের হার নির্ধারণের জন্য একটি কার্যকর কৌশল। তবে ঋণের হার এখনো মূল্যস্ফীতির হারের কাছাকাছি রয়ে গেছে। বিবেচ্য যে মূল্যস্ফীতির চাপ কখন ও কীভাবে হ্রাস পাবে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কারণ সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নয় এবং সরকারের বাজার ব্যবস্থাপনায় মুনাফালিপ্সু সিন্ডিকেটদের দৌরাত্ম্য থামাতে পারছে না। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক আখ্যায়িত ‘স্মার্ট’ নীতি ব্যাংকগুলোকে বাজারের পরিস্থিতি ও ঝুঁকির সম্ভাবনা বুঝে সুদের হার নির্ধারণ করার স্বাধীনতা পুরোপুরি দেয়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বেঁধে দেয়া গণ্ডির মধ্যেই ব্যাংকগুলো আবদ্ধ থাকতে হবে এবং তারা ঋণ বিতরণে বাজার পরিস্থিতির সামঞ্জস্য রেখে স্বাধীনভাবে সুদহার নির্ধারণ করতে পারবে না। তাই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নতুন অর্থবছরের প্রথমার্ধে মুদ্রানীতির কার্যকারিতা সীমিত থাকবে।

সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির বিপরীতে নতুন বাজেটের রাজস্ব নীতি সম্প্রসারণমূলক। নতুন মুদ্রানীতি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অধিক মাত্রায় সরকারের ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ধর্তব্যে নেয়নি। গত অর্থবছরে তারল্য সংকটের মধ্যেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে নেয়া ঋণের ওপর সরকার অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল ছিল। এ

সম্ভাবনা নতুন অর্থবছরেও বিদ্যমান। এতে মূল্যস্ফীতির চাপ আরো বাড়বে। তাই মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে শুধু সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন দেশের দরিদ্র, নিম্ন আয়ের এবং নিম্নমধ্যম আয়ের পরিবারের ভোগান্তি কমাতে যথেষ্ট হবে না। রাজস্ব নীতি ও মুদ্রানীতির মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা সত্ত্বেও মুদ্রানীতি কীভাবে মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরবে তা ভাববার বিষয়।

বণিক বার্তা
৫ জুলাই, ২০২৩

অনিশ্চয়তা শব্দটা আমার কপালে লেগে গেছে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সঞ্চালক: সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলী ঐক্য ডট কম ডট বিডি আজকের সংবাদপত্রে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শকমণ্ডলী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্বাগত দাদা আপনাকে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ মতি ভাই ডাকার জন্য।

সঞ্চালক: অর্থনীতির নানা চাপ আছে এখনো এখন আপনি জানেন যে, এর মধ্য দিয়েই এই অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে বিশেষ করে সদ্য সমাপ্ত যে অর্থবছর সে অর্থ বছরের সরকার ব্যাংক থেকে যেভাবে ঋণ নিচ্ছে তাতে এটা অনেকটা রেকর্ড পরিমাণ। কারণ সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার কোটি টাকা সরকার ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছে। তো এটা যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাতে তো অর্থনীতি আরও বেশি চাপের মধ্যে পড়বে আর সার্বিক অর্থনীতি তো আছেই। তো সেই অবস্থায় আপনি একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে আপনি কিভাবে দেখছেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ মতি ভাই। বাজেট নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি এই বিষয়টি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। সেটা হলো যে সরকারের যে ধরনের ব্যয়ের আগ্রহ বা উৎসাহ এবং যেই ধরনের ব্যয়ের উৎসাহ। বিশেষ করে খুবই পুঁজি-ঘন বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো তৈরি করার ক্ষেত্রে। তো সেটার জন্য যেই পরিমাণে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ সৃষ্টি করা দরকার অর্থাৎ কর আহরণ করা দরকার সেই সক্ষমতা সরকার দেখাতে পারে নাই গত দশ-পনেরো বছরে। আমি বলব ২০১৩র পরের থেকে, ২০১৪

পর থেকে। তো সেটাকে যার ফলে যেটা হয়েছে ওই ব্যয় কে নির্বাহ করার জন্য হয় তাকে বিদেশে টাকা নিতে হবে না হয় অভ্যন্তরী উৎস থেকে নিতে হবে। বিদেশি টাকা সব জায়গায় তো আপনি খরচ করতে পারেন না, আপনার তো প্রকল্প নির্দিষ্টভাবে আসে। সেটার জন্য আপনার বাজেট সমর্থন দরকার করে অথবা অন্য কোন ধরনের আপনার যেগুলোকে আপনি নমনীয়ভাবে খরচ করতে পারেন এরকম। সরকার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই গত বছরের তুলনামূলকভাবে কম বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করতে পেরেছে সেহেতু তারফলে তাকে অভ্যন্তরীণ উৎসতে আসতে হয়েছে। অভ্যন্তরীণ উৎস তে আগে যেটা বড় জায়গা ছিল সেটা হলো সঞ্চয়পত্র বিক্রি করা। সঞ্চয়পত্রের যেহেতু আগ্রহ কমে গেছে সুদের হার কমিয়ে আনতে হয়েছে সরকারকে বিভিন্ন কারণে। কারণ এটার ব্যয় সহ্য করার মতো ক্ষমতা আমাদের রাজস্ব ব্যয় কাঠামোতে নাই। সেহেতু তাকে ব্যাংকের থেকে ঋণ নেওয়াটাই তার অবধারিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ব্যাংকের থেকে যদি আমি আপনি ঋণ নেন তার মানে হলো ব্যাংকের ভেতরে যদি আপনার ঋণ আদায় ভালো না থাকে, আর যদি আপনার সেভাবে আমানত না বাড়ে তাহলে তারল্যের সংকট দেখা দিবে।

তো সেই তারল্য সংকটের ফলে তখন সরকার যদি টাকা নিয়ে যায় যেটুকু সীমিত তারল্য আছে তাহলে ব্যক্তিখাত পায় না। ব্যক্তিখাত তখন বিনিয়োগে আটকে যায় এটাতে শুধু টাকাতে আটকাই নাই। যেহেতু আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি আছে সেহেতু আমদানি করার ক্ষেত্রেও সে এলসি খুলতে পারছে না। যার ফলে ব্যক্তিখাত কিন্তু একটা বড় ধরনের চাপের মধ্যে পড়ে গেছে। ব্যাক্তিখাত চাপে পড়ার মানে হলো এটার উল্টোভাবে যদি আপনি দেখেন তার মানে হলো রাজস্ব আদাই আবার আগামীতে কম হবে, বিনিয়োগ কম হবে, কর্মসংস্থান কম হবে। তাহলে প্রবৃদ্ধির হাড়ও কমে যাবে সেহেতু আগামী অর্থ বছরে সবচেয়ে বড় সংকট হলো এই ভারসাম্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য যেই সমস্ত সংকোচনমূলক পদক্ষেপের দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, সুদের হার বাড়ানো এবং টাকার মূল্যবান আরো কমানো তাতে মূল্যস্ফিতিও বাড়বে। সেটাকে আবার কমাতে হলে সুদের হার বাড়াতে হবে। এইটার ভিতরে কারণ অর্থনীতিতে কোন পদক্ষেপে কিন্তু নির্ভেজাল সুফল আনে না তার কিছু কুফল ও থাকে, সাইড ইফেক্টও থাকে। ওই সাইড ইফেক্ট বা কুফলগুলো আমাদের এখন সহ্য করতে হবে অর্থাৎ অর্থনীতিকে যদি ভারসাম্যে আনতে হয় তাহলে প্রবৃদ্ধির ধারাকে টেনে ধরতে হবে।

সঞ্চালক: একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করেন যে মানুষ সঞ্চয় পত্র কিনছে কম কিন্তু বিক্রয় করছে বেশি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কারণ হলো মানুষের হাতে টাকা নাই। এই মুহূর্তে দ্রব্যমূল্য এবং জীবন যাত্রার ব্যয় এত বেশি যেই ক্ষুদ্র সঞ্চয়ীরা ছিলেন তারা তাদের সঞ্চয় ভেঙে

তাদের জীবনবিবাহ করতে হচ্ছে। এটা আমরা বিভিন্ন গবেষণাতে দেখেছি যে যার যেটুকু সঞ্চয় ছিল, নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্তকে সঞ্চয় ভাঙতে হচ্ছে। প্রথমে তারা খাবার ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণ সীমিত করছে তিন বেলাতে দুবেলা যাচ্ছে তারপরে তারা অন্যান্য খরচ কমানোর চেষ্টা করছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে। সেটা না পারলে তারপর তারা তাদের সঞ্চয় ভাঙছে যার সে সঞ্চয়টা নেই সে ঋণ করছে, ঋণগ্রস্ততা বাড়ছে। এই যে আমরা অর্থনীতির যে প্রবৃদ্ধির ধারা কমে আসা মূল্যস্ফিতি বাড়া সেটার একটা প্রতিফলন এটাতো একটা সামগ্রিক পর্যায়ে। একটা প্রতিফলন প্রতি পরিবারের খানা পর্যায়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই জিনিসটা এটার ভিতরে যুক্ত হচ্ছে এবং এই জিনিসের সাথে যুক্ত হয়েছে আপনার অর্থনীতির দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা অনিশ্চয়তা। অনিশ্চয়তা শব্দটা এখন বাংলাদেশের সামগ্রিকতার সাথে লেগে যাচ্ছে। এই অনিশ্চয়তা কতভাবে আসছে আমি আপনাকে এটা বলতে পারব। দেখুন এখন তো খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বাজারের উপর সরকারি ব্যবস্থাপনার তথ্য-উপাত্ত নাই, কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণও নাই নজরদারিও নাই। তাহলে প্রথমে আপনার পেঁয়াজের দাম বাড়বে তারপর মরিচের দাম বাড়বে তারপর আলুর দাম বাড়বে তারপর আদার দাম বাড়বে। এইগুলো এরকম ভাবে ঘটনার ভিতরে হয়েছে। এখন এটা যদি থাকে তাহলে কিন্তু এটা বিনিয়োগ এবং আমাদের দেশের সামগ্রিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে একটা যুক্ত হয়। এই যে অনিশ্চয়তার কথা বললাম, দেখেন ও নিশ্চয়তার একটা নতুন জায়গা বের হয়েছে সেটা হলো আমাদের সাইবার নিরাপত্তা।

আপনি দেখেন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়বো এটা তো একটা গর্বের ব্যাপার আমাদের এবং এই সরকার এই সময়কালে ডিজিটাইজেশনের জন্য প্রচুর অগ্রগতি করেছে। আজকাল ইলেকট্রিকের বিল দিতে আমাদের আর কোনো সমস্যা হয় না। আমরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে পারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে। এমনকি ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এটার আধুনিকায়ন হয়েছে। কিন্তু এটার জন্য আমার যে নিরাপত্তার দরকার করে যে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সেটা তো আমরা করতে পারিনি। আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে টাকা নিয়ে গেলো, সেই টাকা যে এখন আমরা পেলাম না সেখান থেকে তো আমাদের বুঝার ছিলো। বাংলাদেশ ব্যাংক তিন-চার-পাঁচ বছর আগেও যে সমস্ত পরামর্শ দিয়েছে ব্যাংকগুলোকে তাদের নিরাপত্তা বক্স থেকে জোরদার করা তারা সেগুলো করে নাই। আরেকটা বিষয় দেখেন যে, আমাদের দেশে আরেকটা কমন মানে সাধারণ একটা ইয়ে, কোনো সমস্যা হলে পরে অস্বীকার করার মনোভাব। এবং বিশেষ করে ভিতরের মানুষরা যদি এ সমস্ত কথাগুলো বলে। তো সাইবার নিরাপত্তার জন্যও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আমাদের দেশীয় বিশেষজ্ঞরা বলেছেন সর্বদা। কিন্তু সেখানে তো কেউ কর্ণপাত করে নাই। এখন যখন বিদেশ থেকে হ্যাক করে যখন আমাদের টাকা নিয়ে গেছে তখন প্রথমে অস্বীকার করি তারপরে ওইটাকে আমরা স্বীকার করি কারন বিদেশ থেকে এখন এটা হয়েছে।

এই যে আপনাকে আমি দুটো সাধারণ চিত্র বলেছি আপনি যেদিকেই দেখেন একটা হলো যে আমাদের অস্বীকারের মনোভাব এবং তারপরে এটা বিদেশি না হলে পরে, বিদেশ থেকে যদি না হয় দেশের বিশেষজ্ঞদের কথা দেশের জনগণের কথা, জনমানুষের কথা, নাগরিকদের কথা তাদের কথা সেরকমভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। এটা হলো সমস্য। এবং এর ফলে যেটা সৃষ্টি হচ্ছে, আমি তো দুইটা উদাহরণ আপনার বাজার, অর্থনীতি এবং সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বললাম। অনিশ্চয়তা শব্দটা ২০২৩ সালে কেন যেন আমাদের কপালের মধ্যে লেগে যাচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। এটাই চিন্তার বিষয়।

সঞ্চালক: যেমনটা বলছিলাম যে বিদেশি মেহমান। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল ঢাকা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে আবার কারো কারো সঙ্গে কথা করছেন না। আবার যেটা হচ্ছে যে আপনি জানেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আজই একটা ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল ঢাকায় আসছি। যেটা নিয়ে বেশ আলোচনা রাজনীতিতে। উত্তাপ কিন্তু আছে, তো আপনার কি মনে হয়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ওই যে মতি ভাই বললাম অনিশ্চয়তা শব্দটা আমার কপালে লেগে গেছে।

সঞ্চালক: এখানেও অনিশ্চয়তা?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা হলো আরেক অনিশ্চিত তাই না? প্রথম কথা হলো যে এটা হলো অনেক গর্বের ব্যাপার যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ একটা মৌলিক বিষয়।নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উপায়ে আমার সরকার নির্বাচন করার যে মৌল বিষয়টি। যেটা স্বাধীনতার ভিত্তি আমাদের। আমাদের নির্বাচনের বিষয় থেকেই তো স্বাধীনতার পরবর্তী বিষয়ে আগালো। তো সেই জায়গাতে বিদেশিরা দেশে আলাপ করছে বিদেশে আলাপ করছে, বিদেশের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা আমাদের কথা নিয়ে তাদের চিঠিপত্র আদান-প্রদান করছে। দুই দেশের নেতা তৃতীয় দেশে মিলিত হচ্ছে সেখানে আমরা আলোচ্য বিষয় হয়ে যাচ্ছি। এগুলোতো কোনোটাই সম্মানের ব্যাপার নয়। আমাদের বারবার প্রশ্ন করতে হবে এই পরিস্থিতি কেন হলো। আবার ওই যে এই প্রশ্ন যখন আমরা দেশের মানুষরা বললাম, একটা ভালো নির্বাচন করাটা আমাদের দেশের জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজন এর জন্যই দরকার। এই গণতান্ত্রিক উচ্চারণটা, গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা বৈধতাটা আমার টেকশই উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হিসেবে আসতে হবে। তখন আপনি শুনেন না কথাগুলো কিন্তু এখন আপনাকে ওই বিদেশের লোকেরা এবং খুবই যেমনভাবে আসছে সাধারণ পর্যায়ের মানুষরাই আসছে। তারা এসে আপনাকে এই

ব্যাপারে বি ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন মুখোমুখি করছে। আমি বলব কেন আমাদের জাতি হিসেবে আমাদের এই ধরনের লজ্জাকর পরিস্থিতির মুখোমুখি করা হলো। এটা জবাব দিবে কে? আপনি একটু আগে পড়লেন না সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এরকম সংবাদ প্রচার না করাই ভালো। তো আমি প্রথমেই বলব কোনটা সরকারের ভাবমূর্তি? আর কোনটা দেশে ভাবমূর্তি? আমি দেশের ভাবমূর্তি নিয়ে চিন্তিত। তো আমার দেশের ভাবমূর্তি কি এই লোকগুলো আশাতে বাড়ালো নাকি কমলো। তো এই পোস্টটি কে সৃষ্টি করলো। এটাতো আমার প্রথমে জবাব দেওয়ার ব্যাপার আছে। আর ওনারা যেটা আসছেন সেটা হলো ওনারে সাধরণভাবে অনেকগুলো উপলব্ধির ব্যাপার আছে। একটা উপলব্ধি হলো বাংলাদেশে যদি শান্তি স্মৃতিশীলতা ইত্যাদি বজায় না থাকে এটা শুধু বাংলাদেশের আগামী দিনের টেকসই অর্থনীতির জন্য শুধু না। তারা মনে করেন আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং এই অঞ্চলের বৃহৎ শক্তির বিভিন্ন স্বার্থের সাথে এটাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে এবং এইটাকে মোকাবিলা করার জন্য যেই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার সেটার উপরে উনারা আস্থা রাখতে পারছেন না। এটি হলো বিষয় এবং এইটার সাথে যারা যুক্ত হচ্ছে আরো সেটা হলো যে এই সমস্ত দেশগুলো বাংলাদেশকে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দিয়ে থাকে। তারা বাজার সুবিধা দিয়ে থাকে তাদের দেশ থেকে রেমিট্যান্স আসে। তারা সবচেয়ে বড় প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকারী এদেশে তাদের দেশ থেকে প্রযুক্তি আসে, আমরা বাজার ওই দেশের। যদিও বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুইটা আমদানি উৎস হচ্ছে চীন এবং ভারত।

তো দেখেন, আপনি আনেন এক দেশে বিক্রি করেন এক দেশে, আয় করেন এই দেশে খরচ করার এক দেশে। তাহলে দেখেন অর্থনৈতিক স্বার্থটা কিন্তু এখানে একেবারে বিপরীতভাবে রয়েছে এই জায়গাটাতে। তো সেই জায়গাটাতে এই বিষয়গুলোকে আমাদের গুরুত্বের সাথেই তারা নেয়। তারা কেন গুরুত্বের সাথে নেয়? আজকে যদি বাংলাদেশ অস্থিতিশীল হয়ে যায় তাহলে বাংলাদেশ থেকে শত শত হাজার হাজার মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে ইউরোপ আমেরিকা আরও যেতে চাইবে। তারা তো সেটা চায় না। এখন তো এই মুহূর্তে অভিবাসন নিয়ে সংকট আছে।তারা মনে করে যে এটা যদি স্থিতিশীল না থাকে জলবায়ু নিয়ে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ রয়েছে সেটা মনোযোগের ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। তারা মনে করে যে বঙ্গোপসাগরের ভারতীয় মহাসাগরের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে রাস্তাটি রয়েছে সেটা সেখানে বিঘ্নিত হতে পারে। সো ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের ভেতরে এটা রয়েছে। এখন যেটা হয়েছে সেটা আপনাদের বুঝতে হবে যে,যদিও লাভ ক্ষতির ভিত্তিতে যেটা আমরা বলি বাস্তব ভিত্তিতে ইংরেজিতে বলা হয় ট্রানজেকশনাল রাজনীতি হচ্ছে বৈশ্বিক নীতি হচ্ছে কিন্তু কেউ কেউ। কিন্তু কেউ কেউ এটার সাথে মূল্যবোধকে সাথে নিয়ে আসতে চাচ্ছে। কেননা মূল্যবোধ মানে হচ্ছে ভ্যালু বেজড পলিটিক্স বা ভ্যালু বেজড রিলেশনশিপ। মূল্যবোধ ভিত্তিক হলে

মানে মানবাধিকার বিষয়টি আসবে, গণতান্ত্রিক অধিকারের বিষয়টি আসবে, এটার সাথে আপনার মানুষের মুক্তভাবে নির্বাচনের অধিকার এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের বিষয়টি আসবে। কারণ হলো ওইসব দেশেও তাদের যে নাগরিকরা আছে তারা মনে করে যে অন্য দেশের অপশাসনের দায়ভার আমরা নিব না। ওই যে যেমন আপনার কাপড়ের ক্ষেত্রে হয় আপনি শিশুশ্রম ব্যবহার করে একটা কাপড় তৈরি করেন তাতে সেই কাপড় পড়ে, শার্টটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সে এক ধরনের অপরাধবোধ এর ভিতরে যায় সেই অপরাধবোধ থেকে তারা দূরে থাকতে চায়। সেই জিনিসগুলো হবে এবং আপনাকে বলবে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা হবে, সেটা হলো এটার সাথে বাংলাদেশে যে বিশ্বে সবচেয়ে উজ্জ্বল ভূমিকা তার যেটা আছে সেটা হলো শান্তিরক্ষা করার ক্ষেত্রে আমরা যে ভূমিকা রাখি, সবচেয়ে বড় উজ্জ্বল ভূমিকা তো বিশ্বে আমাদের কাছে নেই পরিচয় জন্যে।এই পরিচয়টার ক্ষেত্রে যেন কোন দাগ না লাগে এটা একটা বড় উদ্বেগের বিষয় রয়েছে। এই জিনিসটা অনেকগুলো বিষয় মিলে একটা পরিস্থিতির ভিতরে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মেহমান রা যে আসছেন এবং কথা বলছেন। আমি আবার বলছি এটা আমার জন্য খুবই লজ্জাকর একটা বিষয় আরকি একটু বিব্রতকর বিষয় কারন আমরা নিজেদের জিনিস নিজেরা সমাধান করতে পারছি না।

সঞ্চালক: আমরা তো পারতাম আমরা ইচ্ছা করলেই তো পারতাম নাকি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার প্রতিষ্ঠানগুলোতো কাজ করছে না।আপনি যে প্রতিষ্ঠান দিয়ে এগুলো কে কাজ করাবেন সেটার জন্য সংসদ সেই অর্থে কার্যকর না বা প্রতিনিধিত্বশীল না। এটাকে করার জন্য আপনি যেই বিচার ব্যবস্থার কাছে যাবেন সেই বিচার ব্যবস্থার কাছে আপনি নিরপেক্ষ বিচার পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না এটা একটা বিষয়। প্রশাসন আপনার যেটাকে সুরক্ষা দিবে সেই প্রশাসন আপনার নিরপেক্ষভাবে করছে কিনা। এক্ষেত্রে যদি দুর্নীতি হয় দুর্নীতি দমন কমিশন কাকে রাখছে কাকে ছাড়ছে এটা বোঝা যাচ্ছে না। মানবাধিকার কমিশন এক অর্থে তো অনেক সময় আমরা অনুভবই করি নাই যে এরকম একটা বিষয় যে আছে। নির্বাচন কমিশন এর ক্ষেত্রে ওনারা ব্যক্তি হিসেবে যতই ভালো হোক না কেনো প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওনারা তো এখনো আসতে পারেন নাই। সেহেতু আমার দেশের ভিতরে যে প্রতিষ্ঠানগুলো এই ধরনের সমস্যা হলে এক ধরনের সমন্বয় এবং আলোচনার মাধ্যমে এটাকে সমাধান করবে সেটা করতে পারছে না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় যেটা হয় তখন এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য বার্তা দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক সংলাপ হয়। রাজনীতিবিদরা তখন বসেন কারণ দেশের অভিন্ন স্বার্থে তারা সকলেই কাজ করেন এটা ধরে নিয়ে আমরা তখন করি। এখন আপনি তো বললেন দেশের স্বার্থে আঘাত লাগে এমন কোনো কথা নাই, তো আমি তো ভাগ করবো কোনটা দেশ আর কোনটা সরকার। সরকারের স্বার্থ এবং

দেশের স্বার্থ অনেক সময় এক হয় না। সরকার অনেক সময় স্বল্প মেয়াদের চিন্তা করে তার টিকে থাকার জন্য। আর আমরা দেশের নাগরিককে আরেকটু লম্বা হয়ে চিন্তা করি যে টেকসই সুষম, সকলের জন্য জীবন ধারণের বিষয়টি কে বড় করে দেখি।

সঞ্চালক: দাদা আপনি তো জানেন যে আমরা ব্রিকসে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই যে সমস্ত দেশ নিয়ে ব্রিকস গঠিত আছে তারা কিন্তু আমাদের দেশের সাথে যে সম্পর্ক যেখানে সেখানে দেখা গেছে যে আমরা আমদানি নির্ভর, কিন্তু এ সমস্ত দেশের সাথে সম্পর্ক করলে অথবা ব্রিকসের যোগ দিলে পরে লাভ ক্ষতিটা কি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মতি ভাই এটা নিয়ে তো আমি লিখেছি আপনি জানেন। আমার ওখানে মূল সিদ্ধান্তটা ছিল যে ব্রিকসে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা যে উদ্যোগটা নিয়েছি সেটা হলো আগ্রহ প্রকাশ করেছি যদিও ব্রিকসের নতুন সদস্য নেওয়ার ক্ষেত্রে পদ্ধতি পদ্ধতি এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। সেহেতু আমরা হয়তো সাউথ আফ্রিকাতে আমন্ত্রিত হচ্ছি বা হয়েছি কিন্তু সদস্য এখনো হতে পারিনি। কিন্তু যদি সদস্য হতে চাই এ যে চেয়েছি এটার মূল কারণ কিন্তু অর্থনৈতিক বিষয় না এটার মূল কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক কূটনীতি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন না এটা রাজনৈতিক কূটনৈতিক। সেটা হলো যে আমরা এই মুহূর্তে পশ্চিমা দেশের বিভিন্ন ধরনের তিরস্কারমূলক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখোমুখি হয়েছি। বিশেষ করে অর্থনীতির বাইরে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মানবাধিকারকে কেন্দ্র করে। তো সেই ক্ষেত্রে সেটাকে মোকাবিলা করার জন্য আমরা এই মুহূর্তে হয়তো দেখাতে চাচ্ছি আরো দেশ আমাদের সাথে আছে, আমাদের সাথে আরো মহাদেশ এবং অন্যান্য আরো মহাসাগর আমাদের সাথে যুক্ত আছে। তাদেরকে সাথে নিয়ে আমরা এদের মোকাবিলা করতে পারব। তো সেইটার আকাঙ্ক্ষা থেকে সম্ভবত এই জিনিসটা এখন এই মুহূর্তে গতি পাচ্ছে বলে আমাদের কাছে মনে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভারত যেটা করে পার পেতে পারে, সাউথ আফ্রিকা যেটা করে পার পেতে পারে, ব্রাজিল যেটা করে পার পেতে পারে বাংলাদেশ করার ক্ষেত্রে আরেকটু আমাদের সাবধানী হওয়ার কৌশলী হওয়ার প্রয়োজন আছে।

সঞ্চালক: তার মানে কি ঝুঁকিপূর্ণ!

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মনে কর, এটা ঝুঁকিপূর্ণ মানে কি বড়দের ক্রসফায়ার মধ্যে যেনো পড়ে না যাই। দেখুন ভারত একদিকে রাশিয়া থেকে তেলও কিনবে আবার মোদি সাহেব কে আমেরিকা তাদের যৌথ সভায় বক্তৃতা দিতেও ডেকে নেবে। দেখেছেন! তারা একই সাথে বহুবিধ বাস্তবতার মাঝে বিরাজ করতে পারে। ঐরকম বহুবিধ বাস্তবতার মাঝে বিরাজ করার সক্ষমতা এই মুহূর্তে আমার আছে কিনা এটা বিবেচনার বিষয়।

এটা কেন আরো বিবেচনার বিষয় এই যে আবার অনিশ্চয়তাটা ফিরে আসছে। কারণ হলো আপনি একটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সুরঙ্গর ভেতর ঢুকছেন। সুরঙ্গের শেষে কোথায় আলো দেখবা আমি জানি না কিন্তু ওই সুড়ঙ্গ যখন আপনি ঢুকেন তখন আপনার সমস্ত মেধা, চিন্তা ওই সুড়ঙ্গের ভেতর থাকে। তার পাশাপাশি যে অন্য কোনো আসর থাকে সেই আসরে আপনার বিনোদন পাওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। সেহেতু আপনার সময়টা খুব ভালো না, সময়টা অনিশ্চিত সময় এই সময়ের ভিতর খুব কৌশলী কূটনীতি করতে যাওয়াটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং কিন্তু আবার আমি নিজে শুভঙ্কর থেকে উত্তরণের জন্য ওই যে সরকারের স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থ আমি আলগা করেছি তখন এটা তার জন্য অনেক সময় প্রয়োজনীয় হতে পারে। শুভেচ্ছা দেওয়া ছাড়া তো এই মুহূর্তে আমি আর কোনো বিশেষ সুযোগ দিচ্ছি না এটার ভেতর।

তবে এটার সাথে নিঃসন্দেহে যেটা যুক্ত হচ্ছে, আমরা দেখছি বিরোধী শক্তি, রাজনৈতিক শক্তিরা বিভিন্ন ধরনের তৎপরতার ভিতর ঢুকছে। আমাদের শুধু নাগরিক হিসেবে একটাই আমি অর্থনীতির মানুষ এবং নাগরিক হিসেবে শান্তি-শৃঙ্খলা যেন থাকে এটা যেন কোনো ধরনের সাংঘর্ষিক অবস্থায় না যায় সহিংসতায় না যায়, কোনো পক্ষই যেন বাড়াবাড়ি ভিতরে না যায়।যে যার নিজের আয়ত্তের ভিতর থাকে এবং এটার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের ধারাকে শক্তিশালী করুক। বিঘ্নিত যেন না করে।

সঞ্চালক: আপনি একটু আগেই সংলাপের কথা বলছিলেন কিন্তু আমরা সেই আলামত দেখতে পাচ্ছি না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন সংলাপ করতে হয় যখন আপনার একটা সমান সমান পরিস্থিতির ভিতরে বিরাজ করে। সেই ছেদবিন্দুটা বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনো এসেছে সেটা জোর দিয়ে এখনো বলা যাচ্ছে না। হয়তো কোনো একটা সময় আসতেও পারে নাও আসতে পারে। আর সংলাপে আরেকটা সমস্যা হয় ক, সকলেই মনে করে যে তারা সংলাপ করার প্রয়োজন নেই কারণ তারা অনেক বেশি শক্তিশালী। আলোচনা করতে হলেই তো কিছু দেয়া নেয়ার প্রশ্ন ওঠে। সেটা দেয়ার আকাঙ্ক্ষা যদি না থাকে এবং মনে করে আমার দেয়ার প্রয়োজন নাই এবং আমি শক্তিশালী। তখন সে কিন্তু সংলাপে যায় না কিন্তু সংলাপের অভিজ্ঞতা ঠিক আবার উল্টোদিকে। যখন সে সংলাপের শেষে আসে তখন সে যা দিতে চাইনি তার চেয়ে আবার বেশি দিতে হয় এটা হলো নিগোসিয়েশনের ট্যাক্টিক্সে। আমার wto-র ক্ষুদ্র দর কষাকষি করে আমি এটা বুঝেছি যে, কোনো সময় আমি নেগোসিয়েশনটা করব, সংলাপটা করবো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওই মুহূর্ত টায় আমার সংলাপের আমার স্বার্থটা কতখানি নিশ্চিত হবে

সেটা আমাকে বলবে। আমি মনে করি যে আমাদের প্রজ্ঞাশীল রাজনীতিবিদরা এই ছেদবিন্দুটাকে খুব দ্রুতই আবিষ্কার করবেন।

সঞ্চালক: অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শকমণ্ডলী আজ এ পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি।

আজকের সংবাদপত্র, চ্যানেল আই
সঞ্চালনায়: জনাব মতিউর রহমান চৌধুরী
১১ জুলাই, ২০২৩

আইএমএফের সঙ্গে ঋণচুক্তি ও কাঠামোগত সংস্কার ইতিবাচক সিদ্ধান্ত

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

আরেকটি সাধারণ নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে। এমন একটি সময়ে জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে নতুন অর্থবছরের বাজেট। কেমন হলো নতুন বাজেট? এ সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কোনো কৌশল কি পাওয়া যাচ্ছে বাজেটে? প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর যে উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, বাস্তবে সেটা কতখানি সম্ভব? রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা কি পূরণ হবে? সর্বোপরি এই বাজেট বাস্তবায়ন কি সহজ হবে? এসব বিষয় নিয়ে কালের কণ্ঠ'র সঙ্গে কথা বলেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ-সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আলী হাবিব

কালের কণ্ঠ: নির্বাচনের বছরে এসে যে বাজেটটি জাতীয় সংসদে পাস হলো, সেটা কিভাবে পর্যালোচনা করবেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বাংলাদেশে সাধারণত নির্বাচনী বছরে যখন সামষ্টিক অর্থনীতিতে একধরনের স্থিতিশীল পরিবেশ থাকে এবং নির্বাচন কাঠামোতে যখন একধরনের প্রতিযোগিতমূলক পরিস্থিতি থাকে, তখন বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দল ভোটারদের আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন রকমের প্রকল্পের ঘোষণা দেয়। সরকারের মন্ত্রী বা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি— তাঁরাও নির্বাচনের মাঠে সেসব প্রকল্পের উল্লেখ করেন। তবে দুটি কারণে এবারের নির্বাচনের পরিস্থিতি ভিন্ন। একটি হলো, সামষ্টিক অর্থনীতির যে চ্যালেঞ্জ যাচ্ছে বাংলাদেশে, তাতে এই মুহূর্তে সরকারের বড় রকমের আর্থিক প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সামর্থ্য সীমিত।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এটি বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকভাবে চতুর্থবারে নির্বাচনে যাওয়া, তাই নতুন করে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিগত সময়ে যেসব বড় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, সেগুলো শেষ করা। অর্থনীতির সুফলগুলো নিশ্চিত করা। এই সরকারের চতুর্থবার হওয়ার কারণে যেকোনো নতুন সরকারের বাজেট দেওয়ার চেয়ে তার প্রেক্ষাপট ও প্রেক্ষিত ভিন্ন। সেদিক থেকে এবারের বাজেটকে ঠিক আসলে নির্বাচনী বাজেট বলা যাবে না।

নির্বাচনী বাজেটে যে ধরনের ইঙ্গিত থাকে— যেমন নতুন নতুন প্রকল্প নেওয়ার কমিটমেন্ট, নতুন নতুন প্রকল্প প্রস্তাব করা— এগুলো এবার নেই। বরং প্রকল্পের সংখ্যা কমানো হয়েছে। বাজেটে প্রকল্প শেষ করার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কালের কণ্ঠ: 'উন্নয়নের অভিযাত্রার দেড় দশক পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা'— এটা ছিল এবারের বাজেটের শিরোনাম। তো এই 'স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে' যাত্রার চ্যালেঞ্জগুলো কী দেখছেন আপনি?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: দেখুন, স্মার্ট বাংলাদেশের বিষয়ে আইসিটি মন্ত্রণালয় বা আইসিটি বিভাগ তাদের অবস্থান ধীরে ধীরে পরিষ্কার করছে। কিন্তু এখনো এ ঘোষণাটি আমরা রাজনৈতিক ঘোষণা হিসেবে দেখছি। এটির পূর্ণ অবয়ব ফুটে উঠবে তখন, যখন বর্তমান সরকারি দল নির্বাচনী ইশতেহারে যাবে। নির্বাচনী ইশতেহারে স্মার্ট বাংলাদেশের পূর্ণ অবয়ব তারা হয়তো ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে এবারের বাজেটে স্মার্ট বাংলাদেশের অভিযাত্রা বা সে ধরনের জায়গাটি তেমন রেখাপাত করা হয়নি। বরং ডিজিটাল বাংলাদেশের যে অভিযাত্রা সেটির বিভিন্ন ঘাটতি পূরণে সরকারি-বেসরকারি খাত কাজ করে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে প্রচেষ্টা ও সক্ষমতার ক্ষেত্রে যে উদ্যোগগুলো সরকার নিচ্ছে, এটা ইতিবাচক, প্রশংসনীয়। ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণাটা আকর্ষণীয়। কিন্তু এটাকে বাস্তবায়নে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের ভেতর নিয়ে আসা, সেটি এখনো চলছে। সামগ্রিকভাবে দেশে এবং সোসাইটির ভেতরে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি সম্ভবত পরবর্তী পাঁচ বছরে দেখা যেতে পারে।

কালের কণ্ঠ: বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। বাস্তবে সেটা কতখানি সম্ভব।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: প্রবৃদ্ধির বিষয়টি যেকোনো রাজনৈতিক সরকারের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। আমরাও মনে করি, যেকোনো সরকারের সময়কালে সামগ্রিকতার বিচারে সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নতির একটা রিফ্লেকশন দেয়। কিন্তু এবার যে ৭.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে এবং সেটি অর্জনের জন্য যে সূচকগুলোতে যে প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশা করা হচ্ছে, আমাদের কাছে মনে হয়েছে সে জায়গাগুলোতে হিসাবের দুর্বলতা রয়েছে। ৭.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে মনে হয়েছে অনেকটা অঙ্কের হিসাব মেলানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতার বিচারে সে হিসাবগুলো আদতে রিফ্লেক্ট করানো যাবে কি না সেটি কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জের বিষয়।

বিগত পাঁচ বছরে ১ শতাংশ জিডিপি বাড়ানো যায়নি। সেখানে এ রকম একটা চ্যালেঞ্জিং ও অনিশ্চিত পরিবেশে বেসরকারি খাত বিনিয়োগে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেখানে দ্বিধান্বিত, সেখানে এত পরিমাণ বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রার হিসাবটি আসলে নড়বড়ে।

কালের কণ্ঠ: পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও কৌশল কি বাজেটে আছে? কী কৌশল থাকতে পারত বলে আপনি মনে করেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বিশেষ সময়টা আসলে এবারের অর্থবছরের ঠিক আগে আগে শুরু হয়। বিশেষ সময়কালটির সূত্রপাত বলা যেতে পারে কোভিড সময়কাল থেকে। পরে এর সঙ্গে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ যোগ হয়েছে। তারপর বৈশ্বিক জ্বালানি রাজনীতি যুক্ত হয়েছে। সুতরাং এটা একধরনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ভেতরে রয়েছে। আমাদের কাছে মনে হয়েছে, সরকার সময় বিশেষে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্নমুখী উদ্যোগ নিয়েছে। এর কিছু কিছু জায়গায় সরকার ভালো সফল হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় সরকারের সাফল্য সীমিত। আবার কিছু কিছু জায়গায় যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার দরকার ছিল, সে উদ্যোগের ঘাটতি আছে।

সামগ্রিকভাবে আমাদের কাছে মনে হয়েছে, সরকার পরিস্থিতিটিকে এখনো একধরনের স্বল্পমেয়াদি সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করছে। সরকার আইএমএফের সঙ্গে ঋণচুক্তিতে গিয়েছে এবং বেশকিছু কাঠামোগত ক্ষেত্রে সরকারের সংস্কারে অঙ্গীকার করা—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং ইতিবাচক দিক। এ ধরনের কাঠামোগত সংস্কার উদ্যোগগুলো সরকারের উদার মনে করা দরকার।

কালের কণ্ঠ: এই বাজেট বাস্তবায়িত হওয়া কঠিন হবে বলে কি আপনি মনে করেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: সরকারের রাজস্ব চাপ থাকা, রিজার্ভের ক্ষেত্রে সীমিত পরিস্থিতি— বলা যেতে পারে যে খোলামেলা বাজেট করার মতো স্পেস স্কেল আসলে সরকারের হাতে এই সময়ে নেই। তার ভেতরে সরকার যে চেষ্টাটি করেছে, সেটি হলো নির্বাচনী বছরে খুব বড় কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত না নিয়ে যতটুকু সম্ভব এই কঠিন সময়টুকু অতিক্রম করা। এখনো এ ধরনের চ্যালেঞ্জগুলোকে একধরনের স্বল্পমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জের বিবেচনায় যে ধরনের দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার, সে জায়গাগুলোতে এখনো উদ্যোগ নেই। সরকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যাপকভাবে তার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা।

বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের আয়ের চ্যালেঞ্জ থাকবে। সরকার যদি ব্যাংকব্যবস্থা থেকে আরো বড় ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা রাখে, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে অর্থ ছাপিয়ে, তাহলে সেটি মুদ্রাস্ফীতির ওপর চ্যালেঞ্জ ফেলবে। বৈদেশিক ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেও কিছুটা সময়ের ঝুঁকি থাকতে পারে। টার্গেট মাত্রায় রাজস্ব আদায় না-ও হতে পারে। সব কিছু মিলিয়ে প্রত্যাশিত মাত্রায় প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ দেওয়ার মতো অর্থ সংস্থান করাতে হিমশিম খেতে পারে।

কালের কণ্ঠ: ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাবে নেতিবাচক ধারায় দেশের অর্থনীতি। ডলারের বিপরীতে টাকার রেকর্ড দরপতন। মূল্যস্ফীতির কারণে জিনিসপত্রের দাম লাগামছাড়া। এ অবস্থায় দেশের মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার মতো কিছু কি বাজেটে আছে? কী করা যেতে পারত?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: মূল্যস্ফীতির বিষয়গুলোকে যতটা সম্ভব ফিসক্যাল বাজেটারি মেজারস দিয়ে অ্যাড্রেস করা যায়, সে জায়গাটিতে ঘাটতি আছে। আমার কাছে মনে হয়েছে, এবারের বাজেটে এটা দুর্বলতম দিক। করমুক্ত আয়সীমাটি বাড়িয়ে যাতে মূল্যস্ফীতিজনিত অভিঘাত কিছুটা মেটাতে পারে সব আয়গোষ্ঠীর মানুষ— বিশেষ করে নিম্ন আয়গোষ্ঠীর মানুষ— সেই চেষ্টাটি সরকারের উদ্যোগের ভেতরে আছে। এর বাইরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আর্থিক বরাদ্দ বাড়িয়েছে।

মূল্যস্ফীতির একটা কারণ বৈশ্বিক। আরেকটা কারণ অভ্যন্তরীণ। আমাদের এখানে মানি সাপ্লাই বাড়ছে। সেটিও কিন্তু মূল্যস্ফীতিতে প্রভাব ফেলছে। প্রকল্পে অপচয় রোধ করতে হবে। অকারণে অর্থ ব্যয়ও কিন্তু মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। বাজারে মূল্য

পরিস্থিতি যতটা না আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে জড়িত, এর বাইরে রয়েছে বাজারব্যবস্থার দুর্বলতা এবং তদারকির কারণেও কিন্তু মূল্যস্ফীতির ঘটনা ঘটছে। সে জায়গাগুলোর জন্য তদারক সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করা, লোকবল বৃদ্ধি করার জন্য বাজেটে যে ধরনের প্রস্তাবনা, সে প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য থাকতে পারে। যেমন— প্রতিযোগিতা কমিশন, ভোক্তা অধিকার রক্ষা কমিশন, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ— এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য বাজেট বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য কিন্তু বাজেটে সে রকম বরাদ্দ আমরা দেখছি না।

কালের কণ্ঠ: রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে, তা কি পূরণ হবে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে পাচ লাখ কোটি টাকা। সরকারি হিসাবে সেটি ১৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দরকার। সরকারকে অতিরিক্ত প্রায় এক লাখ ৪২ হাজার কোটি টাকা জেনারেট করতে হবে। প্রবৃদ্ধির মূল পার্থক্য হচ্ছে যে বর্তমান অর্থবছরেই একটা বড় ঘাটতি থাকার কথা, সরকার মনে করছে যে ঘাটতি হবে না। সিপিডির হিসাবে প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকার একটা ঘাটতি এই অর্থবছরেই থাকবে। সুতরাং সেই হিসেবে আগামী অর্থবছরের জন্য যে টার্গেট, সেটি অর্জন করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। বাজেটে ঘোষিত মেজারস যেগুলো আছে, সেগুলো দিয়ে আমরা খুব বেশি আশা করছি না। এক্ষেত্রে যে ধরনের উদ্যোগগুলো দরকার, বিশেষ করে করজালের বাইরে যারা রয়েছেন, যারা কর ফাঁকি দিচ্ছেন এবং যারা ভুল ফিন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যাদের করজালে আনা যাচ্ছে না, সেগুলো টার্গেট করে যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, সেগুলোর ক্ষেত্রে এখনো ব্যাপকভিত্তিক উদ্যোগ নেই।

এনবিআর ধীরে ধীরে একধরনের সমন্বিত ব্যবস্থায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে সব ধরনের লেনদেন ধীরে ধীরে নেটওয়ার্কের ভেতরে আনা, ফিন্যানশিয়াল রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে একধরনের ক্রস চেক করার ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছে। ব্যাপকভিত্তিক উদ্যোগ নেওয়া দরকার। রাজস্ব আদায়ের জন্য দেশব্যাপী যে ডিজিটাল ফিন্যানশিয়াল সিস্টেম চালু হওয়া দরকার, সে উদ্যোগগুলো এখনো ভালোভাবে নেওয়া হয়নি। সেদিকে এনবিআরের খুব দ্রুত সময় যাওয়া দরকার।

কালের কণ্ঠ: এখন তো মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের জন্য একটি বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য যেসব কৌশল নিয়েছে তা কতটা কার্যকর হবে বলে মনে করেন আপনি?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বর্তমান সময় কিছুটা উচ্চ মূল্যস্ফীতিরই সময়। বিশ্বব্যাপী কোভিড-পূর্ব সময়কালের মূল্যস্ফীতিতে এখনো আমরা যেতে পারিনি। তেলের বাজারে সংকট, অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা, বিশ্বব্যাপী খাদ্য সাপ্লাইয়ে বিভিন্ন রকমের অনিশ্চয়তা— এগুলো রয়েছে। বৈশ্বিকভাবে আপনি হয়তো কিছুটা মূল্য কমে আসার একটা প্রবণতা দেখবেন। বৈশ্বিক পর্যায়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতির একটি সময়কাল যাচ্ছে। তার চেয়ে আমাদের এখানে একটা মূল্যস্ফীতির প্রবণতা রয়েছে, যেটি বাজারব্যবস্থার বাইরে। সেটির ক্ষেত্রে সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়— এদের যৌথভাবে কাজ করার দরকার রয়েছে।

কালের কণ্ঠ: অর্থনীতির নানামুখী চাপ রয়েছে। রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স সেভাবে আসছে না। করণীয় কী?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আমাদের কাছে মনে হয়, এবারের বাজেটে সরকারের উচিত ছিল রেমিট্যান্সকে আরো কিছুটা উৎসাহিত করা। এবং প্রয়োজনবোধে সে জায়গাটির ক্ষেত্রে প্রণোদনা যেটি রয়েছে সেটি কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া। তবে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটি হলো ফরেন মার্কেটের যেকোনো ট্রানজেকশন মার্কেট রেটে হবে। যদি এটি হয় তাহলে আশা করা যায়, ইনফরমাল মার্কেটের সঙ্গে ফরমাল মার্কেটের এবং বাংলাদেশের যে বিভিন্ন রেট রয়েছে, যার কারণে বিভিন্ন ধরনের ডাইভারশন হয় ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনে, এগুলোকে মার্কেট রেটে নেওয়ার কারণে এই ডাইভারশন কমে আসবে। ফলে হুণ্ডি বা এ ধরনের প্রবণতা যদি তুলনামূলক কমে আসে, তাহলে রেমিট্যান্সে তার একটা প্রভাব পড়বে। কেননা উচ্চ মূল্যে যদি আমাদের ব্যাংকাররা কিনতে পারেন, যারা কি না হুণ্ডি সিস্টেমে বাড়তি টাকায় পাঠান, তারা বেশি টাকায় ফরমাল চ্যানেলে পাঠানোর ব্যাপারে উৎসাহিত থাকবেন।

কালের কণ্ঠ: সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে। বাজারে মুদ্রা সরবরাহ কমালেই কি মূল্যস্ফীতি কমবে? নতুন মুদ্রানীতি কি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে খুব বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বাংলাদেশের বিচারে মুদ্রানীতিতে যে অল্প কয়েকটি বিষয় রয়েছে, তার আলোকে আসলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উদ্যোগগুলো নেয়। কিন্তু বাংলাদেশে বাজারব্যবস্থায় মার্কেটের ওপর মনিটরিং, ট্রানজেকশন—এগুলো অনেক সময় প্রপারলি মনিটর করা কষ্টকর। এর ফলে বিভিন্ন ঘোষিত নীতি—কে কিভাবে বাস্তবায়ন করছে এবং না করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া—এটি সব সময় সহজ নয়। তার মধ্যেও সংকোচনমূলক যে মুদ্রানীতি— এই সময়কালে সেটির যৌক্তিকতা রয়েছে বলে আমরা

মনে করি। মানি ফ্লো কোথায় কিভাবে হচ্ছে, সেটিকে কিছুটা হলেও সীমিত রাখার ক্ষেত্রে কিছুটা ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে। তবে এক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতাও প্রয়োজন পড়বে। প্রকল্পের ক্ষেত্রে সব দিক বিবেচনা করে অর্থ বরাদ্দের ব্যাপার যেন থাকে। সেটি যেন প্রোপারলি বাস্তবায়িত হয়।

মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে মুদ্রানীতির যে ভূমিকা সেটি মুদ্রা সরবরাহ ও মার্কেট রেট, ইন্টারেস্ট রেট ও কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো যে রেটে ট্রানজেকশন করার কথা— বলা হচ্ছে মার্কেট রেটে চলে যাবে ধীরে ধীরে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর এই রেটগুলো। সেটিও হয়তো এই সময়কালের একটি যৌক্তিক অবস্থান। তবে মনিটরি পলিসির বাইরে রয়েছে 'নন-মার্কেট আসপেক্ট'। বাজারব্যবস্থার ক্ষেত্রে বড় দুর্বলতা রয়ে গেছে আমাদের, সে জায়গাগুলোতে পর্যাপ্ত নজর রাখা দরকার। সে জায়গাগুলোতে যদি পর্যাপ্ত উদ্যোগ না থাকে, শুধু মুদ্রানীতি নিয়ে সামগ্রিকভাবে মূল্যস্ফীতিকে স্বাভাবিক জায়গায় রাখা দুরূহ হবে।

কালের কণ্ঠ: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: ধন্যবাদ।

শ্রুত লিখন: রায়হান রাশেদ
কালের কণ্ঠ
১৬ জুল্য,২০২৩

খেলাপি ঋণ কমানো ও বাজার কারসাজি নিয়ন্ত্রণ কোনোটাতেই সাফল্য দেখা যাচ্ছে না

ফাহমিদা খাতুন

বাংলাদেশের অন্যতম আর্থ-উন্নয়নবিষয়ক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র নির্বাহী পরিচালক **ড. ফাহমিদা খাতুন**। তিনি বিশ্বের বৃহত্তম এনজিও ব্র্যাকের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য। এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাপ্রতিষ্ঠান আটলান্টিক কাউন্সিলের নন-রেসিডেন্ট সিনিয়র ফেলো। তিনি আঙ্কটাডের প্রডাক্টিভ ক্যাপাসিটি ইনডেক্সের উচ্চপর্যায়ের উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর করেছেন। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে অর্থনীতিতে আরেকটি স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টোরাল ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতৃত্বের ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। সিপিডির আগে বিআইডিএস, ইউএসএআইডি ও ইউএনডিপিতে কাজ করেছেন। ছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক। বাংলাদেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অ্যাডভাইজার গ্রুপের সদস্য ছিলেন। দেশ-বিদেশে প্রচুর গবেষণাপত্র ও গ্রন্থের লেখক। চলমান অর্থনীতির নানা দিক, সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে সম্প্রতি বণিক বার্তার সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাবিদিন ইব্রাহিম**

বণিক বার্তা: বর্তমানে সাধারণ মানুষ মূল্যস্ফীতির ধাক্কায় কষ্টে আছে। গত বছর শ্রীলংকাও এমন সংকটে পড়েছিল। শ্রীলংকা মূল্যস্ফীতি দুই অংক থেকে এক অংকে

নামিয়ে আনতে পেরেছে। কিন্তু আমরা সম্ভাবনাময় অর্থনীতি হওয়া সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি কেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি?

ড. ফাহমিদা খাতুন: এখানে দুটি জিনিস কাজ করে। একটা হলো মুদ্রানীতি, আরেকটা হলো বাজারবহির্ভূত কিছু অনুঘটক। শ্রীলংকায় কোনো ম্যাজিক কাজ করেনি। তারা মুদ্রানীতিকে ব্যবহার করেছে এবং তাদের সরকারের অন্য কয়েকটি নীতিমালা এখানে কাজ করেছে। যখন মূল্যস্ফীতি লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে থাকে তখন সরকারকে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি নিতে হয় এবং সুদের হারের ওপর হাত দিতে হয়। সুদের হার যদি বাড়ানো হয় তাহলে মানুষের ঋণ নেয়া কমে। সুদের হার কম থাকলে মানুষ ঋণ নিতে চায়, বাজারে মুদ্রার প্রবাহ বাড়ে। আমাদের দেশে বহুদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার ধরে রেখেছে। ব্যাংকগুলোর ওপর নির্দেশ ছিল ঋণের জন্য সুদের হার ৯ শতাংশ এবং আমানতের ওপর সুদের হার ৬ শতাংশ রাখতে হবে। অথচ আমাদের মূল্যস্ফীতি ২০২৩-এ গড়ে ৯ শতাংশের ওপরে ছিল। তার মানে হচ্ছে, মানুষ অনেক সস্তায় ঋণ নিতে পারছিল। আবার আমানতকারীরা ব্যাংকে টাকা রেখে প্রকৃত অর্থে কম টাকা নিয়ে ঘরে ফিরত। এ ধরনের মুদ্রানীতি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক নয়। মুদ্রানীতি ছাড়াও বাজারে অসৎ ব্যবসায়ীরা কারসাজি করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে নীতিনির্ধারকরা সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অনেকাংশেই সফল হয়েছে। শ্রীলংকাও তাই করেছে। শ্রীলংকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের সঠিক ও দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে সফলতা এসেছে। দেশটির অর্থনীতি খুব তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। আমরা কিন্তু এখনো কষ্ট করছি। শ্রীলংকা মুদ্রানীতি ছাড়াও আর্থিক নীতির মাধ্যমে সরকারি ব্যয় অনেকখানি কমাতে পেরেছে এবং রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর চেষ্টা করছে। যদিও শ্রীলংকায় এখনো অনেক সমস্যা রয়ে গেছে, কিন্তু তারা অনেক সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করেছে।

বণিক বার্তা: আমাদের সরকার আমদানি কমিয়ে দিয়েছে। এ পদক্ষেপ কতটুকু সফল হয়েছে বলে মনে করেন?

ড. ফাহমিদা খাতুন: বাণিজ্য ভারসাম্য, চলতি হিসাবের ভারসাম্য, আর্থিক হিসাবের ভারসাম্য— সব ক্ষেত্রেই আমাদের সমস্যা রয়েছে। আমদানি কমানোর ফলে ২০২৩ অর্থবছরে আমদানির নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ফলে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা কমেছে। চলতি হিসাবের ঘাটতিও অনেকখানি কমানো গেছে। কিন্তু আমদানি নিয়ন্ত্রণ

করার ফলে মূলধনি যন্ত্রপাতি ও মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানিও কমে গেছে। এটি চলতে থাকলে উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এর ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ব্যাহত হবে, সাধারণ মানুষের আয় কমে যাবে। এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ব্যাহত হবে। সেজন্য একটা নীতির সঙ্গে আরেকটা নীতির সমন্বয় থাকা গুরুত্বপূর্ণ। আর আমদানি কমিয়ে মূল্যস্ফীতি নামিয়ে আনার চেষ্টার ব্যাপারে বলতে হয়, আমাদের মূল্যস্ফীতিকে এখন আর আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি বলা যাবে না। কেননা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় সব পণ্যের মূল্য অনেক দিন থেকে কমতে শুরু করেছে। তাই আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতির ওপর দায় চাপিয়ে শুধু আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে পুরোপুরি সফলতা অর্জন করা যাবে না। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক হাতিয়ারটিই ব্যবহার করতে হবে। অবশেষে এ বছরের জুলাইয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অবলম্বন করেছে। কিন্তু চলতি অর্থবছরের বাজেটের আর্থিক পদক্ষেপগুলো সম্প্রসারণমূলক। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি ব্যয় বাড়ানোর প্রস্তাবনা রয়েছে। তাই বিভিন্ন খাতের নীতিমালার মধ্যে সাযুজ্য না থাকলে নীতির কার্যকারিতা হারিয়ে যায়।

বণিক বার্তা: আন্তর্জাতিক বাজারে ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে তেলের দাম স্থিতিশীল (ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের কাছাকাছি)। আমরা তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি কেন?

ড. ফাহমিদা খাতুন: আমাদের দেশে জ্বালানি তেলের দাম সরকার নিয়ন্ত্রিত। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে সরকার দাম বাড়ায়। কিন্তু দাম কমলে তা কমায় না। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) মুনাফা করে। আইএমএফ বাংলাদেশকে ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়ার সঙ্গে বেশকিছু শর্ত দিয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ফর্মুলাভিত্তিক পেট্রোলিয়ামের দাম নির্ধারণ করা। যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম ওঠানামার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তেলের দাম নির্ধারণ করা হয়। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বলি আর জ্বালানি তেলের দামের ক্ষেত্রেই বলি, অর্থনৈতিক যুক্তিগুলো এখানে প্রায়ই কাজ করে না। আমরা যদিও বাজার অর্থনীতি চালু করেছি কিন্তু আসলে অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থনীতির মতো নীতিমালা দেখতে পাচ্ছি।

বণিক বার্তা: জ্বালানির জন্য আমরা বড় আকারে আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে আমাদের ডলার সংকট আছে। সামনে কোনো বৈশ্বিক সংকট এলে সরকার জ্বালানি সরবরাহ সচল রাখতে পারবে?

ড. ফাহমিদা খাতুন: এখানেই সমস্যা। আমরা জ্বালানি তেলের জন্য সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর নির্ভরশীল। তাই আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লেও আমাদের উচ্চমূল্যে

তেল আমদানি করতেই হবে। আমরা নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে তেমন কোনো উদ্যোগ দেখছি না। যদিও বিভিন্ন জিওলজিক্যাল সার্ভের মাধ্যমে জানা গেছে যে বাংলাদেশে গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনাটা বাস্তবে রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় না। উচ্চমূল্যে জ্বালানি আমদানির জন্য অনেক সময় গোষ্ঠীগত স্বার্থ বিবেচনায় রাখার কথাও শোনা যায়। জ্বালানি সংকট মোকাবিলার জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে কর্মপন্থা নেয়া দরকার। স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে জ্বালানির উৎস বহুমুখী করতে হবে যাতে বিপদের সময় শুধু এক-দুটি দেশের ওপর নির্ভর করতে না হয়। দীর্ঘমেয়াদে গ্যাস কূপ খননে বিনিয়োগ করতে হবে।

বণিক বার্তা: সম্প্রতি চাল, গম ও পেঁয়াজের পর চিনি রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা বা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ভারত। আপনি বাংলাদেশের বাজারে ভারতের এ সিদ্ধান্তে কোনো ধরনের নিকট প্রভাব দেখতে পাচ্ছেন?

ড. ফাহমিদা খাতুন: দেখুন, প্রত্যেকটি দেশই তাদের নিজেদের বাজারের অবস্থাটা বিবেচনা করে এবং তাদের দেশের ভোক্তাদের কথা মাথায় রেখে নীতিমালা নির্ধারণ করে। সেটা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও। যদিও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়মানুযায়ী, এ ধরনের রক্ষণশীল পদক্ষেপ নেয়া কাম্য নয়। কিন্তু নিজেদের দেশের ভোক্তাদের কথা মাথায় রেখে তারা এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তবে এটা কোনো নতুন বিষয় নয়, অন্যান্য দেশও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সংরক্ষণবাদী পদক্ষেপ নেয়। সেজন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এটা হঠাৎ করে এসে যাচ্ছে এমন তো নয়। কোনো সময় চাল, কোনো সময় পেঁয়াজ, কোনো সময় চিনি—পণ্যের সরবরাহ ও চাহিদা অনুযায়ী ভারত এমন সিদ্ধান্ত নেয়। এটা কোনো সময় ভারত, আবার কোনো সময় আরেক দেশ। এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের বিভিন্ন পণ্য আমদানি করার উৎসগুলো বাড়াতে হবে। শুধু একটা দেশের ওপর নির্ভরশীল থাকা যাবে না। পণ্য কেনার বাজার বহুমুখী করতে হবে। নতুন নতুন দেশ খুঁজে বের করে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এজন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়া উচিত। নিষেধাজ্ঞা আসার আগেই বাজারের অবস্থা বুঝে আমাদের বিকল্প উৎস খুঁজে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সঠিক সময়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্য দেশগুলোও তো পণ্য কিনতে চাইবে। যে আগে তৎপর হয়ে পদক্ষেপ নেবে সে সফল হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করতে হবে। শুধু তা-ই নয়, পণ্য কীভাবে বাজারে আসতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। কেননা আমদানির পরও কৃত্রিম সংকট তৈরি করে মুনাফা বাড়ানোর চেষ্টা চলে। আর যেসব পণ্য আমরা দেশীয়ভাবে উৎপাদন করতে পারি সেগুলোর উৎপাদন ও সরবরাহ কীভাবে বাড়ানো যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। আমাদের দেশের বাজারে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করছে কয়েকজন মিলে।

তাদের কয়েকজন পেঁয়াজ আমদানি করছে, কয়েকজন তেল আমদানি করছে, কয়েকজন চিনি আমদানি করছে। বাজার নিয়ন্ত্রণেও তারা ভূমিকা রাখে।

বণিক বার্তা: এটাকে অনেকে সিন্ডিকেট বলে। সিন্ডিকেট ম্যানেজমেন্ট আমরা কেন করতে পারছি না?

ড. ফাহমিদা খাতুন: সিন্ডিকেট যে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে এটাই তো নীতিনির্ধারকরা স্বীকার করতে চান না। বাণিজ্যমন্ত্রী একবার সিন্ডিকেটের ক্ষমতার কথা বলে এখন আবার তা অস্বীকার করছেন। যদি সিন্ডিকেট না থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদেরই দায়িত্ব দাম বাড়ার কারণ খুঁজে বের করা। তাদেরকে বাজারে জিনিসপত্রের সরবরাহ ও দামের ওপর নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে। তাদেরই দায়িত্ব বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা। বাজারে অদৃশ্য শক্তির হাত যদি সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে কে পারবে?

বণিক বার্তা: চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ২০ আগস্ট নাগাদ দেশে ৩১৩টি কারখানা বন্ধ হয়েছে, চালু হয়েছে ১৮৩টি কারখানা। এটা আমাদের সার্বিক অর্থনীতি সম্পর্কে কী ইঙ্গিত দিচ্ছে?

ড. ফাহমিদা খাতুন: অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন খাতের কারখানার মাধ্যমে উৎপাদন করা জরুরি। এর ফলে মানুষের আয় সৃষ্টি হয় যা দিয়ে মৌলিক চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়। এতে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। মানসম্পন্ন জীবনযাপনও নিশ্চিত করা যায়। যে কারখানাগুলো বন্ধ হয়েছে এবং যেগুলো নতুন তৈরি হয়েছে সেগুলো কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কতখানি ভূমিকা রাখছিল বা রাখবে সেটি দেখার বিষয়। কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণ জানা প্রয়োজন। কারণ কর্মসংস্থানের জন্য এটি ভালো খবর নয়। আমাদের দেশে যুব বেকারত্ব এখনো অনেক বেশি। দেশে গড় বেকারত্ব কম হলেও যুব বেকারত্বের হার ১০ দশমিক ৬ শতাংশ। তাই কর্মসংস্থানের উৎসগুলো কমে গেলে তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বণিক বার্তা: সম্প্রতি একটি খবর পাওয়া যাচ্ছে, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) জানুয়ারির পর থেকে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি এবং ছাড় ও পরিশোধের তথ্যগুলো প্রকাশ করছে না। বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

ড. ফাহমিদা খাতুন: আমি মনে করি যে তথ্যের সংকট হচ্ছে সঠিক অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের একটি বড় প্রতিবন্ধক। কারণ সঠিক ও হালনাগাদ তথ্য থাকলেই সঠিক নীতিনির্ধারণ সম্ভব। এছাড়া তথ্যের অভাবে গবেষকরা ঠিকমতো বিশ্লেষণ করতে পারেন না। অনেক সময় হয়তো নীতিনির্ধারকদের কাছে তথ্য আছে, কিন্তু জনগণকে সেগুলো জানানো হচ্ছে না। কিন্তু তথ্য জানার অধিকার জনগণের রয়েছে। আমরা তথ্যের জন্য আবেদন করলে তার জন্য অনেক দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। বৈদেশিক ঋণের স্থিতি, ছাড় ও পরিশোধের তথ্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি একটি দেশের অর্থনীতির চিত্র তুলে ধরে। বৈদেশিক ঋণের বোঝা ক্রমে বাড়ছে। এসব ঋণের অনেকগুলো পরিশোধের সময় ঘনিয়ে আসছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এটি কতখানি শঙ্কার কারণ হতে পারে তা বোঝার জন্য হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

বণিক বার্তা: আমাদের আর্থিক খাতের একটা বড় সংকট হচ্ছে ঋণখেলাপি। বড় বড় ঋণখেলাপিরা সহজেই ঋণ পেয়ে যাচ্ছে। ফের খেলাপি হচ্ছে, কিন্তু তাদের আইনি জালে আটকানো যাচ্ছে না কেন?

ড. ফাহমিদা খাতুন: ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হওয়ার পরও তাদেরকেই বড় আকারের ঋণ দেয়া প্রমাণ করে যে ঋণখেলাপিরা কতটা প্রভাবশালী। কখনো কখনো ঋণগ্রহীতারা খেলাপি হতেই পারে। যখন দেশের ভেতরে বা বাইরে কোনো সংকট সৃষ্টি হয় তখন মানুষের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হতেই পারে। এর ফলে তারা ঋণখেলাপি হতে পারে। যেমন কোভিড কিংবা ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে কিংবা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ব্যবসা খারাপ হয়ে যেতে পারে। তখন ব্যবসায়ীদের জন্য ঋণ পরিশোধ করা কষ্টকর হতে পারে। কিন্তু এখন যে ঋণখেলাপিরা ঋণ নিচ্ছে তারা অনেকেই ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি। ঋণখেলাপি কিংবা বাজারে কারসাজি— সব একই সূত্রে গাঁথা। দুষ্ট পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলছে। বিভিন্ন খাতে সুশাসনের অভাবে একটি গোষ্ঠীতন্ত্র তৈরি হয়েছে যা নিজেদের অনুকূলে নীতিমালা তৈরিতে প্রভাব ফেলছে। এ গোষ্ঠীতন্ত্রের সদস্যরা এতটাই প্রভাবশালী যে নীতিনির্ধারকরা তাদের কাছে অসহায়। ফলে খেলাপি ঋণ কমানো ও বাজার কারসাজি নিয়ন্ত্রণ কোনোটাতেই সাফল্য দেখা যাচ্ছে না। নীতিনির্ধারকরা যেন অসহায় দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। আর সাধারণ মানুষের পকেটে টান পড়ছে। ইচ্ছাকৃত বড় বড় ঋণখেলাপিরা দেশের ব্যাংক খাতকে সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বণিক বার্তা: কৃষি, তৈরি পোশাক ও রেমিট্যান্সে নির্ভর করে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক দূর এগিয়েছে। সামনের দিনগুলোয় এগুলো কি আমাদের উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে নিয়ে যেতে পারবে?

ড. ফাহমিদা খাতুন: এ তিন খাতই বাংলাদেশের অর্থনীতির স্তম্ভ। এগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। কিন্তু যেভাবে এ খাতগুলো এতদিন ভূমিকা রেখে এসেছে, তার মধ্যে কিছু কাঠামোগত ও গুণগত পরিবর্তন করতে হবে। যেমন ধরুন কৃষি। এখানে কৃষিপণ্যের বহুমুখিতা যেমন বাড়াতে হবে, আবার কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে মূল্যবর্ধক কৃষিখাত গড়ে তুলতে হবে। আমাদের জমি কম। তাই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। প্রক্রিয়াজাত করে আন্তর্জাতিক বাজারে রফতানি বাড়াতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এবার আসি তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে। আমরা সবসময় বলে আসছি যে একটা পণ্যের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে বাংলাদেশের রফতানিখাত কত দিন চলবে। তিন দশকের বেশি সময় পার হয়ে গেছে। এখনো এই একটি রফতানি পণ্য বৈদেশিক মুদ্রার মূল উৎস। এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। তখন অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা করে রফতানির বাজার ধরে রাখতে হবে। কেননা তখন শুল্ক মুক্ত বাণিজ্য সুবিধা থাকবে না। নতুন সুবিধা যেগুলো সৃষ্টি হবে, সেগুলোর জন্য অনেক কমপ্লায়েন্স পরিপালন করতে হবে। যেমন শ্রম অধিকার, মানবাধিকার, পরিবেশগত নীতিমালা ইত্যাদি পরিপালন করে বাজার সুবিধা পেতে হবে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশ অন্যান্য দেশের সঙ্গে রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপে বা আরসেপে হচ্ছে, যার মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতাসহ অর্থনীতির নানা খাতে সহযোগিতার সুযোগ থাকছে। তবে এর জন্য অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন রেগুলেটরি পদক্ষেপ নিতে হবে। কমপ্লায়েন্সকে শক্তিশালী করতে হবে। রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রেও মানবদক্ষতা বাড়াতে হবে। নইলে আমরা বাজার হারাব। নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হবে। সারা পৃথিবীতে এখন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। তাই আমাদের কম দক্ষতার কাজের চিন্তা বাদ দিয়ে উচ্চ দক্ষতার কাজের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। না হলে আমরা প্রতিযোগী দেশগুলোর কাছে হেরে যাব।

বণিক বার্তা: প্রযুক্তির উন্নয়ন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটের কারণে জনশক্তিনির্ভর অনেক কাজই ভবিষ্যতে বাতিল হয়ে যাবে। আমরা এটা কীভাবে মোকাবিলা করব?

ড. ফাহমিদা খাতুন: তরুণদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে উপার্জনমূলক কিছু করে। তবে সেটার জন্য তাদের মূলধন জোগাড় করে দিতে হবে।

নতুন উদ্যোক্তাদের কেউ ঋণ দিতে চায় না। বাংকগুলো নিরাপদে থাকতে চায়। নতুনদের ঋণ দিয়ে ঝুঁকি নিতে চায় না। অথচ বড় ব্যবসায়ীদের ঋণখেলাপি হওয়ার পরও তাদের আবারো ঋণ দেয়া হয়। ছোট ও নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারি সহায়তা প্রয়োজন। আর প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বলতে হয় যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে পাস করা তরুণ-তরুণীরা যাতে তাদের প্রশিক্ষণ কাজে লাগাতে পারে সে ধরনের প্রশিক্ষণই দিতে হবে। ব্যক্তি খাতের নিয়োগকারীরা বলে থাকেন যে ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো থেকে পাস করা ব্যক্তিদের গুণগত মান তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মান ও দক্ষতা বাড়াতে হবে। প্রশিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

আর প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোর্স ডিজাইন করতে হবে। এ প্রশিক্ষিত জনগণকে কাজের জন্য বাইরে পাঠানোও সহজ হবে।

বণিক বার্তা: বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা অর্থনীতিতে প্রভাব রাখছে, আমরা যে সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, আমাদের সরকার এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম বলে মনে করেন কিনা?

ড. ফাহমিদা খাতুন: সামনের মাসগুলোয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য যে ধরনের কর্মকাণ্ড দরকার সেগুলোয় হয়তো বেশি মন দেবে। যেমন কয়েকটি মেগা প্রকল্প উদ্বোধনের কথা শোনা যাচ্ছে। ভৌত অবকাঠামো বেশি দৃশ্যমান বলে সরকারগুলোর অবকাঠামোতেই বেশি উৎসাহ থাকে। কিন্তু এতে করে সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন এক বছরের বেশি সময় ধরে মূল্যস্ফীতির চাপে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার অধীনে কি পর্যাপ্ত সহায়তা রয়েছে? কিংবা আর্থিক খাতের উচ্চ ঋণখেলাপির পরিমাণ কমানো, রাজস্ব আয় বাড়ানো, বহিঃখাতের দুর্বলতা কাটানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানো, অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশি ঋণের বোঝা কমিয়ে আনা, চলমান প্রকল্পগুলো দক্ষভাবে সম্পন্ন করা, সরকারি ব্যয় কমানো, যুব সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈষম্য দূর করা ইত্যাদি বহু চ্যালেঞ্জ সরকারের সামনে। আগামী কয়েক মাসে সবকিছু পূরণ করা সম্ভব নয়। এগুলোর কোনো কোনোটি স্বল্পমেয়াদে করা যাবে, আবার কোনো কোনোটির জন্য বেশি সময় লাগবে। আগামী নির্বাচনে যে দল ক্ষমতায় আসবে তাদের শুরু থেকেই সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে যথেষ্ট কাজ করতে হবে।

বণিক বার্তা
৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

উর্দি পরা মানুষদের বাজারে পাঠানো মানে অবস্থাকে আরও জটিল করা

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সঞ্চালক: সুপ্রিয় দর্শকমন্ডলী ঐক্য ডটকম ডট বিডি আজকের সংবাদপত্রে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আমাদের আজকের অতিথি। স্বাগত দেবুদা আপনাকে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনাকেও ধন্যবাদ ডাকার জন্য আপনাকে আমি বিলম্বিত জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জানালাম।

সঞ্চালক: ধন্যবাদ অনেক। শিরোনাম তো আছে অনেক কিছুই কিন্তু যে শিরোনাম নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, আজ থেকে কয়েক মাস আগে আপনি বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে অর্থনীতির চালচিত্র আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সেখানে আপনি বলেছিলেন যে চাপে আছে। এখন তো আর চাপ নেই এখন তো প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি। আপনি একটা এখন কিভাবে দেখছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ মতি ভাই, আপনার এখানে বাজেটের আগে পরে যে আলোচনাগুলো করেছি সেখানে তো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ঘনায়মান বিভিন্ন সমস্যা সেগুলোর কথা সর্বদাই বলেছি এবং এখন এই মুহূর্তে আপনি এই যে শিরোনাম পড়লেন আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে যে যেটা হলো যে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে অর্থনীতির যে বর্তমান চিত্রটি সেটে নিয়ে কিন্তু সেই অর্থে আপনারা শিরোনামের ভিতরে নেই। এবং এটা মূলত এই মুহূর্তে রাজনীতি, কূটনীতি এবং প্রফেসর ইউনোস সেটাকে আমি দুটোর বাইরেই রাখলাম। এটা নিয়ে যতখানি চিন্তিত এবং এটা নিয়ে যতখানি ব্যস্ত সেই অর্থে

বাংলাদেশের মানুষের এই মুহূর্তে জীবন যাত্রার ব্যয় থেকে আরম্ভ করে অর্থনীতির যে বৈদেশিক মুদ্রার চাপ এবং ইত্যাদি বিষয়াদি কিন্তু সেই অর্থে নজর পাচ্ছে না। সেহেতু আমি বাজেটের সময় বলেছিলাম যে বাজেট তো এখন অনাথ এবং আইএমএফ হলো তার পালক পিতা। এখন তো আমার মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের অর্থনীতির পরিত্যক্ত সন্তান। কারণ হলো যে এইটার প্রতি কেউই এখন আর নজর দিচ্ছে না। আপনি লক্ষ্য করে দেখেন বাজেটের পরে প্রথম প্রথম মাসে মূল্য স্মৃতির যে হিসাবে এসেছে সেটাও প্রায় ১০ শতাংশের কাছাকাছি। এবং এবং খাদ্যপণ্য মূল্যও মানুষের আরো বেশি। সেহেতু ইউক্রেন যুদ্ধ দিয়ে তো আপনি দেশে উৎপাদিত শাকসবজি বা আনুষঙ্গিক জিনিসপাতি অথবা চালের দামের উঠানামাকে আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। এটা খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে যারা ইউক্রেন যুদ্ধের উসিলা দিয়ে এগুলা বলতেন এগুলো যে ঠিক না আমরা বলেছি সেটা আরো পরিষ্কারভাবে আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন।

আপনি এখন দেখুন লক্ষ্য করে যে, আগে তো আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে টাকা চুরি হয়ে গেছে, ডলার চুরি হয়ে গেছে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন এর মতো। এখন তো আপনার ৫০/৬০ কিলোগ্রাম সোনা চুরি হয়ে যাচ্ছে কাস্টমসের শুল্ক মজুদ থেকে। মানে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করার ন্যূনতম দায়িত্ব তো আমি রাষ্ট্র পালন করতে পারছি না। আপনি দেখেন যে আগের টাকার মূল্যমান, টাকার মূল্য মাত্র এর আগে যেভাবে ছিল চাপের ভিতরে এখন চাপ যেভাবে বেড়েছে সরকারি দামের সাথে বাজারের দাম সাত-আট টাকার মতো তফাৎ হয়ে গেছে। ১২০ টাকার ডলার হয়ে গেছে ডলার খুঁজে পাচ্ছেন না মানুষ এবং সেখানে আপনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দিয়ে একটা অর্থনৈতিক অযৌক্তিক নীতিকে আপনি কার্যকর করতে চাচ্ছেন।আসলে তো আপনি ডলারকে ১১০ টাকা রাখতে পারবেন না এটা তো আপনার যৌক্তিক না বৈদেশ ভারসাম্য এটাকে রাখবে না। একসময় বানের তোড়ের মতো একদিনে হয়তো ১০-২০ টাকার নিম্নমানে নিতে হবে বা নামাতে হবে। তখন তো একসাথে ধাক্কাটা লাগবে। তখন মূল্যস্ফীতিতে লাগবে একই সাথে আমরা অন্যান্য জায়গায় এটা লাগবে। তখন হয়তো কিছুটা হুন্ডির বদলে আপনার দেশের ভেতরে আসবে। এবং এর সাথে আপনি যদি লক্ষ্য করে দেখেন তেলের দামের ক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়ছে। মানে এটা আপনার ৮০ ডলারের উপরে তো গেছেই ৮৬/৮৮ ডলার পর্যন্ত যেতে পারে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি এবং এটা আগামী বছরের শেষের আগে কোনোভাবে কমবে বলে মনে হয় না মার্কিন অর্থনৈতিক কারণে ইত্যাদি। তো এই পুরা জিনিস নিয়ে আসলে কে চিন্তা করছে? মানে এই মুহূর্তে আপনারা সকলে পত্রপত্রিকায় আপনারা লিখছেন যে একটা অনুপস্থিত নীতি নির্ধারকরা এবং তাদের সাথে সমন্বয় তাদের সাথে প্রতিনিয়ত এটার পরিবিক্ষণ ইত্যাদি তো কিছুই হচ্ছে না। তো এরকম অবস্থায় আসলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা যতখানি না খারাপ তার চেয়ে বেশি হলো আমরা যেভাবে এটাকে মোকাবিলা করছি সেটাকে

আরো বেশি খারাপ করে দিচ্ছে সেহেতু আমি মনে করি না যে এই পরিস্থিতিকে এই কাঠামোগত পরিস্থিতিকে আমরা যৌক্তিকভাবে মনোযোগ দিয়ে করছি। অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে দেশটার প্রতি, অর্থনীতির প্রতি।

সঞ্চালক: আপনি তো দুনিয়ার অর্থনীতি নিয়ে খোঁজ খবর রাখেন। আজকের বাজারে বা এই মুহূর্তে ডলারের যে সংকট এই সংকট মোকাবিলায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা টা কি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি যখন কোন অর্থনীতিতে মজুদ উদ্ধারের জন্য আপনি যদি অর্থনীতির তথ্য বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে স্বচ্ছতা না এনে আপনি নিয়মনীতিকে যদি কার্যকর ভাবে না পারেন, অর্থনীতিতে উর্দি পরা মানুষদের পাঠানো এটার মানে বাজার অবস্থাকে আরও জটিল করে ফেলা। আপনার যা ছিল তাহলে সেটা আবার নিজে চলে যাবে। শুধু এটা তো একেবারেই ঠিক হচ্ছে না মানে এটা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে অর্থনীতি নীতি সংস্কারের জন্য যেই ধরনের সংবেদনশীলতা দরকার সচেতনশীলতা দরকার বা সক্ষমতা থাকা দরকার সেটা কিছুই আমরা দেখাতে পারছি না। এটা হল শেষ চেষ্টা এবং এইটার ফলে বাজার আরো বিকৃত হবে এবং শেষে গিয়ে আমরা বড় ধরনের মূল্য দিব এটার জন্য। আমি তো আপনাকে মোটেই বলতেছি মন খুবই খারাপ এ জন্য যে অর্থনীতির প্রতি আমার শাসকরা প্রশাসকরা সুবিচার করছেন না এবং এটার দায়ভার উনাদের নিতে হবে। এবং এটাতে এই মুহূর্তে মানুষের জীবন যাত্রার উপরে এটার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে। এটা নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি করছে। এটা হওয়ার কোনো কারণ ছিল না।

সঞ্চালক: শ্রীলঙ্কা যদি এই সংকট থেকে উত্তরন ঘটাতে পারে তাহলে আমরা কি করবো? আমি জানিনা আসলে আমি বুঝতে পারছি না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এগুলি প্রশ্ন করে আপনি আমাকে আরো বিব্রত করছেন। দেখেন শ্রীলংকা আপনার ৬০% মতো এক বছর আগে গত সেপ্টেম্বর ওনাদের ছিল মূল্যস্ফীতি এখন এটা নেমে এসেছে ৬–৭% শতাংশে, বাংলাদেশের কম। কেন এসেছে!

এটা শ্রীলংকার থেকে আমাদের অনেক শিক্ষার আছে। আপনার পত্রিকাতে আমি এটা বলেছি একটা সাক্ষাৎকারে সেটা হলো শ্রীলংকার থেকে শিখতে হবে কেন একটা দেশ সংকটে পড়ে। এরকমভাবে বেপরোভাবে বৈদেশিক ঋণ নিলে পরে এটা শোধ করার ক্ষমতা আসে না বিশেষ করে যদি উচ্চ মূল্যায়ন। দুই নম্বর :আমার দেখেছি কিভাবে একটা অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হয় ।বাংলাদেশে অবশ্য উল্টাটা

হচ্ছে রাজনৈতিক সংকট অর্থনৈতিক সংকটকে সৃষ্টি করছে। তিন নম্বর :আমরা দেখেছি এটাকে মোকাবিলা করার জন্য জাতীয় ঐক্যমত্য লাগে একটা। নিষ্ঠার সাথে একটা সংস্কার কর্মসূচিতে আপনার নিজেকে আবদ্ধ করতে হয় এবং সেটা কার্যকর করতে হয়। চতুর্থ :আমরা দেখেছি যদি আপনার মানব সম্পদ থাকে যেটা শ্রীলংকা আমাদের চেয়ে ভালো।তারা বিদেশে মানুষ পাঠিয়ে উপার্জন করতে পারছে খুব দ্রুততার সাথে। আর যদি আপনার প্রতিষ্ঠান থাকে যে প্রতিষ্ঠানের উপর মানুষ বিশ্বাস রাখতে পারে যে প্রতিষ্ঠান নীতি যোগ্যতার সাথ, দক্ষতার সাথে, সক্ষমতার সাথে বাস্তবায়ন করতে পারে সেরকম প্রতিষ্ঠান থাকলে পরে এটা পারে।

শ্রীলংকার সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান যেটা ভালো কাজ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আর আপনি আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিস্থিতি দেখেন। যে সমস্ত ব্যাংকিং খাতে উন্মুক্ত চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি হচ্ছে সেগুলো ধরার মতো তার কোনো সক্ষমতা নাই সেই অর্থে। পত্র-পত্রিকায় বলা হচ্ছে কিভাবে টাকা পাচার হচ্ছে কিন্তু সেখানে আমরা নির্বিকার। যেভাবে তারা মালিকরা ঋণ নিচ্ছে এবং তাদের পরিচালকরা হচ্ছে ইত্যাদি কিছুই করতে পারছে না। আমি তো দেখছি বিভিন্ন জায়গাতে আপনার যারা ব্যাংকের প্রধান ম্যানেজিং ডাইরেক্টর/ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা পদত্যাগ করছেন অসহায়ের মতো অনেক ক্ষেত্রে। তো কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেখেন এই জায়গাটাতে কি ধরনের বড় ভূমিকা করে নিয়ে এসেছে মূল নিঃস্মৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য? তাদের ওখানে যেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, তারা যেভাবে রাজস্ব আয়কে আরাচ্ছে এটাও তো দেখার মতো। তাদের যে সমস্ত জাহাজীকরণ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, তাদের ওখান থেকে মানুষরা যে বিদেশে যাচ্ছে, তাদের কোনো চোরাকারবারের মাধ্যমে দিতে হচ্ছে না, কিভাবে কমবে মানুষ যাচ্ছে এগুলো দেখছি। এগুলো হচ্ছে প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলো যদি শক্তিশালী থাকে তাহলে আপনি মোকাবিলা করবেন। আমি একটা কথা বলি মতি ভাই কিছু মনে করবেন না সেটা হল, একটা সময় তো বাংলাদেশের রাজনীতি পার হবে কিন্তু আগামী ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে যিনি বাংলাদেশের অর্থনীতি চালাবেন তার জন্য আমার পূর্ণ সমবেদনা আছে।

সঞ্চালক: কেন আপনার এই সমবেদনা থাকছে? কি কি সংকট হতে পারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কারণ হলো যে এখন যেটা হচ্ছে অর্থনীতিতে সেটা হলো যে, কোনো মধ্যমেয়াদি চিন্তার ভে তর দিয়ে হচ্ছে না। এ পুরো সময়টা করা হচ্ছে আগামীর চার পাঁচ মাসের ভিতরে নির্বাচনটাকে পার করতে হবে। নির্বাচনটা কে পার করার জন্য সুদের হার বাড়ানো যাবে ন, নির্বাচন টাকে পার করার জন্য টাকার মূল্যমান নেমে নামানো যাবে না, এটার সময় সিন্ডিকেট আঘাত করা যাবে না, এটার সময় ব্যাংকের টাকা তোলা যাবে না, এটার সময় শেয়ার বাজারে যারা তসরুপ করতেছে তাদের বিরুদ্ধে আপনি

করবেন না যারা মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে শেয়ার ছেড়েছে বাজারে। আপনি এগুলো তো কোনো কিছুই করছেন না আপনার আমদানির ক্ষেত্রে টাকা বিদেশ থেকে ফিরছে না সেটাও ধরতে পারছেন না। এবং এখন আপনি টাকা ছাপাচ্ছেন অথবা ব্যাংকের থেকে টাকা ঋণ নিচ্ছেন সেই ঋণ নিয়ে আপনি বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় প্রকল্প করবেন যাতে অর্থনীতিতে টাকা সঞ্চালন হয়। এখন তো এই মুহূর্তে পুরা জিনিসটা হলো চার থেকে পাঁচ মাসের চিন্তা। এর ভিতরে চলতেছে এবং যে দিনটা শেষ হবে সেটা একদিন হবেই সেদিন এটা কি আমরা কিভাবে মোকাবিলা করবো দেশ তো আমাদের আছে দেশ তো থাকবেই দেশ ছেড়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে মোকাবিলা করবো আগামী দিনে এটা তো চিন্তা করতে হবে।

সঞ্চালক: কঠিন প্রশ্ন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মানে আমি আপনার কাছে আজকে সন্ধ্যায় এসেছে এটা বলার জন্য রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ কূটনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সব বন্ধু-বান্ধবকে কোথায় আছে সবই ভালো কিন্তু শেষ বিচারে বাংলাদেশকে মানুষের রুটি রুজুকে রক্ষা করতে হবে শেষ বিচারে তো অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রাখতে হবে। এখানে আমরা মনে করি আমাদের শাসক প্রশাসক সকলে আমরা অন্যায় করছি জনগণের প্রতি।

সঞ্চালক: তাহলে তো একটা প্রশ্ন জাগবে স্বাভাবিকভাবেই যে, আমাদের কাছে আমরা করছি টা কি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না আমরা তো এই মুহূর্তে ব্যস্ত আছি রাজনীতির খেলা নিয়ে, আমরা এই মুহূর্তে রাজনীতির ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করছি কেউ হয়তো ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে এইরকম একটা পরিস্থিতির ভিতরে আপনার সাধারণ মানুষ দর্শকের ভূমিকা রয়েছে তারা কোনদিকে অংশগ্রহণ করছে না। সেই ক্ষেত্রে পরিস্থিতি একটা অচল অবস্থায় আছে সেহেতু রাজনীতির ভিতরে রাজনীতি সমাধান খুঁজে চেষ্টা এখনো চলছে। তো রাজনীতি শুধু রাজনীতির সমাধান দিতে না পারে তখন তো বিষয়টা রাজনীতিবিদের হাতের চেয়ে বড় হয়ে যায়। সেটা আশঙ্কা থেকেই যায় কিন্তু তাতে তো আমার অর্থনৈতিক সমাধান হবে না। আমার তো এখন যে সমস্ত সমস্যাগুলো আছে রাজনীতি তো এই সমস্ত সমস্যাগুলোতে মনোযোগ দিচ্ছে না। এবং এই মনোযোগ দিতে না পারার ফলে সমস্যাগুলো আরো খারাপ হচ্ছে। এবং যে সমস্ত মানুষ দিয়ে এটা করা হচ্ছে তারা সাহস করে সত্য কথা বলে না। তাদের সেই মেধা-যোগ্যতা নাই আনুগত্য আছে কিন্তু মেধা-যোগ্যতা যথেষ্ট নাই।সেটার খেসারত তো দিবে শেষ বিচারে বাংলাদেশের জনগণ, তারাই তো দেশের মালি।

সঞ্চালক: একটা শিরোনাম নিয়ে কথা বলি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ বলুন!

সঞ্চালক: ইত্তেফাকের একটা শিরোনাম আছে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২৫২টা বাড়ি আছে আমলা ও পুলিশদের।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা বাংলাদেশের মানুষের জন্য কোনো চমকৃত করার মতো হেডলাইন নয়। এটা বাংলাদেশের মানুষ ঘরে ঘরে জানে কি বলেন আপনারা উন্মুক্ত গোপনীয়তা বা ওপেন সিক্রেট। কিন্তু কাজ তো কিছু হয় না। আপনি এটা নিয়ে আপনি দেখছেন, এটার ভিতরে আপনার নিজের লোক কজন

বাইরের লোক কজন কাকে ধরলে কাকে কি করব, নির্বাচনের আগে এগুলো করা উচিত হবে কিনা ইত্যাদি বিষয়। কিন্তু বিষয়টা হলো হয়তো এই তালিকা ধরে বিদেশিরা না কোনদিন আপনাকেই নিষেধাকে দিয়ে দেয়। এবং এই মানুষগুলো তো সেই অর্থনীতি নিরাপদ নয় এবং তাদের দেশের ভিতর রয়েছে, চলাফেরার ভিতরে রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় কষ্টটা আপনাকে সন্ধ্যায় বলছি সেটা হল আমরা শুধু নিজের কাজটাকেই নিজেরা করলাম না এটা না। এখন আমাকে অসহায় করে ফেলেছেন বিদেশের কাছে। আপনি বিদেশের মানুষের কাছে আমার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাজনীতি অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ইত্যাদি মানবাধিকার সুশাসন একে এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন তারা আমার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছে। আমি নাগরিক হিসেবে বিচলিত বোধ করি, আমি নাগরিক হিসেবে লজ্জিত বোধ করি, নাগরিক হিসেবে বিব্রতবোধ করি যখন বাইরের লোকেরা আমার দেশ সম্বন্ধে এসব কথা বলে এবং এগুলো কি মোকাবিলা করার জন্য আমার দেশের ভিতরে সুশাসন পুনস্থাপন, আমার গণতন্ত্র ঠিকভাবে জোরদার করা আপনি একই সাথে মানবাধিকার কে সুরক্ষা না দিলে পরে এটা থেকে আজকের বিশেষায়িত বিশ্বে আমি এখান থেকে বেরোতে পারব না। এই জায়গাটাকে আনতে হবে। এখন রাজনীতির খেলা কি এই জায়গায় আমাকে মনোযোগ দিয়ে দিবে নাকি দিবে না!

সঞ্চালক: কিন্তু রাজনীতির যেখানে ঠিক নেই সেখানে আপনি সমাধান পাবেন কোথায়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি তো সেটাই বলছি, এই রাজনীতি তো এই সমাধান এই মুহূর্তে যে অবস্থায় আছে দিচ্ছে না। কিন্তু এটা না দিলে পরে তো হবে না। আচ্ছা ধরেন আমি

আপনাকে বলি, কোনভাবে আপনি এই বছর নির্বাচন সামলালেন পাঁচ বছর পর তো আবার সমস্যা হবে আবার পাঁচ বছর পরে আবার সমস্যা হবে। আপনি আমাকে মতি ভাই বলেন আমি খুবই মন খারাপ আজকে সন্ধ্যায় এই পরিস্থিতির ভিতর এই এলাকা আপনি দেখেন শ্রীলংকার মতো দেশ শ্রীলঙ্কা জাতিগত দাঙ্গার ভেতর নির্বাচন করে, মালদ্বীপের মত দেশ এতকিছুর পরে একটা ছোট দেশ নির্বাচন করা ঠিক মতো।

সঞ্চালক: এমনকি নেপাল ও!

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নেপালের চারটা নির্বাচন করেছে ভারত করে এমনকি পাকিস্তানের মতো দেশ ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারা বলে না যে ফলাফলে। আমরা এমন কি ভিন্ন মানুষ হলাম কি একটা ভিন্ন দেশ হলো যে আমরা নির্বাচন করতে পারি না ঠিকমত পাঁচ বছর পরে পরে হোঁচট খাচ্ছি আর হিচকি তুলছি। এটাতো একটা আমাদের সমাধান লাগবে স্থায়ীভাবে না হলে তো আমরা এভাবে এগোতে পারবো না। যা অর্জন করেছি গত ১০-১৫ বছরই বলেন বা তার আগে এটা আমার রক্ষা করতে পারবো না। গরিব মানুষের পক্ষে এই উন্নয়নকে আমরা কাজে লাগাতে পারব না। এর সমাধান বের করতেই হবে।

সঞ্চালক: ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এর শিরোনামে দেখছিলাম যে, Adani wants $310million power dues.

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি দেখেন এই মুহূর্তে অর্থনীতির সবচেয়ে লাজুক জায়গা হচ্ছে আমাদের বৈদেশিক লেনদেন এবং বৈদেশিক লেনদেনের স্বচ্ছতায় যদি আসে ঐতো আদানির এটা আছে। আমাদের যত বৈদেশিক বিনিয়োগ আছে তারা তাদের মুনাফা নিতে পারছে না। এয়ারলাইন্সগুলো টিকেট কাটা বন্ধ করে দিয়েছে এখানে তারা অন্যভাবে এগুলো ব্যবস্থা করছে কারণ তারা তাদের টাকা নিতে পারে না। এই পরিস্থিতি খুবই কঠিনভাবে রয়েছে এবং এটা যদি স্বচ্ছতা না হয় তাহলে আপনার বিলিয়ন ডলার কি এটার অনেক নিচে যাবে আমাদের এই মুহূর্তে মজুদের। আর দেখেন, যারা এক বছর দু বছর আগেও মজুদকে বাংলাদেশের অর্থনীতির স্বাস্থ্যের লক্ষণ হিসেবে প্রচার করেছে বরঞ্চ আমরা বলেছি এটা নিয়ে এত করো না এটা ওঠানামা করেই। তার আছে কি বলবে? দেখেন এখন কি অবস্থা হয়েছে, আপনি ৩০০০ ডলারের উপরে মাথাপিছু জাতীয় আয় চলে গিয়েছিল এটা ২৮০০ তে চলে আসলো এবার ২৭০০ তে নেমে যাবে। অর্থাৎ জাতীয় আয় গত তিন বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে পতন হবে। কেউ কি এটা নিয়ে কথা বলবে? এখন কেউ বলছে না তোর যে কত বছর জাতীয় আয় তো কমে গেছে আমার আগামী বছর আরো কমে যাবে, তারপরের বছর আরো কমে যাবে। তো এই যে কমে

যাবে এখন, কোথায় আমি এটাকে ৪১ সালে নিয়ে যাব বলেছি আর কোথায় আমি ২০২৩–২৪ এ পতনের দিকে চলে গেলাম। এইটার উত্তর কে দেবে?

সঞ্চালক: এর জন্য আপনি কাকে দায়ী করবেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটাতো সামগ্রিকভাবে আমার যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এটার প্রতি অস্বীকারের মনোভাব। এই যে আপনার এখানে বসে মধ্যরাতে সময় নষ্ট করে সকলের ঘুম ভাঙিয়ে এই যে আমরা আলোচনা করি গণতান্ত্রিক দেশে এগুলা বললে পরে কেউ শুনে। শুনে তারা এটাকে সঠিক পথে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু এখানে তো পুরোটাই এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছেন যে আপনি শত্রু মিত্র বানিয়ে ফেলেছেন। কেউ বিন্দুমাত্রও যদি দেশের ভালোর জন্য কোন কথা বলে তাহলে তাকে আপনি ওই মুহূর্তে লাল তালিকাভুক্ত করে ফেলেন। এটা তো আপনার গণতান্ত্রিক অভাবের থেকে জবাবদিহিতা। সেহেতু আপনি যেই পরিস্থিতিতে এসেছেন এটার মূল কারণ হলো যদি আপনি ফিরে যান তাহলে দেশের ভিতরে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার জায়গাটা নাই। অর্থমন্ত্রী তিন মাস পর পর অর্থনীতি সম্বন্ধে সংসদে বলার কথা এই সংসদ যেই ভাবে গতিতে হয়ে থাকুক না কেন। সেটাও তো বলে না। সেতু কোন স্বচ্ছতা সেই অর্থ তো নাই।এই জবাবদিহির জায়গাটা না ফিরলে বাংলাদেশের মানুষের এই চেষ্টা দেশটাকে আগানোর জন্য এবং আমরা যে এসেছি ৫২ বছর তো অনেক দূর এসেছে সেটাকে রক্ষা করার জায়গাটাকে দুর্বল করে ফেলবেন। এটা আমার কাছে আজকের সন্ধ্যায় একেবারেই সহ্য হচ্ছে না।

সঞ্চালক: অনেক ধন্যবাদ দাদা আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছি। আমি জানেন যে আধুনিক কৃষির রূপকার শাইখ সিরাজের আজ জন্মদিন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শায়েক ভাই তো আমার সুহৃদ মানুষ তাকে আমি প্রায় তিন দশক ধরে জানি এবং বাংলাদেশ আমাদের যে উন্নয়ন সাংবাদিক কথার দিকপাল তিনি এবং একই সাথে বাংলাদেশে জাতীয় কৃষ্টি নীতি নির্ধারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নীতির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, জনমানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার ক্ষেত্রে উনি গণমাধ্যমকে খুবই কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছেন। আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্য হয়েছিল ওনাকে আমার নিজের বাড়িতে এলেঙ্গা তে, টাঙ্গাইলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং আমি উনার নিঃসন্দেহে আরো বহু কর্ণময় জীবন আকাঙ্ক্ষা করি এবং আগামীদিনে উনি যেন বাংলাদেশেকে আরও অনেক কিছু গণমাধ্যমে কার্যকর সৃষ্টিশীল ব্যবহারের মাধ্যমে কোন মানুষের পক্ষে কৃষকের পক্ষে, ক্ষেতমজুরের পক্ষেউদীয়মান কৃষি উদ্যোক্তাদের পক্ষে, যুব সমাজের পক্ষে রাখতে পারেন সেই প্রত্যাশাই করি।

সঞ্চালক: ফরিদ রেজা সাগর তাকে বলছেন যে আধুনিক কৃষকের প্রতিকৃতি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মনে করি যে আধুনিক কৃষি কৃষিক যান্ত্রিকীকরণ, তার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা কে আত্মিকীকরণের বিষয়য়ে উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে সামাজিক সমর্থন তৈরি করা এবং একই সাথে নগর জীবনের সাথে কিভাবে আমরা পরিবেশ সম্মতভাবে কৃষি করতে পারি ছাদ কৃষিসহ। এগুলোর ব্যাপারে শাইখ ভাইয়ের নিঃসন্দেহে বড় ধরনের অবদান রয়েছে এবং আমাদের এই নগর জীবনে আমরা প্রায়শই ভুলে যাই যে বাংলাদেশের ব্যাপকতম জনগণ হলো কৃষির সাথে সম্পৃক্ত এবং কৃষির খাদ্য নিরাপত্তা আমাদের দেশের অর্থনীতির চালিকা বা স্তম্ভের একটা বড় জিনিস। সেই অদৃশ্য নায়েকদের উনি আমাদের কাছে দুষ্মান করেছেন তাদের সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। নিঃসন্দেহে উনি আমাদের অভিনন্দন পাবেন আজকের জন্মদিন।

সঞ্চালক: আপনার এই প্রত্যাশার মধ্য দিয়েই শেষ করতে চাই। অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের এই আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনাকেও ধন্যবাদ।

সঞ্চালক: দর্শকমণ্ডলী আজ এ পর্যন্তই আপনারা সকলে ভালো থাকুন, শুভ রাত্রি।

চ্যানেল আই, আজকের সংবাদপত্র
সঞ্চালনায়: মতিউর রহমান চৌধুরী
৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

কেন বাংলাদেশ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলেও অন্যরা সফল হয়েছে?

ফাহমিদা খাতুন

আমরা কিছু সময়ের জন্য উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে লড়াই করছি এবং নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছি। আমরা দেখেছি ২০২২–২০২৩ অর্থবছর উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে শেষ হয়েছে, জুন মাসে মাসিক গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.০২ শতাংশ। ২০২৩–২০২৪ অর্থবছরে এখনো মুদ্রাস্ফীতির হার কমার কোনো লক্ষণ নেই। বরং আগস্টে সাধারণ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৯২ শতাংশ, যেখানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১২.৫৪ শতাংশ যা বাংলাদেশে গত ১২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই সময়ে বেশ কয়েকটি দেশ (এমনকি উপমহাদেশের দেশগুলো) তাদের মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছে। শ্রীলঙ্কার ঘটনা প্রায় দেড় বছর ধরে তার অর্থনীতিকে একটি ইতিবাচক প্রবণতার দিকে নিয়ে যাওয়ার সাফল্যের জন্য অনেক আলোচিত হয়েছে। দ্বীপ দেশটি তার মুদ্রাস্ফীতির হার ২০২৩ সালের আগস্টে চার শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে, যা ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ৭৩ শতাংশের মতো সর্বোচ্চ ছিল। ভারতও যথাযথ নীতিগত ব্যবস্থা ব্যবহার করে তার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে।

সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকেও ঋণ নিয়েছিল, যার ফলে বাড়তি তারল্য কমে যায়, বেসরকারি খাতের ঋণ নেওয়ার সীমা ঝুঁকিপূর্ণ। ট্যাক্স নেট সম্প্রসারণ এবং কর পরিহার কমিয়ে উচ্চ কর সংগ্রহের দুর্বলতা সরকারকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে বাধ্য করেছে। ট্যাক্স কাঠামোটি পরোক্ষ করের উপর বেশি নির্ভরশীল, যা প্রকৃতিগতভাবে পশ্চাদপসরণকারী এবং উচ্চ আয়ের তুলনায় কম আয়ের ব্যক্তিদের অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে। যদিও অন্যান্য অনেক দেশ মুদ্রানীতির হাতিয়ার গ্রহণ করে মুদ্রাস্ফীতির

চাপ কমাতে সক্ষম হয়েছে, বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা তা করা থেকে দূরে সরে গেছেন। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির চাপের সময়ে মৌলিক অগ্রাধিকার হওয়া উচিত অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা।

সুদের হার বাড়ানোর মাধ্যমে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক লোকেদের ঋণ গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে কারণ এটি অর্থের প্রচলন বাড়াতে পারে। এটি জনগণের ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য সহ একটি সংকোচনমূলক নীতি। অবশ্যই উচ্চ ঋণের হার কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। ঋণের উচ্চ খরচ উৎপাদন খরচ বাড়ায় এবং মুনাফা হ্রাস করে, যা ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে কমিয়ে দিতে পারে। সাধারণ নাগরিক যারা ঋণ নিতে চায় তারাও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে এবং তাদের ঋণ পরিশোধের কিস্তির পরিমাণ বেশি হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে অর্থনীতি নিম্নস্তরে স্থিতিশীল হবে এবং বৃদ্ধি প্রভাবিত হবে। তবে এটি একটি সাময়িক সংগ্রাম। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির সময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নীতিনির্ধারকদের লক্ষ্য হতে পারে না। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ধীরে ধীরে সুদের হার কমাতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে এই তাত্ত্বিক দৃশ্যপট কার্যকর হয়নি।

২০২০ সালের এপ্রিল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ এবং আমানত উভয় হারের উপর ক্যাপ আরোপ করেছে, যা যথাক্রমে নয় শতাংশ এবং ছয় শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছিলো। অর্থনীতিবিদরা সুদের হারের ক্যাপ প্রত্যাহার করে বাজারের হার ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু সবসময়ই শক্তিশালী ব্যবসায়িক লবিং থেকে চাপ ছিলো, যারা উচ্চতর ঋণের হারের তীব্র বিরোধিতা করেছে যুক্তি দিয়েছিলো যে উচ্চ ঋণের হার বেসরকারি বিনিয়োগ হ্রাস করবে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নয় শতাংশ সুদের হারের ক্যাপ থাকলেও বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়েনি। প্রকৃতপক্ষে বহু বছর ধরে বেসরকারি বিনিয়োগ প্রায় ২৩ শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে।

২০২২–২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে, বেসরকারি বিনিয়োগ ২১.৮ শতাংশ অনুমান করা হয়েছিল। এটি এই সত্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে বেসরকারি বিনিয়োগ শুধুমাত্র সুদের হার দ্বারা প্রভাবিত হয় না, এটি ভালো অবকাঠামো, প্রযুক্তি, মানব সম্পদ দক্ষতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতার অনুপস্থিতি, নীতির ধারাবাহিকতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সুশাসনের মতো আরও কয়েকটি কারণের উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রবণতা স্পষ্টভাবে এই তত্ত্বকে সমর্থন করে। সাম্প্রতিক অতীতে ঋণের হার মূল্যস্ফীতির হারের চেয়ে কম ছিলো, যার অর্থ প্রকৃত সুদের হার নেতিবাচক এবং অর্থ সস্তা। কিন্তু সস্তা টাকা বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ায়নি। বরং এটি অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ বাড়িয়েছে। অর্থ সরবরাহের অন্য উৎস হলো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরকারের উচ্চ ঋণ।

২০২২–২৩ অর্থবছরের প্রথম **১১** মাসে সরকারের বাজেট ব্যয়কে সমর্থন করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ৭০,০০০ কোটি টাকা মুদ্রণ করতে হয়েছিল। অর্থনীতিতে সঞ্চালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অর্থ পাঁচগুণ বৃদ্ধি করতে পারে, যার অর্থ মোট অর্থ সরবরাহের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩,৫০,০০০ কোটি টাকা। এটি অনিবার্যভাবে মূল্যস্ফীতিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য তার মুদ্রানীতি বিবৃতিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক একটি মুদ্রা-লক্ষ্যকরণ থেকে সুদের হার-লক্ষ্য নির্ধারণ কাঠামোতে রূপান্তর করার একটি অবস্থান নিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের হারের ক্যাপ প্রত্যাহার করে বাজার-চালিত ঋণের হারে নীতি পরিবর্তন করেছে। কিন্তু রাজস্ব নীতি সম্প্রসারণমূলক হলে মুদ্রানীতি ঠিকভাবে কাজ করবে না। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং স্বল্প আর্থিক জায়গা থাকা সত্ত্বেও কঠোরতা ব্যবস্থার কোনো লক্ষণ নেই। জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারি ব্যয় বাড়তে পারে। তাই মুদ্রানীতির সাফল্য অনিশ্চিত। মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। জরুরি প্রয়োজন হয় না এমন জিনিসগুলোতে ব্যয় করার পরিবর্তে, সরকারের উচিত দরিদ্র এবং নিম্ন আয়ের পরিবারের জন্য সহায়তা বাড়ানো এবং তাদের উপর মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমানোর জন্য সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করা।

ড. ফাহমিদা খাতুন, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের নির্বাহী পরিচালক এবং আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো।

সূত্র: ডেইলি স্টার। অনুবাদ: *মিরাজুল মারুফ*

আমাদের সময়
৪ অক্টোবর, ২০২৩

অর্থনীতি এখন অনিশ্চয়তার ঝুঁকিতে

মোস্তাফিজুর রহমান

দেশের চলমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, ডলার সংকটে আমদানি-রপ্তানি কমে যাওয়া এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব নিয়ে কালের কণ্ঠ'র সঙ্গে কথা বলেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র সম্মাননীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান। সংকট উত্তরণে পরামর্শও দিয়েছেন এই অর্থনীতিবিদ। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মিরাজ শামস

কালের কণ্ঠ: দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: এই সংকট খুব অল্প সময়ে আসেনি। কোভিড-১৯, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের চাপ এবং দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার নেতিবাচক প্রভাব— একে একে সবকিছু যুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে বিপাকে ফেলেছে। সামষ্টিক অর্থনীতি পরিচালনায় বাংলাদেশ এখন বড় ধরনের চাপে আছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পতন এবং ডলারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি, আমদানি, রপ্তানি ও বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

সামষ্টিক অর্থনীতির শক্তি যেটা দেশের ছিল, অনিশ্চয়তা বেড়ে যাওয়ায় তা এখন ঝুঁকিতে রয়েছে।

কালের কণ্ঠ: ডলার সংকটে আমদানিতে কড়াকড়ির ফলে স্থানীয় বাজারে সরবরাহ ও রপ্তানি বিঘ্নিত হয়েছে। এর প্রভাব কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: ডলার সংকটে অনেক দিন ধরে ঋণপত্র খুলতে সমস্যায় পড়ছেন ব্যবসায়ীরা। এতে সরবরাহ ও চাহিদার ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে।

পণ্যের ঘাটতি সমস্যা দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া টাকার অবনমন হয়েছে। এটি একদিকে বাজারে মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিয়েছে, অন্যদিকে রপ্তানি কমে গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের দাম বেঁধে দিলেও বাজারে অনেক বেশি দামে ডলার বিক্রি হচ্ছে।

ডলার বেচাকেনায় অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরি হয়েছে। এটা মূল্যস্ফীতিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে দিচ্ছে। সার্বিকভাবে লেনদেন ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ায় অর্থনীতিতে পৌনঃপুনিক প্রভাব পড়ছে। ঋণপত্র খোলা অনেকটা বন্ধ থাকায় সরবরাহ প্রক্রিয়ায় বাধা আসছে। এমন অর্থনৈতিক দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে দেশ বড় ধরনের অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে পড়বে।

তবে ডলারের সঙ্গে টাকার মূল্যমান অবনমন হওয়ায় রপ্তানিকারকদের সক্ষমতা বেড়েছে। বৈধ পথে রেমিট্যান্স বাড়তে শুরু করেছে। এটা ইতিবাচক।

কালের কণ্ঠ: অর্থনীতিতে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার ক্ষতি কেমন হতে পারে?

মোস্তাফিজুর রহমান: কয়েক বছর ধরে নানা সংকটে থাকা অর্থনীতির অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। এখন অর্থনীতি আগের চেয়ে আরো নাজুক অবস্থার দিকে যাচ্ছে। এমন সময়ে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর নানা বার্তা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাকে আরো ঘনীভূত করছে। এই অনিশ্চিত অবস্থা থেকে স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার তাই কঠিন হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের স্বার্থে সমঝোতাপূর্ণভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

কালের কণ্ঠ: চলমান সংকট উত্তরণে আপনার পরামর্শ কী?

মোস্তাফিজুর রহমান: সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে এখনই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে পদক্ষেপ নিতে হবে। যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে না পড়তে হয়। অর্থনৈতিক ভারসাম্য নিয়েও বাংলাদেশ ব্যাংককে নতুনভাবে কাজ করতে হবে।

অনেক বিষয় আগে থেকে বলা হলেও যেহেতু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, তাই আরো কিছু সময় অর্থনীতি অনিশ্চয়তার মধ্যেই থাকবে। স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগেও নেতিবাচক প্রভাব চলবে। এই পরিস্থিতিতে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে নজর দিতে হবে।

স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা এখন খুব সহজ হবে না। অনেক কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এজন্য ভালো অবস্থায় ফিরতে কিছুটা সময়ও লাগবে। তবু ঋণের সুদহার, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও জোরদার পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ করে বৈদেশিক ঋণ সময়মতো পরিশোধ করতে হবে, যাতে আস্থার ঘাটতি না হয়। সর্বস্তরে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ায় ডলারের দাম বাড়লে যাতে মূল্যস্ফীতিতে চাপ ততটা না পড়ে, এ বিষয়ে নজর দিতে হবে।

তবে অভ্যন্তরীণ আয় বাড়াতে পারলে বর্তমান সংকট মোকাবিলা তুলনামূলক সহজ হবে। অর্থনৈতিক ভারসম্য ফিরিয়ে আনতে করখেলাপি ও ঋণখেলাপিদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়ার আর সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

কালের কণ্ঠ: পরিস্থিতি মোকাবিলায় মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন?

মোস্তাফিজুর রহমান: দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়নে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার একটা সমাধান লাগবে। সবার আগে মূল্যস্ফীতি কমাতে হবে। মধ্যমেয়াদি পরিকল্পায় করখেলাপি ও ঋণখেলাপি কমাতে হবে। পাশাপাশি রপ্তানি সক্ষমতা বাড়াতে হবে। বিশেষ করে ব্যবসা পরিচালন ব্যয় কমিয়ে আনতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার বাজারের ওপর ছাড়লে রেমিট্যান্স আরো বাড়বে। তবে বাজারে চাপ থাকবে। এটা মোকাবিলা করার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি আরো বাড়াতে হবে। তাহলে মধ্য মেয়াদে অনেকটা ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হবে।

কালের কণ্ঠ: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মোস্তাফিজুর রহমান: কালের কণ্ঠকেও ধন্যবাদ।

কালেরকণ্ঠ
২৬ নভেম্বর, ২০২৩

খেলাপিদের বিরুদ্ধে শূন্যসহিষ্ণুতা প্রয়োগের এখনি সময়

মোস্তাফিজুর রহমান

ঋণখেলাপি-করখেলাপি ও দেশ থেকে টাকা পাচারকারীদের আইনের প্রাতিষ্ঠানিক আওতায় নিয়ে একটা সিগন্যাল দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বেসরকারি খাতের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, অর্থনীতি যখন চাপের মধ্যে তখন এসব খেলাপিদের বিরুদ্ধে শূন্যসহিষ্ণুতা প্রয়োগের এখনই সময়।

বার্তা২৪.কম-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেছেন তিনি। কথা বলেছেন পরিকল্পনা সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম।

বার্তা২৪.কম: সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি কোন দিকে যাচ্ছে?

অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান: অবশ্যই সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা একটা ঝুঁকির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একটা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থসামাজিক সূচক আছে, সেসবের মধ্যে তার একটা প্রতিফলন আমরা দেখছি। সেটা আমাদের মূল্যস্ফীতি, রিজার্ভের সিচুয়েশনস, টাকার মূল্যমানের প্রবণতা, বিদেশি বিনিয়োগ, ঋণ প্রবাহ কিংবা রিজার্ভের কারণে আমদানি ও রফতানির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা; সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিচালনার ক্ষেত্রে অক্টোবরে তো নেগেটিভ হয়ে গেছে, নভেম্বরেও সুবিধার না। সব ধরনের সূচকই একটা চাপের মধ্যে আছে। সুতরাং সেদিক থেকে অবশ্যই এসবের অভিঘাত পড়ছে জীবনযাত্রার মান, কর্মসংস্থান, প্রবৃদ্ধি-এগুলোর উপরে তার

একটা নেতিবাচক প্রভাব তো পড়ছেই। সুতরাং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা একটা ঝুঁকির মধ্যে আছে।

বার্তা২৪.কম: বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আর্থিক খাতের অংশীজন ও সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগকে আপনি কিভাবে দেখেন-

অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান: কিছু কিছু পদক্ষেপ তারা নিচ্ছে। প্রথম কথা হলো সংকটের কারণটাকে যদি কেবলমাত্র কোভিড পরবর্তী উত্তরণ এবং ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বলা হয় যে এটি বাহির থেকে আসছে আমার মনে হয়; তাহলে সম্পূর্ণ গল্পটা বলা হবে না। আমাদের নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে এই বাইরের ফ্যাক্টরগুলো আরও জেঁকে বসেছে। আমরা অনেকদিন ধরে বলছি, আমাদের টাকা অতিমূল্যায়িত আছে, এটাকে গ্রাজুয়্যালি অবমূল্যায়িত করেন; তখন বলা হলো- মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়বে। আমরা বললাম যে আমাদের রেমিটেন্স এবং রফতানি সক্ষমতা বাড়বে, প্রতিযোগিতার সক্ষমতা এবং তার ফলে এটা অর্থনীতির জন্য ভালো হবে। আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতিকে আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনা, শুল্ক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি দিয়ে সামাল দিতে হবে। কিন্তু ইতোমধ্যে আমরা অনেক বিলম্ব করেছি, ডলারের দাম ৮৬ টাকা অনেক দিন ধরে রেখেছি, এরপর এক লাফে এখানে ১১০-১১১ টাকা হয়েছে, যখন নাকি আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেড়েছে। মূল্যস্ফীতি শেষ পর্যন্ত বাড়লই। এসব বিষয়গুলো যেমন আছে-তেমনি দেশ থেকে অনেক টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে; আমরা বলছি অনেকদিন ধরে, বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা দিয়ে এগুলো মোকাবিলা করুন। বাজারের মধ্যে একধরণের একচেটিয়াকরণ হচ্ছে— এগুলোকে মোকাবিলা করুন। বাজার ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, সাশ্রয়ীভাবে সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন— এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন ধরণের দুর্বলতার কারণে আমরা ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছি। ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছি, অনিশ্চয়তায় পড়ে গেছি। যেহেতু আমাদের সমস্যাটা ভেতরে, সেহেতু সমাধানটাও ভেতরেই খুঁজতে হবে-সেটাই হলো এখন মূল উদ্দেশ্য। এখন বাইরে জ্বালনি আর চিনি ছাড়া সবকিছুর দাম কমেছে। অভ্যন্তরীণ বাজারে তো বাড়ছেই। ইনফ্লেশন কমার তো কোনো লক্ষণ নেই। আর এখন ইনফ্লেশন যদি কিছু কমেও সেটি উপরের স্তরে; ১০০ টাকারটা ১০ শতাংশ বেড়ে ১১০ হয়েছে, তারপরে ইনফ্লয়েশন ১০ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশ কমলো তার মানে ১১০ টাকারটা ১৮ হলো, তাতে তো আমার কোনো স্বস্তি নেই, ভিত্তি অলরেডি উপরে উঠে গেছে। সুতরাং এইখানে আমাদের এখন চেষ্টা করতে হবে যাতে ব্যালেন্স অব পেমেন্টটা আরেকটু বেটার করা যায়। রেমিট্যান্স ইনফরমাল চ্যানেলে চলে গেছে। একে ফরমাল চ্যানেলে আনতে হবে। ঋণ খেলাপি, কর

খেলাপি, দেশ থেকে টাকা পাচারকারী— এদের সবাইকে আইনের প্রাতিষ্ঠানিক আওতায় নিয়ে একটা সিগন্যাল দেওয়ার সময় আসছে। শূন্য সহিষ্ণুতার কথা আমরা বলি, এই শূন্য সহিষ্ণুতা প্রয়োগের এখনই সময়, অর্থনীতি যখন একটা চাপের মধ্যে আছে। সবদিক থেকে আমার মনে হয়, অর্থনৈতিক চাপের উৎকর্ষতা, সুশাসন, শূন্য সহিষ্ণুতা, ঋণখেলাপি, করখেলাপি, হুন্ডি চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে, যাতে করে অনিশ্চয়তা কাটিয়ে বিনিয়োগ তার আগের জায়গায় আসে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আমাদের বিনিয়োগকারীরাও যাতে উৎসাহ পায়। একটা পেইনপুল প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আরেকটা ভারসাম্যে আসতে হলে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাদের সংস্কার করা দরকার, বাংলাদেশব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইউনিটগুলোর মাধ্যমে বিদ্যমান যেসব আইন আছে তা প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। বিশেষ করে ভোক্তা অধিদপ্তর, কমপিটিশন অধিদপ্তর স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলে পেইনপুল প্রসেসের মধ্য দিয়ে আমরা আরেকটা ভারসাম্যে পৌঁছে যাবো।

বার্তা২৪.কম: স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সক্ষমতার জায়গাটি কতটা দেখাতে পারছেন?

অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান: বাংলাদেশ ব্যাংক বেশকিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে রাইট ডাইরেকশনে-তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আমরা দেখেছি ধারাবাহিকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপরে বিভিন্নভাবে (তাদের) স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে, তাদের দিয়ে বিভিন্ন কাজ করানো হয়েছে। নতুন আইন পাস হলো পার্লামেন্টের শেষ মুহূর্তে, তাতে দেখলাম পরিচালক পদে নয় বছরের জায়গায় ১২ বছর থাকার সুযোগ রাখা হয়েছে। সেন্ট্রাল ব্যাংককে তো স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। মুদ্রানীতি, মূল্যস্ফীতি নীতির জন্য যেটা করার দরকার, বিশেষ করে ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে— এসবের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। কিছু দরকারি পদক্ষেপ তারা নিচ্ছেন কিন্তু সেটা আরও শক্তিশালী করতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও বুঝতে হবে যে স্বাধীনভাবে যেসব সংস্থাকে কাজ করতে দিলে সেখানে তার জন্য ভালো হবে। তাদের নিজেদের স্বার্থে এটা করা উচিত। কারণ যদি ন্যায্যতার ভিত্তিতে আমরা যদি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন করতে চাই তাহলে বিভিন্ন সংস্থাগুলোকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে দিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলো ভালো কিন্তু আমার মনে হয় আরও একটু দ্রুততার সঙ্গে নিতে হবে। এক্সচেঞ্জ রেট-ইন্টারেস্ট রেটকে দ্রুততার সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে।

বার্তা২৪.কম: আমরা জ্ঞান ও তথ্যভিত্তিক সমাজের কথা বলি সেখানে অর্থনীতির সংকট নিয়ে যেসব গণমুখি গবেষণা হয়, সেসব গবেষণাকে সরকার বা সংশ্লিষ্টরা কতখানি অগ্রাধিকার দেন—

অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান: আমার মনে হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতি ৪৬০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এটা পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটিতে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হয়ে গেছে— ক্রয় ক্ষমতার নিরিখে; এরকম একটা অর্থনীতি চালাতে গেলে অবশ্যই একটা জ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে আমার মনে হয় না সেটার অনুধাবনটা আছে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জ্ঞানভিত্তিক কথাবার্তা বললে আবার অনেকের পছন্দ হয় না। যারা এগুলো নিয়ে চর্চা করেন, যাদের বুদ্ধিমত্তা-মেধা আছে সেটা দিয়ে তারা পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু দেখা যায় এসব পরামর্শকে অনেক সময় নেতিবাচকভাবে নেওয়া হয়। আমার মনে হয় এটা ভালো কোনো লক্ষণ না। সমাজের যত জ্ঞানভিত্তিক আলাপ-আলোচনা হবে, শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিরাই সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করবেন; সেটা তো তাদের ম্যান্ডেট, কিন্তু গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনার স্পেস থাকতে হবে। তখন সেখান থেকে তারা বেছে নিতে পারবেন, কোনটা তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো। ক্‌রণ রাজনৈতিক বিচার বিবেচনা করেই তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সেটা কি আমরা বুঝি না? কিন্তু গঠনমূল সমালোচনার প্রতিও শ্রদ্ধা থাকা উচিত বলে আমার মনে হয়।

বার্তা২৪
৯ ডিসেম্বর, ২০২৩

অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলাই বড় চ্যালেঞ্জ

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বর্তমানে অর্থনীতিতে নানামুখী চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে করোনা-পরবর্তী সময়ে নতুন করে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব ২০২২–২৩ অর্থবছর এবং এই অব্যাহত পরিস্থিতি ২০২৩–২৪ অর্থবছরের শেষ ছয় মাসেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সামষ্টিক অর্থনীতি একধরনের চাপের মধ্যে রয়েছে। জুলাই-নভেম্বর সময়ে অর্থনীতিতে একধরনের শ্লথ গতির প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে- যা উৎপাদন, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও আমদানির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে উচ্চমূল্য, দুর্বল বিনিময় হার, ডলারের বিপরীতে টাকার অব্যাহত মূল্যহ্রাস, এমনকি সুদের হারের ক্ষেত্রেও এ পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও এর একটি প্রভাব পড়ছে। ফলে সরকারের বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত ১১ বছরে এডিপি বাস্তবায়ন সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এ ঘাটতি পূরণে সরকারি উৎসগুলো থেকে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও একধরনের ধীরগতি দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে বৈদেশিক ঋণ এবং দেশীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। ঘাটতি অর্থায়নের জন্য সরকার যে ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ গ্রহণ করে সেখানেও একধরনের নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অর্থনীতির সব পরিস্থিতিতেই নানা ধরনের দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে।

দেশে বৈদেশিক ঋণের যে ঘাটতি সেটিও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যে পরিমাণ রিজার্ভ ছিল তাও কমে গেছে। অন্যদিকে রিজার্ভের পরিমাণ তুলনামূলক বৃদ্ধি না হওয়ায় আগের ৪৮ বিলিয়ন ডলার কমে এখন ২৪ বিলিয়নে পৌঁছেছে। ব্যবহারযোগ্য ডলারের পরিমাণ মাত্র

১৯ বিলিয়ন। ফলে অর্থনীতির সব ক্ষেত্রেই একধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এর বিপরীতে যেমন টাকা অবমূল্যায়িত হয়েছে, অন্যদিকে টাকার বিপরীতে আমদানিতে ঘাটতির কারণে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমদানিনির্ভর কাঁচা পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মূল্যস্ফীতিতে এর এক প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ ধরনের শ্লথ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচনী সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা দেখা যায়। আবার নির্বাচন সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প দ্রুত শেষ করা, মুদ্রাস্ফীতিজনিত মুদ্রা সরবরাহ, কোনো কোনো সরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূল্যস্ফীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, বাজার ব্যবস্থাপনা ও তদারকিতে দুর্বলতা, বেসরকারি খাতে অব্যাহতভাবে অতি নির্ভরশীলতা এবং দেশের ভেতরে যারা বড় ব্যবসায়ী তাদের বাজার ব্যবস্থাপনার ওপর প্রভাব বিস্তার। পণ্য সরবরাহে তাদের এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাও মূল্যস্ফীতির বড় কারণ। অব্যাহত মূল্যস্ফীতিতে প্রকৃত আয় যেমন কমেছে, একই সঙ্গে তার খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেক ছাড় দিতে হয়েছে। বিশেষত, সীমিত অথবা নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যে সঞ্চয় সাধারণত নিম্ন আয়ের মানুষ দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য রাখে, সেটা তাকে ভাঙতে হচ্ছে। ফলে ব্যাংকে যে পরিমাণ সঞ্চয় থাকে সেগুলো ক্রমাগত কমছে। নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা সব সময়ই আমরা দেখে এসেছি। এ বছরও আমরা সেই অস্থিরতা দেখছি। মোটামুটিভাবে আমরা সব সময় দেখে এসেছি ব্যবসায়ীরা এই সময়কে উপলক্ষ করে বিনিয়োগ কমিয়ে দেন। দেশের বাইরে থেকে যারা পণ্য আমদানি করেন, তারাও এ সময়ে পণ্য আমদানিতে সাবধান থাকেন। নির্বাচন-পরবর্তীকালীন এ ধরনের অস্থিরতা কেটে যাবে, তা মনে হয় না। অন্যান্য সময় অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা কেটে গেলেও এবার তা প্রলম্বিত হতে পারে।

বিভিন্ন সহযোগী দেশ যাদের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক জড়িত, তাদের সঙ্গে নির্বাচনকেন্দ্রিক অবস্থানের কারণে যদি সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, সেটি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ভালো হবে না। এসব বিষয়ে বিশ্লেষণ করলে আমাদের সামনের সময়গুলো অর্থনীতির জন্য খুব একটা মসৃণ হবে না। আগামীর সময়গুলো আমাদের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে পার করতে হবে। ছয় মাস পর্যন্ত অর্থনীতিতে যথেষ্ট ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে। সংকট মোকাবিলার জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ক্ষেত্রে বৈদেশিক লেনদেনে এখন যে চাপ রয়েছে, তা কতটা কমিয়ে আনা যায় সেটা ভাবতে হবে। সে ক্ষেত্রে আমদানি নিয়ন্ত্রণেরও প্রয়োজন পড়বে। বিদেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ডলার নিয়ে যাওয়ার যে সুযোগ রয়েছে তাতে সরকারি নজরদারি রাখা দরকার। যেহেতু দেশে রিজার্ভ সংকট রয়েছে, অন্যদিকে টাকা বাইরে নিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, সেক্ষেত্রে এটিকে

কমিয়ে আনা দরকার। রেমিট্যান্সকে উৎসাহিত করার জন্য বাজারভিত্তিক রেমিট্যান্স মূল্য থাকা দরকার।

বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে যে শর্তাবলি রয়েছে সেগুলো যদি সহজ করা যায়, সময় যদি বাড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলে কিছুটা হলেও স্বস্তিদায়ক হবে বলে মনে হয়।

এক কোটি কার্ডের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষকে খাদ্য বিতরণের যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। এরা যেন রাজনৈতিক মহলের প্রভাব বিস্তারের বলিদান না হয়, সেদিকটাও আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। বিভাগীয় পর্যায় থেকে শুরু করে মাঠপর্যায়ে ব্যাপারটি খেয়াল রাখা প্রয়োজন। একই সঙ্গে বাজার ব্যবস্থাপনায় সুশাসন জরুরি।

অর্থনীতির এই চ্যালেঞ্জগুলো দূর করা সম্ভব না হলে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা হবে। বিদেশি অনুদান অথবা বিদেশি ঋণের ওপর ভিত্তি না করে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা দরকার। যারা কর এড়িয়ে যাচ্ছেন তাদের কীভাবে করের আওতায় আনা যায়, কীভাবে ডিজিটালাইজড সিস্টেম করে সবাইকে অনলাইনভিত্তিক সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসা যায়, সেই আধুনিকায়ন ব্যবস্থার দিকে জোর দিতে হবে। আগামী সময়গুলোয় দ্রুত অর্থনীতিকে স্বস্তিদায়ক অবস্থায় নিয়ে আসা কঠিন হবে। চেষ্টা থাকতে হবে এটি যেন দীর্ঘায়িত না হয়। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে নিয়মিত মনিটরিং ও সঠিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই ধীরে ধীরে স্থির অবস্থানে ফিরে আসবে।

খবরের কাগজ
১১ ডিসেম্বর, ২০২৩

অর্থনীতির সমাধান সংস্কারে

মোস্তাফিজুর রহমান

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আইএমএফের ঋণ কতটা স্বস্তি দেবে। সংস্কার কতটা বাস্তবায়ন হবে। সংকট মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে কথা বলেছেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মিরাজ শামস

কালের কণ্ঠ: আইএমএফের ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়ায় বাস্তবে বাংলাদেশ কিভাবে লাভবান হবে?

মোস্তাফিজুর রহমান: প্রতি মাসে গড়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় হচ্ছে।

সেখানে আইএমএফের দ্বিতীয় কিস্তির ৬৯০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সরাসরি তেমন ভূমিকা রাখতে পারবে না, এটা ঠিক। আইএমএফের ঋণ মাত্র দুই মাসের জন্য সহায়ক হতে পারে। তবে এই ঋণের লাভকে ভিন্নভাবে দেখতে হবে।

দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ পাওয়ার ফলে এটা প্রমাণ হয়েছে যে আইএমএফের ঋণের শর্তে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভালো করেছে।

যদিও রাজস্ব ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। ব্যাংক আইনসহ অন্যান্য আইনের সংস্কারসহ বেশকিছু শর্ত বাংলাদেশ পালন করে চলছে। কৃচ্ছ্রসাধন ও রাজস্ব বাড়াতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডেরও উদ্যোগ আছে।

এসব পদক্ষেপের কারণে আইএমএফ মনে করে বাংলাদেশ সঠিক পথে আছে।

এই ঋণ পাওয়া মানে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা ইতিবাচক সংকেত পাওয়া। এটি অন্যান্য সংস্থার ঋণ পেতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। বিভিন্ন সংস্থা থেকে যে বাজেট সহায়তা আশা করা হচ্ছে, তাও চলে আসবে। এদিক থেকে লাভবান হচ্ছে বাংলাদেশ।

কালের কণ্ঠ: শর্ত অনুযায়ী সংস্কারের উদ্যোগ ও প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন বর্তমান প্রেক্ষাপটে কতটা সম্ভব?

মোস্তাফিজুর রহমান: বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইএমএফের শর্ত বাস্তবায়ন হবে, এমনটি জোর দিয়ে বলা যায় না।

রাজস্ব বোর্ড ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংস্কারে এর আগেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে অনুঘটক যোগ হয়েছে। এবার শর্ত বাস্তবায়ন না করলে নেতিবাচক সংকেত যাবে।

এই শর্ত বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সমর্থন ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর ভূমিকা লাগবে। সেটি কতটা সম্ভব হবে তা সময় বলে দেবে।

অতীত দেখলে মনে হয়, সঠিক কর্মসূচি গ্রহণে শৈথিল্য ও বাস্তবায়নে ধীরগতি ছিল। সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা আছে। ব্যাংক কম্পানি আইন সংস্কারে পরিচালকরা টানা ১২ বছর থাকতে পারবে— এমন একটি বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কর ও ঋণখেলাপির সঙ্গে রাজনৈতিক শক্তি জড়িত থাকায় সেটা কতটা বাস্তবায়ন হবে, এ বিষয়ে শঙ্কা আছে। এক্ষেত্রে অনেক শক্তিশালী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শূন্য শৈথিল্য দেখাতে হবে এবং নজরদারি বাড়াতে হবে।

অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, পদক্ষেপ নেওয়া হলেও পরিপূর্ণভাবে কার্যকর হয়নি। শর্ত পালন করতে কর ও ঋণখেলাপি কমাতে পারে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও শূন্য সহিষ্ণুতা। এ ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় হার ও সুদহার বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। তবে যেভাবে হওয়ার কথা তার কতটুকু হবে, বলা যাচ্ছে না। যদিও আইএমএফ বলছে, শক্তিশালীভাবে শর্ত বাস্তবায়ন করতে হবে।

কালের কণ্ঠ: রাজস্ব ও ব্যাংক খাত সংস্কার নিয়ে আপনার পরামর্শ কী?

মোস্তাফিজুর রহমান: আইএমএফের সংস্কার কর্মসূচির মধ্যে রাজস্ব ও ব্যাংক খাতে সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে কর ও ঋণখেলাপি কমিয়ে আনার কথা বলছে আইএমএফ। আমরাও একই কথা বলে আসছি। তবে সংস্কার করতে গিয়ে কিছু ভর্তুকি ও সামাজিক সুরক্ষাগুলো যাতে বাধাগ্রস্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সামস্টিক অথনীতি উন্নত করার কথা বলছে আইএমএফ। আমরা মনে করি, এটি সঠিক পরামর্শ। বিশেষ করে কর জিডিপি অনুপাত বাড়াতে হবে। এটা বাড়ানো সম্ভব না হলে ঘাটতি বাজেট বাড়িয়ে দিয়ে বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। এতে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ঋণ বড়বে।

আইএমএফ বলছে, নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এটি আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য করা উচিত। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ আর্থিক খাতে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো এবং আইন প্রণেতারা সংস্কারের পথে হাঁটছে। তার পরও ভালোভাবে বাস্তবায়ন নিয়ে শঙ্কা আছে। আমি বলব, এ ক্ষেত্রে বড় বাধা এলেও এগিয়ে যাওয়া উচিত।

কালের কণ্ঠ: শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবস্থান এবং রিজার্ভ সংরক্ষণের শর্ত পূরণ কিভাবে সম্ভব হবে?

মোস্তাফিজুর রহমান: করখেলাপির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান ও তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে শিথিল হলে চলবে না। এখন পর্যন্ত রাজস্বের ক্ষেত্রে আইএমএফের টার্গেট পূরণ হয়নি। রিজার্ভ ঠিক রাখতে হলে দেশের অর্থ যেন পাচার না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। রপ্তানি ও রেমিট্যান্স সঠিকভাবে আনতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজারের সঙ্গে সমন্বয়ের সময় হয়েছে। এই পদক্ষেপ ইতিবাচকভাবে নিতে হবে। তবে আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী, নির্বাচনের পর সংস্কার বড় আকারে দেখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে শক্তিশালী রাজনৈতিক অঙ্গীকার গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখন অর্থনীতি বড় ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তায় আছে।

কালের কণ্ঠ: আইএমএফের ফর্মুলাভিত্তিক জ্বালানির দর সমন্বয় হলে এর প্রভাব মোকাবিলায় কী করণীয়?

মোস্তাফিজুর রহমান: জ্বালানির দাম বাজারভিত্তিক হলে ভালো হবে। কারণ এত দিন নিয়ন্ত্রণে রেখেও তেমন সুবিধা পাওয়া যায়নি। যখন জ্বালানির দাম কম ছিল তখন মুনাফা করেছে। আবার যখন দাম বাড়ছে তখন তা সমপরিমাণ হয়নি। আইএমএফের ফর্মুলা

অনুযায়ী, বাজারমূল্যের সমন্বয় করাই ভালো। তবে এ ক্ষেত্রে শুল্ক কত রাখা হবে, সেটা বিবেচনা করে করতে হবে। যখন দাম বাড়বে তখন শুল্ক ছাড় দেওয়ার প্রয়োজন হবে। এ ক্ষেত্রেও ঝুঁকি আছে। আন্তর্জাতিক বাজারে দাম ওঠানামার সময় সমন্বয় করে মানুষকে সহনীয় মূল্যে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

তবে কৃষি ও সামাজিক সুরক্ষায় ভর্তুকিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আইএমএফ এখন ঢালাওভাবে ভর্তুকি রহিতকরণ ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে কাটছাঁট থেকে সরে এসেছে। তারাও সামাজিক সুরক্ষা অব্যাহত রাখার কথা বলছে। তবে ভর্তুকি দেওয়ার ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনমতো দেওয়ার লক্ষ্য ঠিক করতে হবে; যাতে নির্দিষ্টভাবে যৌক্তিক মানুষ পায়।

কালের কণ্ঠ: চলমান অর্থনৈতিক ও ডলার সংকট মোকাবিলায় আপনার পরামর্শ কী?

মোস্তাফিজুর রহমান: বর্তমানে বড় সমস্যা আর্থিক হিসাবের। বিভিন্ন ধরনের ঋণের অর্থ পরিশোধ করার চাপ আছে। কাঠামোগত সমস্যা থাকায় বিনিয়োগ বাড়ছে না। এ কারণে রিজার্ভ বাড়ানো যাচ্ছে না। যদিও চলতি হিসাবের উন্নতি হয়েছে। আমদানি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে অর্থনীতির দিক থেকে সার্বিকভাবে দেখলে উৎপাদন কমেছে, নতুন বিনিয়োগ হচ্ছে না। এতে কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমদানি বাড়াতে হবে। রপ্তানি ও বিনিয়োগ বাড়াতে নজর দিলে কর্মসংস্থান বাড়বে। তা ছাড়া পাইপলাইনে থাকা ৪০ বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা দ্রুত ছাড় করার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

কালের কণ্ঠ: আপনাকে ধন্যবাদ।

মোস্তাফিজুর রহমান: কালের কণ্ঠকেও ধন্যবাদ।

কালের কণ্ঠ
১৭ ডিসেম্বর,২০২৩

এক দশকের দুর্বলতম ও সমস্যাসংকুল বছর ২০২৩

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রশ্ন: ২০২৩ আমাদের অর্থনীতির জন্য কেমন ছিল এবং অর্থনীতির চ্যালেঞ্জের জায়গাগুলো কী ছিল?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সাম্প্রতিক অর্থনীতির ইতিহাসে বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্বল বছর হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে ২০২৩ বর্ষপঞ্জিটি। আগামী দিনের বিশ্লেষকরা হয়তো এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল বা সমস্যাসংকুল বছর হিসেবে বিবেচনা করবেন। এর একটি বড় কারণ হতে পারে কভিড-উত্তরকালে যে পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়া ছিল তা এ বছর এসে শ্লথ হয়ে এসেছে। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি খাতে প্রবৃদ্ধি হলেও সার্বিক প্রবৃদ্ধি হার আশাব্যঞ্জক ছিল না। প্রবৃদ্ধির ধারা ক্রমান্বয়ে শ্লথ হয়েছে। ২০২৪ সালের জুনে চলতি অর্থবছর শেষ হলে হয়তো অবক্ষয়ের চিত্রটি পুরোপুরিভাবে ফুটে উঠবে আমাদের সামনে। কভিডের দুই বছর বাদ দিলে প্রবৃদ্ধির হার হয়তো সর্বনিম্ন স্তরে চলে যাবে। এক্ষেত্রে বড় কারণ হিসেবে বলা যায় যে এ সময়ে ব্যক্তি খাত তো বটেই, সরকারি খাতেও বিনিয়োগের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। এতে অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। যদিও এ সময়ে বিদেশে কাজের সন্ধানে গেছে দ্বিগুণের অধিক অনাবাসিক শ্রমিক। যদিও সে তুলনায় আমাদের রেমিট্যান্সপ্রাপ্তি নগণ্য। অর্থনীতি যে সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা চিহ্নিত করতে গেলে প্রথমে বলতে হবে, প্রবৃদ্ধির হার শ্লথ হয়ে যাওয়া, ব্যক্তিগত ও সরকারি খাতে বিনিয়োগ কমে যাওয়া, বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ বাজারে। এতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ঢিলেঢালা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ পেছনে ফিরে দেখতে হলে আমরা যা দেখব, আমাদের আর্থিক খাত অনেক দুর্বল,

কর আহরণের ক্ষমতা বিশ্বের সর্বনিম্নদের মধ্যে। এতে সরকারের খরচ করার ক্ষমতা অনেক সীমিত হয়ে গেছে।

সরকারের খরচ বাড়িয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা, অর্থাৎ সম্প্রসারণশীল অর্থনীতি করার জন্য যে সক্ষমতাটা দরকার তা এ মুহূর্তে সরকারের নেই। ফলে সরকারি বিনিয়োগ কমার কারণ হিসেবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার সর্বনিম্নে পৌঁছেছে। এর পেছনের কারণ হলো সরকারের হাতে পর্যাপ্ত টাকা নেই। এর উল্টো পাশের কথা যদি বলি, এতদিন ধরে আমরা আমাদের আর্থিক খাতের দুর্বলতার কথা জানতাম, বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ৪, ৫ বা ৬ শতাংশের মধ্যে আটকে রাখতে পেরেছিলাম। এতদিন কম খরচ করে কম আদায় ও কম আদায় করে কম খরচের মাধ্যমে চলছিলাম। কিন্তু এখন যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে যা আগে ছিল না তা হলো গত বছর বা এর কিছু আগ মুহূর্ত থেকে শুরু করে বৈদেশিক খাতের লেনদেনেও অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ যে হারে রফতানি বেড়েছে তার চেয়ে বেশি হারে আমদানি বেড়েছে। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আমদানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে জ্বালানি, খাদ্য, সার ইত্যাদি। এছাড়া নানা পুঁজিপণ্য, গার্মেন্টসের নানা কাঁচামাল। আমাদের এসব আমদানি পণ্যের আর্থিক মূল্য রফতানি মূল্যের চেয়েও বেড়ে গেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে যা হয়েছে, এতদিন যে বড় বড় ঋণ নিয়েছি তা পরিশোধের সময় হয়েছে। অথবা এগুলো ছিল স্বল্পমেয়াদি বা বাণিজ্যিক কিংবা ব্যয়বহুল ঋণ। যেমন কর্ণফুলী টানেল উদ্বোধন হওয়ার আগেই ঋণ পরিশোধের সময় শুরু হয়ে গেছে। আগামী বছর রূপপুর প্রজেক্টের ঋণ পরিশোধে নামতে হলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। অর্থাৎ কেবল বাণিজ্যিক লেনদেনে ঘাটতি বেড়েছে তা না, বরং আর্থিক খাত থেকে অধিক অর্থ এনে ঋণ শোধ করতে হচ্ছে। এতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ কমেছে। ২০২৩ সাল বৈদেশিক মুদ্রার মজুদহানির বছর হিসেবেও চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পতনের ফলে কী হয়েছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: রিজার্ভ পতন একটা উদ্বেগের জায়গা হিসেবে ছিল এবং এর প্রভাব পড়েছে অন্যান্য জায়গায়। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ কমে যাওয়ায় আমরা এলসি বা ঋণপত্র নিয়ন্ত্রণ করেছি। এলসি নিয়ন্ত্রণের মানে হলো ব্যাংক পর্যাপ্ত মুদ্রা সরবরাহ করতে পারেনি। আর ব্যাংক পর্যাপ্ত মুদ্রা সরবরাহ করতে না পারার কারণে প্রকল্পে বিনিয়োগ হয়নি। যেহেতু বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের ওপর চাপ সৃষ্টি হওয়ায় আমাদের স্থানীয় মুদ্রা অর্থাৎ টাকার ওপরেও চাপ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এ সময়ে টাকার মূল্যমানের অবনমন ঘটেছে ২৫-৩০ শতাংশ। এ বৈদেশিক লেনদেনের জায়গায় যে ভারসাম্যহীন অবস্থা গেল যা বিনিয়োগের জায়গায় মুদ্রার ওপর যেমন চাপের সৃষ্টি করল, তেমনি পণ্যমূল্য বাড়ার কারণে মূল্যস্ফীতি আরো বেড়েছে। এ বছরের মূল্যস্ফীতির প্রবণতা লক্ষ করে দেখব এটি

যে কেবল শহরে বেড়েছে এমন নয়, গ্রামেও বেড়েছে। গ্রামের খাদ্য মূল্যস্ফীতি বরং আরো ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। এ পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য সরকার আগে বড় ধরনের প্রকল্প ঋণ করেছে এবং এবার বাজেট সমর্থনের জন্য বড় ঋণ করেছে। ফলে আমাদের দায়দেনা পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে।

গত পাঁচ বছরে আমাদের মাথাপিছু পরিশোধযোগ্য দায়দেনা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ৩০০ বা ৩৫০ ডলার থেকে এখন মাথাপিছু দেনা ৬০০ ডলারে চলে গেছে। আগামী দিনের দায়দেনা পরিস্থিতি টেকসই রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে গেছে। আমরা যদি ২০২৩ সালটি দেখি তাহলে তিন রকমের সমস্যার মধ্য দিয়ে আমরা গেছি। প্রথমত, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের উত্থান-পতনের চাপ। দ্বিতীয়ত, সামষ্টিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্বলতা। তৃতীয়ত, বহুদিন ধরে প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো না করার ফলে সৃষ্ট সংকট। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাংক খাতের অনাদায়ী ঋণ, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে সম্পদ আহরণ বাড়াতে না পারা, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা, সরকারি বিনিয়োগে কার্যকারিতা বিচার বা অতিমূল্যায়িত প্রকল্প যেন না হয় সেদিকে দৃষ্টি না দেয়া। এ জায়গাগুলোয় সমস্যা সমাধান না হওয়ায় সংকট বেড়েছে। অবকাঠামগত উন্নয়নে আমরা যে ধরনের ঋণ নিয়েছি তা যথাযথ বিবেচনাপ্রসূত হয়নি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে নেয়া সেসব ঋণ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে। সংকটের পেছনে এ তিনটি বড় কারণ আমরা দেখছি।

প্রশ্ন: ২০২৪ সালে নির্বাচন শেষে সমস্যা কেটে যাবে বলে মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আগামী বছরের দিকে যদি তাকাই তাহলে সামনে নির্বাচনকেন্দ্রিক বড় ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে। অনেকেই আশা করছেন, নির্বাচনের পর হয়তো সরকারের পক্ষ থেকে কিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আসবে, বহুদিনের জমে থাকা সংস্কার কর্মসূচি কার্যকর হবে, আইএমএফ-ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি আমরা পরিপালন করব। আমি অবশ্য এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত না। কারণ এগুলো করার জন্য যে ধরনের রাজনৈতিক মোমেন্টাম বা ত্বরণ দরকার পড়ে (যা প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র সৃষ্টি করতে পারে) তার কোনো চিহ্ন আমি আপাতত দেখতে পাচ্ছি না। নির্বাচন হয়ে গেলে তৎপরবর্তী সরকারের মনোভঙ্গি, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সদিচ্ছা ও দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সাপেক্ষে ভবিষ্যতে হয়তো আমরা এ নিয়ে কথা বলতে পারব। বর্তমান পরিস্থিতিতে বলতে পারি, একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা ২০২৪-এ প্রবেশ করছি।

প্রশ্ন: ২০২৩ সালে আমাদের বেশকিছু অবকাঠামো চালু হয়েছে। সরকার সেগুলোকে অর্জন হিসেবে দেখাচ্ছে। আমাদের ঋণের বোঝাও তো বাড়ল। বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নির্বাচন সামনে রেখে সরকার অনেকগুলো অবকাঠামো উদ্বোধন করেছে, যার মধ্যে বেশির ভাগই ব্যয়বহুল। আবার কিছু কাজ শেষের আগেই উদ্বোধন হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি অবকাঠামো কৃতিত্বপূর্ণ হলেও দুঃখজনকভাবে সরকার তার ক্রেডিট উপভোগ করতে পারছে না। দুঃখের ব্যাপার হলো সরকারের অবকাঠামো নির্মাণের কৃতিত্ব দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, দায়দেনা পরিস্থিতি, টাকার মূল্যপতনে ঢাকা পড়ে গেছে। এখন আরেকটি বিষয় যুক্ত হলো, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পত্রপত্রিকায় সম্ভাব্য প্রার্থীদের যে ধরনের সম্পদ ও অর্থবৈভবের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে তা উদ্বেগের। কারো কারো আয় শতগুণ বেড়েছে। পাঁচ বছরের ব্যবধানে প্রার্থীদের সম্পদের ব্যাপ্তি এখানকার বৈষম্যের চিত্রকে প্রকটভাবে তুলে ধরেছে। অর্থাৎ ভৌত অবকাঠামোর অর্জনগুলো সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের সঙ্গে খুব বেশি মেলানো যায় না। অবকাঠামোগুলোর অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার সঙ্গে রাজনৈতিক বাস্তবতার সামঞ্জস্য ছিল কিনা এ বিচার ভবিষ্যৎ করবে।

প্রশ্ন: মূল্যস্ফীতি ও সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতাকে কীভাবে দেখেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ২০১৪ ও ২০১৮-এর নির্বাচনের ভেতর দিয়ে সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা থাকলেও রাজনৈতিক বৈধতার জায়গাটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। অন্যান্য বিরোধীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হওয়া, ভোটদানের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির অভিযোগের কারণে রাজনৈতিক বৈধতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ কারণে বাজারে সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে সরকার কোনো জোরালো পদক্ষেপ নিতে পারছে বলে মনে হয় না। ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, পুঁজিবাজারে যারা তছরুপ করছে তাদের ব্যাপারেও পদক্ষেপ নেয়নি। একইভাবে জ্বালানি খাতে যারা বসে থেকে ক্যাপাসিটি চার্জ নিয়ে যাচ্ছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। নির্মাণ খাতে ১০ টাকার পণ্য যারা ১০০ টাকায় কিনেছে সেটাও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। এক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের ব্যাপারটা যদি বলতে হয় তাহলে বলা যায়, সরকারের বৈধতার ঘাটতি থাকায় অপশক্তির সঙ্গে তাকে আপস করতে হয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক কায়েমি শক্তির কাছে জিম্মি না হোক, অসহায় থেকেছে। এ সরকারের দুর্ভাগ্য যে ১৫ বছরের শাসনামলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষাসহ অবকাঠামোয় অনেক অর্জন থাকলেও নির্বাচনে যাওয়ার সময় তারা জনগণের মনে এসব বিষয় ভালোভাবে স্থাপন করে যেতে পারল না। এটা তাদের জন্য মন খারাপের বিষয় হিসেবে থেকে যেতে পারে।

প্রশ্ন: রাজনৈতিক সংকট গভীর হচ্ছে। এ রাজনৈতিক সংকট না কাটার অর্থনৈতিক ঝুঁকি কী হতে পারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি আগেও যেটা বলেছি, সরকারের বৈধতার সংকট আছে। এ বৈধতার সংকট সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে নির্বাচনী ব্যবস্থার কারণে। এমন পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে সরকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে, সংস্কার পদক্ষেপ নিয়ে এগোতে পারবে বলে মনে হয় না। এ ধরনের প্রত্যাশা করতে আমার কষ্ট হচ্ছে। রাজনৈতিক সমাধান বাদ দিয়ে এ অনিশ্চয়তা কাটবে না। এক্ষেত্রে বাজার সংস্কার বলেন বা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বলেন না কেন তা করার ক্ষেত্রে সরকারের আত্মশক্তিতে একটা ঘাটতি থাকবে।

বণিক বার্তা
২৭ *ডিসেম্বর,* ২০২৩

অধ্যায় ২

গণতান্ত্রিক উত্তরণ এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতি

অর্থনৈতিক সাফল্যের সাথে আমরা কেন রাজনৈতিক সাফল্য আনতে পারলাম না?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সঞ্চালক: সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলী, ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে। শুরু হচ্ছে oikko.com.bd আজকের সংবাদপত্র। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্বাগত জানাচ্ছি ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মতি ভাই। আপনি এই ঢাকা, বাংলাদেশে যখন ইংরেজি নববর্ষ পদার্পণ করছে, সেরকম একটি সময় আমাকে আহ্বান করেছেন। আপনাকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা। আপনার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান যারা দেখছেন, দর্শকশ্রোতা, দেশে-বিদেশে যারা আছেন এবং চ্যানেল আইয়ের যে নেতৃত্ব আছে এবং যে কর্মীরা আছে, তাদের সকলের জন্যই আমার শুভ কামনা রইলো।

সঞ্চালক: ধন্যবাদ আপনাকে, আমি একটু শিরোনামটা দেখে নিই। দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম হচ্ছে 'আসুক আলো, জাগুক আশা': সবার জন্য শুভ হোক ২০২৩। মানবজমিনের শিরোনাম 'নতুন বছরে কঠিন চ্যালেঞ্জ' এবং 'বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী'। আমাদের সময়-এর শিরোনাম 'নির্বাচনের হিসাব-নিকাশের বছর' এবং '২০২৩ হবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্রান্তিকালের বছর'। যায়যায় দিন-এর শিরোনাম 'বিদায় ২০২২, স্বাগত ২০২৩' এবং 'দেশের প্রতিটি নাগরিকই হবে প্রযুক্তি জ্ঞানে স্মার্ট: প্রধানমন্ত্রী'। দেশ রূপান্তর-এর শিরোনাম 'সংঘাত না সংলাপ' এবং 'নিরাশার মেঘ, আশার আলো'। কালবেলা-এর শিরোনাম 'অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ সহনশীল রাজনীতি' এবং ' পরিচালন মুনাফা বেড়েছে অধিকাংশ ব্যাংকের'। দৈনিক সংগ্রাম-এর শিরোনাম 'স্বাগত ২০২৩' এবং 'স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারের

দাবিতে সংগ্রাম’। করতোয়া-এর শিরোনাম ‘নতুন বছর নির্বাচনের’ এবং ‘বদলে যাচ্ছে উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা’। The Business Standard-এর শিরোনাম ‘The legacies of a tumultuous 2022 are a long haul’। যে বিষয়টা দেখলাম, কাগজের শিরোনামগুলোও তাই, অর্থনীতি নিয়েই হতাশা, নিরাশা, আশা। সবকিছুই অর্থনীতির মধ্যেই আছে। তবে আপনাকে যেহেতু সুযোগে পাওয়া গেল, মূলত অর্থনীতি নিয়েই যেহেতু আমরা আলোচনা করব। রাজনৈতিক অর্থনীতিও আছে তার মধ্যে। বিষয়টা দাঁড়ালো কী? বিষয়টা হলো যে ২০২২, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে এই বছরটা পার হয়েছে, আপনি একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে কী বলবেন যে কেমন ছিল ২০২২? আর কেমন হবে ২০২৩? মোটাদাগে আমরা এটাই শুনব।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ, আপনাকে। মতি ভাই আপনার স্মরণ আছে কিনা আমি ২০২২-এ আপনার এ অনুষ্ঠানে প্রথম এসেছিলাম। এসে বলেছিলাম, প্রথম দিকে একদম। সেটা হলো যে, ২০২২ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের ভিত্তি বছর হবে। এটা আমি বলেছিলাম, ভিত্তিবছর হিসেবে। এখন যদি পিছন ফিরে দেখেন এই ভিত্তি বছরের কিছু কিছু উপাদান আমরা এই সময়কালে দেখতে পেয়েছি এবং সেইগুলো কিছুটা এসেছে ইতিবাচক কারণে, কিছুটা নেতিবাচক কারণে। ইতিবাচক কারণে যেটা এসেছে সেটা হলো যে, রাজনৈতিক দলগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় হয়েছে। তারা মাঠে-ময়দানে, ঢাকা, অন্যান্য জেলা-শহরগুলোতে, বিভাগগুলোতে সভা-সমাবেশ করছে, এটা আমরা লক্ষ করছি ইত্যাদি। নাগরিক সমাজও আগের চেয়ে অনেক বেশি সোচ্চার হয়েছে। পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকারের জন্য এবং এই গণতান্ত্রিক অধিকারের ব্যাপারে অথবা একটা ভীতির সংস্কৃতি যে গড়ে উঠেছে সেটার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার ক্ষেত্রে। মানবাধিকারের বিষয়ের প্রশ্নটি সামনে নিয়ে এসেছে। এর পাশাপাশি নেতিবাচকভাবে যেটা এসেছে, যেটা অর্থনীতির প্রসঙ্গে আসবে সেটা হলো যে মূল্যস্ফীতি অকল্পনীয়ভাবে হয়েছে। এটা আমাদের সেই আন্দাজের ভেতরে ছিল না এবং এটা পুরোটা ফেব্রুয়ারি মাসের যুদ্ধ দিয়ে, ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

যেমন একইরকমভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না যেভাবে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পতন ঘটলো সেইভাবে। যেটা ব্যাখ্যা করা যায় না সেটা হলো ব্যাংকগুলোতে রীতিমতো দিনে-দুপুরে ডাকাতি হলো যেভাবে সেটাও আপনি বৈশ্বিক পরিস্থিতি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না যে এই সময়কালে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যে বিভ্রাটটা হলো ২০২২-এ, সেই বিভ্রাটও তো আপনি শুধুমাত্র বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাথে তেলের দাম বাড়ার সাথে শুধু যে যুক্ত তা না। এখানে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যত্যয় হয়েছে, সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। এই সময়কালে মানুষের তরুণ শিক্ষিত যুবসমাজ চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে আরও বেশি কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে।

একইসাথে আমরা লক্ষ করছি সবচেয়ে বেশি যেটা বহুদিন পরে মধ্যবিত্ত একটা কঠিন চাপের ভেতরে পড়েছে এবং মধ্যবিত্তের এ চাপে পড়াটার কারণে আমাদের সামাজিক যে ভিত্তিটা এবং যে মূল্যবোধগুলোকে ধারণ করে আমাদের সমাজ এগোয় সেই মূল্যবোধকে ধারণ করা, সেই ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে সে কিছুটা পিছিয়ে যাচ্ছে, দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তো আপনি বলতে পারেন যে একদিকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা হয়তো অগ্রসর হচ্ছে। নির্বাচনের আলোচনাটা মধ্যিখানে চলে আসছে। সংসদ থেকে বিরোধী দলের কেউ কেউ পদত্যাগ করছেন ইত্যাদি মিলিয়ে যেমন একদিকে আসছে, সহিংসতার আশঙ্কাও যেরকম এটার সাথে বাড়ছে, কিন্তু এর সাথে গতবছর নেতিবাচক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বোধহয় অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পুরো জীবনকে প্রভাবিত করে এসেছে। আর যদি আগামী দিনের দিকে তাকাই তাহলে আমি যদি গত বছরকে গণতন্ত্রের ভিত্তিবছর হিসেবে মনে করছি। এই বছরটাকে আমি সেই উত্তরণের একটি প্রকাশের জায়গা হিসেবে আগামীতে দেখতে চাচ্ছি বা দেখব বলে আমি মনে করছি।

সঞ্চালক: সেটার কারণ?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটার কারণ হলো প্রথম কথা হলো যে নেতিবাচক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ২০২২-এ আমাদের বিব্রত করেছে, বিচলিত করেছে, অনেক সময় বিভ্রান্ত করেছে, সেই বিভ্রান্তি, বিচলিত পরিস্থিতি বা বিপন্নভাব আরও ২০২৩-এ অব্যাহত থাকবে। আমি দুই-একটা জিনিস যেটা দায়িত্বের ভিতরে পড়বে আগামী বছরে সেটা হলো এক কথায় বললে স্থিতিশীলতা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাটা খুব থাকবে। অর্থাৎ আপনার মূল্যস্ফীতিকে ধরে রাখার ব্যাপার উঠবে। মূল্যস্ফীতির সবচেয়ে বড় আশঙ্কার জায়গাটা আমরা যেটা দেখছি সেটা হলো ঢাকা শহরে আপনি-আমি থাকি হয়তো আমরা মনে করি আমাদের মূল্যস্ফীতি বেশি কিন্তু সরকারি হিসাব বলছে যে গ্রামাঞ্চলে খাদ্যপণ্যের বাইরে যে সমস্ত সেবা তারা ব্যবহার করে সেখানে মূল্যস্ফীতি অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, যেটা দাঁড়াবে সেটা হলো যে খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টি বড় ভাবে আসবে। আমরা দেখেন বলছি যে আমন অনেক ভালো হবে কিন্তু আমন সত্যি সত্যি সরকার কতখানি সংগ্রহ করতে পারবে কার্যকরভাবে, তার মজুদকে সে আমদানি মাধ্যমে এবং সংগ্রহের মাধ্যমে কতখানি শক্তিশালী করতে পারবে, এটা একটা বড় দেখার বিষয় রয়েছে।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা বড় দুটো বাধাকে দেখতে পাচ্ছি। এক তো হলো বিদ্যুৎ সরবরাহ, গ্যাস নেই সেক্ষেত্রে এলএনজি ইত্যাদি মিলিয়ে আমরা বিকল্প উৎস থেকে সংগ্রহ করতে পারব কিনা, বৈদেশিক মুদ্রা থাকলেও আমরা সেটা আনতে পারব কিনা সেটা একটা বিষয় রয়ে গেছে। আর যেটা রয়ে গেছে সেটা হলো যে ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্য সংকট যেটা দেখা দিয়েছে। এই তারল্য সংকট এখন সরকারের উপরও উপনীত

হচ্ছে অর্থাৎ ব্যাংক থেকে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ যেমন নেই, সরকারও সেরকম রাজস্ব ব্যয় করার মতো সক্ষমতার দিক থেকেও অনেক পিছিয়ে গেছে। যার ফলে সরকারি প্রকল্পগুলো এখন বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না অনেক ক্ষেত্রেই। সেটার জন্য সরকার সময়মতো অর্থ দিতে পারবে কিনা আগামী ছয় মাসে এটা একটা বড় বিষয় হিসেবে খুব দ্রুতই সামনে চলে আসবে।

টাকার মানের পতনকে আটকে রাখা একটা বড় বিষয় হবে এবং সেটাতে যদি রেমিট্যান্স আয় ভালো না থাকে, যদি রপ্তানির ক্ষেত্রে যে আশঙ্কাগুলো আমরা করছি কারণ অর্থনৈতিক মন্দা উন্নত দেশে আসলে সেখানে যদি আমরা বিক্রি করতে না পারি তাহলে সেটার একটা ধাক্কা এসে লাগার একটা সম্ভাবনা রয়েছে, তাতে টাকার মানের পতন হতে পারে। সাথে একটা বড় জিনিস যেটা আসছে সেটা হলো আমাদের যে বড় বড় মেগাপ্রকল্পগুলো আছে সেই মেগাপ্রকল্পগুলো অর্থায়ন করাটা একটা বড় বিষয়, দেশীয় মুদ্রায়, বৈদেশিক মুদ্রায়। আর এর সাথে যুক্ত হচ্ছে সাম্প্রতিককালে বৈশ্বিক অর্থনীতির বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার কারণে আপনারা দেখেছেন যে রাশিয়ান জাহাজ আসতে পারছে না এবং সেটার ফলে আমাদের রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের এখন এক-দেড় বছর পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে এবং অন্যান্য বড় বড় প্রকল্পগুলোও একই অবস্থায় আছে। সেহেতু অর্থনীতির এই আশঙ্কাটা রয়ে গেছে। এখন এই আশঙ্কা যদি আপনার জন-অসন্তোষে পরিণত হয়, যেমন আমি আপনাকে বলি, যদি কোনো কারণে (এটা হোক আমি সেটা বলছি না) আপনার বড় ধরনের বৈদেশিক বাজারের পতন ঘটে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণে, তাহলে যে কল-কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে রপ্তানিমুখী শিল্পের, সেটার শ্রমিক অসন্তুষ্ট হওয়াটা খুব আশঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একইরকমভাবে কৃষকরা যদি এখন যেই পরিমাণে টাকা-পয়সা খরচ করে সার, ডিজেল, কীটনাশক ইত্যাদি কিনছে সেই অনুযায়ী যদি ন্যায্যমূল্য সে না পায় সেক্ষেত্রে যদি কোনো ধরনের সমস্যা দেখা দেয়, সেটা এটার ভেতরে রয়েছে। এছাড়া যেটা রয়েছে, যে উচ্চবর্গের মানুষের ভেতরেও তাদের আয়-ব্যয়ের স্থিতিশীলতা, আগামী দিনের অনিশ্চয়তা, এক ধরনের দেশের থেকে টাকা বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। এটা তো একটা প্রকাশ্য সত্য, যে দেশ থেকে টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। আর আমরা জানি নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশ থেকে টাকা আরও বাইরে যায়। এটার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকে। তো এরকম একটা পরিস্থিতি আপনাকে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা থেকে সামাজিক অসন্তোষ, সামাজিক অসন্তোষ থেকে রাজনৈতিক বিক্ষোভের সৃষ্টি যেন না করে, যাতে দেশের ভিতরে স্থিতিশীলতা, গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা, উন্নয়নের যে সমস্ত প্রচেষ্টা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এটা এক ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে কিনা সে আশঙ্কাটা কিন্তু থেকে যায়। অর্থাৎ আপনার

স্থিতিশীলতাটাকে রক্ষা করাটা একই সাথে আপনার জনগণের যে প্রত্যাশাটা, গণতান্ত্রিক প্রত্যাশাটা এই দুটোর কীভাবে সমন্বয় হবে আগামীতে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে, এটি এখন সবচেয়ে বড় বোধ হয় প্রশ্নের বিষয়।

সঞ্চালক: এক্ষেত্রে যদি আইএমএফের ঋণ পাওয়া যায়, তাহলে কি পরিস্থিতির উন্নতি হবে না?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ, এবং বেশি না। কারণ হলো, ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস নাগাদ আপনি হয়তো আরও চারশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার পেলেন, কিন্তু চারশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার তো 'সিন্ধু মাঝে বিন্দু যথা'। কারণ আমার যা প্রয়োজন, আমি তো সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার চেয়েছি। এর চেয়ে আমি অন্তত সাড়ে বারো গুণ চেয়েছি, সেটা আমার পেতে হবে। কিন্তু এর সাথে সাথে অন্যান্য পরিস্থিতি, আইএমএফ যে সমস্ত সংস্কারের কথা বলেছে, কিছু কিছু লক্ষণ আমরা দেখছি কিন্তু তারপরেও দুট বড় সংস্কার সরকার তো এখনো করতে পারছে না। সেটা হলো সুদের হারকে সেই অর্থে শিথিল করা। এখন আপনি নিজের সঞ্চয় যদি ব্যাংকে রাখেন, তার চেয়ে ঘরে টাকা রাখা আপনার জন্য ভালো কারণ হলো ওখানে যে সুদ পাবেন আপনি তার থেকে কেটেকুটে আপনার প্রকৃত মূল্য কমে যাবে কারণ মূল্যস্ফীতি হলো নয় শতাংশ আর ছয় শতাংশ- সাত শতাংশ আপনি ব্যাংকে সুদের হার পাবেন, এটা তো হবে না। আরেকটা হলো টাকার মূল্যমানের ক্ষেত্রে একাধিক বিনিময় হার ব্যবহার করা হচ্ছে এবং যার ফলে আমাদের প্রবাস থেকে টাকা আসার প্রবাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক সেদিনও আড়াইশো মিলিয়ন ডলার ছাড় করেছে, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকও দিবে, অন্যান্যরাও দিবে। কিন্তু এটা আসলে পুরোটাই অর্থ প্রবাহের ব্যাপার না। এখানে সংস্কার করার ব্যাপার রয়েছে। আপনি টাকা পেলেন কিন্তু আপনার ব্যাংক ব্যবস্থা তো উন্নত হচ্ছে না। ব্যাংকে তো খেলাপিদের আপনি কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছেন না।

চোখের সামনে একটা ভালো ব্যাংক কীভাবে লুট হয়ে গেল, সেটারও কোনো ব্যবস্থা আমরা নিতে পারছি না। তো ওগুলো যদি না নিতে পারি মানে আপনার যদি ফুটা কলসি হয় তার ভিতরে আপনি যতই জল ঢালেন না কেন কলসি তো ভরবে না। কারণ কলসির নিচে তো ফুটা আছে, তো সেরকম অনেকটা অর্থনীতির পরিস্থিতি হয়েছে। আপনি যতই এটার ভিতরে বিদেশ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে আসেন কিন্তু অর্থনীতি যদি প্রক্রিয়াগতভাবে বিকৃত থাকে, ওটার ভিতরে অসামঞ্জস্যতা থাকে, ওটার ভিতর নীতির যদি সঠিক প্রয়োগ না হয়, আইনের শাসন যদি না থাকে, তার কোনো জবাবদিহিতা

না থাকে আথলে তো আপনি এটাকে আগাতে পারবেন না। সেহেতু এই সংস্কারের প্রয়োজনটা সবচেয়ে কঠিন সময়ে এই সরকারের কাছে এসেছে। এই সংস্কারগুলো করার দরকার ছিল উনারা সরকার দায়িত্ব নিয়েছেন যখন প্রথম দিকে। যেকোনো দেশের সংস্কার সরকার এসে প্রথমেই করে, শেষে এসে করতে বাধ্য হচ্ছে। সেজন্য সবদিক দিয়েই মিলিয়ে, ইউক্রেনের যুদ্ধ থেমে যাবে তা মনে হয় না এবং ভূ-রাজনৈতিক এবং ভূ-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিলই হবে মনে হচ্ছে এবং সবকিছুই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের বিদেশি-দেশি বন্ধুরা দেখবে এটার ভিতরে। এই জায়গাটাতে বাংলাদেশ কীভাবে যে দাঁড়াবে। এর সাথে তো রোহিঙ্গা সমস্যা রয়েছেই আমাদের। এটার ভিতরে দাঁড়াবে, এটা বড় ধরনের বিচক্ষণতা, সাহসিকতা এবং সমন্বয় এবং সম্ভবত অন্তর্ভুক্তি- সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে।

সঞ্চালক: নেপাল পরিস্থিতিটা কেমন দেখছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না, আপনাকে আমি বলছিলাম, নেপালের বিষয়ে আমি মনে করি এখন যেটা বাংলাদেশের উচিত যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এরকম পরিস্থিতিকে কীভাবে কে মোকাবিলা করেছে। আপনি দেখেন, আপনি নেপালের কথা তুললেন, নেপালে দেখেন এই মুহূর্তে তো সরকার বদল হলো গত সপ্তাহে। নেপালি কংগ্রেসের বদলে এখন কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসলো। তারই অংশ হিসেবে ছিল তারা আগে দল বদল করে নতুন সমঝোতা করলো। তো আপনি লক্ষ করে দেখুন নেপালে গত দশ বছরে অন্তত তিনটা নির্বাচন হয়ে গেছে। তো, তাদের নির্বাচন নিয়ে তো কেউ প্রশ্ন তোলে না যে এখানে নির্বাচনে কোনো ভণ্ডামি হয়েছে, বা এখানে কোনো তছরূপ হয়েছে। সরকার বদল হচ্ছে, সরকার আসছে, বিপক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি আহ্বান জানাচ্ছে, বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থেকে নতুন প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমি যেটা বুঝে পাই না, নেপালের মতো একটা তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির রাষ্ট্র তার দেশে একাধিকবার ভালো নির্বাচন করতে পারে আর আমরা কেন পারি না? মানে এই বিষয়টা বুঝতে হবে। আপনি দেখুন একইরকমভাবে আপনি নেপালের কথে যদি বাইরে রাখেন, আপনি শ্রীলঙ্কার কথা দেখেন। শ্রীলঙ্কাতে যখন তাদের জাতিগত দাঙ্গা চলছে, যুদ্ধ চলছে তামিল এবং সিংহলীদের, তখনও যে নির্বাচন হয়েছে সেখানেও কিন্তু তামিলরা বা মুসলিম সংখ্যালঘু মানুষরা যারা আছে শ্রীলঙ্কাতে, তারা নির্বাচনি প্রক্রিয়ার ভিতরে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ হয়েছে, ব্যত্যয় হয়েছে, এটা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন তোলে না।

এমনকি আপনি দেখেন যদি পাকিস্তানের নির্বাচনের কথাও বলেন, সেখানেও তো শুধু নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার না। ওখানে খুন হয়, তাদের এখানে মারা যায় এবং পাকিস্তান

কোনো বড় ধরনের আদর্শ না আমাদের জন্য কিন্তু ওখানেও আপনার বিচার-ব্যবস্থা কিন্তু একটা যৌক্তিক পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করে বিভিন্ন ধরনের। যদিও ওখানে সেনাবাহিনীর ভূমিকায় যে ছায়াতে থাকে সেটা আমরা সবাই জানি। আর ভারতের কথা বললাম না এমনকি মালদ্বীপেও নির্বাচন হচ্ছে। আমি যেটা আপনাকে বলি, আমি বুঝতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশ কেন এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোর ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চর্চা থেকে হঠাৎ করে কেন পিছিয়ে যাচ্ছে? অন্যান্য অঞ্চলে আমাদের চেয়ে দুর্বল রাষ্ট্রে নির্বাচন হচ্ছে, নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠুতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে না, তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে না, সরকার বদল হচ্ছে এবং এর ফলে কেউ কাউকে মেরে ফেলছে না, কেউ কার বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে না। পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে এবং একটি রাজনৈতিক সংলাপ এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে আছে। আমরা কেন পিছিয়ে গেলাম? এই অর্থনীতি এবং এই যেই সাফল্যের কথা বলি তার সাথে আমরা কেন রাজনৈতিক সাফল্য আনতে পারলাম না?

সঞ্চালক: এই প্রশ্নের জবাব কি আপনার কাছে নেই?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার কাছে এই প্রশ্নের জবাব পুরোটা নেই। কারণ হলো আমি আপনাকে বলি, কারণ হলো যে অন্যান্য দেশগুলোর ক্ষেত্রে, জবাব নেই বলে আমি আপনাকে উদাহরণ দিই। কারণ আমি অন্য কিছু থেকে শিখতে চাই। যেমন, নেপাল থেকে শিখতে চাই। আমি আপনাকে দক্ষিণ আফ্রিকার উদাহরণ দিই। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ যেখানে নেলসন ম্যান্ডেলার মতো নেতা এসছেন। বঙ্গবন্ধুর মতো নেতাই তো। বঙ্গবন্ধু ও নেলসন ম্যান্ডেলার অনেক সামঞ্জস্য আছে। তাদের নিপীড়ন, নির্যাতন, জেল-খাটা সব ক্ষেত্রেই এবং অসহযোগ আন্দোলন সবকিছু। সেই নেলসন ম্যান্ডেলার দল এএনসি এতদিন ধরে ক্ষমতায় আছে, দশক দশক ধরে, কিন্তু সাম্প্রতিককালে তারা সমস্ত ধরনের জনগণের সমর্থন হারাচ্ছে।

কারণ হলো, এই দলের ভিতরে আপনার দুর্নীতি ঢুকেছে, দলের ভিতরে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা এসেছে, দলের সাথে সমাজের অন্যান্য নাগরিক সমাজের সম্প্রীতি কেটে গেছে, দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক স্বার্থ দলটার উপর প্রভাব বিস্তার করছে এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। সেহেতু, বাংলাদেশে যদি আমাদের স্বাধীনতার দল যদি কোনো কিছু দেখতে চায় তাহলে তাদের এএনসির দিকে তাকানো উচিত। তারা দক্ষিণ আফ্রিকার যে দল স্বাধীনতার দল, তাদের এখন কী পরিস্থিতি হচ্ছে যদি দলের ভিতর থেকে, দলের ভিতরে এই ধরনের ঘটনাবলি ঘটে এবং বিরাজনীতিকরণ দলের ভিতরে অনেক সময় আসে যে যেটা এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করবে। সেটার জন্য এএনসির ভিতরে এখন অনেক ধরনের সংস্কার, চিন্তা হচ্ছে। আমার প্রত্যাশাটা হলো ২০২৩-এ যে এইরকম আমাদের দেশেও রাজনৈতিক দলের ভেতরে একটু পেছনে যেয়ে আত্মজিজ্ঞাসা

নিতে হবে। এ না হলে ক্রান্তিকালীন এই সময়কে মোকাবিলা করার যে আত্মশক্তি আমাদের তাকে আমরা সামনে আনতে পারবোনা। আমি প্রত্যাশা করি ২০২৩ এ আমরা সমস্ত গ্লানি এবং ক্লেশ কাটিয়ে যে সংকটের কথা আমরা বলছি তাকে আমরা সাহসিকতা এবং মানসিক ঔজ্জ্বল্য দিয়ে মোকাবিলা করতে পারবো। আমি সে ভরসা করি।

সঞ্চালক: এ প্রত্যাশার ভেতর দিয়ে আজকের এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানছি।

আজকের সংবাদপত্র, চ্যানেল আই
সঞ্চালনায়: জনাব মতিউর রহমান চৌধুরী
১ জানুয়ারি, ২০২৩

উন্নয়নের সুফল কি সবাই সমানভাবে পাচ্ছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সঞ্চালক: সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান ইস্পাহানি মির্জাপুর শুভরাত্রি পাওয়ার্ড বাই ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ প্রিয় দর্শক আমরা গতকাল কেউ কথা বলেছিলাম কেমন গেলো ২০২২ সাল এবং ২০২৩ সাল কেমন দেখতে চাই।

আমি আলোচনা শুরু করতে চাই ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আপনাকে দিয়েই। যেই কথা শুরুতে বলছিলাম যে অনেকদিন ধরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি যে সারা পৃথিবীতেই একধরনের অনৈতিক মন্দার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে ইউক্রেন রাশি যুদ্ধের কারণে এই পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে নতুন বছরের। তার ভেতর দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে নানারকম চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে, প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে এবং এবছরটি রাজনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটই বছর ইতোমধ্যে আমরা রাজনৈতিক বিভিন্ন রকম কর্মকাণ্ড দেখতে পাচ্ছি বড় দলগুলো রাজপথে নির্বাচনের বছর সবমিলিয়ে আপনি কেমন দেখতে পাচ্ছেন ২০২৩ সাল কেমন হতে পারে বাংলাদেশের জন্য।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ মামুন ডাকার জন্য আজকে এবং আপনার মাধ্যমে এখনো প্রথম দিনটি শেষ হয়নি বছরের, যেহেতু সকলকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং আপনার মাধ্যমে যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন দেশে-বিদেশে তাদের সকলকে মঙ্গল

কামনা করি এ বছরের জন্য এবং এটিএন বাংলাতে যারা কর্মীরা আছেন তাদের জন্য শুভকামনা রইলো। ২০২৩ শুধু পৃথিবী না না বাংলাদেশ না মানে সামগ্রিক বিচারেই একটি বিশেষ বছর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য যে সমস্ত কারণ আপনি বললেন সেগুলো তো বটেই। এখন অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমার হিসেবে যে যদি আপনি ৭৪/৭৫ এর সময় যদি সাথে যদি ফিরে না যায় আপনি ২০০৬/৭ এর ৭/৮ এর যে বৈশ্বিক মন্দা সে সময়ের কাছে যদি ফিরে না যেতে চাই এই সময়কালের ভিতরে এই সবচেয়ে কঠিনতম বছর হিসেবে আমাদের সামনে আসছে। এর বহুবিধ কারণ আছে আপনি বলেছেন ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের কথা কিন্তু বর্তমানে অর্থনীতিতে যে সমস্ত আমি সংকট শব্দটা ব্যবহার নাই করি, যে সমস্ত চাপ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমস্ত অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে শুধুমাত্র ইউক্রেন বা রাশিয়ার যুদ্ধ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আমি উদাহরণ হিসেবে আপনাকে বলি সেটা হলো যে, অনেকেই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমাকে মজুদ কমাকে বলা হয় যে বেশি দামে কিনতে হয়েছে কোনো সময় ঠিক আর কোনো সময় সার কোনো সময় তেল কিন্তু যারা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের খবর জানেন তারা দেখবেন এটা গত বছর অক্টোবর নভেম্বর মাসে সেপ্টেম্বর নভেম্বর পর থেকেই এটার পতন শুরু হয়েছে। এটা ফেব্রুয়ারি থেকে এ বছর অথবা গত বছর থেকে হয়ন। অথবা আপনি যদি মনে করেন যে, ব্যাংক ব্যবস্থার ভিতরে যে তারল্য সংকট এবং সেটার যে এখানে যে অনাদায় ঋণ রয়েছে এটা তো ইউক্রেন যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত নয়। আপনার যদি লক্ষ্য করুন যে আমাদের লোডশেডিং এর যেই পরিস্থিতি আমাদের সৃষ্টি হয়েছে এটা আমাদের জ্বালানির পরিকল্পনা বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের গুরুতর অসঙ্গতির কারণে সৃষ্টি হয়েছে। আমি বাজারে যদি অন্যান্য ক্ষেত্র দেখেন যে তারল্য সংকট বলেন বা এটার বৈদেশিক মুদ্রার যে সংকট এটা বাংলাদেশ একটিমাত্র পণ্যের উপর নির্ভরশীল থেকে যে রপ্তানি করে থাকে সেইটার বড় ধরনের সমস্যা থেকে এসেছে এবং রেমিট্যান্স আয়ের ক্ষেত্রে এটা হয়েছে এবং আপনি যেহেতু দুটো বড় বিষয় এখন যেটা রয়েছে সেটা হলো একটি হলো সুদের হারের ক্ষেত্রে। সুদের হারের ক্ষেত্রে সরকার মনে করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখনো মনে করছে যে সুদের হার তারা বাড়াবে না এবং সুদের হার যদি আপনার মূল্য স্ফিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তাহলে অবশ্যই আপনার টাকার মূল্যমান যাদের সঞ্চয় আছে সেটার ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেটা অসুবিধা সেটার এখনো হয়নি।

আইএমএফ-এর কাছে কথা দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটার পরিপালনের ক্ষেত্রে সময় নিয়েছে সরকার। অপরদিকে আপনি যে বিষয়টা দেখবেন সেটা হলে বিনিময় হার, টাকার বিনিময় হারের ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়ে হার কালোবাজারে বা খোলা বাজারে ১১২ টাকায় চলছে আর আমি ১০১ টাকায় আনার চেষ্টা করছি ১০২ টাকায়। যার ফলে হুন্ডিতে টাকা আসছে রেমিটেন্স এ কিছুটা সামান্য বেড়েছে গত বছর তুলনায় এই ডিসেম্বরে।

কিন্তু এটা সেই ভাবে আসছে না। আপনি একই রকমভাবে লক্ষ্য করে দেখবেন যে, আমার আমন উঠছে বলা হচ্ছে যে আমনে খুব দেরি করে ফসল আসলেও বৃষ্টির পরে আসলেও উৎপাদন ভালো হয়েছে কিন্তু আপনি সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেখবেন সরকারি সংগ্রহ অন্যান্য বছরের মতোই এটা পিছিয়ে থাকছে যে দাম কৃষকের যে খরচ গেছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে না। সেহেতু অনেকগুলি বিষয় আছে, যে বিষয়গুলো আপনার ঠিক যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত না।আমি এটাকে বলি উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু বিষয় রয়ে গেছে। এখন বড় সমস্যাটা কোথায় দুটো বড় সমস্যা একটা বড় সমস্যা হলো যে এই সমস্ত সমস্যাকে আপনি যদি অস্বীকারের মনোভাবে থাকেন তাহলে যেটুকু শক্তি দিয়ে এটাকে আমরা মোকাবিলা করতে পারি সেই মোকাবিলা করার মত মনোভাব তখন থাকে না। পুরো প্রশাসন এবং সরকারের যে সমস্ত কৌশল থাকে সেই কৌশলগুলো আলোকিতভাবে যথোপযুক্ত ভাবে তৎপরতার সাথে প্রস্তুৎপন্নমতিত্বের সাথে এগুলোকে কার্যকর করা যায় না এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব নেই মন্ত্রী মহোদয় সেখানে এই মুহূর্তে খুবই অনুপস্থিত আপনার অর্থ মন্ত্রণালয়। এটা একটা বড় সমস্যা।

দ্বিতীয় সমস্যাটা যেটা এসেছে সেটা হলো যে সরকারের পক্ষে মনোযোগের জায়গা তো সীমিত সেহেতু সেখানে রাজনীতিটা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যে গেছে তুলনামূলকভাবে অর্থনীতিতে এই মনোনিবেশ টা করার বোধহয় মনে হচ্ছে যে আপাতদৃষ্টিতে সরকার এই মুহূর্তে করতে পারছে না। কিন্তু যেটা মনে রাখার দরকার যে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যদি কোনো কারণে আরো দুর্বলতর হয় বা কোনো ধরনের সংকটাপন্ন হয়।ধরুন আপনি যদি আমি একটা উদাহরণ হিসেবে, বলি আমি প্রার্থনা করি এরকম যেন না হয় দেশের জন্য, আপনার খুব বড় ধরনের রপ্তানি আয় কমে গেলো এই মন্দার কারণে ইত্যাদি সেই ক্ষেত্রে আপনার গার্মেন্টস শিল্প অনেকগুলো বন্ধ হয়ে যদি যায় তখন সেই ক্ষেত্রে যেই অসন্তোষ আসবে সেটাতো রাজনীতিতে প্রভাবিত করবে। যদি মূল্যস্ফীতি আরো বাড়তে থাকে টাকার মূল্যবান আরো পতন হয় তাহলে মধ্যবিত্তের উপর যে চাপ এখন রয়েছে যেখানে তার জীবন মান রক্ষা করা শিক্ষা স্বাস্থ্য রক্ষা করা এখন কষ্টকর হয়েছে তাকে সুরক্ষা দিও আপনি তখন রাখতে পারবেন না। তখন এটা রাজনীতিতে চলে যাবে। সেহেতু আমার প্রত্যাশা হলো দুটো সেটা হলো যে এই অস্বীকারের মনোভাব থেকে বের হয়ে যথপোযুক্ত ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা তড়িৎ ভাবে এবং এটা সেই সেইক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনাকে সৃষ্টিশীল ভাবে করা। আর দ্বিতীয় টা হলো, রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অর্থনীতি যদি আমরা যথেষ্ট মনোযোগ না দেই সেটা রাজনীতি থেকে কিন্তু বিরূপভাবে প্রভাবিত করবে।

সঞ্চালক: উন্নয়নের সুফল কি সবাই সমানভাবে পাচ্ছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রথম কথা হলো প্রফেসর নূর নবী বলছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা, এখানে ক্যাপিটাল হিল আক্রমণ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি সে সমস্ত আরো কিছু। পার্থক্যটা হলো সেখানে এখন বড় ধরনের বিচার হয়েছে। ট্রাম্প সাহেবের ট্যাক্সের আমরা উদঘাটন শুনছি এবং সেটার ভিতর দিয়ে তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে পুনঃস্থাপন এবং তার প্রতি আস্থাকে পুনঃস্থাপন করতে পারবে। বাংলাদেশে এমন একটি প্রতিষ্ঠান বলেন তো যেখানে আমরা এই ধরনের প্রক্রিয়া দিয়ে জনগণের আস্থাকে বা গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতাকে পুনস্থাপিত করতে পারি যেটা রাজনৈতিক কোনো প্রভাবের বাইরে আছে। সে আস্থার জায়গাটা যদি আপনি আমাকে নিশ্চিত করতে পারেন তাহলে আমি সাচ্ছ্যন্দ বোধ করবো। জনগণের পক্ষ থেকে কথা বলাটা সেটা একটা খুব বড় জিনিস যে,''জনগণ এটা মনে করে''। কিভাবে জনগণ মনে কর? কোত্থেকে জানলেন আপনি ? বাংলাদেশে এই মুহূর্তে কোনো জনমত যাচাই পদ্ধতি নাই। বাংলাদেশের যে কটা স্বাধীন পত্রিকাগুলো ছিল সেগুলো এখন আর জনমত যাচাই করে না। শুধুমাত্র শুনি যে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংস্থার জনমত যাচাই করে। করে তারা কি সিদ্ধান্ত দেয় সেটা তো আর আমরা জানি না। এবং একই রকম ভাবে দলীয়ভাবে হয়তো কেউ কেউ করে। সেহেতু জনগণ এটা মনে করে এটা বলাটা খুবই বড় কথা।

দেখুন আপনি একটা কথা, এই অঞ্চলের ভিতরে সবেমাত্র নেপালে নির্বাচন হয়ে গেলো, সরকার বদল হয়ে গেল কেউ তো মারা যায়নি! কেউ কাউকে মেরে ফেলিনি। সেই সরকারের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর কমিউনিস্ট দের ডেকে এনে হাতে তুলে দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিল। তার আগে আপনি যদি দেখেন,পাকিস্তানের কথা যদি বলেন সেখানেও এক ধরনের নির্বাচন হয়েছে। পাকিস্তান কোনো আদর্শ রাষ্ট্র না সেটা আমরা জানি কিন্তু তারপরও আপনি একটু দেখেন। আপনি মালদ্বীপে দেখেন নির্বাচনের জন্য সেখানেও সঠিকভাবে নির্বাচনে একটা হচ্ছে যেখানে লোকে এইটা বলে না যে আমি ভোট দিতে পারিনি। আপনার শ্রীলঙ্কাতে যখন জাতিগত দাঙ্গা হয়েছে তখনও সরকার বদল হয়েছে। তো বাংলাদেশ একটা অদ্ভুত দেশ যেখানে চার পাশে এরকম নির্বাচন প্রতিষ্ঠান কাজ করে, আমার দেশে কেন এটা কাজ করে না? নাগরিক সমাজে কথা বলি বা আমি অন্য বা নাগরিক সমাজে যাওয়ার আগে আপনাকে আমি বলি, নাগরিক সমাজ বলতে প্রফেসর নুরুন্নবী যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন এটা খুবই সংকীর্ণ ধারণা। যদি আপনি আরেকটু বৃহৎভাবে দেখেন নাগরিক সমাজের ভিতরে আপনি আছেন মিডিয়া যেখানে আছে, অনেক ক্ষেত্রে আপনার রাষ্ট্রীয় বহির্ভূত সংস্থা হিসেবে বেসরকারি খাত থাকে। এই ঢাকা ক্লাব, গুলশান ক্লাব এই সবগুলো নাগরিক সমাজের সংজ্ঞার ভিতরে পড়বে। আমি

ওই তর্কের ভেতরে যাচ্ছি না। আপনি আমাকে বলেন তো, এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এদের ভিতর নির্বাচন হয় কিনা আজকাল।

সঞ্চালক: কোনো প্রতিষ্ঠান?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যতগুলো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে চেম্বার অফ কমার্স এর ভিতরে একটা নির্বাচন হয়? সেখানে তো মনোনীত ভাবে কিভাবে আসে আমরা তো সকলে ভালো করে জানি। যারা নির্বাচন করতে পারে না নির্বাচন করে আসে না জনগণের পক্ষ থেকে। তাদের জবাবদিহির জায়গা থাকে না, তাদের কোনো কার্যকর ক্ষমতা থাকে না। এটি হলো বিষয়। গত এক বছর অন্তত আমি আটটি জায়গাতে লোকজনের সাথে বসে বসে কথা বলে এসেছি আপনাকে আমি সেটা বলি। লোকজন আওয়ামী লীগ জিতবে না বিএনপি জিতবে সেইটার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তিত সে তার ভোটটা দিতে পারবে কিনা। মানুষ ভোট দিতে চায়। সেটা সে কাকে দিবে কি করে করবে এটা আমি জানি না। কিন্তু ভোট দেয়ার আগ্রহ এটা ষোল আনা। এবং আপনি যদি দ্বিতীয়ত আপনি দেখেন, মানুষের মনের ভেতর এটাই আজ যে আপনি বলছেন মেগা প্রকল্প, সাচ্ছ্যন্দ ইত্যাদি। আসলে এই যে জাতীয় আলেখ্যটা আমরা তৈরি করেছি এই জাতীয় আলেখ্যের ভেতরে সত্য আছে। আবার এটার ভেতরে অনেক ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে। অর্থাৎ এই উন্নয়নের সুফল কি সবাই সমানভাবে পাচ্ছে? এই উন্নয়নের সুফল সমানভাবে আসে না। আমি আপনাকে বলি, মধ্যবিত্তের এখন যে পরিস্থিতি এমন প্রচুর পরিবার আছে যারা ঢাকা শহরে এখন বাড়ি ভাড়া দিতে পারে না দেখে রিভার্স মাইগ্রেশন আবার সেই কোভিডের মতো গ্রামে পরিবার রেখে আসছে। আমার পরিচিত মানুষের ভিতরে আছে যারা এক লাখ টাকা দেড় লাখ টাকার উপরে বেতন পায় তারা গাড়ি বসিয়ে রেখেছে তেলের পয়সা হয় না দেখে।

আমার পরিচিতের ভিতর এই যে আমি যাদের কাছে গেছি খুলনাতে আমাকে বলেছে ৬০-৭০ হাজার টাকা বেতন পায়। দুটো ছেলেকে পড়াতো পনেরো হাজার টাকা দিয়ে রেখেছিলো সেই স্কুল থেকে একজনকে ছাড়িয়েছে আর একজনকে রাখিনি। ডাক্তারদের কথা আমি বলছি আপনাদের, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনারা কি পেশেন্ট পাচ্ছেন? বলছে যে আগে পেশেন্ট আসতো আমরা ৪০% ডিসকাউন্ট দিতাম সে অপারেশন করে যেতো। আর এখন ৬০-৭০ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিতে চাই সে অপারেশন করতে চায় না। কারণ সেই খরচটা করার মত তার এখন অবস্থা নাই। আমাদের বুঝতে হবে যে এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া, এটাকে সব সময় আমাদের ব্যবস্থাপনার ভিতর রাখতে হবে, সজাগ থাকতে হবে এবং এটা রাজনীতিবিদদের ভিতরে থাকতে হবে।কিন্তু রাজনীতিবিদরা তো চালাচ্ছে না অর্থনীতি। এটা সকলেই জানে যে

কারা অর্থনীতি চালাচ্ছে এই মুহূর্তে। হয় আপনি চালাচ্ছেন যারা আপনার ব্যাংকিং লুট করে নিয়ে চলে যাচ্ছে না হলে আপনার এমন কিছু প্রশাসনিক ব্যক্তিরা আছেন যাদের কাছে হয়তো তাদের সময়কালের বাইরে তাদের আর কিছু চাওয়া পাওয়ার নাই। রাজনীতির যে গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ এই জায়গাটা যে এখানে আছে এইটা যদি না থাকে তাহলে এটা হয় না।

আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, যেকোনো একটি দেশ যদি ক্রমান্বয়ে এককেন্দ্রিক কর্তৃতবাদী পরিস্থিতির ভিতরে যেতে চায় তখন সে অন্যান্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে অবশ করে দেয়। অবশ করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় উপায়টি হলো নির্বাচনী প্রক্রিয়া যদি একটু শিথিল করে দেয়া যায়। এজন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়া আমাদের জীবনে শক্তিকে ফিরিয়ে দিবে। এক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশের অর্থনীতির যে বিরাট সম্ভাবনার কথা আমরা বলি এবং গত ১০ বছরে যে উন্নতিটা হয়েছে সেটা কেউ অস্বীকার করে না এবং সেই উন্নতিটাকে যদি ধরে রাখতে চাই,ওই মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাই ২০৪১ সালে যদি আমরা উন্নত দেশে নিতে চাই, আমরা যদি এলডিসি থেকে মসৃণ হয়ে বের হতে চাই তাহলে এটাকে আরেকটা সুষম উন্নয়নের জায়গায় নিতে হবে। ওই সুষম উন্নয়নের জায়গাকে নিশ্চিত করতে পারে। দেশের ভিতরে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং গণতান্ত্রিক আচরণের ভেতর নিয়ে যেতে। সেজন্য ২০২৩ সাল সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে।

সঞ্চালক: ২০২৩ সাল আমাদের জন্য এক অর্থে একটা পরীক্ষা

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মামুন একটা কথা আপনাকে বলতে চাই সেটা হলো যে, মানে আগামী বছরের আলোচনা হচ্ছে তো! আগামী বছর আমাদের জন্য একঅর্থে কিন্তু একটা পরীক্ষা। পরীক্ষাটা হলো এই যে, গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সমস্ত সমস্যা বা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এগুলোকে ধারণ করার মতো প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি আমার দেশের ভিতরে আছে কিনা। এটা টেস্ট হবে, এটার পরীক্ষা হবে। অর্থাৎ আপনি মনে করে দেখেন এর আগে যখন আমরা ৯০ এর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন করেছি তখন আমরা সংবিধানের ভিতরে একটা সমাধান বের করার চেষ্টা করেছি এবং সেটার ভিতর দিয়ে বের করে একটা ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছে, মওদুদী পদত্যাগ করেছেন শাহাবুদ্দিন সাহেব ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছে তারপর এর এরশাদ সাহেব পদত্যাগ করার মাধ্যমে তাকে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। এটা একটা প্রকৃত মধু দিয়ে করা হয়েছে।

আপনি যদি ফিরে আসেন ৯৬ এ যখন একটা অদ্ভুত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিএনপি ক্ষমতায় আসলো এবং তারপর যে আন্দোলনটা হলো তারপর তারা নিজেরাই সংবিধান পরিবর্তন করে একটা সমাধান রাস্তা দিয়েছে।দুটো কিন্তু সমাধানের রাস্তা আমাদের আছে

আবার সমাধান করতে পারি নাই এমন অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। ২০০৬ সালে আমরা সমাধান করতে পারিনি সমাধান করতে পারি নাই দেখে রাষ্ট্রের মূল প্রতিষ্ঠান বিকল হয়ে গিয়েছিল এবং সেটার আমরা দুই বছর একটা অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছি। আমার সামনে কিন্তু ২০২৩ এ এই দুই ধরনের উদাহরণই সামনে রয়েছে।

সঞ্চালক: তিন ধরনের উদাহরণ।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ তিন ধরনের উদাহরণ। আপনি যদি ফিরে যান ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী যে প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন এবং সেটা সেই যেটা গ্রহণ করলো না বিএনপি ওইটাও একটা সমাধান ছিল। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন সরকারের ভিতরে মন্ত্রীর পথ তিনি কিছু ছেড়ে দিবেন।উনারা এটা যে কি আক্কেলে নেন নাই সেসময় এটা আমি তখন বুঝতে পারি না এখন। তো সেতু এই সমস্যাগুলো কিন্তু সমাধানের জায়গা ছিল কিন্তু যদি আপনি মনে করেন আপনার কোনো নমনীয়তা নেই আর আপনি যদি মনে করেন এটার ফলে আপনার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা আছে আপনার ক্ষমতা হাত বদল হয়ে যাবে তাহলে আপনার এই নমনীয়তার জায়গাগুলো কিন্তু শক্ত হয়ে যাবে। সেহেতু আগামী ২০২৩ এ এটাই পরীক্ষা হবে আমাদের রাজনীতিবিদরা তারা কতখানি আলোকিতভাবে এই যে পথটাকে আমাদের কতখানি সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারেন।

যদি রাজনীতিবিদরা আলোকিতভাবে নিয়ে যেতে না পারেন তাহলে কিন্তু বাইরে যে শক্তিগুলো কাজ করে সেটা আপনি নাগরিক সমাজের কথাই বলেন অথবা পেশাজীবীদের কথাই বলেন,বা উর্দি পরা মানুষের কথাই বলেন তারা তখন ভিন্ন ভিন্নভাবে এক ধরনের সমাধানের পথকে নীতিবিদদের এক ধরনের চাপ দেওয়ার চেষ্টা করবে। আমি ভরসা করে আছি রাজনীতিবিদদের উপরে।

মির্জাপুর 'শুভরাত্রি', এটিএন বাংলা
সঞ্চালনায়: জ.ই.মামুন
১ জানুয়ারি ২০২৩

দেশে নতুন রাজনৈতিক বোঝাপড়া প্রয়োজন

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সমকাল: দেশে গণতন্ত্রের প্রশ্ন উঠলে পাল্টাপাল্টি উন্নয়নের কথাও ওঠে। উন্নয়ন, নাকি গণতন্ত্র- কোনোটা অগ্রাধিকার?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এ বিষয়ে আমি আগেও বলেছি; উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে প্রতিস্থাপন শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, বিরক্তিকরও। এটা যাঁরা বলেন তাঁরা আধুনিক উন্নয়নের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নন। আবার গণতন্ত্রের তাৎপর্য ও কার্যাবলি সম্পর্কেও পরিস্কার ধারণা নেই তাঁদের। সাধারণভাবে বলি, বৈশ্বিক উন্নয়নের ব্যাপারে যে আন্তর্জাতিক ঐকমত্য হয়েছে, এটা এসডিজি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নামে পরিচিত। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে এতে স্বাক্ষর করেছেন। সেখানে পরিষ্কার বলা আছে— উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে যদি মানবাধিকার, মানুষের মর্যাদাবোধ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সম্মান না থাকে, তাহলে সেটি প্রকৃত উন্নয়ন নয়। পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের যে ধারণা, তার মধ্যে গণতন্ত্র ও সব মানুষের সমান অধিকারের কথা উল্লেখ আছে বলেই বলা হয়েছে— কাউকে পেছনে রাখা যাবে না। এটিই আসলে গণতন্ত্রের ধারণা। কারণ, রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সব নাগরিক সমান। এটি পরিস্কার— উন্নয়নকে টেকসই করতে গণতন্ত্র দরকার। গণতন্ত্রহীনভাবে উন্নয়নকে টেকসই করা যায় না। এটিকে সুষম করা যায় না। ভারসাম্যপূর্ণভাবে নেওয়া যায় না। উন্নয়নহীনভাবেও গণতন্ত্রকে টেকসই করা যায় না। তখন উগ্রবাদ আসে, স্বৈরাচারের আবির্ভাব ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ববাদ আসে- নির্বাচিত ও অনির্বাচিতভাবে।

সমকাল: গণতন্ত্রে কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও উন্নয়নে অগ্রাধিকারের পক্ষে যারা বলেন, তারা মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এমনকি চীনের উদাহরণ দেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মনে রাখা দরকার, এসব দেশের কর্তৃত্ববাদী বা এককেন্দ্রিক সরকার নির্বাচিত কিনা। যদি নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তাহলে অনেক ধরনের নমনীয়তা পান। যেমন ভারতে নরেন্দ্র মোদি সরকারের কার্যক্রমের সঙ্গে যারা দ্বিমত পোষণ করেন, তারা এ বিষয়ে দ্বিমত করেন না- তিনি নির্বাচিত। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রে ঘাটতির জায়গাটি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে পূরণ সম্ভব। অর্থাৎ তার আমলাতন্ত্র কোনো ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়াবে না। তার সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব কলুষমুক্ত থাকবে। এ বিষয়গুলো তাকে দলীয় ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে। যেমন চীনে কেন্দ্রীয়ভাবে একদলীয় সরকার হলেও দলের অভ্যন্তরে বা স্থানীয় সরকারের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা হয়। দল বা স্থানীয় সরকারে গণতন্ত্র চর্চার মধ্য দিয়ে যে কেউ নেতৃত্বে ও কেন্দ্রীয় সরকারে আসতে পারে। আমাদের আরও নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। তা না হলে অর্ধসত্য থেকে যায়। ওই দেশগুলোতে শাসকদের কোনো না কোনো ধরনের বৈধতা নিয়ে থাকতে হয়। সেটি নির্বাচনী বৈধতা হতে পারে, স্থানীয় সরকারের বৈধতা হতে পারে, রাজনৈতিক দলের ভেতরে গণতন্ত্রের বৈধতা হতে পারে।

সমকাল: ওই দেশগুলো এবং আমাদের দেশেও দেখা যাচ্ছে, উন্নয়নের সঙ্গে বৈষম্যও বাড়ছে। কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ, চীনের সবচেয়ে বড় উন্নয়নের সময় বৈষম্যও বেশি বেড়েছে। যদি ৯০ ও ২০০০ দশক দেখেন— এমডিজি যখন হয়েছে, এ সময় চীনে উন্নয়ন যেমন হয়েছে, বৈষম্যও বেড়েছে। কাজেই আমাদেরও মনে রাখতে হবে কোনো ধরনের উন্নয়নের কথা বলছি। মেগা প্রকল্প, নাকি পিছিয়ে পড়া মানুষের সুরক্ষার কথা বলছি।

সমকাল: সরকার তো দুটির কথাই বলছে। তারা মেগা প্রকল্প করছে; সামাজিক সুরক্ষার আওতা বাড়িয়েছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রথম কথা হলো, সামাজিক সুরক্ষা খাতে আপনি কী পরিমাণ টাকা দিচ্ছেন। জিডিপির ২ শতাংশের বেশি নয়। এর মধ্যে ১ শতাংশ আবার সরকারি কর্মকর্তাদের অবসর ভাতা। তার মানে, আপনি ১ শতাংশের কম এ খাতে ব্যয় করছেন। বাংলাদেশের ২৪ শতাংশ মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে। অতিমারি-উত্তর এটি ৩০ শতাংশ। ৩ হাজার ডলার হয়েছে মাথাপিছু আয়, আর ভাতা দেওয়া হচ্ছে ৪ ডলার। তাহলে ৩ হাজার আর ৪ ডলারে কীভাবে সাম্য হলো? তারপর দেখেন, আপনি ২০টি মেগা প্রকল্পে যে অর্থ ব্যয় করেন, এর অর্ধেকও স্বাস্থ্য খাতে করছেন না। ২০টি প্রকল্পের সমান অর্থ আপনি পুরো জাতির শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য দেন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, খাতওয়ারি সাম্য হচ্ছে না। গড় জাতীয় আয়ের সঙ্গে মিলছে না।

সমকাল: কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকে উন্নয়ন তো হচ্ছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা অস্বীকার করি না। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বিস্তৃতি ঘটানো, সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে অল্প হলেও অগ্রগতি হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন হয়েছে। রেমিট্যান্স বেড়েছে, রপ্তানিও সচল ছিল। ২০৪১ সালে আমাদের উন্নত দেশের কাতারে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এগুলো যদি করতে হয় তাহলে আমরা যে পদ্ধতি বা চরিত্রের উন্নয়ন করে এসেছি, এর পরিবর্তন দরকার। আরও সুষমভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে নিতে হবে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলো মধ্যবিত্তের ফাঁদে আটকে আছে। অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ যদি হয়; বায়ুদূষণ ও পরিবেশ বিপর্যয়ের ব্যাপারগুলো যদি থাকে; স্থানীয় সরকার যদি দুর্বল থাকে; যদি দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে আমাদেরও ফাঁদে আটকে থাকতে হবে। গণতান্ত্রিক জবাবদিহি, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়ন— এ তিনটি বিষয়ে যদি কাঠামোগত পরিবর্তন করা না যায়, তাহলে সাফল্য আসবে না। বরং নানা ধরনের সংকটের মুখে পড়তে হবে।

সমকাল: বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের পরিবর্তন হলেই কি কাঠামোগত পরিবর্তন হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশে যে দুটি বৃহৎ দল আছে, তাদের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির মধ্যে পার্থক্য সামান্য। আগে আমরা বলতাম, আওয়ামী লীগ কৃষিসমাজ, মধ্যবিত্ত, পেশাজীবী সমাজের দল। এখন তো আমরা এটি বলতে পারি না। ক্ষমতাসীনরা এখন নব্য ধনিকের দল। বিএনপিকে আগে আমরা মনে করতাম, আধুনিক, রপ্তানিমুখী ও বিকাশমান ধনিকের দল। এখন তারাও গ্রামীণ মধ্যবিত্তের কাছে পৌঁছানোর জন্য ধর্মীয় কার্ড খেলছে। এর বাইরে এখন দুই দলই একমত— অবকাঠামোগত উন্নয়ন লাগবে। দুই দলই বলে— মানবসম্পদের উন্নয়ন করতে হবে, রপ্তানির বৈধতা লাগবে, আঞ্চলিক সহযোগিতা লাগবে, শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করতে হবে, রেমিট্যান্সের বাজার উন্মুক্ত করতে হবে। অর্থনীতি ও কূটনীতির প্রশ্নে দুই দলের মধ্যে বড় ধরনের কোনো ব্যত্যয় আমরা দেখি না। সরকার পরিবর্তন হলে মেগা প্রকল্পের চরিত্রের পরিবর্তন হতে পারে বা একই প্রকল্প নতুন নামে চালু হতে পারে অথবা ওই প্রকল্পই থাকবে; শুধু সুবিধাভোগীর গোষ্ঠীটা বদল হবে। যে জায়গায় আগে আমরা সবচেয়ে বড় তফাত লক্ষ্য করতাম তা হলো, জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন, রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কের প্রশ্ন। দুঃখজনক হলেও সত্য, সে ক্ষেত্রে বর্তমান শাসক দল আগের অবস্থানে নেই। যারা মনে করেন, সরকার পরিবর্তন হলে নীতিগত পরিবর্তন হয়ে যাবে— সে রকম দুশ্চিন্তার কারণ আমি দেখি না।

সমকাল: তাহলে নীতি ও কাঠামোগত পরিবর্তন কীভাবে আসবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেশে আসলে একটি নতুন রাজনৈতিক বোঝাপড়া প্রয়োজন। সবাইকে সেটা ধারণ করতে হবে।

সমকাল: বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করে বলবেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমরা এ রকম একটি রাজনৈতিক বোঝাপড়া করেছিলাম এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময়। ওই সময় তিন জোটের পক্ষ থেকে আমরা একটি রূপরেখা তৈরি করেছিলাম। সংবিধানকে অক্ষত রেখে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় নির্বাচনের মাধ্যমে উত্তরণ ঘটিয়েছি। গণতন্ত্রের নতুন যুগে প্রবেশ করেছি। আমরা আরেকবার বোঝাপড়া করেছিলাম ১৯৯৬ সালে। আমরা সবাই মিলে একমত হয়েছিলাম— একটি ভালো নির্বাচন দরকার। সেটা হতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। কিন্তু ২০০৪–০৫ সালে বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটিকে কলুষিত করে ফেলা হলো। তখন ওই ধারণা অতিক্রম করে রাষ্ট্রের একাংশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। আবার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুরো বোঝাপড়াটি অবলোপন করে দেওয়া হয়েছে। এরপর থেকে গণতন্ত্র সেই অর্থে মসৃণ গতিতে এগোতে পারেনি। দেশের জন্য এখন একটি নতুন রাজনৈতিক বোঝাপড়া প্রয়োজন।

সমকাল: নতুন বোঝাপড়া মানে কি আবার অনির্বাচিত সরকার?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রথম কথা হলো, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থার জন্য সবার সঙ্গে বোঝাপড়া। যদি সেই বোঝাপড়া ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচনও হয়, শান্তি আসবে না। নির্বাচনের মাধ্যমে যে-ই ক্ষমতায় আসুক— সংঘাত, সহিংসতা, দৌরাত্ম্য, বৈপরীত্য থেকেই যাবে। হবে না। কাজেই বৃহত্তর রাজনৈতিক অনুধাবন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এটি সবার স্বার্থেই দরকার। রাজনীতিবিদদের জন্য বিশেষভাবে দরকার। তা না হলে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থেকেই যাবে।

সমকাল: বোঝাপড়া তো করতে হবে রাজনীতিকদেরই। যুযুধান পরিস্থিতিতে সেটা কি সম্ভব?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার যেটি মনে হয়, সবাইকে অনুধাবনের জায়গায় পৌঁছাতে হবে। দেখেন, কীভাবে হরতাল বন্ধ হলো। এটি এ জন্য বন্ধ হয়নি যে, হরতাল করার শক্তি কারও নেই। কিন্তু জনমানুষের কাছে আবেদন হারিয়ে ফেলেছে। রাজনীতিকদের মধ্যে যদি বোঝাপড়া না হয়, তাহলে রাজনীতির ক্ষেত্রেও ওইভাবে আবেদন চলে যাবে। একটি দেশে রাজনীতি যদি আবেদন হারিয়ে ফেলে, তাহলে আগে বিশ্বে দেখেছি স্বৈরশাসন আসত।

সমকাল: এখন তো স্বৈরশাসনের ধ্রুপদি চরিত্র নেই।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এখনও উগ্রবাদী স্বৈরশাসন আছে অনেক দেশে। আফগানিস্তান তো বেশি দূরে নয়। বিভিন্ন ধরনের স্বৈরশাসন আসতে পারে। আপনি মিয়ানমারে দেখেন, ওখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বৈরশাসন সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার করছে। এসব শাসকের প্রতি সাময়িক আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তারা ক্ষমতায় এসে সবকিছুর পরিবর্তন ঘটাবে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তার ফল ভালো হয় না। এগুলো তো আমরা দেখেছি। তাই আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। কেউ ঠেকে শেখে, কেউ দেখে শেখে। আমার ভরসা, বাঙালি তো বুদ্ধিমান জাতি। তারা দেখেও এসেছে, ঠেকেও এসেছে। কাজেই শেখার ব্যাপার আছে।

সমকাল: এক্ষেত্রে বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি দাঁড়িয়ে যেতে পারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কার্ল মার্ক্স বলেছেন— ধনতন্ত্রের গর্ভে ধনতন্ত্রের গোরখোদকরা জন্মায়। গত দেড় বছরে এ সরকারের প্রতিপক্ষ শক্তি হিসেবে নতুন মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত যুবসমাজ দেখা যাচ্ছে। এই নতুন মধ্যবিত্ত খুবই গোলকায়িত। দেশীয় সামাজিক চিন্তাধারায় যেমন, তেমনই বৈশ্বিক যোগাযোগে আছে। তাদের ন্যায়-অন্যায়বোধ খুব পরিষ্কার। সুশাসনের সুবিধা-অসুবিধা তারা বোঝে। তারা রাজনীতি করে না; কিন্তু অরাজনৈতিক নয়। আপনি যদি বিশ্বের দিকে তাকান দেখবেন, প্রথাগত রাজনীতিবিদরা মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারছেন না বিভিন্ন কারণে। তখন জনগণ বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি খোঁজে। আগে তারা সেনাশাসন খুঁজত। এখন এর বাইরে গিয়ে সামাজিক শক্তি খোঁজে। সবচেয়ে বড় উদাহরণ সুদান। লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে নতুনভাবে বাম শক্তি আবার আসছে। চিলির মতো দেশে বাম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। দেখেন, থাইল্যান্ডে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে যুবসমাজ কীভাবে আন্দোলন করছে। মিয়ানমারেও দেখেন। আমি তো মনে করি, মিয়ানমারে প্রবাসী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করলে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হবে।

সমকাল: এই সামাজিক শক্তি বাংলাদেশে কী অবস্থায় আছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এখানে এই শক্তি হঠাৎ আসেনি। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে তারা সক্রিয় ছিল। আরও নিকটে এলে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আন্দোলনে না এলে এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ক্ষমতায় আসতে পারত? ২০০৬-০৭ সালে সৎ, যোগ্য প্রার্থীর কথা বলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভূমিকা রেখেছিল— এটা তো সত্য। বাংলাদেশের ইতিহাস হলো, যখনই নাগরিক শক্তি

আর গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল শক্তি এক হয়েছে তখন তারা ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পেরেছে। আর যখন তারা দুই ভাগে গেছে, তখন দেশে সমস্যার সমাধান জটিল হয়েছে।

সমকাল: কিন্তু নাগরিক সমাজই তো আগের চেয়ে দুর্বল ও বিভক্ত হয়ে গেছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নাগরিক শক্তি এক রকমের হয় না, বহুবিধ নাগরিক শক্তি আছে। যেসব দেশে কর্তৃত্ববাদী সরকার এসেছে, সেসব দেশে নাগরিক সমাজের কার্যকারিতা সংকুচিত হয়ে গেছে। আরেকটি বিষয় হলো, নাগরিক শক্তির মধ্যে একটি ভীতি কাজ করে— বিকল্পটি কী? তখন তারা সরকারের অংশ হয়ে যায়। নাগরিক শক্তি যদি তার স্বাধীন সত্তা হারায়, রাষ্ট্রের অংশ হয়ে যায়, তখন আবেদন হারায়।

সমকাল: বিরোধীদল ঘনিষ্ঠ নাগরিক সমাজের ক্ষেত্রেও কি একই কথা বলা চলে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ঠিকই বলেছেন। যদি সরকার পতন করতে গিয়ে বিরোধী অন্য শক্তির অংশ হয়ে যায়, তাহলেও নাগরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের নাগরিক শক্তির মূল চেহারা হলো— তারা ‘৭১-এর চেতনার মধ্যে থাকে; ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক; গরিব মানুষের পক্ষে; প্রগতিশীল চিন্তা করে। ওই ধারাটা এখনও আছে। কিন্তু বাস্তবতার কারণে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব আরও গভীর হয়েছে। রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে নাগরিক শক্তি মিলিত হতে পারার পরিসর কমে গেছে। মুক্ত বাতাসে দু’জন লোক কথা বলবে— সেই আস্থার জায়গাটি নেই।

সমকাল
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

গণতন্ত্রহীনভাবে উন্নয়নকে টেকসই করা যায় না

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

গণতন্ত্রের ধারণা হলো— কাউকে পেছনে রাখা যাবে না। রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সব নাগরিক সমান। এটি পরিষ্কার— উন্নয়নকে টেকসই করতে গণতন্ত্র দরকার। গণতন্ত্রহীনভাবে উন্নয়নকে টেকসই করা যায় না। এটিকে সুষম করা যায় না। ভারসাম্যপূর্ণভাবে নেয়া যায় না। যখন গণতন্ত্র থাকে না তখন উগ্রবাদ আসে, স্বৈরাচারের আবির্ভাব ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ববাদ আসে— নির্বাচিত ও অনির্বাচিতভাবে। উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে প্রতিস্থাপন শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, বিরক্তিকরও।

এটা যারা বলেন তারা আধুনিক উন্নয়নের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নন। আবার গণতন্ত্রের তাৎপর্য ও কার্যাবলি সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা নেই তাদের। সাধারণভাবে বলি, বৈশ্বিক উন্নয়নের ব্যাপারে যে আন্তর্জাতিক ঐকমত্য হয়েছে, এটা এসডিজি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নামে পরিচিত। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে এতে স্বাক্ষর করেছেন। সেখানে পরিষ্কার বলা আছে- উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে যদি মানবাধিকার, মানুষের মর্যাদাবোধ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সম্মান না থাকে, তাহলে সেটি প্রকৃত উন্নয়ন নয়। পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের যে ধারণা, তার মধ্যে গণতন্ত্র ও সব মানুষের সমান অধিকারের কথা উল্লেখ আছে বলেই বলা হয়েছে— কাউকে পেছনে রাখা যাবে না।

গণতন্ত্রে কিছুটা ছাড় দিয়ে উন্নয়নে অগ্রাধিকার

মনে রাখা দরকার, এসব দেশের কর্তৃত্ববাদী বা এককেন্দ্রিক সরকার নির্বাচিত কিনা। যদি নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তাহলে অনেক ধরনের নমনীয়তা পান। যেমন ভারতে নরেন্দ্র

মোদি সরকারের কার্যক্রমের সঙ্গে যারা দ্বিমত পোষণ করেন, তারা এ বিষয়ে দ্বিমত করেন না— তিনি নির্বাচিত। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রে ঘাটতির জায়গাটি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে পূরণ সম্ভব। অর্থাৎ তার আমলাতন্ত্র কোনো ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়াবে না। তার সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব কলুষমুক্ত থাকবে। এ বিষয়গুলো তাকে দলীয় ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে। যেমন চীনে কেন্দ্রীয়ভাবে একদলীয় সরকার হলেও দলের অভ্যন্তরে বা স্থানীয় সরকারের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা হয়। দল বা স্থানীয় সরকারে গণতন্ত্র চর্চার মধ্য দিয়ে যে কেউ নেতৃত্বে ও কেন্দ্রীয় সরকারে আসতে পারে। আমাদের আরও নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। তা না হলে অর্ধসত্য থেকে যায়। ওই দেশগুলোতে শাসকদের কোনো না কোনো ধরনের বৈধতা নিয়ে থাকতে হয়। সেটি নির্বাচনী বৈধতা হতে পারে, স্থানীয় সরকারের বৈধতা হতে পারে, রাজনৈতিক দলের ভেতরে গণতন্ত্রের বৈধতা হতে পারে।

উন্নয়নের সঙ্গে বৈষম্য বৃদ্ধি

চীনের সবচেয়ে বড় উন্নয়নের সময় বৈষম্যও বেশি বেড়েছে। যদি ৯০ ও ২০০০ দশক দেখেন— এমডিজি যখন হয়েছে, এ সময় চীনে উন্নয়ন যেমন হয়েছে, বৈষম্যও বেড়েছে। কাজেই আমাদেরও মনে রাখতে হবে কোনো ধরনের উন্নয়নের কথা বলছি। মেগা প্রকল্প, নাকি পিছিয়ে পড়া মানুষের সুরক্ষার কথা বলছি।

সরকারের মেগা প্রকল্প ও সামাজিক সুরক্ষার আওতা বাড়ানোর দাবির প্রশ্নে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, প্রথম কথা হলো, সামাজিক সুরক্ষা খাতে আপনি কী পরিমাণ টাকা দিচ্ছেন। জিডিপির ২ শতাংশের বেশি নয়। এর মধ্যে ১ শতাংশ আবার সরকারি কর্মকর্তাদের অবসর ভাতা। তার মানে, আপনি ১ শতাংশের কম এ খাতে ব্যয় করছেন। বাংলাদেশের ২৪ শতাংশ মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে। অতিমারি-উত্তর এটি ৩০ শতাংশ। ৩ হাজার ডলার হয়েছে মাথাপিছু আয়, আর ভাতা দেওয়া হচ্ছে ৪ ডলার। তাহলে ৩ হাজার আর ৪ ডলারে কীভাবে সাম্য হলো? তারপর দেখেন, আপনি ২০টি মেগা প্রকল্পে যে অর্থ ব্যয় করেন, এর অর্ধেকও স্বাস্থ্য খাতে করছেন না। ২০টি প্রকল্পের সমান অর্থ আপনি পুরো জাতির শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য দেন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, খাতওয়ারি সাম্য হচ্ছে না। গড় জাতীয় আয়ের সঙ্গে মিলছে না।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকে উন্নয়ন

এটা অস্বীকার করি না। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বিস্তৃতি ঘটানো, সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে অল্প হলেও অগ্রগতি হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়

উন্নয়ন হয়েছে। রেমিট্যান্স বেড়েছে, রপ্তানিও সচল ছিল। ২০৪১ সালে আমাদের উন্নত দেশের কাতারে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এগুলো যদি করতে হয় তাহলে আমরা যে পদ্ধতি বা চরিত্রের উন্নয়ন করে এসেছি, এর পরিবর্তন দরকার। আরও সুষমভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষকে এগিয়ে নিতে হবে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলো মধ্যবিত্তের ফাঁদে আটকে আছে। অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ যদি হয়; বায়ুদূষণ ও পরিবেশ বিপর্যয়ের ব্যাপারগুলো যদি থাকে; স্থানীয় সরকার যদি দুর্বল থাকে; যদি দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে আমাদেরও ফাঁদে আটকে থাকতে হবে। গণতান্ত্রিক জবাবদিহি, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়ন— এ তিনটি বিষয়ে যদি কাঠামোগত পরিবর্তন করা না যায়, তাহলে সাফল্য আসবে না। বরং নানা ধরনের সংকটের মুখে পড়তে হবে।

বর্তমান সরকারের ক্ষমতার পালাবদলে সম্ভাব্য কাঠামোগত পরিবর্তন

বাংলাদেশে যে দুটি বৃহৎ দল আছে, তাদের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির মধ্যে পার্থক্য সামান্য। আগে আমরা বলতাম, আওয়ামী লীগ কৃষিসমাজ, মধ্যবিত্ত, পেশাজীবী সমাজের দল। এখন তো আমরা এটি বলতে পারি না। ক্ষমতাসীনরা এখন নব্য ধনিকের দল। বিএনপিকে আগে আমরা মনে করতাম, আধুনিক, রপ্তানিমুখী ও বিকাশমান ধনিকের দল। এখন তারাও গ্রামীণ মধ্যবিত্তের কাছে পৌঁছানোর জন্য ধর্মীয় কার্ড খেলছে। এর বাইরে এখন দুই দলই একমত— অবকাঠামোগত উন্নয়ন লাগবে। দুই দলই বলে- মানবসম্পদের উন্নয়ন করতে হবে, রপ্তানির বৈধতা লাগবে, আঞ্চলিক সহযোগিতা লাগবে, শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করতে হবে, রেমিট্যান্সের বাজার উন্মুক্ত করতে হবে। অর্থনীতি ও কূটনীতির প্রশ্নে দুই দলের মধ্যে বড় ধরনের কোনো ব্যত্যয় আমরা দেখি না। সরকার পরিবর্তন হলে মেগা প্রকল্পের চরিত্রের পরিবর্তন হতে পারে বা একই প্রকল্প নতুন নামে চালু হতে পারে অথবা ওই প্রকল্পই থাকবে; শুধু সুবিধাভোগীর গোষ্ঠীটা বদল হবে। যে জায়গায় আগে আমরা সবচেয়ে বড় তফাত লক্ষ্য করতাম তা হলো, জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন, রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্কের প্রশ্ন। দুঃখজনক হলেও সত্য, সেক্ষেত্রে বর্তমান শাসক দল আগের অবস্থানে নেই। যারা মনে করেন, সরকার পরিবর্তন হলে নীতিগত পরিবর্তন হয়ে যাবে— সে রকম দুশ্চিন্তার কারণ আমি দেখি না।

নীতি ও কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া

দেশে আসলে একটি নতুন রাজনৈতিক বোঝাপড়া প্রয়োজন। সবাইকে সেটা ধারণ করতে হবে। আমরা এ রকম একটি রাজনৈতিক বোঝাপড়া করেছিলাম এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময়। ওই সময় তিন জোটের পক্ষ থেকে আমরা একটি রূপরেখা তৈরি করেছিলাম। সংবিধানকে অক্ষত রেখে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় নির্বাচনের মাধ্যমে উত্তরণ

ঘটিয়েছি। গণতন্ত্রের নতুন যুগে প্রবেশ করেছি। আমরা আরেকবার বোঝাপড়া করেছিলাম ১৯৯৬ সালে। আমরা সবাই মিলে একমত হয়েছিলাম— একটি ভালো নির্বাচন দরকার। সেটা হতে হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। কিন্তু ২০০৪–০৫ সালে বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটিকে কলুষিত করে ফেলা হলো। তখন ওই ধারণা অতিক্রম করে রাষ্ট্রের একাংশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। আবার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুরো বোঝাপড়াটি অবলোপন করে দেওয়া হয়েছে। এর পর থেকে গণতন্ত্র সেই অর্থে মসৃণ গতিতে এগোতে পারেনি। দেশের জন্য এখন একটি নতুন রাজনৈতিক বোঝাপড়া প্রয়োজন।

সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থার জন্য সবার সঙ্গে বোঝাপড়া। যদি সেই বোঝাপড়া ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচনও হয়, শান্তি আসবে না। নির্বাচনের মাধ্যমে যে-ই ক্ষমতায় আসুক— সংঘাত, সহিংসতা, দৌরাত্ম্য, বৈপরীত্য থেকেই যাবে। হবে না। কাজেই বৃহত্তর রাজনৈতিক অনুধাবন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এটি সবার স্বার্থেই দরকার। রাজনীতিবিদদের জন্য বিশেষভাবে দরকার। তা না হলে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থেকেই যাবে।

রাজনীতিবিদদের প্রতি পরামর্শ

আমার যেটি মনে হয়, সবাইকে অনুধাবনের জায়গায় পৌঁছাতে হবে। দেখেন, কীভাবে হরতাল বন্ধ হলো। এটি এ জন্য বন্ধ হয়নি যে, হরতাল করার শক্তি কারও নেই। কিন্তু জনমানুষের কাছে আবেদন হারিয়ে ফেলেছে। রাজনীতিকদের মধ্যে যদি বোঝাপড়া না হয়, তাহলে রাজনীতির ক্ষেত্রেও ওইভাবে আবেদন চলে যাবে। একটি দেশে রাজনীতি যদি আবেদন হারিয়ে ফেলে, তাহলে আগে বিশ্বে দেখেছি স্বৈরশাসন আসত।

দেশের স্বৈরশাসন আসার সম্ভাবনার বিষয়

এখনও উগ্রবাদী স্বৈরশাসন আছে অনেক দেশে। আফগানিস্তান তো বেশি দূরে নয়। বিভিন্ন ধরনের স্বৈরশাসন আসতে পারে। আপনি মিয়ানমারে দেখেন, ওখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বৈরশাসন সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার করছে। এসব শাসকের প্রতি সাময়িক আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তারা ক্ষমতায় এসে সবকিছুর পরিবর্তন ঘটাবে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তার ফল ভালো হয় না। এগুলো তো আমরা দেখেছি। তাই আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। কেউ ঠেকে শেখে, কেউ দেখে শেখে। আমার ভরসা, বাঙালি তো বুদ্ধিমান জাতি। তারা দেখেও এসেছে, ঠেকেও এসেছে। কাজেই শেখার ব্যাপার আছে।

কার্ল মার্ক্স বলেছেন— ধনতন্ত্রের গর্ভে ধনতন্ত্রের গোরখোদকরা জন্মায়। গত দেড় বছরে এ সরকারের প্রতিপক্ষ শক্তি হিসেবে নতুন মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত যুবসমাজ দেখা যাচ্ছে। এই নতুন মধ্যবিত্ত খুবই গোলকায়িত। দেশীয় সামাজিক চিন্তাধারায় যেমন, তেমনই বৈশ্বিক যোগাযোগে আছে। তাদের ন্যায়-অন্যায়বোধ খুব পরিস্কার। সুশাসনের সুবিধা-অসুবিধা তারা বোঝে। তারা রাজনীতি করে না; কিন্তু অরাজনৈতিক নয়। আপনি যদি বিশ্বের দিকে তাকান দেখবেন, প্রথাগত রাজনীতিবিদরা মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারছেন না বিভিন্ন কারণে। তখন জনগণ বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি খোঁজে। আগে তারা সেনাশাসন খুঁজত। এখন এর বাইরে গিয়ে সামাজিক শক্তি খোঁজে। সবচেয়ে বড় উদাহরণ সুদান। লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে নতুনভাবে বাম শক্তি আবার আসছে। চিলির মতো দেশে বাম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। দেখেন, থাইল্যান্ডে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে যুবসমাজ কীভাবে আন্দোলন করছে। মিয়ানমারেও দেখেন। আমি তো মনে করি, মিয়ানমারে প্রবাসী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করলে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হবে।

বাংলাদেশে সামাজিক শক্তির অবস্থান

এখানে এই শক্তি হঠাৎ আসেনি। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে তারা সক্রিয় ছিল। আরও নিকটে এলে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আন্দোলনে না এলে এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ক্ষমতায় আসতে পারত? ২০০৬-০৭ সালে সৎ, যোগ্য প্রার্থীর কথা বলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভূমিকা রেখেছিল— এটা তো সত্য। বাংলাদেশের ইতিহাস হলো, যখনই নাগরিক শক্তি আর গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল শক্তি এক হয়েছে তখন তারা ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পেরেছে। আর যখন তারা দুই ভাগে গেছে, তখন দেশে সমস্যার সমাধান জটিল হয়েছে।

নাগরিক সমাজের বিভক্তি

নাগরিক শক্তি এক রকমের হয় না, বহুবিধ নাগরিক শক্তি আছে। যেসব দেশে কর্তৃত্ববাদী সরকার এসেছে, সেসব দেশে নাগরিক সমাজের কার্যকারিতা সংকুচিত হয়ে গেছে। আরেকটি বিষয় হলো, নাগরিক শক্তির মধ্যে একটি ভীতি কাজ করে— বিকল্পটি কী? তখন তারা সরকারের অংশ হয়ে যায়। নাগরিক শক্তি যদি তার স্বাধীন সত্তা হারায়, রাষ্ট্রের অংশ হয়ে যায়, তখন আবেদন হারায়।

যদি সরকার পতন করতে গিয়ে বিরোধী অন্য শক্তির অংশ হয়ে যায়, তাহলেও নাগরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের নাগরিক শক্তির মূল চেহারা হলো- তারা ‘৭১-এর

চেতনার মধ্যে থাকে; ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক; গরিব মানুষের পক্ষে; প্রগতিশীল চিন্তা করে। ওই ধারাটা এখনও আছে। কিন্তু বাস্তবতার কারণে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব আরও গভীর হয়েছে। রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে নাগরিক শক্তি মিলিত হতে পারার পরিসর কমে গেছে। মুক্ত বাতাসে দু'জন লোক কথা বলবে— সেই আস্থার জায়গাটি নেই।

মানবজমিন
২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

পরিকল্পনা ‘আকাশে’ আছে, ‘মর্ত্যে’ আনতে হবে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রশ্ন: ৫–৯ মার্চ কাতারের রাজধানী দোহায় জাতিসংঘের এলডিসি-৫ সম্মেলন হচ্ছে। বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় আছে। এই সম্মেলন কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) জন্য এটি পঞ্চম সম্মেলন। প্রতি ১০ বছর অন্তর এই সম্মেলন হয়। এতে সাধারণত উন্নয়ন-সহযোগী ও এলডিসির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা অংশ নেন। এই সম্মেলনে এলডিসির উন্নয়ন এবং উত্তরণে কী ধরনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন, সেই বিষয়ে একটি সম্মতিপত্র গৃহীত হয়।এই এলডিসি সম্মেলনের সূত্রপাত হয় ১৯৮১ সালে। প্রথম দুবার হয় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে, পরের বার ব্রাসেলসে এবং সর্বশেষ ২০১১ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবার কাতারের দোহায় হবে। সম্মেলনে এলডিসির অভিপ্রায় ও অঙ্গীকার নিয়েই বেশি আলোচনা হয়। ২০১১ সালের ব্রাসেলস সম্মেলনে বড় সাফল্য ছিল এভরিথিং বাট আর্মস (ইবিএ) সুবিধার আওতায় ইউরোপের বাজারে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত বাজারসুবিধার প্রবর্তন। সম্মেলনের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য টেকনোলজি ব্যাংক গঠিত হয়। তাহলে এবার কী হবে, সেদিকে লক্ষ দিই।গত বছরই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। অতিমারির কারণে চলাচল সীমিত হওয়ায় তা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। কিন্তু ২০২২ সালের মার্চ মাসে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য দোহা কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরবর্তী সময়ে এপ্রিল ২০২২-এ এই দলিল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অনুমোদন লাভ করে। আগামী ১০ বছরের জন্য একটি অভিযোগ্য (অ্যাকশনেবল) কর্মপরিকল্পনা আগেই নির্ধারিত হয়ে যাওয়ায় এই সম্মেলন এখন অনেকটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। তাই এবার সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দর-কষাকষি ও উত্তেজনা অনেক কম। এ ছাড়া বিরাজমান

বিভিন্নমুখী বৈশ্বিক পরিস্থিতির ও প্রবলতার কারণে প্রধান প্রধান উন্নয়ন-সহযোগীরও এবার আগ্রহ একটু স্তিমিত। উন্নত দেশগুলোর নিজেদের অর্থনীতিতে চাপ, ইউক্রেন যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে এলডিসি নিয়ে একধরনের অবসাদ সৃষ্টি হয়েছে। তাই এই সম্মেলনে বড় বড় দেশের শীর্ষ নেতারা খুব বেশি যাচ্ছেন না।

প্রশ্ন: গত ৫০ বছরে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো কতটা এগিয়ে গেল?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জাতিসংঘের আওতায় ১৯৭১ সালে এলডিসির ধারণাটির যাত্রা শুরু হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে যারা একটু পিছিয়ে আছে, তাদের একটি আলাদা তালিকা করা হয়, যা স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি হিসেবে পরিচিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৫৩টি স্বল্পোন্নত দেশ তালিকাভুক্ত হয়েছিল। এখন এ রকম ৪৬টি দেশ আছে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ এর সদস্য হয়। এলডিসি তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য শর্তের চেয়ে জনসংখ্যা বেশি থাকার পরও স্বাধীনতা-পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনা করে সহমর্মিতা দেখিয়ে বাংলাদেশকে এলডিসিতে তালিকাভুক্ত করা হয়। এই পর্যন্ত মালদ্বীপসহ ছয়টি দেশ এলডিসি তালিকা থেকে বের হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ ১৬টি দেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। বিশ্বের ১৪ শতাংশ জনগোষ্ঠীর বসবাস এই স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে। কিন্তু বৈশ্বিক জিডিপির মাত্র ১ দশমিক ৩ শতাংশের জোগান দেয় এসব দেশ। এসব দেশ থেকে বিশ্ব রপ্তানির ১ শতাংশের কম হয়। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ১ দশমিক ৪ শতাংশ পায় স্বল্পোন্নত দেশগুলো। এতে বোঝা যায়, বিশ্বে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রান্তিক অবস্থান ৫০ বছর ধরে অপরিবর্তিত আছে।

প্রশ্ন: স্বল্পোন্নত দেশগুলো কেন তাদের পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারল না?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মূলত তিনটি কারণে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অগ্রগতি কম। প্রথমত, এসব দেশের উৎপাদন সক্ষমতার শ্লথ বিকাশ হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বেশ কম। তৃতীয়ত, বহির্জনিষ্ণু ধাক্কায় (এক্সটার্নাল শক) অনেক দেশ বিপন্ন হয়েছে। এ ছাড়া বৈরী ভৌগোলিক অবস্থান অনেক এলডিসির উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এর মধ্যে আফ্রিকা ও দক্ষিণ প্যাসিফিকের অনেক স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থান আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে গেছে।যে প্রশ্নটি উঠছে তা হলো, সার্বিকভাবে বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে নাকি অভ্যন্তরীণ দুর্বল শাসনব্যবস্থার কারণে স্বল্পোন্নত দেশগুলো এগোতে পারছে না। উন্নয়ন-সহযোগী দেশগুলোর কাছ থেকে তাদের জাতীয় আয়ের দশমিক ৭ শতাংশ উন্নয়ন-সহায়তা পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এলডিসিরা পেয়েছে মাত্র দশমিক ৩ শতাংশ। আবার উন্নয়ন-সহযোগী দেশগুলো বাজারসুবিধা দিয়েছে, মেধাস্বত্ব আইন শিথিল করেছে।

উন্নত দেশ থেকে প্রযুক্তির হস্তান্তরও হয়েছে। একটি দেশের উত্তরণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, কিন্তু মুখ্য দায়িত্ব ওই দেশের নিজের। স্বল্পোন্নত দেশগুলো সে দায়িত্ব পূর্ণ করতে পেরেছে, তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

প্রশ্ন: কোভিডের কারণে বাংলাদেশসহ উত্তরণ পর্যায়ে থাকা দেশগুলোর কী অবস্থা?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: গত দুই বছরে অতিমারি ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশসহ উত্তরণ পর্যায়ে থাকা স্বল্পোন্নত দেশগুলো আগের চেয়ে দুর্বল হয়েছে। স্মরণ করা যায় যে ইতোমধ্যে অ্যাঙ্গোলা তাদের উত্তরণ প্রক্রিয়া নিজেরা আবেদন করে স্থগিত করেছে। সলোমন আইল্যান্ডের ২০২৪ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের সময়সীমা ঠিক করা ছিল। কিন্তু এখন তারা নিজেরাই অনুরোধ করেছে, তিন বছর যেন পিছিয়ে দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে তাদের অনুরোধ গৃহীত হয়েছে। লাওসের বৈদেশিক ঋণের ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। নেপাল ও ভুটানের অবস্থাও আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ হলো তারকা দেশ। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে গতি নিয়ে এলডিসি থেকে বের হওয়ার জন্য এগোচ্ছিল, তাতে টান পড়েছে। তবে শুধু অতিমারি এবং ইউক্রেন যুদ্ধ দিয়ে এই দুর্বল অবস্থান ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। অভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কিত ও প্রাতিষ্ঠানিক নানা সমস্যাও এর জন্য দায়ী। বাংলাদেশকেও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের অর্থ নিতে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি কিছুটা সমস্যায় তো পড়েছে, তা না হলে দুই চিকিৎসক (আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক) ডাকতে হলো কেন? মূলত দুটি কারণে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বাজেট সহায়তা চাওয়া হয়েছে। একটি হলো বাজেটীয় ঘাটতি এবং অপরটি বৈদেশিক খাতের ঘাটতি। তবে এলডিসি থেকে উত্তরণ বাধাগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি নেই বাংলাদেশের। সময়মতো (২০২৬ সালে) বের হয়ে যাবে বাংলাদেশ। কিন্তু যে ধরনের শক্তিমত্তা নিয়ে বের হওয়ার কথা ছিল, সেই সামর্থ্যের জায়গায় দেশ কিছুটা হীনবল হয়েছে।

প্রশ্ন: এলডিসি উত্তরণে বাংলাদেশের শক্তির জায়গা কোথায়? দুর্বলতা কোথায়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ হলো গৌরবোজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এই তালিকা থেকে বের হতে অন্য দেশগুলো উৎসাহহীনভাবে উত্তরণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়। কিন্তু বাংলাদেশ এই উত্তরণকে অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব উত্তরণের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং জলবায়ু সম্পর্কিত ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা—এই তিনটি সূচকের নির্ধারিত মাত্রার অনেক ওপরে আছে বাংলাদেশ। এমন সাফল্য অন্য কোনো

দেশের নেই।তবে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ হতে বাংলাদেশের অন্তত চারটি দুর্বল জায়গা চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, রাজস্ব আহরণের মাত্রা অত্যন্ত কম। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু সে তুলনায় রাজস্ব আদায় হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক এবং ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত হারে হচ্ছে না। বিনিময় হার কম রাখা হলো, সুদের হার কম করা হলো, কিন্তু বিনিয়োগ বাড়ল না। তৃতীয়ত, শুল্ক-করসহ এত প্রণোদনা দেওয়া হলো। কিন্তু তৈরি পোশাক ছাড়া অন্য কোনো খাত দৃশ্যমানভাবে শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড়াতে পারল না এখনো। এর অনুষঙ্গ হচ্ছে চাহিদা অনুযায়ী কর্মসংস্থান না হওয়া। চতুর্থত, মানবসম্পদে ঘাটতি আছে। মানসম্পন্ন শিক্ষার অভাব প্রকটভাবে দেখা দিচ্ছে। সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবাও অপ্রতুল। চাহিদা অনুযায়ী যুবসমাজের কর্মসংস্থান না হওয়ায় শিক্ষিত যুবসমাজের মধ্যে আজ বেকারত্ব জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি।

প্রশ্ন: সংস্কারের প্রতি অনীহা কেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শুধু বাংলাদেশে নয়; বহু দেশে তথাকথিত সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যেও খুব কেন্দ্রায়িত শাসনব্যবস্থা বিরাজমান দেখা যায়। স্বচ্ছতার জায়গায় অনীহা থাকে। অংশগ্রহণের ভিত্তিতে মূল্যায়িত হতে চান না ক্ষমতাসীনেরা। রাজনৈতিক বৈধতার ঘাটতিকে দৃশ্যমান উন্নয়ন দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা থাকে। সেই উন্নয়ন প্রশ্নবিদ্ধ হোক, তা তারা চান না। এলডিসি-উত্তর যাত্রাকে মসৃণ ও টেকসই করতে হলে এই দ্বন্দ্বের নিরসন করতে হবে।

প্রশ্ন: এক্ষেত্রে দোহা কর্মপরিকল্পনা কী বলে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: গত বছর দোহা আলোচনায় এলডিসি উত্তরণে ছয়টি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। প্রতিটি বিষয় বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এক. কাউকে পেছনে ফেলে না রাখতে মানবসম্পদে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। অথচ বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) যথাক্রমে ১ শতাংশ এবং ২ শতাংশ বিনিয়োগ করছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। দুই, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ব্যাপক ব্যবহার। বাংলাদেশ এসব খাতে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেছে, তবে সক্ষমতার অভাব রয়েছে। তিন, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের মাধ্যমে অর্থনীতির রূপান্তর। বাংলাদেশে কৃষি থেকে 'খালাস' পাওয়া শ্রমকে নতুন ধারার শিল্পে নিয়োজন দিতে হবে। চার, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশ। রপ্তানিযোগ্য পণ্য এবং রপ্তানির বাজার— দুটোরই বিস্তৃতি ঘটাতে হবে বাংলাদেশকে। পাঁচ, জলবায়ুর অভিঘাতের থেকে সুরক্ষায় ঝুঁকি সচেতন টেকসই উন্নয়ন। এ এলাকায় সচেতনতা বেড়েছে, কিন্তু এখনো কাঙ্ক্ষিত

মাত্রায় অগ্রগতি নেই। ছয়, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সংহতি বৃদ্ধি করা। পুরোনো প্রতিশ্রুতির বাইরে এলডিসি-উত্তর পরিস্থিতিতে সহযোগিতার নতুন অঙ্গীকার নিতে হবে।

প্রশ্ন: এলডিসি থেকে উত্তরণের পর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ কী করছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এলডিসি তালিকা থেকে বের হওয়ার জন্য একটি উত্তরণকালীন কর্মসূচি প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নেতৃত্বে একটি উত্তরণকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে। বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন উপকমিটি হয়েছে। সার্বিক দায়িত্ব পালন করছে বৈদেশিক সম্পদ বিভাগ (ইআরডি)। তবে এই পরিকল্পনা এখনো ‘আকাশে’ আছে, এটিকে ‘মর্ত্যে’ আনতে হবে। কারণ, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও নজরদারি কীভাবে হবে, তা পরিষ্কার নয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন কতটা হচ্ছে, তা জানা যাচ্ছে না। সঠিকভাবে হচ্ছে কি না, ফলাফল কী, তা-ও জানা যাচ্ছে না। তথ্য-উপাত্তের বড় অভাব। তাই সরকারের উদ্যোগগুলোর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও অংশীজনদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।উপরন্তু আছে সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বিভিন্ন খাতভিত্তিক কর্মসূচি। এসব উদ্যোগকে সমন্বিত করে একটি উত্তরণকালীন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা যথেষ্ট নৈপুণ্যের দরকার। কিন্তু এমুহূর্তে কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক। গণতান্ত্রিক জবাবদিহির অভাব যেন তাকে পিছিয়ে না দেয়। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিপ্রায়ের সঙ্গে প্রকৃত বাস্তবায়নের পার্থক্য দূর করতে হবে।আমার মতে, এলডিসি থেকে উত্তরণে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। এ জন্য শিক্ষার গুণগত মান বাড়াতে হবে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়লে প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা বাড়বে; প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়বে, শ্রমজীবী মানুষের আয় বাড়বে, সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। এছাড়া এলডিসি থেকে উত্তরণপ্রক্রিয়া এবং পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উন্নয়ন-সহযোগীদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ার ক্ষেত্রে এলডিসির পক্ষে বাংলাদেশ নেতৃত্ব দিতে পারে। সমসাময়িক সার্বিক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় এনে এবং আসন্ন দোহা সম্মেলনের মাধ্যমে সৃষ্ট রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিকে কাজে লাগিয়ে জাতিসংঘের পরবর্তী কোনো সাধারণ অধিবেশনে উত্তরণকালীন এলডিসিদের সমর্থনে একটি প্রস্তাব পাস করার চেষ্টা করা উচিত। ২০১১ সালের এ রকম একটি প্রস্তাবের ধারাবাহিকতায় তা হতে পারে। বাংলাদেশ এরূপ একটি উদ্যোগে নেতৃত্ব দেবে বলে আশা করি।

প্রথম আলো
৪ মার্চ, ২০২৩

গণতন্ত্র শুধু পশ্চিমাদের ধারণা নয়

রওনক জাহান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. রওনক জাহান। প্রখ্যাত এ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শিক্ষকতা করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র সম্মাননীয় ফেলো হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও এর সঙ্গে চলমান রাজনীতির মেলবন্ধন নিয়ে কথা বলেছেন বণিক বার্তার সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আনিকা মাহজাবিন

পশ্চিমারা যেভাবে উন্নয়ন ও গণতন্ত্র বাস্তবায়নের কথা বলে, সেটি আমাদের দেশে কতটুকু সম্ভব?

গণতন্ত্র শুধু যে পশ্চিমাদের ধারণা, আমাদের নয়; সেটি মানতে আমি নারাজ। একটি দেশে গণতন্ত্র কতটুকু প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে, তা অনেকটাই নির্ভর করে কারা ক্ষমতায় আছে এবং গণতন্ত্রের প্রতি তাদের অঙ্গীকার কেমন তার ওপর। যারা ক্ষমতায় আছে তারা যদি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে, তাহলে এটি বাস্তবায়ন সম্ভব। অতএব এটা এমনভাবে বলা যাবে না— গণতন্ত্রটা শুধু পশ্চিমাদের সংস্কৃতিতে মানায়, আমাদের মানায় না। এজন্য দরকার রাজনীতিবিদদের গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করার জন্য অঙ্গীকার। দেশের মানুষ গণতন্ত্র চায় না, তাও বলা যাবে না। কেননা গণতন্ত্রের জন্য নানা সময় এ দেশের মানুষ আন্দোলন করেছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচন বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর এসে এখনকার নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে আপনার মূল্যায়ন শুনতে চাই।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জেতার পর পাকিস্তানি শাসকরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে আমাদের ওপর গণহত্যা শুরু করল। তখন সারা পৃথিবীতে আমরা প্রচার করতে পেরেছিলাম, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গণতান্ত্রিক জনসমর্থন আছে। এ গণতান্ত্রিক বৈধতা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ের সরকারকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি ও বৈধতা দিতে সাহায্য করে। স্বাধীনতার আগে আমরা দেখেছি পাকিস্তানি শাসকরা বারবার নির্বাচন পিছিয়ে দিয়েছে কিংবা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়নি। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের বক্তৃতায় এর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভের ৯০ দিনের মধ্যে সেই সরকারকে পাকিস্তানি শাসকরা ক্ষমতাচ্যুত করে। ১৯৫৬ সালের নির্বাচনের আগে সামরিক শাসন জারি করে আইয়ুব খান ক্ষমতা নিয়ে নেন।

সে সময় আমরা ভেবেছিলাম, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে অবশ্যই একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলা হবে, যেখানে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় থাকবে। কিন্তু আজ অবধি তেমন নির্বাচন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন হতে না পারাটা অত্যন্ত দুঃখজনক। বিগত ৫২ বছরে আমরা তা করতে পারিনি। সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ার পেছনে কারণ হলো যারা ক্ষমতায় যায় তারা আর ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। সেজন্য তারা নির্বাচনকে 'ইঞ্জিনিয়ারিং' করতে চায়। নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ শুরু করেন প্রথম সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। তার পরের সামরিক শাসক এরশাদও তা করেছিলেন। আমরা ভেবেছিলাম ১৯৯১-এর পর রাজনৈতিক সরকার নির্বাচন ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তারা সেটি করেনি। প্রথম বিএনপি শাসিত সরকারের সময় আমরা মাগুরার ও পরে মিরপুরের বাই-ইলেকশনের নির্বাচনে অনিয়ম দেখলাম।

আওয়ামী লীগ আন্দোলন করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে। এরপর ১৯৯৬ ও ২০০১— দুবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে দুটো নির্বাচন হয়। পর্যবেক্ষক ও জনসাধারণের কাছে নির্বাচনের ফলাফল সঠিক মনে হয়েছিল। কিন্তু যে দল হেরেছে, তারা বলেছে কারচুপি হয়েছে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচনে প্রত্যেকবারই ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। এরপর আমরা দেখলাম ২০০৬ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেও দলীয়করণ করার চেষ্টা। তারপর আমরা দুই বছর সেনা সমর্থিত এক সরকারের দ্বারা শাসিত হলাম। ২০০৮

সালে তারা একটি নির্বাচন করল, যা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এল। কিন্তু ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনী করে সরকার তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করে দিল। তার পর থেকে দুটো নির্বাচন ২০১৪ ও ২০১৮ প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। সামনের নির্বাচন কেমন হবে তা নিয়ে সংশয় আছে।

আমি অনেকবার বলেছি যে সুষম নির্বাচন করার জন্য সবার আগে দরকার একটি রাজনৈতিক সমঝোতা। সব দলের মধ্যে একে অন্যের ওপর বিশ্বাস ফেরাতে হবে যে যে-ই জিতুক না কেন, তারা সব সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত করবে না এবং বিরোধী দলগুলোকে নিপীড়ন করবে না। আমাদের এখানে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে; তাকে বলা যায় 'উইনার টেকস ইট অল' মানে বিজয়ী সব নিয়ে নেবে। এ সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এখন যে অবস্থা তাতে নির্বাচনে যারা জিতছেন, তারা নানা উপায়ে প্রভাব খাটিয়ে বিপুল সম্পদের মালিক হতে পারছেন। অন্যদিকে যারা হারছেন, তারা অনেক সময় তাদের জানমালের নিরাপত্তা হারাচ্ছেন। এমন অবস্থায় একবার ক্ষমতায় গেলে কেন কেউ ক্ষমতা ছাড়তে চাইবেন? তারা তো ভাববেন তারা আর ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবেন না।

স্বাধীনতার আগে পাকিস্তান আমলে সম্পদ পুঞ্জীভূত ছিল ২২ পরিবারের হাতে। এখনো দেখা যাচ্ছে দেশের অধিকাংশ সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে পুঞ্জীভূত। এ নিয়ে আপনার বিশ্লেষণ বলুন।

আইয়ুব খানের সময় ২২ পরিবারের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল। সেখানে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় যে ওই ২২ পরিবারের মধ্যে একমাত্র বাঙালি পরিবার ছিল চট্টগ্রামের এ কে খান পরিবার। স্বাধীনতার আগে-পরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, এ দেশে অর্থনৈতিক অসমতা থাকবে না। কিন্তু তখনো এ দেশে অনেক মানুষ ছিল; যারা মনে করত পাকিস্তানিরা চলে গেলে তারা সে জায়গাটি নিয়ে নেবে। আমরাও ২২ পরিবার বা আরো বেশি হয়ে যাব। দেশের সামাজিক পরিবর্তনের কথা তারা ভাবেনি।

আমাদের সংবিধানে চারটি মূলনীতি যুক্ত করা হয়। এর একটি হলো সমাজতন্ত্র। তখন হয়তো আওয়ামী লীগের সব নেতা এটিতে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাস করতেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র বিদায় দিলেন। আমরা বাজার অর্থনীতির দিকে ঝুঁকলাম, যা ক্রমেই ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের পথে চলে গেল। এ অবস্থায় কিছু লোক ক্ষমতার চারপাশে থেকে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ঋণখেলাপি হয়ে নানাভাবে হঠাৎ করে বড়লোক হওয়া শুরু করল। ক্রমেই আমাদের একটি নব্য ব্যবসায়ী গ্রুপ তৈরি হলো। যদিও

গার্মেন্টসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা অবদান রেখেছে। কিন্তু তারা এতই ক্ষমতাবান হওয়া শুরু করল যে তারা রাজনীতিতেও প্রভাবশালী হয়ে উঠল। প্রথমে অর্থনৈতিক ও পরে সামাজিক অসমতা বেড়ে চলল। একদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে দেখে আমরা গর্বিত। অন্যদিকে অসমতা বেড়ে যাওয়া নিয়ে আমরা চিন্তিত। যদিও দারিদ্র্যের হার কমেছে, কিন্তু ক্রমবর্ধমান অসমতা ভবিষ্যতে সমাজে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।

সামাজিক বিজ্ঞানে আমরা একটি কথা বলে থাকি তা হচ্ছে 'রাইজিং এক্সপেক্টেশন এবং রাইজিং ফ্রাস্ট্রেশন'। আমাদের দেশে কিছু লোক খুব দ্রুত ধনী হয়েছে। এতে অন্যরাও দ্রুত ধনী হয়ে উঠতে চায়। তা যেকোনো উপায়েই হোক না কেন। কিন্তু সবাই তো হতে পারবে না। তাই তাদের মধ্যে হতাশা বেড়ে যাচ্ছে। এ হতাশা সামলানো যারা সরকারে থাকেন তাদের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে আমরা দেখছি দেশের বিভিন্ন জায়গায় একই দলের প্রভাবশালীদের মধ্যে নানা কোন্দল হচ্ছে। ধনসম্পদ থেকে শুরু করে নানা সুবিধা নেয়ার জন্যই কোন্দল হয়ে থাকে। সবাই চাচ্ছে আরেকজনকে ঠেলে সামনে চলে যেতে। প্রভাবশালীরা কেউই আইন মানতে চান না। তারা বিশেষ সুবিধা চান। এ রকম আইনহীন অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত এটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্যহীনতার শক্তি (ডিস্ট্যাবিলাইজিং ফোর্স) হিসেবে দেখা দেবে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আমরা সবসময়ই গুরুত্ব দিচ্ছি। এর সঙ্গে অসমতা দূর করার নীতিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের সুশাসন প্রতিষ্ঠার দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। অনেকে বলতে পারে, সুশাসনের অভাবের মধ্যেও তো আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু আমাদের ব্যাংকিংসহ অনেকগুলো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ পথে বেশিদিন চলা যাবে না। কাজেই এখন প্রয়োজন শৃঙ্খলা আনা।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ও এর প্রভাবকে আপনি কীভাবে দেখেন?

আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই না কোনো একটি দেশ আমাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেবে। অর্থাৎ বাইরের কোনো দেশ এসে গণতন্ত্রের কোনো একটি বিষয় না মানার জন্য আমাদের শাস্তি দেবে আমি সেটির বিরুদ্ধে। বিশেষ করে আমেরিকা দু মুখো নীতিতে চলে। তারা আমাদের ওপর স্যাংশন দিলেও ইসরায়েলের ওপর কোনো স্যাংশন দিচ্ছে না। তবে বাংলাদেশ মানবাধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক অনেক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। সেসব চুক্তির বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার থিসিসে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্যতম কারণ হিসেবে পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খানের জাতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বেশি গুরুত্ব দেয়াকে চিহ্নিত করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও জাতীয়তার চিত্রটি কেমন দেখছেন?

আমার থিসিস পরবর্তী সময়ে বই হিসেবে 'পাকিস্তান: ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এতে আমার মূল বক্তব্য ছিল যে একটি সরকারকে একই সঙ্গে রাষ্ট্র গঠন ও জাতি গঠন প্রক্রিয়ার দিকে নজর দিতে হবে। রাষ্ট্র গঠন করতে গেলে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান যেমন প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সামরিক বাহিনী, এগুলোকে সুসংহত করতে হবে। আর জাতি গঠন করতে হলে গণতান্ত্রিক সংগঠন যেমন রাজনৈতিক দল, মিডিয়া, নাগরিক সমাজ এসব প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ারও দরকার হয়।

তথ্য-উপাত্ত দিয়ে আমি দেখিয়েছিলাম যে আইয়ুবের শাসন আমলে অর্থনৈতিক অনেক উন্নতি হচ্ছিল। অনেক নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছিল। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বেড়ে উঠছিল। কিন্তু গণতন্ত্রের অভাবে রাজনীতির মাধ্যমে দেশ পরিচালনার কাজে তারা অংশ নিতে পারছিল না। তাতে তারা ক্রমেই পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বিমুখ হয়ে পড়ছিল।

আসলে মানুষ একসঙ্গে অনেক কিছু চায়। তারা অর্থনৈতিক উন্নতি চায়। আবার একই সঙ্গে বৈষম্য দূরীকরণ চায়। তারা নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা চায়। তারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে চায়। যারা ক্ষমতায় থাকেন, তাদের একই সঙ্গে নানা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। কিছু কাজ প্রশাসন-আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিংবা অন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দিয়ে করা সম্ভব। কিন্তু কিছু সমস্যার সমাধান রাজনৈতিকভাবে, গণতান্ত্রিকভাবে অংশীদারত্ব বাড়িয়ে করতে হয়। আইয়ুব খান সব সমস্যা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন দিয়ে সমাধান করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি বাঙালিদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই অধিকার দিচ্ছিলেন না। তাই অর্থনৈতিক উন্নতি হলেও বাঙালিরা ভাবতে শুরু করল যে পাকিস্তান নামের এক দেশে তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

বাংলাদেশেও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে তুলনায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান যেমন রাজনৈতিক দল, মিডিয়া, সিভিল সোসাইটি অনেকটা দুর্বল। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও শক্তিশালী করতে হবে। তাদের স্বাধীনভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে।

স্বাধীনতার আগের ও পরের বিরোধী দলগুলোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আপনার মতামত বলুন।

এটি নিয়ে আমি একটি বই লিখেছি, যা ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয় ‘পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন বাংলাদেশ’ নামে। দুঃখের বিষয় রাজনৈতিক দলগুলোকে আমি ভালো কোনো নম্বর দিতে পারছি না। রাজনৈতিক দলগুলোই রাজনীতির প্রধান সংগঠন। রাজনৈতিক দলগুলোকে বলা যায় রাজনীতির পাঠশালা। কিন্তু সেখানে কর্মীরা কী শিখছে? আমি গবেষণা করে দেখেছি তৃণমূল পর্যায়ে দলের মধ্যে আদর্শ কিংবা নীতি নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা বা বিতর্ক হয় না। দলগুলোর উদ্দেশ্যই হয়ে যাচ্ছে শুধু ক্ষমতায় যাওয়া। এখন তো অনেকে রাজনীতিতে আসছে টাকা-পয়সা বানানোর জন্য। এমনকি বালি উত্তোলন করে কিংবা আবর্জনা পরিষ্কারের টেন্ডারের মাধ্যমে অনেকে কয়েক বছরের মধ্যে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এসব সুবিধা পাওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক হতে হবে। বিরোধী দলে গেলে ধনসম্পদ বানানোর সুযোগ নেই।

সত্তরের দশকেও নির্বাচন নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে যেমন আলোড়ন দেখা যেত, এখন আর তা দেখা যায় না। ভোটারদের এ আচরণ পরিবর্তনকে কীভাবে দেখছেন?

আগে মানুষকে যতটা সহজে একত্র করা যেত এখন সেটা যায় না। এখন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা কমে গেছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মানুষের রাজনীতির ওপর যেমন বিশ্বাস ছিল এখন সেটা নেই। তাই তারা আন্দোলনের প্রতিও আগ্রহ হারাচ্ছে।

বণিক বার্তা
১৯ এপ্রিল, ২০২৩

দু'পক্ষেরই ইতিবাচক ফল পাওয়ার সুযোগ আছে

মোস্তাফিজুর রহমান

সম্প্রতি ভারতকে স্থায়ীভাবে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে বাংলাদেশ। ভারতকে এই সুযোগ দেওয়ায় বাংলাদেশের কী লাভ হয়েছে?

ভারতের যেসব পণ্য এই বন্দরগুলো দিয়ে উঠানামা করবে, তার মধ্যে কোনো নিষিদ্ধ পণ্য থাকছে কিনা, সেটা কীভাবে নিশ্চিত করা হবে? যে ফি নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটা কী ঠিক আছে? নাকি কম হয়ে গেছে? এসব বিষয় নিয়ে ডয়চে ভেলের সঙ্গে কথা বলেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ সিপিডির বিশেষ ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান।

ডয়চে ভেলে: ভারতকে স্থায়ীভাবে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের যে সুযোগ দেওয়া হলো সেটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন? এতে কী বাংলাদেশের লাভ হলো?

অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান: ভারতকে যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সেটা আমাদের আগের সম্পাদিত চুক্তির আওতায়। এর মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে চালানোও হয়েছে। এটাকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে। ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে নৌ প্রটোকল সই করেছে। সেই প্রটোকলের অধীনে ভারতের পণ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়ার জন্য এই চট্টগ্রাম ও মোংলা পোর্ট ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ সম্মত হয়েছে। আমার মনে হয়, এতে ভারত ও বাংলাদেশ দুই পক্ষেরই ইতিবাচক ফলাফলের সম্ভবনা আছে। ভারতের তো একটা সুবিধা হবেই। তাদের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের যে দূরত্ব ও ব্যয় সেটা কমবে। শুল্ক তো নেওয়া হবে না। তাদের কাছ থেকে বড় কোনো আয় হবে না। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য বড় যে সুবিধাটা হবে, লোডিং, আনলোডিং ও ট্রান্সপোর্ট

দিয়ে ভারতের আখাউড়া বা আগরতলা এসব জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। এই ট্রান্সপোর্ট ব্যবসাটা আমাদের জন্য একটা আকর্ষণের জায়গা হবে বলে আমার মনে হয়। লোডিং, আনলোডিং এর ব্যবসাটাও আমরা করতে পারব। বাংলাদেশের জাহাজ যেন এই ব্যবসাটা ধরতে পারে সেদিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। সার্বিকভাবে দুই পক্ষেরই এখান থেকে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়ার সুযোগ আছে।

এই দুইটি বন্দরের কী সেই সক্ষমতা আছে? আর নিজেদের পণ্য উঠা-নামায় কোনো সমস্যা হবে কিনা?

এখন চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। পায়রা বন্দর এখানে যোগ হচ্ছে। মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দর হচ্ছে। এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে, বন্দরের সুবিধা কিভাবে বৃদ্ধি করে সেবা খাতের রফতানি সুবিধা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। পোর্টের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে যদি আমরা এই ব্যবসাটা ধরতে পারে তাহলে এটা আমাদের অন্য ধরনের একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। তবে অবশ্যই আমাদের পোর্টে জেটি, ক্রেন, হ্যান্ডেলিং এগুলোতে বিনিয়োগ করতে হবে। তাদের এই বাড়তি কাজ আমাদের বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে সেটা হবে না। তবে যেটা হতে পারে, আশুগঞ্জ আন্তর্জাতিক নৌ বন্দর করার পর আমরা যেটা ভেবেছিলাম, ভারত থেকে এখানে জাহাজ আসবে আর ৩৫ কিলোমিটার সড়ক পথ পাড়ি দিয়ে আখাউড়া যাবে। কিন্তু গত ৭ বছরে এই ব্যবসার কিছুই হয়নি। কারণ আমরা সেখানে অবকাঠামো গড়ে তুলতে পারিনি। অতএব যদি আমরা অবকাঠামো গড়ে না তুলি তাহলে এইসব সুযোগ কেউ ব্যবহার করবে না। ফলে আগে তারা যেভাবে ব্যবসা করছিল, সেভাবেই করবে। আমাদের দুশ্চিন্তা হওয়া উচিত আমরা আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করছি কিনা ব্যবসাটা ধরার জন্য?

এর জন্য যে ফি নির্ধারণ করা হয়েছে তা কি ঠিক আছে? নাকি কম হয়ে গেছে?

এই ফি দিয়ে বড় কোনো আয় হবে না। যেটা ধরা হয়েছে, সেটা আমাদের সংশ্লিষ্টরা নির্ধারণ করেছেন। এটা বড় ধরনের আয়ের কোনো সোর্স না। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তুলনা করেই টেকনিক্যাল লোকেরা এটা ঠিক করেছেন।

ভারতীয় পণ্য পরিবহন করতে গিয়ে বাংলাদেশের সড়ক ও বন্দরের উপর যে চাপ পড়বে বা ক্ষতি হবে, সেটা তো বাংলাদেশকেই ঠিক করতে হবে? বাংলাদেশের সড়কগুলো কী এই চাপ নেওয়ার জন্য তৈরি কিনা?

এটা নির্ভর করবে, কতটুকু ব্যবহার হচ্ছে তার উপর। যদি অনেক ব্যবহার হয় তাহলে তো এর উপর চাপ পড়বে। আমরা জানি, অনেকগুলো সড়ক ভারতের রেয়াতি ঋণে তৈরি করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে আমরা আট বিলিয়ন ডলার তিন খাতে পেয়েছি। সেটা দিয়ে অনেক অবকাঠামো হচ্ছে। সুতরাং ভারতেরও একটা বিনিয়োগ এখানে আছে। তারপরও যদি অনেক বেশি ব্যবহার হয় তাহলে আমরা আলোচনা করে অবচয় ফি নির্ধারণ করতে পারি। এটা নির্ভর করবে বৃহত্তর সহযোগিতা কাঠামোর উপর। আরেকটা হতে পারে, আমরা টোল রাস্তা বানিয়ে সেখানে টোল নিতে পারি। ওই রাস্তা দিয়ে যেই যাবে তাকে টোল দিতে হবে। আশুগঞ্জ নৌ বন্দরের মতো হচ্ছে কিনা, আমরা বন্দরের সুযোগ সুবিধা বাড়াতে পারছি না এসব কিছু দেখেই পরবর্তীতে অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

পণ্য পরিবহনে বাংলাদেশের যানবাহন ব্যবহারের বিষয়টি কী নিশ্চিত করা হয়েছে? নাকি ভারতের পরিবহন এখানে চলাচল করবে?

এখন যেটা হয়েছে, সেটাতে তো আমাদের পরিবহন দিয়েই করতে হবে। আর যদি যান চলাচল চুক্তি হয়, সেখানে বলা আছে নিজেদের পরিবহন দিয়েই এক জায়গা থেকে পণ্য অন্য জায়গায় নিতে পারব। তখন আমাদের যানবাহন ভারতে যেতে পারবে, ভারতের যানবাহন এখানে আসতে পারবে। সেটা কিন্তু অন্য চুক্তি। এখন যেটা হয়েছে, জাহাজে পণ্য আসবে, সেটা ভারতেরও হতে পারে, আমাদেরও হতে পারে। দুই পোর্টে সেটা লোড বা আনলোড করার পর আমাদের ট্রান্সপোর্টই সেটা বর্ডার পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

যেসব পণ্য এই বন্দরগুলো দিয়ে উঠানামা করবে, তার মধ্যে কোনো নিষিদ্ধ পন্য থাকছে কিনা, সেটা কীভাবে নিশ্চিত করা হবে?

এগুলোতে নজরদারি রাখতে হবে। সিলগালা বা জিপিএস নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। এখন এসকোর্টের একটা বিষয় এসেছে। সেই ফিও নির্ধারণ করা হয়েছে। জিপিএস সিস্টেম লাগালে এগুলোর আর প্রয়োজন হবে না। অবশ্যই সিকিউরিটি একটা প্রশ্ন। নিষিদ্ধ পণ্য যাতে না আসে এবং সিকিউরিটির বিষয়ে আমাদের অবশ্যই নজর দিতে হবে। তবে আজকাল বিভিন্ন সিস্টেম আছে, ইউরোপে তো এটা নিয়মিতই হচ্ছে। তারপরও আমাদের যেসব সিকিউরিটির প্রয়োজন বাংলাদেশ সেটা তো নিশ্চয় করবে।

গত বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় বাংলাদেশকে ভারতের স্থলবন্দর, বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে নেপাল ও ভুটানে পণ্য রপ্তানিতে বিনা মাসুলে ট্রানজিট দেওয়ার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, সেটি কেন পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হচ্ছে না?

এটা তো সরকার করবে না, করবে ব্যবসায়ীরা। অনেক সময় আমাদের এখানে তো জট লেগে যায়। তখন কেউ যদি সড়কপথে কলকাতায় নিয়ে, সেখানের বিমানবন্দর ব্যবহার করে, তাহলে সে সেটা করবে। আমাদের গার্মেন্টের পণ্য অনেক সময় দ্রুত পাঠানোর দরকার হয়। তখন কেউ চাইলে কলকাতা বিমানবন্দর ব্যবহার করে করতে পারবেন। এই সুযোগটা ভারত আমাদের দিয়েছে। কিন্তু আমাদের চেষ্টা করা উচিত নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে। একটা অপশন থাকল, যদি হঠাৎ করে প্রয়োজন হয় সেটা আমরা নেবো। কিন্তু এর মানে এই না যে, আমরা কিছু করলাম না, সব ব্যবসা ভারতের মাধ্যমে করব। এটা কোনোভাবেই কাম্য হবে না।

ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এখন ৩০টিরও বেশি পয়েন্ট উন্মুক্ত আছে। কিন্তু এসব জায়গায় বর্ডার লজিস্টিকস পুরানো পদ্ধতিতে মূল্যায়ন হয়। এগুলোকে আধুনিকায়ন করা হয়নি। যার ফলে পণ্যজট লেগেই থাকে। এসব বিষয়ে কেন সুরাহা হচ্ছে না?

এসব বিষয় দ্রুত সুরাহা করা উচিত। বেনাপোল, পেট্রাপোলসহ আরও দুই তিন জায়গায় ইন্টিগ্রেটেড কাস্টমস পয়েন্ট করার উদ্যোগ চলছে। সিঙ্গেল উইনডো করার দরকার। দুইটা সিস্টেমের ইন্টার অপারেটেবিলিটি নিশ্চিত করা দরকার। এগুলো শ্লথ গতিতে হচ্ছে। এর ফলে আমরা রপ্তানি সক্ষমতা হারাচ্ছি। আমদানিতেও আমাদের খরচ বেশি পড়ছে। সেটা আমার ভোক্তা, উৎপাদকের জন্য কষ্ট বাড়াচ্ছে। এই ৩০টির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো সেগুলোতে দ্রুত এসব কাজ করা দরকার। সমন্বিতভাবে এখানে বিনিয়োগ করা উচিত। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রাজনীতিবিদেরা ভালো চুক্তি করেন। কিন্তু আমলা পর্যায়ে গেলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। আবার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সময় টাকা ছাড়ের সমস্যা হয়। এটা থেকে যে ফল আসবে সেক্ষেত্রে আমলা পর্যায়ে অনেক সময় সঠিকভাবে অনুধাবন করা হয় না।

কীভাবে দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক আরও ইতিবাচক ও সুন্দর হতে পারে?

ভারতীয় বিনিয়োগকে কীভাবে আকর্ষণ করে অর্থনৈতিক অঞ্চলকে আরও বেশি কার্যকর করা যায় সেটা দেখতে হবে। পদ্মা সেতুকে ট্রান্সপোর্ট করিডোর থেকে কীভাবে অর্থনৈতিক করিডোরে করতে পারি। বর্ডারের শুল্ক, অশুল্ক বাধা দূর করে আমরা যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিনিয়োগ এবং ব্যবসা ও রফতানির ক্ষেত্রে ত্রিমাত্রিক সমস্যার সমাধান করতে পারি তাহলেই এসব উদ্যোগ থেকে আমরা ভালো ফলাফল পাব।

ডি ডাব্লিউ ডট কম
৫ মে, ২০২৩

আমরা ইতিহাসের ভেতর রাজনীতি খুঁজি, ইতিহাসের ভেতরে বৈধতা খুঁজি

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সঞ্চালক: দর্শক আমরা এই সময় অনুষ্ঠানে আমাদের দেশের সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করি। ঠিক এ সময়ে আমাদের আলোচনা প্রধান বিষয় হচ্ছে আগামী নির্বাচন এবং আমাদের যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মধ্যে যে বিরোধ, বিভক্তি এবং অনিশ্চয়তা সে বিষয়টিতে সামগ্রিকভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে এবং আগামী দিনগুলো কেমন যাবে, কিভাবে এই সংকটগুলো সমাধান হবে বা আদৌ সুরাহা হবে কিনা এমন নানা ধরনের কৌতূহল দেশে এবং বিদেশে সব মহলেই আছে। আজকের এ অনুষ্ঠানে আমরা আলোচিত এ বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশ্লেষণ পাওয়ার চেষ্টা করবো। আমাদের সাথে আছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্বাগত আপনাকে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ জহির। কেমন আছেন?

সঞ্চালক: আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? অনেক দিন পর আপনাকে পেয়েছি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমিও ভালো আছি।

সঞ্চালক: প্রধানত অর্থনীতি বিষয় নিয়েই আপনি বিশ্লেষণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু একই সাথে দেশের আগামী দিনগুলো নিয়েও মানুষের এক ধরনের উৎকণ্ঠা আছে, কৌতূহল আছে। সে বিষয়গুলো নিয়ে আপনার বিশ্লেষণ পাবার চেষ্টা করবো। দেশে নির্বাচন কেন্দ্রিক যে আলোচনাটি সেখানে আমরা সবাই জানি যে সংবিধান মত নির্বাচন করার

ব্যাপারে সরকার বরাবরই কথা বলে আসছে এবং একই সাথে যে প্রধান বিরোধী দল তারা বলছে যে এ বিষয়ে তারা নির্বাচন করার মতো স্বস্তি পাচ্ছে না ও তারা এখানে নির্বাচন করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। একদফার একটা আন্দোলন ও তারা শুরু করেছে। ঠিক এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক মহলও বাংলাদেশের ব্যাপারে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা অন্যান্য দেশগুলো অনেক আগ্রহী এবং কৌতূহলী এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ, আলোচনা ইত্যাদি তাদের পক্ষ থেকে চলছে। আপনি আগস্ট মাসের এ সময়ে এসে বাংলাদেশের নির্বাচন কেন্দ্রিক যে চিত্রটি তা কিভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই যে আলোচনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা তা বোঝার জন্য প্রথমে আমাদের অনুধাবন করা দরকার যে হঠাৎ করে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো কেনো? জাতীয়ভাবে, আঞ্চলিকভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে। দেখুন অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে আমরা এটা অবলোকন করি গত দশ দশক এবং তারও বেশি সময়ে বাংলাদেশে একটি দল তিনবার দায়িত্ব পেয়েছেন এবং এ সময়কালে বহুবিধ ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নয়ন হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই উন্নতির প্রতিফলন আমরা যদি প্রবৃদ্ধির হারের ভেতরেই দেখি অথবা আমরা যদি মনে করি যে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, অবকাঠামোর উন্নয়ন, জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন আছে অর্থনীতির অভ্যন্তরীণভাবে। একই সাথে রপ্তানির ক্ষেত্রেও, কৃষি বা খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ভূমিকা আছে। এ ব্যাপারে আমার মনে হয় আমাদের মতো যারা পেশাগত বিশ্লেষক আছেন, তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেন তারা এটা অস্বীকার করেন না। সমস্যাটা যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হলো বাংলাদেশ এ সময়কালে নিম্ন আয়ের দেশের থেকে আমরা নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ হয়েছি এবং নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ থেকে এর পরবর্তী উত্তরণের জন্য একটি বড় ধরনের উল্লম্ফনের প্রয়োজন পড়ে এবং এরকম দেশ পৃথিবীর অনেক জায়গায় আছে। বিশেষ করে যদি দক্ষিণ আমেরিকাতে যদি আমরা দেখি তাহলে ল্যাটিন আমেরিকাতে এমন দেশ ৩০–৪০ বছর ধরে একই জায়গাতে আটকে আছে, পরবর্তী জায়গাতে যেতে পারছে না। তাদের সেখানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে নগরায়ণ হয়েছে বাংলাদেশে যেটা হয়। সুশাসনের অভাবের ফলে তাদের বিভিন্ন ধরনের সরকারি সেবার মান নিম্নে থাকে, দুর্নীতিও অনেক ভাবে আসে, স্থানীয় সরকার শক্তিশালী নয় ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আছে আমরা দেখেছি।

তো প্রশ্ন থাকে যে বাংলাদেশের পরবর্তী জায়গায় যেতে হলে এরকম সমস্যায় পড়বে কিনা? কিভাবে আমরা স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হচ্ছি সেটার জন্য আগামী ২০২৬ অথবা আরো ৩/৪ বছর রেয়াত পাবো। কিন্তু এর পরের ধাক্কাটা আমরা অর্থনৈতিকভাবে সামলাতে পারবো কি পারবো না। বিশ্ব একটি সংকটজনক অর্থনৈতিক

পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেখানেও মূল্যস্ফীতি, সুদের হার বৃদ্ধি, ইত্যাদি ঘটনা ঘটছে এবং উন্নত বিশ্বে চাহিদা পড়ার ফলে আমাদের রপ্তানি আয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সেটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমরা যে পরবর্তী ধাপে যেতে চাচ্ছি সে ধাপে যাওয়ার জন্য এ নির্বাচনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ হলো এ সময়কালে যে উন্নতিটা হয়েছে তার সুবিধা সবাই সমানভাবে পায়নি। যেহেতু সবাই সমানভাবে পায়নি তাই দেশের ভেতরে সরকারি হিসেবেই আপনার বৈষম্যের হার বেড়েছে এবং মাথাপিছু আয় বাড়লেও তা আমাদের দেশের একটা মানুষের অনেক উন্নতি এবং আরেক মানুষের এক জায়গায় আটকে থাকাকে চেপে রাখে। এটা এখন অনুভূত হচ্ছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে। এই যে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের যে চ্যালেঞ্জের কথা বলি, অর্থনীতির সকলেই তা স্বীকার করবেন যে এটার সাথে একটা উন্নয়নের উত্তরণের চ্যালেঞ্জও যুক্ত আছে।

সঞ্চালক: আপনি তো শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলছেন কিন্তু এর কি আর কোনো দৃষ্টিকোণ আছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আরও আছে কিন্তু আপনাকে আরো তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বস্তুগত প্রয়োজনটাকে অনুধাবন করতে হবে। কারণ আমরা যেটাকে রাজনীতি বলি সে রাজনীতি আসলেই অর্থনীতির ঘনীভূত বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ যে মানুষটা সন্তানের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যয় করতে না পারে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত; যদি সে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিতে না পারে এবং যদি দৈনন্দিন বাজার করতে সে না পারে সে যে অর্থনৈতিক চাপটা অনুভব করে তাকে উত্তরণের জন্যই সে রাজনীতিকে নিয়ে আসে। এখন এই যে সময়কালে যেটা হয়েছে, রাজনীতির সম্পর্কটা অর্থনীতির সাথে এখানে এরকম। সরকার ধরুন বহু ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন কিন্তু সে প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুঃস্থ মানুষ, পিছিয়ে পড়া মানুষ, বিভিন্ন ধরনের যেসকল বঞ্চিত মানুষ আছে এমনকি মধ্যবিত্ত তারা সমানভাবে সুযোগ পাচ্ছেন না। আমি ২০২২ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এটা নিয়ে আলোচনা করে এসেছি, এ বছরও ঢাকার বাইরে বেশকিছু আলোচনা করেছি। যে জিনিসটা আসে সেটা হলো দেশের ভেতরে এক ধরনের গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার অভাব আছে। এই গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার অভাবটা সৃষ্টি হয়েছে আমাদের যে নির্বাচনী ব্যবস্থা আছে সে নির্বাচনী ব্যবস্থায় তাদের কণ্ঠস্বরটা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। এজন্যেই ২০১৪ এবং ২০১৮ তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি এবং সেজন্য সে আগামী নির্বাচনটার প্রতি অনেক বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছে। আপনি যদি লক্ষ্য করে দেখেন বিভিন্ন জরিপ হয়েছে, আজকেও এসেছে একটা। সেসব জরিপে দেখবেন যে মানুষের ভোট দেয়ার আগ্রহটা এখন প্রচণ্ডভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

সঞ্চালক: আমি একটু এ ব্যাপারে কৌতূহলী। এখানে বলা হয়েছে যে প্রায় ৯২ শতাংশ মানুষ ভোট দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী। আপনি কি কনভিন্স এ ব্যাপারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মনে করি যে মানুষ ভোট দিতে চায়।

সঞ্চালক: যদি উপযুক্ত পরিবেশ থাকে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ এবং সে ভোটের অধিকারটাও সে অর্জন করতে চায় এটাও ঠিক।

সঞ্চালক: কিন্তু কয়েকদিন আগেই যে একটা উপনির্বাচন হয়ে গেলো সেখানে ঐ ৯২ শতাংশ মানুষ কোথায় ছিলো?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সেটা তো নির্বাচন না।

সঞ্চালক: উপনির্বাচন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ওটা উপরনির্বাচনও না। এ মুহূর্তে মানুষ ওগুলোকে নির্বাচন হিসেবে বিবেচনা করে না। একটা নির্বাচন করার জন্য যে ধরনের পূর্বশর্ত থাকে এবং যে পরিবেশগত বিষয় থাকে সে আস্থাটা মানুষের নেই। তাই যখন আমরা নির্বাচনের কথা বলি তার অর্থ হলো সেটা অংশগ্রহণমূলক হবে, প্রতিযোগিতাপূর্ণ হবে, নিয়ম-কানুন মেনে হবে এবং যারা রেফারির দায়িত্বে আছে তারাও সঠিকভাবে এটা করবে। অন্য ধরনের প্রশাসনিক বলপ্রয়োগ হবে না এবং সকলেই সমান সুযোগ পাবে তাদের বক্তব্যগুলোকে ভোটারের কাছে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে।

সঞ্চালক: এটা তো একটি আদর্শ চিন্তা। আপনি কি মনে করেন না সরকার এটা জানে বা বোঝে এবং যারা কর্তৃপক্ষ আছে তারা সেটা জানে না?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা তারা জানবে না কেনো? কিন্তু উনাদের মনে যদি কোনো দ্বিধা থাকে যে জনগণের রায় তার কাছে গ্রহণযোগ্য হবেনা তখন তো তারা একটা সমস্যার ভেতরে থাকে, একটা দোটানার ভেতরে থাকে।

সঞ্চালক: কিন্তু জরিপ তো সেটা প্রতিফলিত করছে না। জরিপ বলছে ৭০ শতাংশ মানুষের সমর্থন আছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারের কার্যক্রমের প্রতি। ৭০ ভাগ মানুষের যদি সমর্থন থাকে তাহলে সুষ্ঠু কিভাবে হচ্ছে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটার তো দুটো উত্তর আছে। একটি উত্তর হচ্ছে আমার মানুষের দৃষ্টিতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং সরকার এক নাও হতে পারে। আপনি যদি প্রতিটি মন্ত্রীর দায়িত্ব এবং তাদের পরিসম্পাদন দেখেন তাহলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যতটুকু ইতিবাচক সমর্থন পান তারা হয়তো সেটা নাও পেতে পারেন। আপনি যদি এখন পুলিশের মূল্যায়ন করতে যান, বাজারে যারা আছে তাদের মূল্যায়ন করতে যান, যারা ব্যাংক দেখাশুনা করেন সেখানে যদি আপনি অনাদায়ী ঋণের হিসেবে ঢুকেন এমনকি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি যেটা দুই টাকাতে হবার কথা সেটা যদি ২০ টাকাতে হয় এবং সেটার ব্যাপারে যদি মূল্যায়ন করতে হয় তাহলে তো সকলে এ ব্যাপারে একমত হবেনা। তারা হয়ত ব্যক্তি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর উপরে আস্থা রাখে অনেক ক্ষেত্রেই। তারা বিকল্প অনেক সময় দেখেনা সেটার জন্য হতে পারে। যাই হোক আমি আসল আলোচনায় ফিরে আসি এবং সেটা হলো নির্বাচনটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের জাতীয় উত্তরণের ঘটনায় আমাদের ৭০ সালের নির্বাচনও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিলো, পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি ৯১ এর নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিলো, ২০০৮ এর নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিলো। তেমনই এবার ২০২৪ এর নির্বাচন ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এজন্য এ আকাঙ্ক্ষার জায়গাটাতে সকলেই যাচ্ছে। এখন বিষয় হলো যারা নির্বাচন চাচ্ছে তারা যে সকলেই আবার সরকার পরিবর্তন করতে চায় এমন নাও হতে পারে। এটা একমাত্র আপনি নির্বাচন হলেই বুঝতে পারবেন। তাহলে আমাদের সেই আস্থার জায়গাটাতে নিয়ে যাবার ব্যাপার রয়েছে। নির্বাচনী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন লোকের ভোট দেয়ার আগ্রহ আছে, আবার চলমান যে নির্বাচনী ব্যবস্থা এটার উপর তার চরম অনাস্থা আছে। এ দুটোর দোলাচলের ভেতরে জনগণ অবস্থান করছে। তার আকাঙ্ক্ষার সাথে পরিস্থিতির সম্মিলন কি প্রক্রিয়ার ভেতরে হবে এটা নিয়েই মানুষের মনের ভেতরে উত্তেজনা রয়েছে এবং এক ধরনের উদ্বেগ রয়েছে। রাজনীতির ময়দানে এটার সমাধান হবে বলে এটাতে আস্থা রাখতে পারছে না।

সঞ্চালক: রাজনীতির ময়দানে নাকি রাজনীতির টেবিলে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: টেবিলে যাবার জন্য যে পরিবেশ দরকার, যে পূর্বশর্ত দরকার সেটা নেই। আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো খুব কাছ থেকে আমাদের জলিল ভাই এবং মান্নান ভূঁইয়া সাহেবের সংলাপ দেখার। আমরা দিনের পর দিন সংলাপ করেছি যার কোনো অর্থ ছিলো না। পরবর্তী সময়ে এটা রাজনৈতিক সমাধান দিতে পারেনি। কারণ এটার জন্য যে পূর্বশর্তগুলো ছিলো সেগুলো সেখানে প্রতিফলিত হয়নি। এখন অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন তাহলে সামনে কি দেখেন?

সঞ্চালক: একই রকম তো আগেও আমরা দেখেছি যে ৯৪ তে লিনিয়ার স্টেজ হয়েছে ২০১৩ তেও।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সংলাপের পূর্বশর্ত যদি পূরণ না হয় এবং সেখানে যদি আমরা যেটা ইংরেজিতে বলি নেগোসিয়েশনের সময় কিছু থাকে গিভ অ্যাওয়ে অর্থাৎ এগুলো আপনি দিয়ে দিতে পারেন তাতে অসুবিধা হয় না। আর কিছু কিছু থাকে আপনার কোর ইস্যু সেগুলো আপনাকে ধরতে হবে। এখন এ মুহূর্তে আপনার মৌলিক যে চাহিদাটা সেটা হলো অন্তর্বর্তীকালীন একটি ব্যবস্থা লাগবে যেটার অধীনে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আপনি আস্থা পেতে পারেন। এটি তো হলো বিরোধীদের বক্তব্য তাই না? তারা বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে চায় না। তো এই জায়গাটাতে দেওয়া নেওয়ার সুযোগ ক্রমান্বয়ে অনেক সীমিত হয়ে যাচ্ছে। আপনি যদি ২০১৪ তেও দেখেন সেখানেও দেওয়া নেওয়ার সুযোগ কিছুটা করা হয়েছিলো। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে বিভিন্ন দল থেকে নিয়ে দল গঠন করা ইত্যাদি এটা কার্যকর কি হতো সেটা নিয়ে সন্দেহ হয়ত থাকতে পারে কিন্তু সে জায়গাগুলো এখন খুব সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

সঞ্চালক: কিন্তু যে সময়ে তারা ২০১৪ এর নির্বাচন বর্জন করেছিলো আবার ২০১৮ এ তারা এসেছিলো। যে শর্তগুলো তখন ছিলো সেখান থেকে কি কোনো কিছু পরিবর্তন হয়েছিলো বলে আপনি মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না।

সঞ্চালক: বর্জনের যে কারণগুলো ছিলো সেখানে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ২০১৪ এবং ২০১৮ এ যে অভিজ্ঞতা আছে তা এ নির্বাচনে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের নিয়ে আসবেনা। এখন তাই বোঝা যাচ্ছে। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বিরোধী দলের এবং অন্যান্য যে সমস্ত জোট আছে তারা এটায় আসবেনা। এখন বিষয়টা যেটা দাঁড়াবে সেটা হলো বর্তমান সরকার তার নিজস্ব শক্তিতে ২০১৪ এর মত একটা নির্বাচন করে বের হয়ে যেতে পারবে কিনা এবং নির্বাচন যদি করতেও পারে, নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিটা কি দাঁড়াবে। এ জায়গাটাতেই নাগরিকদের উদ্বেগটা বাড়ছে।

এখানে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে যারা এক্টরস বা প্লেয়ারস আছেন তাদের তো এক ধরনের নীতিমালা আছে যা ধরে তারা আগাচ্ছে। একই সাথে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়টা কিছু বিদেশিদের বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয়

ইউনিয়ন বলেন তাদের বয়ানের মধ্যে খুব জোরালোভাবে আসছে। এটা কি মিনিংফুল কোনো ইন্সট্রুমেন্ট কিনা?

২০১৪ এবং ২০১৮ এর সাথে ২০২৩-২৪ এর যে মৌলিক একটা বড় পার্থক্য সেটা হলো আমাদের বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোভাবের পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতিতেও এই পরিবর্তনটা লক্ষণীয়। আমরা ট্রাম্প উত্তর যুগে বসবাস করছি এবং এ যুগে বসবাস করাতে বাইডেন শাসনের যে ধরনের ঘোষিত নীতি আছে তার ভেতর গণতন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মানবাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সুশাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং দুর্নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এ সমস্ত বিষয়গুলো বিভিন্ন কারণে, ভূ-কৌশলগত কারণে বাংলাদেশের কাছে নমুনা হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। এটার ইঙ্গিত কিন্তু আপনি এখন দেখছেন, আমরা তো দেখেছি তিন বছর আগে যখন গণতন্ত্র সম্মেলনে বাংলাদেশকে দাওয়াত দেওয়া হলো না। তাও একবার নয়, দুইবার। তো ওটাই এক ধরনের কিন্তু বার্তা ছিলো আমাদের জন্য। তারপরে তো স্যাংশন নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে এবং এখন বিভিন্ন জিনিস আলোচনার ভেতরে আছে বলে আমরা শুনি। এটা নির্বাচনের আগেও বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপের মধ্যে আসাটা অসম্ভব না। বাংলাদেশের এ পুরো জায়গাটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের যুক্ত হবার একটা বড় জায়গা হলো এটা আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী যারা আছেন বিশেষ করে বৃহত্তর প্রতিবেশী যারা আছেন আমাদের পূবে তাদের চীনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা একটা বড় বিষয়।

সঞ্চালক: প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু মন্তব্য করেছিলেন আগে যেগুলো অনেক আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র যেকোনো দেশে ক্ষমতা উল্টাতে-পাল্টাতে পারে বলেছেন। এটার পক্ষে চীনা একটা সমর্থন আবার তারা স্ট্যাটমেন্ট দিয়েছিলেন। বেশকিছু কংগ্র্যাসম্যান কয়েকদিন আগেও জাতিসংঘে একটা চিঠি লিখেছে এবং সেগুলো নিয়ে আবার পাল্টা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ একটি স্ট্যাটমেন্ট করেছেন যে বাংলাদেশে যারা কংগ্র্যাসম্যানরা চিঠিপত্র লিখছেন তারা আবার এখানে পুরানো দিনগুলোকে ফেরত আনার জন্য যারা চেষ্টা করেছে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত ছিলো তাদের ভাষায় তাদেরকে সমর্থন করছেন কিনা ইন দ্যা নেম অফ ফ্রি ফেয়ার ইলেকশনের কথা বলছেন। আবার একই সাথে যুক্তরাষ্ট্র বলেন বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলেন বা অন্যান্য যেকোনো দেশ বলেন তারা কিন্তু সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের কথা বলছে কিন্তু তারা কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলছে না যেটা বিরোধী দল বারবার বলছেন এবং তারা একদফা চাইছে। আপনি এই ক্যামিস্ট্রিগুলো কিভাবে দেখেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন আপনার অনুষ্ঠান বিরতিতে যাবার আগে আপনি যে দেওয়া নেওয়ার কথা বলছিলেন আপনার এখানে বোঝার ব্যাপার আছে যে এ দেওয়া নেওয়ার ক্ষেত্রে কোথায় দেশের স্বার্থ আর কোথায় সরকারের স্বার্থ। ইংরেজিতে যেটাকে বলে কান্ট্রি ইন্টারেস্ট এবং রেজিম ইন্টারেস্ট। এই দুটো যে এক হবে এটার কোনো নিশ্চয়তা নেই এবং বিশেষ করে যদি কোনো সরকার মনে করে যে জনমানুষের যথেষ্ট পরিমাণে সমর্থন বা তার কোনো নির্বাচনী বৈধতার ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি আছে তখন সে ধরনের দেওয়া নেওয়াতে অনেক দুর্বল অবস্থানে থাকে। সেজন্য এই যে বিদেশিরা এতদূর পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে করতে পারছে যেটুকু যদি বলি হেনস্তা করছে আমাদের তাহলে সে হেনস্তার সুযোগটা সৃষ্টি হয়েছে আমাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে। যদি আমার সরকার সামগ্রিকভাবে নির্বাচনী বৈধতা, নাগরিক বৈধতা বা নৈতিক বৈধতার ভেতরে নিরঙ্কুশ থাকতো তাহলে তার কিন্তু হেনস্তা হবার কোনো কারণ ছিলোনা। এ বাংলাদেশী বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও এর চেয়ে অনেক কঠিন সময়কে মোকাবিলা করেছেন এর আগে। এবারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোথায় যেনো ফাটল ধরে যাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা মনে রাখার ব্যাপার। আরেকটা যেটা মনে রাখার ব্যাপার সেটা হলো যে এটাই পরিষ্কার করা দরকার নির্বাচন চাওয়া মানেই বিরোধী দলকে ক্ষমতায় আনা না। মানে এ দুটোকে আলগা করতে হবে। আমরা যারা নাগরিকেরা সুষ্ঠু নির্বাচন চাই এবং একটা এমন অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থান চাই যেখানে নির্বাচনের উপর কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার হবে না। এখন এটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে হবে নাকি তদারকি সরকার দিয়ে হবে যদি আমার সরকার সামগ্রিকভাবে নির্বাচনী বৈধতা, নাগরিক বৈধতা বা নৈতিক বৈধতার ব্যাপারে নিরঙ্কুশ থাকতো তাহলে তার কিন্তু হেনস্তা হবার কোনো কারণ ছিলো না।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এর থেকেও কঠিন সময়কে মোকাবিলা করেছেন এর আগে। কিন্তু এবারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোথাও যেনো ফাটল ধরে যাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা মনে রাখার ব্যাপার। আরেকটা যেটা মনে করা দরকার সেটা হলো, এটি পরিষ্কার করা দরকার যে নির্বাচন চাওয়া মানেই বিরোধী দলকে ক্ষমতায় আনা না। মানে এই দুটোকে আলগা করতে হবে। আমরা যারা নাগরিকরা সুষ্ঠু নির্বাচন চাই এবং এমন অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থান চাই যেখানে নির্বাচনের উপর কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার হবে না। এখন এটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে হবে নাকি তদারকি সরকার দিয়ে হবে নাকি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দিয়ে হবে তা জানি না। নাকি বর্তমান সরকারেরই কোনো ব্যবস্থায় হবে বা অন্য কোনো সাংবিধানিক ব্যবস্থার অধীনে এটা করা সম্ভব কিনা। আমরা এটুকু বুঝি যে এমন কোনো নির্বাচনকালীন সরকার হতে হবে যে সরকার আপনার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করবেনা, আপনার ফলাফলকে প্রভাবিত করবে না। আমাদের ঘর পোড়া গরু তো, আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। এটার অর্থ তো এই না যে কোনো উগ্রপন্থী বা বিরোধী দলকে জনগণেরা নিয়ে আসতে চাচ্ছে।

বাংলাদেশের এখন এক-তৃতীয়াংশ মানুষ যুব সমাজ, তিরিশ পয়ত্রিশের মতো। তাদের বয়স পয়ত্রিশের মত হয়ে গেলো অথচ জীবনে একটা ভোট দিতে পারলো না। এটা তো কোনো গ্রহণযোগ্য পরিস্থিতি হতে পারে না। সুতরাং, এ পরিস্থিতির উত্তরণ করতে হবে। এ পরিস্থিতিতে জনমানুষ যদি অন্য কিছু চায় সেটা তো মানুষের চাওয়া। সেটিকে কি আপনি রোধ করতে পারবেন, তাহলে তো আর গণতন্ত্র হতো না। এ রোধ করতে গিয়েই তো পাকিস্তানিরা ৭১ বানিয়ে দিলো।

সঞ্চালক: তাহলে এই প্রসঙ্গটা আনাটা যৌক্তিক হবে না এর আগে যে জঙ্গিবাদ বলেন বা সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত আছেন তাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য তো...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সেটা তো আপনি নির্বাচনী ময়দানে আদর্শিক লড়াই যখন করবেন তখন করবেন। এটার ভিত্তিতে কারো মানবাধিকারকে আপনি সংকুচিত করতে পারেন না। তার মত প্রকাশের অধিকারটা তার অবিচ্ছেদ্য মত প্রকাশের অধিকারের ভেতর থাকে। সেটুকু তাকে আপনাকে বলতে দিতে হবে। সেটাকে যদি আপনি মোকাবিলা করতে চান সেটাতে আপনি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে যতক্ষণ না আপনি আইন ভঙ্গ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি তার অধিকারটা নষ্ট করতে পারেন না। এর এটা সঠিক কি বেঠিক এটা রায় দেয়ার মালিক হলো জনগণ এবং সেটা রায় দেয়ার জায়গাটা হলো নির্বাচন। সে নির্বাচন হলে যে বৈধতা নিয়ে আসে সেটাতে তাকে রাজত্ব করতে দিতে হবে নির্দিষ্ট যেটুকু সংবিধানে দিয়েছে। আমাদের যে জায়গাটাতে সমস্যা হচ্ছে সেটা হলো বর্তমান যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা আছে, এ সাংবিধানিক ব্যবস্থাটা তো আসলে এক ধরনের রাজনৈতিক নিষ্পত্তি হয়েছিলো সে নিষ্পত্তিটাকে উল্টে দিয়ে এটি এসেছে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। এই অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের ব্যবস্থাকে বর্তমান সরকার, বর্তমান নেত্রীই তো ৯৬ সালে নির্বাচনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আমরা কেয়ারটেকার সরকার এনেছিলাম। তাই না? মধ্যরাতে খুব খারাপ একটা নির্বাচন হয়েছিলো যেখানে স্বাধীনতা বিরোধীদের আনা হয়েছিলো।

সঞ্চালক: কিন্ত এটাকে জাস্টিফাই করা হয়েছিলো যে সেটা না হলে সংসদে তাদের আনা যেত না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: একটা তো হয়েছে। ওটা একটা নিষ্পত্তি হয়েছিলো। সে নিষ্পত্তিটাকে আবার নষ্ট করতে নিয়েছিলো ২০০৬ সালে যেখানে রাষ্ট্রপতিকে কেয়ারটেকারের প্রধান করা হয়েছিলো। এইটা তো আমাদের জীবনকালের ইতিহাস, এটা তো আমরা সকলেই জানি। এখন যদি আপনি খণ্ডিত স্মৃতি নিয়ে কথা বলেন আপনি ২০০৬ এর কথা বলবেন আবার ৯৬ এর কথা বলবেন না এটা তো হয় না। কারণ আমার নেত্রীই তো

এই আন্দোলন করেছিলো। এখন তো এটা বললে হবেনা যে এই আন্দোলন কোনোদিন আওয়ামীলীগ করে নাই। আবার এটাও ঠিক বিএনপি এই কেয়ারটেকার সরকারকে বিতর্কিত করার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেছে এক সময়। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে রাজনীতিবিদদের এই কাজের জন্য আপনি কেনো বাংলাদেশের নাগরিকদের শাস্তি দিবেন? তার ভোটাধিকারকে আপনি কেনো বঞ্চিত করবেন?

সঞ্চালক: বাংলাদেশের নাগরিকদের কথা সামষ্টিকভাবে আপনি বলছেন কিন্তু আপনি এখানে জোর দিচ্ছেন যে দলমত যাই থাকুক না কেনো একটা সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচনের ক্ষেত্র নির্বাচন করতে হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনার মত প্রকাশের স্বাধীনতার চরম প্রকাশ হলো নির্বাচনে মতামত দেয়া এবং আপনার যদি কারো ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকে তাহলে রাজনীতির ময়দানে আপনি এটাকে প্রচার করেন।

সঞ্চালক: ভালো কথা এখন রাজনৈতিক কর্মী, সমর্থক বা অনুসারী বা সাধারণ নাগরিক যাদের বোঝার ক্ষমতা ভ্যারি করে, কিন্তু এখানে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের বিভক্তিটা কেনো?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নাগরিক সমাজের বিভক্তি বলতে আপনি কি বোঝালেন এটা আমাকে? এখন নির্ভর করে আমি যদি কালকে বলি আপনার মিডিয়ার ভেতরে বিভক্তি কেনো তো এটা তো একটা গণতান্ত্রিক সমাজে একাধিক মতামত থাকবে, নাগরিকদের ভেতরে একাধিক মতামত থাকতেই পারে।

সঞ্চালক: অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রসঙ্গে বলছি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রসঙ্গে আমার মনে হয় না যে যারা মূলধারার নাগরিক সমাজ আছে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের প্রগতিশীল রূপান্তরে বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। এই নাগরিক সমাজের মধ্যে কোনো বিভক্তি নাই। আমি মনে করি তারা সকলেই নির্বাচনের পক্ষে। এটা রাজনৈতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ ইংরেজিতে 'পলিটিক্যালি কারেক্ট' থিং। যে মনে করে না সেও এটা বলবেনা কারণ এটা রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। ইস্যুটা হলো কেউ এ নির্বাচনটাকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে কোনো ভীতি আছে কিনা। যদি ভীতি থাকে তাহলে বিভিন্ন ধরনের উছিলা আমরা এটার ভেতরে টেনে নিয়ে আসবো।

সঞ্চালক: এই যে পরিস্থিতি, এই অতলাবস্থা থেকে বের হয়ে আসবার ক্ষেত্রে অতীতের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগিয়ে ২০১৪ এর কথা বললেন বা ২০১৮ এর কথা বললেন সেখানে ২০১৪ তে এক ধরনের চেষ্টা ছিলো যেটা হয়তো বিবাদমান পক্ষগুলো সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি, ২০১৮ এ এটা কার্যকর হয়নি এটার কোনো বিকল্প উপায় কি আপনি পরামর্শ দিবেন কিনা?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেশের ইতিহাস ৫০ বছরের। আমাদের জন্মকালে আমাদের চোখে দেয়া যায়। সে ইতিহাসে অন্তত তিনটি ঘটনা আমি আপনাকে বলতে পারি। দুটো ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে আছে যেখানে আমরা একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তি করতে পেরেছিলাম সফলভাবে এই নির্বাচনী উত্তরণের ক্ষেত্রে। একটি হলো **১৯৯১** সালে এরশাদ সাহেবের পতনের মাধ্যমে শাহাবুদ্দিন সাহেবকে উপরাষ্ট্রপতি মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বানানো এবং তারপর একটা সুষ্ঠু নির্বাচন করা হয়। এটি হলো একটি সফল অভিজ্ঞতা এবং দ্বিতীয় আরেকটি হলো ৯৬ এর অভিজ্ঞতা। একটা পচা নির্বাচনের পরেও আমরা রাজনৈতিকভাবে সক্ষম হয়েছিলাম রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করে সংশোধনের মাধ্যমে উত্তরণ করা। দুই জায়গায় কিন্তু আমরা সফল হয়েছি এই ইতিহাস আছি। ব্যর্থ হয়েছিলাম কোথায়? ২০০৮ এ যেয়ে আমরা এটা পারিনি। তখন আমার কাঠামো ভেঙ্গে গেছে। অর্থাৎ শান্তিপূর্ণভাবে সাংবিধানিকভাবে আপনি যদি উত্তরণের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করেন তাহলে অবধারিতভাবে আপনার রাষ্ট্র ব্যবস্থা হোঁচট খাবে।

এখন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা বোঝার বিষয় সেটা হলো আমরা **১৯৯১** এ এবং ২০০৬ এ যে সমাধানটা আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে বের করে এনে দিয়েছিলাম, অর্থাৎ সেটা বাইরে আমরা তৈরি করেছিলাম রাজনৈতিক দলগুলো তা নিয়েছিলো এবং তিনদলীয় জোটের রূপরেখা হিসেবে এসেছিলো। এটা থেকে অভিজ্ঞতাটা বলে রাজনীতিবিদরা এমন একটি অভিজ্ঞতায় যান যখন তাদের একটি নিজস্ব সীমাবদ্ধতার কারণে তারা একা এটা সমাধান করতে পারেনা। আরেকটা হলো এটা বিদেশিদের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করলেও সমাধান হয়না। শেষ বিচারে যেয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদেরকেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং সে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে বড় বড় কতগুলো স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী থাকে। নাগরিক সমাজ একটা, পেশাজীবি সমাজ একটা, ব্যবসায়ী সমাজ আরেকটা এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের ভেতরে যারা রক্ষক থাকে সেটা হলেন আরেকটা। এই রক্ষকরা কেউ উর্দি পরেন, কেউ উর্দি ছাড়া। এর ভেতর দিয়েই এক ধরনের সমাধান তখন আস্তে ধীরে বের হয়ে আসে যখন রাজনীতিবিদরা এই সুষম উন্নয়নের পথটাকে বাধাগ্রস্ত করে ফেলে। আমাদের দেখার বিষয় আমরা কি সফল উত্তরণের দিকে যাবো নাকি আমাদের ব্যবস্থাকে হোঁচট খাওয়াবো।

সঞ্চালক: এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বা দেখার দৃষ্টি থেকে সফল উত্তরণের জন্য যদি সরকারের বা বিরোধী দল স্পেসিফিক্যালি বিএনপির জন্য উত্তরণের কোনো বিকল্প পরামর্শ কী আছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন আপনি যতই বিকল্প রাজনীতির কথা বলেন শেষ বিচারে আমি মনে করি দেশের মানুষের মতামতটাই গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি বিকল্প রাজনীতি নিয়ে আসতে চায় তাহলে জনমানুষের সমর্থন দৃশ্যমান করতে হয় রাজপথে।

সঞ্চালক: সেটা তো দুই পক্ষেরই প্রচুর জনসমাগম ঘটছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমাদের শাসকদলের সুবিধাটা হলো উনারা রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে জমায়েত করেন। উনারা জমায়েত করলে রাষ্ট্রযন্ত্রের সুবিধাভোগীদের একত্র করতে পারেন, রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থাকে তার ভেতরে ব্যবহার করতে পারেন। বিরোধী দলের কাছে সে সুযোগ নেই। অনেক ক্ষেত্রেই তারা বিভিন্ন ধরনের হয়রানির স্বীকার হয়।

সঞ্চালক: সাম্প্রতিক সময়ে তো এই বাধা বিপত্তি দূর হয়েছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা তো পুরোটা ঠিক না। সেখানেও ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যায়, সেখানেও বাস মালিকরা ধর্মঘট করে। সেখানেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গাতে এই জায়গায় পারবে ঐ জায়গায় পারবে না ইত্যাদি হয়। সম্পূর্ণভাবে হয়েছে সুষ্ঠু এটা বলতে পারবো না আর কি। তাদের ও একইরকমভাবে যেনো চেষ্টা করে সহিংসতার পথে না যেতে, জনমানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত না করতে ইত্যাদি। সুতরাং, শেষ বিচারে জনমানুষের অংশগ্রহণ দৃশ্যমান হওয়া এটিই নিয়ামক সত্য। এটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বলে, এটিই বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাস বলে এবং বাংলাদেশের যত জায়গাতে যা হয়েছে অনেক মানুষের কাছে অনেক চিন্তা থাকতে পারে, আমার কাছে অনেক চিন্তা থাকতে পারে, আপনার কাছে থাকতে পারে; কিন্তু এটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য যে প্রক্রিয়ার দরকার পড়ে, যে শক্তিগুলোকে দরকার পড়ে, সে শক্তিগুলো রাজনৈতিক শক্তি, রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত শক্তি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত গোষ্ঠীরা আছে সেটা হলো তারা। তাদের ভেতরে যদি এক ধরনের চাঞ্চল্য আপনার না থাকে তাহলে এ ধরনের পরিবর্তনকে আনাও যায় না, টেকানোও যায় না। দেখার বিষয় নাগরিক হিসেবে আমরা বাংলাদেশের ইতিবাচক উত্তরণের যে আকাঙ্ক্ষা করি, বাংলাদেশের যে উন্নয়ন হয়েছে তাকে টেকসই করা এবং পরবর্তী ধাপে নিয়ে যাওয়া, শান্তি-শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে একটি গর্বিত জাতি হিসেবে থাকা এ মনোভাবটাকে রাজনীতিবিদরা কতটুকু ধারণ করতে

পারে। উনারা যদি জনমানুষের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ না করে শুধুমাত্র ক্ষমতার ধারণাটাকে ধারণ করেন তাহলে এই বৈপরীত্য নিয়ে, এই দ্বন্দ নিয়ে সুষ্ঠুভাবে প্রক্রিয়া চলে না।

সঞ্চালক: সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন যে সরকার খুবই কমিটেড একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করার ব্যাপারে এবং এটা কোনো চাপের কাছে নয়। এটি একটি বিবেকের দায় হিসেবে, বিবেকের চাপ হিসেবে। সে অনুযায়ী মেজারস বিন ট্যাকেন, এটা কি মনে হচ্ছে কিনা?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিবেক জিনিসটা আমি ঠিক অনুধাবন করে উঠতে পারি না। এটা দেখতে কেমন, আয়তন কি, কার বিবেক কত বড়। আমি এটা মনে করি সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব। যারা শপথ গ্রহণ করে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এটাকে তার অংশ হিসেবেই দেখতে হবে। আমার কাছে এটা বিবেকের বিষয় না, এটা হলো দায়িত্ব, কর্তব্য এবং শপথের অংশ হিসেবে আসতে হবে।

সঞ্চালক: রাজনৈতিক প্রসঙ্গ তো আমরা আলাপ করলাম অবশ্যম্ভাবী ভাবেই, অর্থনীতির বিষয়ে আমার কিছু কৌতূহল আছে জানার। আপনি কিছু পজিটিভ নোট দিয়েছেন এটা আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে যে আমরা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন করেছি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকেও অনেক সময় বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের গ্রোথ খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু একই সাথে উচ্চ মূল্যস্ফীতি আছে, দ্রব্যমূল্যের ধাক্কা আছে, রিজার্ভের ঘাটতি আছে, বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে এক ধরনের সংকট আছে। এ সবকিছু কি অর্থনীতির গতিটা শ্লথ বলে ইঙ্গিত দিচ্ছে? আমরা যে এত কমিটমেন্ট দিচ্ছি যে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করবো, বিদেশে টাকা পয়সা যাবেনা কিন্তু সম্প্রতি দেখেন একটি বিজনেস হাউজের প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারের বাইরের বিনিয়োগের চিত্র ফুটে উঠেছে যা আমাদের কর্তৃপক্ষের নজরে নেই বলে মনে করা হচ্ছে। এ বিষয়টাকে আপনি কিভাবে দেখেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই যে আপনাকে প্রথম শুরু করেছিলাম রাজনীতির সাথে যে সম্পর্ক উন্নয়নের এবং আমি আপনাকে তখন বলেছিলাম যে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা না থাকলে উন্নয়নকে সুষমভাবে করা যায় না এবং শেষ বিচারে একে টেকসই করা যায় না। আপনি যে উন্নয়নটা করেছিলেন সে উন্নয়নের ভেতরে আপনার যে কৌশলগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতিটা ছিলো সেটা হলো জবাবদিহিতার ঘাটতি। জবাবদিহিতার ফলে ব্যাংকের ভেতর আপনার যে খেলাফি ঋণ বাড়লো এবং এ ঋণ বাড়ার ফলে আপনি এখন ব্যক্তিখাতে ঋণ দিতে পারেন না যার ফলে ঋণের প্রবাহ ব্যক্তিখাতে খুবই কম। এর সাথে হয়েছে যে

টাকা রপ্তানি করলো, দেশ থেকে পাচার হয়ে গেলো এর ফলে বিদেশি টাকাও আপনার কাছে নেই। সেটাও আপনি জবাবদিহিতার মধ্যে আনলেন না কারণ আপনি কিছু ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীকে এই সুযোগগুলো করে দিয়েছেন যেটা আজকে আপনার জন্য কষ্টকর হয়েছে। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যেমন আপনি ২২০০০ মেগাওয়াটের সক্ষমতা বসিয়েছেন কিন্তু ১১০০০ মেগাওয়াটও ব্যবহার করতে পারেননি। সেখানেও হাজার হাজার কোটি টাকার ঘাটতি রয়েছে। আজকে ডলার সংকটের কারণে আমরা জ্বালানি আমদানি করতে পারছি না যার ফলে বিদ্যুৎ সংকট উত্তরণ করবে। আপনি যেই প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করছেন এটা তো সকলেই জানে তারা সরকার ঘনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এবং এক ধরনের আশীর্বাদপুষ্ট ঘনিষ্ঠ। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংকিং খাত এবং অন্যান্য খাতে তাদের যে সম্প্রসারণ ঘটেছে এটাও আমরা জানি যে সে আশীর্বাদের ফলেই হয়েছে।

অর্থনীতিত ভেতরে যদি আপনার জবাবহিদিতা না থাকে সে বৈধতা আসে গণতান্ত্রিক বৈধতা এবং জবাবদিহিতার ফলে। ঐটা যদি থাকতো, সরকার যদি আমার প্রশ্নের সম্মুখীন হতো আজ থেকে ১০ বছর আগে, আজক কিন্তু সরকারকে এই দুর্বল অবস্থা নিয়ে নির্বাচনে যেতে হতো না। দেখুন এ কথাগুলো কিন্তু আপনার এখানে বসে আমিও অনেকবার বলেছি এবং সে কথাগুলো যদি আপনি কর্ণপাত করতেন তখন আজকে ১৫ বছরের ভেতরে সবচেয়ে দুর্বলতম অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনি নির্বাচনে যেতেন না এবং নির্বাচনে যাবার জন্য আপনাকে বলতে হচ্ছে যে রাশিয়া-ইউক্রেন যে যুদ্ধ হলো তা না হলে হয়ত আমার সোনার সংসারে আগুন লাগতো না। এটা তো খুবই দুর্বল যুক্তি কারণ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ভেতরেও অন্য অর্থনীতি কিভাবে সামাল দিচ্ছে তা আপনি লক্ষ্য করে দেখেন। ভারতও তো আছে এর ভেতরে; পাকিস্তান, নেপাল এমনকি শ্রীলংকা যেভাবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে এখন এ জিনিসগুলো আমাদের বোঝার ব্যাপার। আপনাকে আমি আজকে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি যে উন্নয়ন এবং গণতন্ত্র একে অপরের অবিচ্ছেদ্দ অংশ। সুষম উন্নয়নের জন্য গরীব মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে হলে যেটা বিভিন্ন দল বলে থাকে উনারা যদি এটা আসলেই বিশ্বাস করে তাহলে উনাদের জনগণের কাছে যেতে হবে এবং ঐ বৈধতাই উনাকে শক্তি দিবে। বিদেশিদের মোকাবিলা করার জন্য এবং দেশের ভেতরে যদি অপশক্তি থাকে তাদের মোকাবিলা করার জন্য।

সঞ্চালক: আপনি বলছিলেন সরকারের ভেতর প্রভাবশালী কারা এটা জানা এবং পাচার করা যে অর্থ তা বৈধ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। আপনি বলেছেন আমি লক্ষ্য করেছি যে সামাজিক সুরক্ষা খাতে গরীব মানুষদের জন্য যে বিনিয়োগটা দেয়া হয় সে তুলনায় পাচার হওয়া প্রভাবশালী লোকদের ফেরত আনার জন্য এর চেয়ে বেশি ইন্সেন্টিভ দেয়া হচ্ছে। এটার কি কোনো সুফল পাওয়া গেছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এ আলোচনাটা আমাকে বৃহত্তর বৈশ্বিক আলোচনাতে নিয়ে যাবে। বর্তমান সরকারের যদি আপনি নীতিমালা দেখেন তাহলে আমার মতো পেশাজীবী অর্থনীতিবিদরা নীতিমালার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখেন না, সমস্যা দেখেণ তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। পৃথিবীতে এখন এমন তর্ক উঠেছে যে মূল্যবোধভিত্তিক অর্থনীতি নাকি সুশাসনভিত্তিক অর্থনীতি। এটা আরো বেশি এসেছে দিল্লীতে আমাদনি সরকার আসার পরে। নীতিমতের দিক থেকে, মূল্যবোধের দিক থেকে বিশ্বে মোটামুটি এক ধরনের ঐক্যমত এসেছে এবং সেটা বাংলাদেশেও এসেছে। আপনি বিএনপি বলেন বা আওয়ামীলীগ বলেন যদি অর্থনৈতিক নীতিমালার দিকে তাকান তাহলে সকলেই বলবে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা দরকার আছে, সকলেই বলবে আমাদের রপ্তানিকে বহুমুখীকরণ করতে হবে, গার্মেন্টস থেকে বের হতে হবে, সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে হবে পরিবেশ নষ্ট করতে পারবে না, শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে হবে, গরীব মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে হবে, প্রবৃদ্ধি হবার পরেও কিছু গরীব মানুষ থাকবে যাদেরকে সুরক্ষা দিতে হবে। বিষয়টা এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?

যদি আপনার নীতির ক্ষেত্রে ৯০-৯৫ শতাংশ বৈশ্বিকভাবে এবং জাতীয়ভাবে ঐক্যমত হয়ে থাকে, আপনি প্রত্যেকের নির্বাচনী ইশতেহার দেখলে পড়ে এ জায়গাটা পাবেন। তাহলে তখন প্রশ্ন দাঁড়ায় কে দক্ষতার সাথে এ কাজটা করতে পারবে এবং দক্ষতার সাথে কাজ করার একটি বড় উপায় হলো প্রতিমুহূর্তে মানুষের মুখোমুখি হওয়া। তাই অনেক দেশেই আলোচনা হচ্ছে এ যদি সত্যি সত্যি দক্ষতার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়, রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধ তো আমার সংবিধানে আছে তাকেও কার্যকর করার ব্যাপার আছে। কিন্তু তখন ৫ বছর নয়, তিন বছর পর পর রাজনীতি দিয়ে দিবে। তখন দেখবেন বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় যে তারা প্রথম দুই বছর ভালো শাসন করে, তিন বছরে যেয়েই বিভিন্ন ধরনের দুষ্কর্ম শুরু হয়ে যায়।

সঞ্চালক: তাহলে আমাদের হয়ত বিবেকের নির্বাচন না, নীতি নির্বাচন করলেই চলে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি আপনাকে যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সমাধান আমরা বিভিন্ন সময়ে করেছি। আমাদের স্বাধীনতাও এক ধরনের রাজনৈতিক সমাধান ছিলো। একইভাবে আমাদের সামরিক শাসনের জন্য আন্দোলন গণতন্ত্রের জন্য ওরকম ছিলো। আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনও সেটার অংশ ছিলো। আমাদের বোধহয় এখন এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আরেকটু বড়ভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের উন্নয়নের ৫২ বছরের এ অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় আমরা কি ধরনের রাষ্ট্র কাঠামো নিয়ে চলবো, কি ধরনের

নাগরিকের কণ্ঠস্বর, স্থানীয় সরকার এগুলোকে আমরা কিভাবে সামনে আনবো, কিভাবে নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান এবং কিভাবে নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দাঁড় করাবো।

সঞ্চালক: এটা তো ওভার নাইট করা সম্ভব হবেনা। যেহেতু প্রতিষ্ঠান ভেংগে পড়েছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যেহেতু প্রতিষ্ঠান ভেংগে পড়েছে আপনি হয়ত মনে করছেন যে পুরোটা এখনো পড়েনি এক ধরনের খোঁড়াচ্ছে হয়ত। এটাই সময় আরেকটু গভীরে যেয়ে মনে করার যে এ ধরনের সমস্যা কেনো পৌনঃপুনিকভাবে আমার ৫ বছর পর পর আসে। একটা রাষ্ট্র কাঠামোর জন্য এটা এত বড় টেনশন কেনো এবং যে ক্ষমতা ছেড়ে দেয় সে কেনো এত উদ্বেগের ভেতরে থাকে যে এরপরে তার জীবন রুজি থাকবে কি থাকবে না। একটা গণতান্ত্রিক সমাজে আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে এত অনিশ্চয়তা থাকবে কেমন করে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে যদি এত বড় ঝুঁকি তৈরি হয় এবং অনিশ্চয়তা নিয়ে যদি আপনি জীবনযাপন করেন তাহলে তো গণতন্ত্র প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে। যদি গণতন্ত্র ঝুঁকিতে পড়ে তাহলে উন্নয়নও ঝুঁকিতে পড়ে যাবে। তার মানে হলো আমাদের সাধারণ মানুষের জীবনও ঝুঁকিতে চলে যাবে। আমি আসলে জহির আপনাকে যা বলতে চাচ্ছিলাম তা হলো আমাদের বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু দেখতে হবে। কেনো আমাদের এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যে আমরা বার বার এরকম হোঁচট খাচ্ছি। এই হোঁচটকে নতুন সমঝোতা এবং উপলব্ধির ভেতরে আনতে হবে। কি ধরনের কাঠামো আমাদের রাষ্ট্রে হলে আমাদের হোঁচট খেতে হবেনা।

সঞ্চালক: যেটা আসার কথা তার কোনো সমাধানের সমীকরণ বা নির্দেশ কারোই জানা নেই আর কি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার ধারণা এবারের নির্বাচনে যারা যাবেন আমাদেরও দাবি করা উচিত উনারা যেনো মধ্যমেয়াদে এ কাঠামোগত সমাধানগুলো, আজকাল কি একটা নতুন শব্দ শুরু হয়েছে রাষ্ট্রের সংস্কার সে সংস্কারের ব্যাপারটা দেখতে হবে।

সঞ্চালক: এগুলো তো পরবর্তী ধাপের কথা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কিন্তু রাজনীতিতে যখন আপনি জনগণের মুখোমুখি হবেন তখন কি এই প্রতিশ্রুতির কথা আপনার সামনে আসবে না? এটাই তো বলার সময়। আমরা মনে করি গণতান্ত্রিক উত্তরণটা একটি খুবই ফলপ্রসু সময় হিসেবে আমাদের দেখতে হবে, খুবই প্রতিশ্রুতিশীল সময় হিসেবে দেখতে হবে। যেখানে আমরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সংকটটাও ধারণ করবো, উত্তরণের পথটাও খুঁজে বের করবো এবং রাজনীতিবিদদের

এ আলোচনার ভেতরে আসতে হবে। এখনো বাংলাদেশের রাজনীতি অনেক বেশি পশ্চাদমুখী। আমরা ইতিহাসের ভেতরে রাজনীতি খুঁজি, ইতিহাসের ভেতরে বৈধতা খুঁজি। আমরা আগামী দিনের বাংলাদেশের ভেতরে নিজের বৈধতাকে স্থাপন করতে চাইনা। বাংলাদেশের যে তরুণ সমাজ আসে তার ৭০/৮০ শতাংশ স্বাধীনতার পরে জন্মেছে। তারা তো অন্য বাংলাদেশ দেখতে চায়। সে বাংলাদেশকে আমাদের সামনে নিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে। আমি মনে করি এটিই সময়। এই ঝুঁকির সময়েই সব থেকে উৎকর্ষ ধারণাগুলো আমাদের সামনে বের হয়ে আসবে। আর রাজনীতিবিদরা এটা ধারণ করবে।

সঞ্চালক: আদিবাসী দিবস উদযাপিত হলো আজকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন বাস্তবতা আছে এই জনগোষ্ঠীকে ঘিরে। এই আন্তর্জাতিক দিবসকে কেন্দ্র করে একটি মতামত আপনার থেকে চাইবো। ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনটা নতুন নামে এসেছে। অর্থাৎ সাইবার সিকিউরিটি আইন নিয়ে সংক্ষেপে যদি কিছু বলেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আদিবাসী শব্দটা নিয়ে আমাদের রাষ্ট্রের ভেতর অনেকের হয়ত সংবেদনশীলতা আছে। কিন্তু উনাদের অনুধাবন করতে হবে যে এটি একটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়। আদিবাসী মানেই এই না যে আদি বাসী। মানে যে আগে থেকে ছিলো না অর্থাৎ বাঙ্গালিরা ছিলোনা এমন কিছু না। এটি হলো একটি বিপন্ন জনগোষ্ঠী যার নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে আমরা যা ব্যবহার করি। বাংলাদেশের আদিবাসী সম্প্রদায় আমাদের পার্বত্য অঞ্চলেও আছে, সমতলেও আছে। এরা উভয়েই বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আছে। আমরা শান্তিচুক্তি করেও বাস্তবায়ন করতে পারিনি পুরোপুরি। ওখানে যথেষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করে।

সঞ্চালক: ওখানে উন্নয়ন কার্যক্রমও হচ্ছে প্রচুর।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: উন্নয়ন কার্যক্রম হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সব সময় প্রশ্ন থাকে যে ওই উন্নয়ন কার্যক্রমের সুবিধাভোগী তারা হবে নাকি অন্য কোথাও থেকে কিছু হবে। এটার আলোচনা অন্য একদিন করবো। বিশেষ করে ভারতে যদি ১৯৭০ ধারা যদি তারা তুলে দিলো কাশ্মীরের জন্য যেটাতে কাশ্মীর এক ধরনের বিশেষ সুবিধা পেতো তাহলে এটা প্রয়োজন ছিলো। আমিও মনে করি এটি তুলে দিয়ে ভুল এবং অন্যায় হয়েছে। সেরকম আমিও মনে করি যে আমরা কি সুরক্ষা দিতে পেরেছি আমাদের আদিবাসীদের বিশেষ করে সমতল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে। আদিবাসী দিবসটা গুরুত্বের সাথে পালন করা উচিত বলে আমি মনে করি এবং আমাদের জাতীয় ঐক্যের সাথে এ ব্যাপারটা যুক্ত। আপনি অন্য যে আইনের কথা বলেছেন সেটা তো সরকার এক ধরনের পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হলো।

সঞ্চালক: অর্থাৎ আপনি এটা সদিচ্ছা হিসেবে দেখছেন না?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি দেখছি সরকার যে পদক্ষেপই নেয় সেটা এক ধরনের রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসেবে। কারণ এই সাইবার সিকিউরিটি আইন কিছু করা হবে না এ কথাও জোর দিয়ে আমরা শুনেছি। তারপরেও তো এটা করতে হলো। সংস্কার হবে এবং সংস্কার করতে গিয়ে উনারা প্রতিস্থাপন করছে। সকলেই যেটা আশঙ্কা করছে এখন যে শুধুমাত্র কিছু কতিপয় ধারার সাজা কমানোর মাধ্যমে জেলে যাবার পরিবর্তে টাকা দিলে হবে বিষয়টা এটা না। বিষয়টা হচ্ছে হয়রানিমূলক ব্যবস্থা যেটা ছিলো মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সেটা ছিলো এবং এটাকে অপব্যবহার করে হয়রানির ক্ষেত্রে আপনার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা যেনো না হয়। যদি সরকার এটা আসলেই সদিচ্ছা থেকে করে থাকেন তাহলে এটার টেস্ট কেস হচ্ছে সরকার এটা নিয়ে মুক্ত আলোচনা করবেন কিনা। যদি সরকার আলোচনা করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে বুঝবেন যে সরকার গণতান্ত্রিক বৈধতার ব্যাপারে যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থানে আছে।

সঞ্চালক: আলোচনা তেমন একটা নেই।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আলোচনা যদি না থাকে তাহলে আমি মনে করি সরকার রাজনৈতিক সমাধানের বিভিন্ন উপাদান বলছিলাম যে উনারা আরেকটা হয়ত সুযোগকে ছেড়ে দিলেন।

সঞ্চালক: তাহলে আজকে আমরা নির্বাচনকে নিয়ে যে আলোচনা করলাম সেটার কোনো সমীকরণ বা সমাধান সামনে নেই কিন্তু এটার একটা আশাবাদ আছে যে এটা সবাই অনুধাবন করবে যে একটা সময় নির্বাচনের তাগিদ অনুভব করবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার ইতিহাস বলছে যদি আপনি সুস্থভাবে, সাংবিধানিকভাবে বা নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে অবৈধ মনে করেন তাহলে কাঠামো কখনো কার্যকর হয় না, সেটা হোঁচট খায়। বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে এটা একটা অবধারিত শিক্ষা আমাদের কাছে আছে। আমি আশা করবো আমাদের রাজনীতিবিদরা তাদের প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা এবং দেশপ্রেম নিয়ে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে হোঁচট খাওয়ানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে না।

সঞ্চালক: যদি কোনো বন্ধু আমাদের অতীতের মত সহযোগিতা করে সেক্ষেত্রেও না?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমাদের আন্তর্জাতিক বন্ধুরা যতটাই থাকুক না কেনো, যতটা প্রণোদনা বা সাহায্য দিক না কেনো শেষ বিচারে এটা বাংলাদেশের নাগরিকদেরই, বাংলাদেশের

রাজনীতিবিদদেরকেই একটি সিদ্ধান্তের ভেতর আসতে হবে এবং উপলব্ধির ভেতর আসতে হবে। এটা অন্য কারো পেছনে পালিয়ে থাকার সুযোগ নেই।

সঞ্চালক: ধন্যবাদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য এবং চমৎকার বিশ্লেষণের জন্য। আজকের আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করবো।

এই সময়, এনটিভি
সঞ্চালনায়: জহিরুল আলম
১০ আগস্ট, ২০২৩

রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে জটিল ও অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মানুষের সাফল্যের কিছু দায় থাকে, প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়। সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করাটা খুবই কষ্টকর। বাংলাদেশের মানুষের বিশেষ করে যে পরিস্থিতি বর্তমানে জাতীয়ভাবে, আঞ্চলিকভাবে ও বৈশ্বিকভাবে যা চলছে। তাই মানুষ অনেক কিছু আকাঙ্ক্ষা নিয়ে টিভির পর্দার সামনে বসে। কিন্তু সব সময় আমরা সবাই তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারি কিনা- এটার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সেই জায়গাটাতে আমরা কী করতে পারি? আগামী দিনের ভূমিকাটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হলো আমরা বলি যে, রাজনীতিবিদদের আগামীর ভূমিকার কথা। কিন্তু এটাও ঠিক যে, সেই সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়া ও নাগরিক সমাজের ভূমিকাটাও আগামীতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আসবে। তাদের চাহিদাটা আরও বাড়বে। রাজনীতির যে বিষয়টি বাংলাদেশে চলছে এটা প্রথম নয়। এরকম ঘটনা আমরা ১৯৯০, ’৯৬ ও ২০০৬ সালেও মোকাবিলা করেছি। আমাদের এমন একটি পরিস্থিতি মোকাবিলার কোনো অভিজ্ঞতা নেই— এমন কিন্তু না। এবং এই তিনটি ঘটনার মধ্যে দুইবার আমরা সফলভাবে এর সমাধানও করেছি। এরশাদের পদত্যাগ ও পরবর্তী সময়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে সফল নির্বাচনের মাধ্যমে এর সমাধান হয়েছিল। ২০০৬ সালে যে ধরনের বাজে নির্বাচন হয়েছিল তার মধ্য দিয়েও একটি কেয়ারটেকার সরকারের বিল আমরা পাস করেছিলাম। কিন্তু এরপরে এই প্রক্রিয়াকে যখন আমরা এগুতে দেইনি উপরন্তু কেয়ারটেকার সরকারকে আমরা বিতর্কিত করেছি। তখন আমাদের আলোচনার প্রক্রিয়া ভেঙে গেছে। আপনি যদি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে সহজ না করেন, নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে প্রক্রিয়াটা ভেঙে পড়ে। এখন বিষয়টি হলো আমরা কি এই ব্যবস্থা ভাঙার দিকে যাচ্ছি? নাকি আমরা একটা সুরাহার ভেতরে থাকবো? যখন এরকম রাজনৈতিক সমস্যা

বা সংকট আসে তখন রাজনীতিবিদরা একা একা সমাধান করতে পারে না। তখন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শক্তি এটার সঙ্গে কাজ করে। নাগরিক সমাজ থাকে, পেশাজীবীরা থাকে, ব্যবসায়ীরা থাকে, অনেক সময় প্রশাসনের ভেতরে উর্দি পরা লোকেরাও থাকে। তখন দেখা যায় একটা সমাধান আসে।

একটি বিষয় হলো বিদেশিরা সবসময়ই এসেছে। এখনো বিদেশিরা আসবে কিন্তু তারা কখনো কোনো সমাধান দিতে পারবে না। আবার অনেকে সংলাপের কথা বলে। এখানে সংলাপ যদি শুধুমাত্র সংলাপ বা আলাপ করার জন্য হয় তাহলে এতে কোনো ফল দেয় না। কারণ অতীতে আমরা দেখেছি মান্নান ভুঁইয়া আর জলিল ভাই দিনের পর দিন বসেছে। তাতে কোনো ফল আসেনি। প্রথমত, রাজনীতির বাইরে যেসব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীরা আছে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যারা সংলাপের ভেতরে ঢুকতে চান। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক যে বন্ধুরা আছেন তারাও লোকদৃষ্টির আড়ালে একটি আলোচনা করতে পারেন। তাই আমি বলবো লোক দেখানো সংলাপের নামে সংলাপ করে কোনো লাভ নেই। এখন ওই জায়গাটিতে আমরা এখনই পৌঁছেছি কিনা সেটা নির্ভর করবে দৃশ্যমানভাবে রাজপথে জনমানুষের মতামত প্রকাশিত হলে। যদি জনমানুষের মতামত প্রকাশিত হয় তাহলে সেটার বাতাবরণে লোকচক্ষুর অন্তরালে আলোচনা হয়। আমি তো সেরকম একটি পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে বলে মনে করছি। আমি দেখছি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে, জটিল হয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনের আগে যদি জনমানুষের মনোভাব প্রকাশের জায়গা না থাকে তাহলে সাংঘর্ষিক অবস্থার দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সহিংসতা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে রাষ্ট্রের এবং নাগরিকের বিরাট ক্ষতি হয়।

রাষ্ট্রের ভেতর যদি নাগরিক সমাজ দুর্বল থাকে তাহলে রাষ্ট্রকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে। যেটুকু নাগরিক সমাজ আছে সেটুকুও তো আমরা সহ্য করতে পারছি না। অনেক সময় যারা নিজেকে নাগরিক সমাজ বলে আসলে তারা রাজনৈতিক সমাজ। কারণ তারা এমন বেশি দলীয় রাজনীতির ভেতর ঢুকে গেছেন সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নাগরিক প্রতিনিধি পরিচয় দেয়া সম্ভব না। নাগরিক সমাজের সংজ্ঞা হলো, রাষ্ট্রের ভেতরে রাজনীতির সঙ্গে দলীয় মতের সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত নয়। আপনি যদি স্বাধীন না থাকেন মনের দিক থেকে দলীয়ভাবে তাহলে কোনোভাবেই আপনি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হতে পারবেন না। তার অর্থ এই না যে, আপনার মূল্যবোধ থাকবে না। আপনি মানবতার পক্ষে থাকবেন, আপনি গরিব মানুষের পক্ষে থাকবেন, স্বাধীনতার পক্ষে থাকবেন কিন্তু তার অর্থ এই না যে, আপনি নির্দিষ্ট দলের পক্ষে থাকবেন। আমরা অনেক সময় দেখি কেউ একজন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদলে নিজেকে পরিচয় দেন আসলে তিনি একজন রাজনৈতিক দলেরই উপ-দল হিসেবে সেখানে উপস্থিত হন। এটাও নাগরিকদের সচেতন

থাকার দরকার আছে স্বাধীনভাবে এই মানুষটি আছে কি নেই? নাগরিক সমাজ যখন ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অংশ হয়ে যায় তখন আর সে নাগরিকদের পক্ষে থাকে না, তখন দলের পক্ষ হয়ে যায়। নাগরিক সমাজ যেন কোনো দলের না হয়ে প্রকৃত নাগরিকের কণ্ঠস্বরটা ধরে রাখতে পারে। তবেই দেশের কল্যাণ হবে।

মানবজমিন
২১ আগস্ট ২০২৩
(চ্যানেল আইতে প্রচারিত 'আজকের সংবাদপত্র' হতে গৃহীত)

বাংলাদেশ একটি সন্ধিক্ষণে আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জাগো নিউজ: আসন্ন নির্বাচন ঘিরে ফের রাজনৈতিক সংকট। স্বাধীনতার অর্ধশত বছর পরেও এমন সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: গত পাঁচ দশকের হিসাব ধরে আলোচনা করলে বাংলাদেশের যে অর্জন তা বিশ্বের যে কোনো সম্প্রদায়েরই নজর কাড়বে।

একটি যুদ্ধবিধস্ত দেশ, এরপর নানা রাজনৈতিক উত্থান-পতন। এর মধ্যেও বাংলাদেশ নিম্নমধ্য আয়ের দেশ হয়ে গেলো সমকক্ষ দেশগুলোকে পেছনে ফেলে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে আসা, দারিদ্র্য ব্যাপকভাবে নামিয়ে নিয়ে আসা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যখাতের অবকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল অগ্রগতি তো চোখে পড়ার মতো। এ অর্জন তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে অনেকেই সন্দেহ করেছিলেন যে, বাংলাদেশ টেকসই জাতি হিসেবে দাঁড়াতে পারবে না। সেই সন্দেহ কাটিয়ে আমরা নিঃসন্দেহে নানা সাফল্যগাঁথা রচনা করে চলছি। সম্প্রতি এ সাফল্য আরও বেগবান হয়েছে বলে মনে করি।

জাগো নিউজ: এই সাফল্যের ক্রেডিট মূলত কাদের দেবেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের যা সাফল্য তা একই সঙ্গে যেমন রাষ্ট্র-সরকারের নীতির প্রতিফলন, তেমনি ব্যক্তিখাতের, সাধারণ মানুষের অবদান রয়েছে। যৌথ সাফল্যে বাংলাদেশ আজ এই জায়গায় বলে মনে করি।

বাংলাদেশ একটি সন্ধিক্ষণে আছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা আমাদের জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেমন ১৯৭০ সালের নির্বাচন স্বাধীনতাযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একইভাবে ১৯৯১ সালের নির্বাচন সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। ২০০৮ সালের নির্বাচন মূলধারার নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করে। একইভাবে ২০২৪ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষের জীবনে ক্রান্তি উত্তরণের সময় বলে মনে করি।

জাগো নিউজ: কেন এমনটি মনে করছেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের যে অর্জন তা কতটুকু টেকসই হবে তা নির্ভর করছে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার ওপর। যদি আমরা গণতান্ত্রিক সংকটের উত্তরণ না ঘটাতে পারি, তাহলে উন্নয়নের ধারা পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবো না।

জাগো নিউজ: সার্বিক পরিস্থিতি কী জানান দিচ্ছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মধ্য দিয়ে গত পাঁচ দশক পার করেছে। রাজনৈতিক সংকটও ছিল। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যা, সামরিক শাসন, নাগরিক আন্দোলনের মধ্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মতো ঘটনা আমাদের দেখতে হয়েছে।

আমরা যে ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে সময় পার করছি, তা নতুন ঘটনা নয়। আমাদের ইতিহাসে এমন ঘটনা বহু আছে। আমরা অনেক ঘটনাই সফলতার সঙ্গে উত্তরণ করতে পেরেছি। ১৯৯১ সালের ঘটনা তেমনই। রাজনীতিকদের পাশাপাশি নাগরিক সমাজও তখন ভূমিকা রেখেছে। রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে নাগরিক শক্তিগুলো এক হয়ে কাজ করলে সমাধান করা সহজ হয়।

আর যদি রাজনীতিবিদরা এমনভাবে প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থেকে বিকৃত করার চেষ্টা করে তাহলে ফলাফল ভালো হয় না। ২০০৬ সাল তার প্রমাণ। আমাদের কাছে ভালো সমাধানও আছে আবার খারাপ সমাধানও আছে।

আমাদের সমস্যা আমাদেরই সমাধান করতে হবে। বিদেশিরা কখনো সমাধান দিতে পারে না। বিদেশিরা হয়তো বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে যুক্ত হন। কিন্তু শেষ বিচারে বাংলাদেশের মানুষকেই সমাধানের পথ বের করতে হয়। মানুষকে দৃশ্যমানভাবে তার কণ্ঠস্বর প্রকাশ করতে হয়। যদি এই কণ্ঠস্বর প্রকাশ না পায়, তাহলে কোনো সম্ভাবনাই আর কার্যকর করা যায় না।

জাগো নিউজ: ২০০১ সালের পর নাগরিক সমাজ যেভাবে সোচ্চার ছিল, বর্তমানে সেভাবে ভূমিকা রাখছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। নাগরিক সমাজ নানাভাবে বিভাজিত এবং সেটা স্বার্থের কারণেই।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি এমন অভিযোগের সঙ্গে প্রথমত একমত হতে পারলাম না। নানা আদর্শের ভিত্তিতে, নানা মতের ভিত্তিতে রাজনীতি বিভাজিত হয়। নাগরিক সমাজও নানা আদর্শের ভিত্তিতে বিভাজিত হতে পারেন। এখানে দোষের কিছু নেই। আপনি যাদের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছেন, তারা আসলে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি না। তারা সরকারপক্ষ থেকে উপঢৌকন নিয়ে উপদল হিসেবে কাজ করেন। তারা রাজনীতিরই উপছায়ায় অবস্থান করেন। তাদের দায়-দায়িত্ব নাগরিক সমাজের ওপর দিতে পারেন না। সত্যিকার নাগরিক প্রতিনিধিরা কারও কাছ থেকে সুবিধা নিতে পারে না। তবে আমি মনে করি বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের অবস্থা অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে জটিল।

আপনি যদি বিরাজনীতিকরণের অভিযোগ তোলেন, তাহলে আমি বলবো সর্বাপেক্ষা বিরাজনীতিকরণ চলছে এখন। আমলাতন্ত্র দেশ চালাচ্ছে। এটি রাজনীতিকরাই বলছেন। যে দেশে গণতন্ত্র, জবাবদিহি দুর্বল থাকে সে দেশে নাগরিক সমাজ কাজ করতে পারে না।

জাগো নিউজ: নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আছে যে ১/১১ সৃষ্টিতে তাদের ভূমিকা আছে এবং বিরাজনীতিকরণে তারা সোচ্চার ছিলেন। এ অভিযোগ সরকার এবং বিরোধী জোট উভয়ই করে আসছে। আর এ কারণেই নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা জনআস্থা হারিয়েছে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি এ অভিযোগের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত না। যে দেশে গণতন্ত্র দুর্বল হয়, সে দেশে নাগরিক সমাজ দুর্বল থাকে। মানুষ ভোট দিতে না পারলে নাগরিক সমাজ কার কণ্ঠস্বর নিয়ে এগোবে।

আপনি যদি বিরাজনীতিকরণের অভিযোগ তোলেন, তাহলে আমি বলবো সর্বাপেক্ষা বিরাজনীতিকরণ চলছে এখন। আমলাতন্ত্র দেশ চালাচ্ছে। এটি রাজনীতিকরাই বলছেন। যে দেশে গণতন্ত্র, জবাবদিহি দুর্বল থাকে সে দেশে নাগরিক সমাজ কাজ করতে পারে না।

জাগো নিউজ
২৯ আগস্ট, ২০২৩

সংকট বাড়লে রাজনীতি রাজনীতিবিদদের নাগালের বাইরে চলে যায়

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জাগো নিউজ: আজকের যে রাজনৈতিক সংকট তার জন্য ১/১১ এর সরকার ব্যবস্থাও দায়ী বলে মনে করা হয়। অন্তত ওই সময়ের সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরাজনীতিকরণের নানা কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কী বলবেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রধানমন্ত্রী তো নিজেই বলেন, ১/১১ তার আন্দোলনের ফসল। আমার নেত্রী তো বলেছেন ১/১১ সরকার যা করবে তার বৈধতা দেওয়া হবে সংসদে। সুতরাং, এই দায় নাগরিক সমাজের ক্ষুদ্র স্কন্ধে কেন চাপানো হয়, তা বুঝি না।

রাজনীতিবিদরা যখন নিজেরা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে পারেন না, তখনই সব ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা যদি রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে না পারা যায়, তাহলে অবধারিতভাবে ভেঙে পড়বে। তখন অন্য কারও হাতে চলে যাবে।

জাগো নিউজ: এখন কী বলবেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এখনকার সমস্যা যদি রাজনীতিবিদরা বুঝতে চেষ্টা না করেন তাহলে সংকট আরও বাড়বে। অন্যের মতামতকে সম্মান না করে যদি চালানো হয় তাহলে সেখানে নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার কিছুই থাকে না।

বাংলাদেশের ৫০ বছরের ইতিহাসে সাধারণ মানুষ যে অর্জন করলো অনেক ক্ষেত্রেই আমরা রাজনৈতিকভাবে সমর্থন দিতে পারিনি। এটিই হচ্ছে আমাদের জন্য বড় দুঃখ। যদি আমরা এ বাস্তবতা বুঝতে না পারি তাহলে বাংলাদেশের উন্নয়ন, অর্থনীতি হুমকির মুখে পড়বে।

জাগো নিউজ: যেমন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমরা ইতিহাস ভুলে যাই। ১৯৯৬ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি খারাপ নির্বাচন হয়েছিল। কিন্তু সেই খারাপ নির্বাচন একটি ভালো উদ্যোগ সামনে আনে। আমরা সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। কিন্তু বর্তমান সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান থেকে তা বাতিল করে এবং সংকট থেকেই যায়। যদিও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই ওই সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন হয়। পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে তা উল্টে দেওয়া হলো। এটি বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

জাগো নিউজ: পঞ্চদশ সংশোধনীর রায়ে আরও দুটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করার কথাও উল্লেখ ছিল।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: একদম। শেষ বিচারে আপনাকে রাজনীতিবিদদের কাছে আসতে হবে। রাজনীতিবিদরা যদি সমাধান দিতে না পারেন, তাহলে তার দায়-দায়িত্ব অন্যের ওপর চাপানো ঠিক হবে না।

আপনি যদি পেশাজীবী, নাগরিক সমাজ, ব্যবসায়ীদের দায়ের কথা বলতে চান, তাহলে আমি বলবো আপনারা সাংবাদিকরা কি আগের মতো দায়িত্ব পালন করতে পারছেন? আপনি রাস্তায় যা দেখছেন, তা কি লিখতে পারছেন? যা দেখছেন, তা কি টেলিভিশনের শিরোনামে প্রকাশ পাচ্ছে? বিটিভির সঙ্গে অন্য মিডিয়া হাউজগুলোর তুলনামূলক মূল্যায়ন তো আমি করতে পারি।

আমরা জাতীয়ভাবে বহু মত ধারণ করার সহ্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি। বহু মত ধারণ করার ক্ষমতা না থাকলে সাধারণ গরিব মানুষের অধিকার সংকুচিত হয়ে যায়। আমাদের বড় উপলব্ধি হচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়নের চেষ্টার সঙ্গে রাজনৈতিক সংকট উত্তরণ খাপ খায়নি। এ কারণেই আগামীর উত্তরণটা অতিগুরুত্বপূর্ণ। পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো উন্নয়নের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চাইলে রাজনৈতিক সংকটের উত্তরণ জরুরি।

জাগো নিউজ: সমাধানের আগে সংকট নিয়ে ভাবতে হয়। এ মুহূর্তে সংকট কতটুকু অনুভব করছেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই মুহূর্তে সংকট তীব্র অনুভব করছি। গত দুটি নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ ঠিকমতো ভোট দিতে পারেনি। এটি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ যুবক, তাদের অনেকেই ভোট দিতে পারেননি। তাদের ভোট ছাড়াই দেশ পরিচালনা হচ্ছে। এটি তো প্রকাশ্য সত্য। আপনি প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থনীতি চাইবেন, আর প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি চাইবেন না, তা তো হতে পারে না। এজন্য এমন একটি ব্যবস্থায় নির্বাচন হতে হবে যেখানে মানুষের আস্থা আছে। কীভাবে করবেন সেটা রাজনীতিবিদদের ব্যাপার। কিন্তু যে ব্যবস্থা ভোটদানে প্রভাবিত করবে না, নির্বাচন প্রক্রিয়া-ফলাফল প্রভাবিত করবে না, নতুন সরকার গঠন করার ক্ষেত্রেও কোনো প্রভাব রাখবে না, এমন একটি ব্যবস্থা মানুষ এখন চাইছে।

আমাদের দেশের উচ্চবিত্তরা টাকা পাচার করে বিদেশে নিয়ে গেছে। এটি তো আমরা বুঝি। এটি সাধারণ মানুষের সমস্যা নয়। এটি উচ্চবিত্তদের সমস্যা। বিদেশিদের হস্তক্ষেপ বিষয়ে যদি কেউ দায়-দায়িত্ব নেয় তাহলে উচ্চবিত্তদেরই নিতে হবে।

জাগো নিউজ: সরকার ও সরকারবিরোধীদের যে অবস্থান তাতে কি ঘটবে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সংকট বাড়লে রাজনীতি রাজনীতিবিদদের হাতের বাইরে চলে যায়।

জাগো নিউজ: কোনো হাতে পড়তে পারে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কোনো হাতে পড়বে এটি আমি আপনি এই মুহূর্তে বলতে পারবো না। শুধু বলবো, এমটি হলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। আমি বলবো, হোঁচট খায়। পুনঃস্থাপন করতে গেলে বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয়। বাংলাদেশে এ অভিজ্ঞতা আছে এবং রাজনীতিবিদরা এ বিষয়ে বিজ্ঞ। তারাও পোড় খাওয়া মানুষ। আমার প্রশ্ন হচ্ছে তারা নিজেদের স্বার্থ বোঝেন কি না? কারণ রাজনীতি তাদের হাতের বাইরে চলে গেলে কেউ ভালো থাকবেন না। এজাতীয় উপলব্ধিটা সবার আগে বুঝতে হবে।

দৃশ্যমান সংলাপ দিয়ে আসলে কিছু হয় না। পর্দার অন্তরালে যে সংলাপ হয়, সেটাই মূল আলোচনা। আমি মনে করি দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আলোচনা করে তারা একটি জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছাবে।

জাগো নিউজ: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়ে বিদেশিদের তৎপরতা কীভাবে লক্ষ্য করছেন?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যে দেশ গণতান্ত্রিকভাবে দুর্বল হয় এবং বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন থাকে সেখানে বিদেশিরা খুব হস্তক্ষেপ করেন। এটি খুব পরিষ্কার। সরকার যদি গণতান্ত্রিক বৈধতা, রাজনৈতিক বৈধতা ও নৈতিক বৈধতার জায়গাটা পরিষ্কার করতো তাহলে বিদেশিরা এভাবে কথা বলতে পারত না।

আমাদের দেশের উচ্চবিত্তরা টাকা পাচার করে বিদেশে নিয়ে গেছে। এটি তো আমরা বুঝি। এটি সাধারণ মানুষের সমস্যা নয়। এটি উচ্চবিত্তদের সমস্যা। বিদেশিদের হস্তক্ষেপ বিষয়ে যদি কেউ দায়-দায়িত্ব নেয় তাহলে উচ্চবিত্তদেরই নিতে হবে।

দেশকে এ অবস্থায় তারা আনলো কেন? আমাকে কেন অপমান করা হচ্ছে বিদেশিদের এমন হস্তক্ষেপের মাধ্যমে?

দ্বিতীয়ত, শেষ বিচারে মানুষের দৃশ্যমান মনোভাবের প্রকাশ লাগবে। এর জন্য গণঅভ্যুত্থানের দরকার নেই। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করবো আর নির্বাচনে হেরে যেতে পারি এটি মানবো না, তা হতে পারে না। গণতন্ত্রে বিশ্বাস করলে আপনাকে জনতার মতামতকে সম্মান করতেই হবে। জনতার মতামতকে বাজেয়াপ্ত করে নিজে তার দায়িত্ব নিলে রাষ্ট্রযন্ত্র টেকে না।

আমি বহুদিন সমাজতান্ত্রিক দেশে থেকে এসেছি। সেসব দেশ গণতন্ত্রের অভাবের কারণে ভেঙে গেছে। গণতন্ত্র, মানবাধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো না থাকলে কার জন্য উন্নয়ন? এ উপলব্ধিটা সবার মধ্যে জাগ্রত হোক।

জাগো নিউজ
৩১ আগস্ট, ২০২৩

রাজনৈতিক সমাধান না এলে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা চাপ তৈরি করবে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মানবজমিন: দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কেমন মনে হচ্ছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অর্থনীতি তো চাপের মধ্যে আছে এটা মোটামুটি পরিষ্কার। বিষয়টা হলো যে কোভিডের অতিমারির সময়ে অর্থনীতির ওপরে যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তৎপরবর্তী সময়ে কিছুটা উন্নয়নের দিকে ঊর্ধ্বগতির দিকে অর্থনীতি যাওয়া শুরু করেছিল যদিও সেগুলোর উন্নতিটা বিভিন্ন কারণে সব জায়গাতে সমানভাবে না। তো সেটা কিন্তু ধরে রাখা যায়নি। এবং ২০২২–২৩ অর্থবছর শেষ হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, একদিকে যে আর্থিক খাত সেটাতে আমার রাজস্ব আদায় এবং একইসঙ্গে সরকারি ব্যয় দুই জায়গায়ই কমের দিকে রয়েছে। উপরন্তু সাম্প্রতিককালে যেহেতু আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে শুল্ক আদায় কম হওয়াতে রাজস্ব আদায়ের ওপরে চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

পক্ষান্তরে যেহেতু ব্যক্তি খাতে ঋণ প্রবাহ কমে গেছে এবং বিনিয়োগ কমছে কিন্তু অপরদিকে প্রত্যক্ষ কর আহরণের একটা বড় চেষ্টা রয়েছে। সেটাও একটা আগামী দিনের বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের ওপরে নতুন চাপ সৃষ্টি করছে। যেটা দেখার বিষয় সরকার যে ব্যয়টা করছে এখন সেই ব্যয়টাতে দেখা যাচ্ছে উন্নয়ন ব্যয়ের চেয়ে পরিচালন ব্যয়ের ক্ষেত্রে বরাদ্দ এবং ব্যয় ব্যবহারটা বেশি। সেটা দেখতে গেলে আর্থিক খাতের যে কাঠামোগত সমস্যা এখন মৌসুমী সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেশ সমস্যায় রেখেছে। আর তার চেয়েও বড় সমস্যা যেটা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিগত দশকে শক্তির জায়গা ছিল

বৈদেশিক খাতে লেনদেনের ভারসাম্য সেই জায়গাতে তো আমরা লক্ষ্য করছি কীভাবে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত কমে যাচ্ছে এবং রপ্তানি যেটুকু বাড়ছে সেটুকু দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ আমদানি করতে পারছি না, আমদানি নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে আবার ব্যক্তি বিনিয়োগের ওপর প্রভাব ফেলছে এবং যেটা দেখা যাচ্ছে যে রেমিট্যান্সটা যেভাবে আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম সেভাবে নেই। যার ফলে যেই ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা মজুতের প্রত্যাশা করেছিলাম সেভাবে হচ্ছে না।

ফলে যেটা হচ্ছে সরকারের আরও বেশি করে বৈদেশিক ঋণ নেয়ার জন্য সরকারকে দ্বারস্থ হতে হচ্ছে বাজেট সাপোর্ট জোগাড় করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অন্যদের কাছ থেকে। এবং আরেকটা যেটা লক্ষ্য করছি যে সরকার ওই যে আর্থিক খাতে যে তার ঘাটতি সেটা পূরণ করার জন্য আবার ব্যাংকিং খাত থেকে বড় ধরনের ঋণ নিচ্ছে যেটা আবার ব্যক্তিখাতে প্রভাব ফেলছে বলে আমরা দেখছি। যেহেতু সরকারের বড় দুটো খাত আর্থিক খাত এবং বৈদেশিক লেনদেন খাত। দুই ক্ষেত্রেই যে ভঙ্গুরতা আমরা ২০২২–২৩ এ দেখেছিলাম সেটা জুলাই আগস্ট মাসে এসে খুব বেশি কমেনি। আর এর সঙ্গে যে অর্থনীতির বড় সমস্যাটা যুক্ত হয়েছে সেটা হলো মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় প্রত্যক্ষভাবে বেড়ে গেছে। যেটা লক্ষণীয় বিষয় সেটা হলো আন্তর্জাতিক বাজারে কিন্তু পণ্যমূল্য আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। সেটার সুযোগ বাংলাদেশ নিতে পারছে না। অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের বহু ঘাটতি রয়ে গেছে। তার একটা প্রধান ঘাটতি তো অবশ্যই যে তথ্য-উপাত্ত ঠিকমতো নেই এবং সেই তথ্য-উপাত্তের প্রতি যথেষ্ট নজর দিয়ে নীতি নির্ধারকরা দৈনন্দিন নীতিগুলোর যে সংস্কার দরকার সেগুলো সেভাবে করছে না। সেহেতু আপনি দেখবেন যে যদিও আমরা আইএমএফের কাছে গেছি বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা ঠিকমতো নিষ্ঠার সঙ্গে পরিপালন করতে পারছি না। যেমন আপনার সুদের হার যেভাবে শিথিল করার কথা ছিল এবং মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যাতে সঞ্চয়ের হার বাড়ে সেটার জন্য চেষ্টা করার কথা ছিল সেটা করা হয়নি এবং একইভাবে আপনার টাকার বিনিময় হারকে যে সামঞ্জস্য বিধান করার কথা ছিল সেটা করেনি।

মানবজমিন: বিশ্বব্যাপী অনেক দেশে গত এক বছরের মূল্যস্ফীতি কমে আসলেও বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি বেড়েই চলছে। আপনার কাছে এর কারণ কী বলে মনে হচ্ছে?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনাকে তো বললাম যে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পণ্য মূল্য একটা বড় বিষয়। তো পণ্য মূল্য যদি আমদানিকৃত পণ্য মূল্য হয় তাহলে সেটা যদি টাকার মান কমতে থাকে তাহলে সেটাতে আমরা আসবো। কিন্তু তারপরেও যে সমস্ত

জিনিসের দাম কমেছে সে সমস্ত জিনিসের দামের সুফলটা আমাদের ভোক্তাদের কাছে দেয়ার ক্ষেত্রে আমরা বললাম যে বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা রয়ে গেছে। এবং এখানে যে সমস্যা রয়ে গেছে এটাতো প্রকাশ পাচ্ছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যে কথাটা বলছে, কৃষি মন্ত্রণালয় সে কথার সঙ্গে একমত হচ্ছে না বা প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তার সঙ্গে একমত হচ্ছে না সময়মতো আমদানির সিদ্ধান্ত হচ্ছে না সময়মতো প্রণোদনার প্রয়োজনটাকে মেটানো যাচ্ছে না। তো এখানে একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের শৃঙ্খলার অভাব আমরা লক্ষ্য করছি। এবং আরেকটা যেটা বড় বিষয় সেটা হলো যে মূল্যস্ফীতি সবই তো আর আমদানিকৃত পণ্য না, খাদ্য উৎপাদনের বড় অংশই দেশের ভেতর এখন হয়। সেহেতু যেগুলো দেশে উৎপাদিত হচ্ছে সেই জিনিসের দাম কেন বাড়ছে। এর ব্যাখ্যা তো আমরা নীতি নির্ধারকদের কাছ থেকে পাচ্ছি না। তো আমি আপনাকে সাধারণভাবে বলবো অর্থনৈতিক কাঠামোগত যে সমস্যাগুলো ছিল বৈশ্বিক পরিস্থিতি এটাকে যে নতুন চ্যালেঞ্জগুলো দিয়েছে এইগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য যে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বা নীতি-নেতৃত্ব বা সংস্কারের উদ্যোগ সেগুলোর ক্ষেত্রে দুঃখজনকভাবে আইএমএফের কাছে যাওয়ার পরেও আমরা বড় ধরনের ঘাটতির মধ্যে রয়ে গেছি। অভাবের ভেতরে আছি।

মানবজমিন: শ্রীলঙ্কা কিছুদিন আগে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল এখন আবার তাদের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে এর পেছনে ম্যাজিক কী? শ্রীলঙ্কা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও আমরা কেন পারছি না।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শ্রীলঙ্কার উদাহরণ থেকে দুটো শিক্ষা নেয়ার ব্যাপার আছে একটা হলো যদি আপনার অর্থনৈতিক কাঠামোতে মৌলিক শক্তি থাকে বিশেষ করে মানবসম্পদ এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতার ভেতরে যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা আপনার কর আদায় করার প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিনিয়োগকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর যদি আপনার মৌলিক শক্তি থাকে তাহলে আপনি যখন সমস্যা উত্তরণে যান তখন এই শক্তিগুলো অনেক কাজে দেয়। দ্বিতীয় যে শিক্ষাটা এসেছে সেটা হলো, যে এই সংকটকে মোকাবিলা করার জন্য যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন সেই সমস্ত সংস্কারের পদক্ষেপ তারা নিয়েছে। যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি তারা বৈদেশিক দাতা গোষ্ঠীর কাছে বা ঋণদাতাদের কাছে দিয়েছিল সেগুলো তারা কার্যকর ভাবে করেছে তার সবচেয়ে বড় সুফল হলো যে, তারা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। এখন বাংলাদেশের চেয়ে শ্রীলঙ্কাতে মূল্যস্ফীতি কম। এবং তার চেয়ে বড় যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা হলো এর ভেতরে শ্রীলঙ্কা আপনার বৈদেশিক ঋণ যেটা বাংলাদেশ থেকে নিয়েছিল সেটা তারা শোধ করার উদ্যোগ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে আমরা দুই কিস্তি পেয়েছি। তো

এর চেয়ে বড় শিক্ষা আর কি হতে পারে। যে সংকট যখন আসে সংকটকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার চেয়ে সংকট মোকাবিলা করার জন্য যে ধরনের পরীক্ষিত পথগুলো আছে। সেই তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সেই পরীক্ষিত পথগুলোতে যাওয়াই হলো বড় বিষয়। সেখানে যেন আমাদের দলীয় রাজনীতির বা জাতীয় রাজনীতির প্রয়োজনগুলো আমার অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে যেন বিস্তৃত করে না দেয়।

মানবজমিন: শ্রীলঙ্কায় আগের সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না কিন্তু বর্তমান সরকার কীভাবে পারলো?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নতুন সরকার যেটা এসেছে সেই নতুন সরকার তো জাতীয় ঐকমত্যের সরকার। সেহেতু এখানে যে সংস্কার যে পদক্ষেপগুলো হয়েছে সেখানে আপনার সব ধরনের দলমত নির্বিশেষে আলোচনার ভিত্তিতেই তারা একটা জাতীয় উত্তোলন পরিকল্পনা করেছে। এবং সেই জাতীয় উত্তোলন পরিকল্পনাকে তারা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে। সেহেতু শ্রীলঙ্কা থেকে তৃতীয় শিক্ষা যদি আপনি বলেন তাহলে এই ধরনের সংকট মোকাবিলা উত্তরণের ক্ষেত্রে জাতীয় ঐকমত্যের অনেক প্রয়োজন পড়ে। তখন সবাই মিলে যদি সমর্থন না দেয় এবং শুধু রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে পেশাজীবী, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, নাগরিক সমাজ যদি একসঙ্গে থাকে তাহলে এটা কার্যকর করা সম্ভব।

মানবজমিন: আপনি বেশকিছু জায়গায় বলেছেন, ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ না হলেও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সংকটে পড়তো এর পেছনের কারণ কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এর কারণ হলো যে ধরুন এটা হলো একটা অংশ যেকোনো পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি হয়েছে যুদ্ধের কারণে সরবরাহ থেমে গেছে ইত্যাদি। তো এটা একটা বড় জায়গা হলো আপনার খাদ্য প্রবাহ। ইউক্রেন দিয়ে আপনি গম আনতে পারছেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। তো বাংলাদেশ তো খাদ্যের ক্ষেত্রে তো ৯৯% অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আসে। তাহলে চালের দাম কেন বাড়বে? অভ্যন্তরীণ উৎপাদন যেগুলো আছে এগুলো কেন বাড়বে? এই দামগুলো কেন বাজারে বাড়ছে এবং আপনি যে দামে আনছেন সেই ক্ষেত্রে আপনার যে সমস্ত সংকটগুলো আছে সেখানে আপনি শুল্ক সমন্বয় করে আপনি তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন না কেন? তার বাইরে আপনি যদি দেখেন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কথা আমি বললাম, বাংলাদেশে তো প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় সংকটের জায়গা হলো আমার ব্যাংকিং খাত। তো ব্যাংকিং খাতে অনাদায় ঋণ কি বেড়েছে ইউক্রেনের কারণে? শেয়ারবাজার ঘুরে দাঁড়ায় না কেন? শেয়ারবাজারে কি ইউক্রেন থেকে পুঁজি আসতো?

মানবজমিন: বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আপনার কোনো পরামর্শ আছে কী?

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার প্রথম পরামর্শ হলো যে এই মুহূর্তে বিরাজমান যে রাজনৈতিক অস্বস্তি রয়েছে আমি সংকট বললাম না অস্বস্তি বললাম সেই অস্বস্তি যেন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি না করে। এমন ধরনের পদক্ষেপ যেন সরকার এবং বিরোধী পক্ষ থেকে না আসে যাতে বাংলাদেশের জনজীবন অসুবিধার ভেতর পড়ে, খেটে খাওয়া মানুষের আয়-রুজি নষ্ট হয় এবং একটা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার ভেতরে দেশটা চলে না যায়। সে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় যাওয়ার জন্য এর চেয়ে আর খারাপ সময় নেই কিন্তু। আর দ্বিতীয়ত, এই মুহূর্তে যে রাজনৈতিক আলোচনা হচ্ছে বা রাজনৈতিক পক্ষ বলছি তারা সকলেই অতীতমুখী একটা আলোচনা করে যেই জিনিসটা আমি এখনো দেখি না সেটা হলো যদি নির্বাচনের পরে উনারা কীভাবে দেশ পরিচালনা করবেন। এই ব্যাপারে মুখে মুখে বিভিন্ন বা কাগজপত্রে বিভিন্ন কথা থাকলেও উনারা এটা প্রচার এবং কথার ভেতরে সেভাবে আনেন না। সরকারি দল যেটুকুও বা আনে কারণ হলো তারা ক্ষমতায় আছে প্রক্রিয়ার ভেতর আছে। বিরোধী দল তারা অনেক দফা দিলেও সেগুলো তাদের রাজনৈতিক প্রচারণার অংশ হিসেবে আসে না। সেটা হলো যে তারা ভিন্নভাবে কী করবেন? তারা এই ব্যাংকিং সমস্যার সমাধান কীভাবে করবেন? পুঁজিবাজারকে কীভাবে চাঙ্গা করবেন? মূল্যস্ফীতিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন? এলডিসি থেকে বের হলে পরে আমরা কি কি সমস্যায় পড়বো বা মোকাবিলা ওনারা কীভাবে করবে? কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কী করবেন? গরিব মানুষের জন্য যে সুরক্ষা আছে সেই সুরক্ষা ওনারা কীভাবে সম্প্রসারণ করবেন যেখানে আয়ের সংকট আছে এই সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের সামনে নিয়ে আসা উচিত।

নাগরিকদের পক্ষ থেকে দেখেন বাংলাদেশে প্রায় এখন এক তৃতীয়াংশের উপরে হলো যুবসমাজ। সেই যুবসমাজ অনেক বেশি ইতিহাস সচেতন। তাদের অনেক বেশি প্রত্যাশা হলো দেশ আগামী দিনে কোথায় থাকবে? এই কথাটা আমার রাজনীতিতে নিয়ে আসতে হবে। রাজনীতিতে এখন আগামী দিন কোথায় থাকবে এটার ভেতরে শুধুমাত্র রক্তপাত এবং ভয়-ভীতির আলোচনা চলছে। দেশকে পরবর্তী ধাপে নিয়ে যাওয়ার জন্য আলোচনাকে আমরা সেইভাবে গুরুত্ব পেতে দেখি না।

আমি বলছি রাজনৈতিক সমাধানে আসতে হবে। রাজনৈতিক সমাধানে না আসলে পরে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা আমাদের ওপরে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে। এটা দেখা গেছে যে,

বাংলাদেশের যদি আপনি ইতিহাস দেখেন ৫২ বছরে বাংলাদেশের নাগরিকরা খেটে খাওয়া মানুষ যেভাবে অর্থনীতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে আমরা অনেক সময় তাকে পরিপূরক সন্তোষজনক রাজনৈতিক পরিবেশ দিতে পারিনি। আমাদের কথা হলো আগামী দিনে এমন রাজনৈতিক পরিবেশ দিতে হবে যাতে বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকা মানুষগুলো খেটে খাওয়া মানুষগুলো আরও বেশি সুষম উন্নয়নের অংশীদার হতে পারে।

মানবজমিন
৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

রাজনীতিতে বহুমত চর্চার খুব অল্পই অবশিষ্ট আছে

রেহমান সোবহান

অনেক বছর ধরেই আমরা 'বিজয়ী সব সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত করবে'— এ সংস্কৃতি থেকে রাজনীতিকে বের করে আনার পথ খুঁজছি। প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে, রাজনীতির খেলায় হেরে যাওয়া মানেই জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়া নয়।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান (জন্ম ১২ মার্চ ১৯৩৫) বাংলাদেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ, চিন্তক। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যুক্ত হন। ১৯৭৭ সালে অধ্যাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন।

তিনি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক ও ১৯৯১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান চেয়ারম্যান। রেহমান সোবহানের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মাহবুব আজীজ

গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত বা ভিত্তি বহুমতের সহাবস্থান। আমাদের রাজনীতিতে বহুমতের চর্চা কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে? আমাদের গণতন্ত্র বা রাজনীতিতে বহুমতের চর্চার সংকট কী কী?

রেহমান সোবহান: আমাদের রাজনীতিতে এখন বহুমত চর্চার খুব অল্পই অবশিষ্ট আছে। 'বিজয়ী সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত করবে'— এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠছে। এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ক্ষমতায় যাওয়া এবং তারপর যে কোনো মূল্যে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা হয়ে পড়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ একবার যদি ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে ক্ষমতাসীনদের জীবন-জীবিকা সবই খোয়া যাওয়ার ভয় থাকে। এমন রাজনৈতিক পরিবেশে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখা অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন।

নির্বাচন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম। বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো কী?

বাংলাদেশে যখন নির্বাচন একটি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় তখন নির্বাচনী ব্যবস্থা, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো দলীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। আমরা দেখেছি একটার পর একটা সরকার রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) পক্ষে নির্বাচন তদারকির দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পালন করা খুবই কঠিন। যেহেতু ইসি একটি দলীয় সরকার দ্বারা মনোনীত ও পরিচালিত হয়, তাই ইসির পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করা দুরূহ।

একসময় যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আন্দোলন করেছিল, এখন তারা এর বিরোধী। যেখানে দুটি পক্ষের একে অন্যের প্রতি চরম অবিশ্বাস রয়েছে, সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিকে অনেকে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যম মনে করছেন। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য আশা করছি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তখন ক্ষমতায় ছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি অত্যন্ত জোরালো হয়ে উঠেছিল, কারণ প্রধান বিরোধী দলসহ প্রায় সব বিরোধী দলেরই বিশ্বাস ছিল যে বাংলাদেশে দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব নয়; কেননা যখন যে দল ক্ষমতায় থাকবে তারাই যে কোনো উপায়ে

ক্ষমতায় টিকে থাকতে বদ্ধপরিকর হবে। ইতিহাস বলছে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কোনো শাসক দলের অধীনে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন। পরিস্থিতি শাসকদের অবাধ নির্বাচন আয়োজনে বাধ্য করে। তবে বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে শুধু ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮— এই চার সময়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনে চারবারই তৎকালীন বিরোধী দল জয়লাভ করে ক্ষমতাসীন হয়।

আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে বিদেশি কূটনীতিকরা নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী বক্তব্য দিচ্ছেন। এটি কি আমাদের গণতন্ত্রের দুর্বলতাকে নির্দেশ করে?

যখন বিদেশি কূটনীতিকরা আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কথা বলার তাগিদ অনুভব করতে থাকেন তখন আমাদের রাজনীতির দীনতাই প্রকাশ করে। দেশে একটি কার্যকর গণতন্ত্র থাকলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের এ নিয়ে কথা বলার সুযোগ থাকে না। তখন যদি তারা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কথা বলতেন— শুধু সরকার কেন, বিরোধী দলসহ সুশীল সমাজেরও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তেন।

রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বেড়েছে। এটি কি গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত?

রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারই আমাদের একাত্তরের গণহত্যার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। রাজনীতিতে এটি সবচেয়ে বিপজ্জনক খেলা। ’৭২-এর সংবিধান প্রণেতারা একে বেআইনি ঘোষণা করেছিলেন। তবু রাজনৈতিক দলগুলোকে এর রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য তা যথেষ্ট নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিজেপি রাজনৈতিক সমর্থন বাড়াতে ধর্মের যথেচ্ছ ব্যবহার করে ভোটের রাজনীতিতে তাদের বিজয় নিশ্চিত করেছে।

আমাদের অর্থনীতি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা কি তা কমিয়ে দিতে পারে?

আমাদের উন্নয়ন অনেক ক্ষেত্রে প্রশংসিত হয়েছে। তবে সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে। এটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে পারে। এই অস্থিতিশীলতা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার স্থায়িত্বকে দুর্বল করবে।

আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ছে কিন্তু মূল্যস্ফীতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ঊর্ধ্বগতিতে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনমান নিচের দিকে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতি কি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলবে?

উচ্চ মূল্যস্ফীতি জনসাধারণের ব্যাপক ক্ষতি করে, বিশেষ করে জনগণের দরিদ্র অংশের। এই মূল্যস্ফীতি জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে, যেটি শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক অস্থিরতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এ অবস্থা শেষ পর্যন্ত শুধু একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই নয়; বরং যে কোনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।

অনেকের মতে, টেকসই গণতন্ত্র ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন?

টেকসই গণতন্ত্র ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশসহ বেশির ভাগ দেশের জন্য এ কথা প্রযোজ্য। তবে চীন, ভিয়েতনাম এমনকি সিঙ্গাপুরের মতো দেশের সাফল্যের গল্পগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে এটি সর্বজনীন সত্য নয়।

আমাদের গণতন্ত্র ও রাজনীতিতে বহুমতের চর্চার যে সংকট চলছে, তা থেকে উত্তরণের উপায় কী?

অনেক বছর ধরেই আমরা ‘বিজয়ী সব সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত করবে’— এ সংস্কৃতি থেকে রাজনীতিকে বের করে আনার পথ খুঁজছি। প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে রাজনীতির খেলায় হেরে যাওয়া মানেই জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়া নয়। রাজনীতিকদের এই আশঙ্কা দূর করা ছাড়া বহুমত সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দুই দলেরই বড় দায় রয়েছে।

সমকাল
৬ অক্টোবর, ২০২৩

উন্নয়নের উত্তরণ গণতান্ত্রিক উত্তরণের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আগে বলেছিলাম, অর্থনীতি এতিম হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) তার পালক পিতা। এখন সেই পালক পিতাও নেই, অর্থনীতি পরিত্যক্ত সন্তান হয়ে গেছে। কেউ নজর দেয়নি। অর্থনীতির এই পরিস্থিতি এক দিনে হয়নি। এখানে সবাই উপসর্গের কথা বললেন, ফলাফলের কথা বললেন। কারণ বলেননি। ব্যাধির জায়গায় পৌঁছাতে হবে।

বর্তমানে যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আছে, তারা ঐতিহাসিকভাবে মধ্যপন্থী সামাজিক গণতন্ত্রী দল। ২০০৮ সালের পর দলটি যখন দায়িত্ব নেয়, তখন রাজনৈতিক ঘোষণা দিয়েছিল। তাতে কল্যাণকর রাষ্ট্রের কথা বলেছে। সেখানে এমন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে সুযোগের সমতা থাকবে, সমতার সুযোগ থাকবে।

কিন্তু এখন শুধু অর্থনৈতিকভাবে নয়, সামাজিকভাবেও বৈষম্যমূলক সমাজে পরিণত হয়েছে। কল্যাণকর আর্থ-সামাজিক দর্শন নিয়ে একটি দল ক্ষমতায় এসে কীভাবে এমন পরিণতিতে গেল। এটা কি অবধারিত ছিল? কোনো বিকল্প কি ছিল না?

সমাধানের পথ খুঁজতে হলে দেখতে হবে, এই পরিস্থিতিতে কেন এলাম, অর্থাৎ উপসর্গগুলো কী। প্রথমত, শুধু অফলপ্রসূ সংসদীয় ব্যবস্থার কারণে এমন হলো। সংসদে জনমানুষের কথা ধ্বনিত হলো না।

দ্বিতীয়ত, স্থানীয় জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে, এমন স্থানীয় সরকার বেশ দুর্বল এবং তা প্রতিনিধিত্ব করল না। তৃতীয়ত, উদ্যোক্তারা শ্রেণিস্বার্থ ভুলে গিয়ে রাজনৈতিক সংশ্লেষের মধ্যে ঢুকে গেলেন। চরম পরিণতি হিসেবে গোষ্ঠীস্বার্থ দেখছি। এর তিনটি চরিত্র দেখছি। এগুলো হলো প্রভূত অর্থ, প্রভূত রাজনৈতিক শক্তি এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ। উদ্যোক্তারা আর শ্রেণিস্বার্থ দেখেননি। আরও দেখলাম, প্রশাসন পেশাদারি পরিত্যাগ করল, রাজনীতিতে যুক্ত হলো।

আমরা আরও দেখলাম, বিচারব্যবস্থা ও নজরদারি ব্যবস্থা দলীয়করণ হয়ে গেল। নীতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেখলাম, সমন্বয়ের অভাব, সংযোগের অভাব ও নেতৃত্বের অভাব। আরও দেখলাম, বাজার অসম্ভবভাবে মেজাজি হয়ে গেল, বাজার দুর্বিনীত আচরণ করা শুরু করল। নাগরিক সমাজ ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। গণমাধ্যম সীমিত সত্য বলা শুরু করল, নির্বাচিত সত্য বলা শুরু করল। তথ্যের ঘাটতি ছিল, এরপর নতুন তথ্যের সৃষ্টি হলো। এতে আমরা বিভ্রান্ত হচ্ছি।

বর্তমান সরকারকে তিনটি পর্যায়ে দেখা যায়। প্রথম পর্যায়টি হলো ২০১৪ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে বিনিয়োগ, সংস্কারসহ যত নীতি উদ্যোগ নিয়েছে, সময়টি তাই উজ্জ্বলতম সময়। কোভিড পর্যন্ত একটি মন্দীভূত পরিস্থিতির মধ্যে গেছে। ২০১৮ সালের পর এই সংকটের উৎসমুখ পাওয়া গেছে। এ তিনটি সময়ের প্রতিটিতে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে। এছাড়া কোভিডসহ বহির্বিশ্বের ইস্যু এসেছে।

আমি বলব, গণতান্ত্রিক জবাবদিহির অভাবের ক্রমবিকাশ আর অর্থনৈতিক সংস্কারের অভাবের ক্রমবিকাশ সমান্তরাল হয়ে গেছে। যত বেশি গণতান্ত্রিক জবাবদিহির অভাব হয়েছে, তত বেশি অর্থনৈতিক সংস্কারের অভাব হয়েছে। বর্তমান সরকারের উন্নয়নে বিপর্যয়ের জায়গাটি কোথায়? দর্শন, নাকি কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। দর্শনের ক্ষেত্রে খুব বেশি আপত্তি নেই।

কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে বর্শাফলক হিসেবে নেওয়া হলো। কিছু আশীর্বাদপুষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নেওয়া হলো। এরপর দলীয় চিন্তা থেকে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলো। দলের ভেতর গণতন্ত্র নেই, বিতর্ক নেই, রাজনীতি নেই। দলটিও সেই ষাটের দশকের দল নয়।

এমন পরিস্থিতিতে আমরা স্থিতিশীলতায় যেতে পারব কি না? এভাবেই চললে আমরা কি সামনের দিকে যেতে পারব? যদি যেতে পারি, তবে কি তা ধরে রাখতে পারব?

বাংলাদেশ এমন একটি ক্রান্তিকালে অবস্থান করছে, যেখানে উন্নয়নের উত্তরণ গণতান্ত্রিক উত্তরণের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

আমরা প্রতিযোগিতামূলক জবাবদিহি একটা অর্থনীতি করব, যেটা দক্ষ হবে, প্রতিযোগিতামূলক হবে, অপচয় করবে না, অতিমূল্যায়িত প্রকল্প বানাবে না, বৈষম্য সৃষ্টি করবে না, বিভাজন করবে না— এগুলো সব চাইব। আর রাজনীতির ভেতরে থাকবে— ভোট দিতে পারব না, দলীয় প্রতিযোগিতা হবে না, দলের ভেতরে গণতন্ত্র থাকবে না, স্থানীয় সরকার ঠিকমতো কাজ করবে না, গণতান্ত্রিক উত্তরণ হবে না। এটা তো মৌলিক বিষয়। আপনি প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি ছাড়া প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি অর্জন করতে পারবেন না।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জন, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা (এলডিসি) থেকে উত্তরণ, উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ হওয়া— এসব করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক গুণগত পরিবর্তন দরকার। আর প্রাতিষ্ঠানিক গুণগত পরিবর্তনের জন্য প্রথম প্রতিষ্ঠান হলো রাজনীতি। এটিই বাকি সবকিছুর গন্তব্য ঠিক করবে।

সংকট উত্তরণে বড় দুই দলের কাছে নির্বাচনী অ্যাজেন্ডায় উত্তরণকালীন কৌশল দরকার। স্থিতিশীলতার জন্য এই অ্যাজেন্ডার মাধ্যমে রাজনৈতিক বৈধতা পায়, তাহলে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করতে পারবে। কারণ, ওই সব প্রতিষ্ঠান নিজেরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি সিদ্ধান্ত নিতে পারে? তাহলে তো আইএমএফকে আনতে হয় না।

প্রথম আলো
১৮ অক্টোবর, ২০২৩

সুশাসনের অর্থনীতি, রূপান্তরের বাংলাদেশ

মোস্তাফিজুর রহমান

২০২৩–২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাজেট ধরা হয়েছে ২ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকা। জানা কথা, বাংলাদেশে কর ও রাজস্ব আহরণ থেকে আয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম (১২৩টি দেশের মধ্যে ১১৯তম স্থান)। রাজস্ব আয়ের প্রায় পুরোটাই চলে যায় আবর্তক (রাজস্ব/পরিচালন) ব্যয়ের পেছনে। ফলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রাজস্ব বাজেটে উদ্বৃত্ত মোটামুটি শূন্যের কাছেই থাকে। তাই এডিপির বাস্তবায়ন মূলত সম্পূর্ণই বহন করতে হয় ঋণের টাকায়। ২০২৩–২৪ অর্থবছরের ক্ষেত্রেও এ ধারাবাহিক প্রবণতার ব্যত্যয় হবে না। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়ন হতে হয় অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে, যেমন— সঞ্চয়পত্র বিক্রির মাধ্যমে, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক খাত থেকে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণের মাধ্যমে অথবা বৈদেশিক (দ্বিপক্ষীয়, বহুপক্ষীয়) বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত ঋণের টাকায়। অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে আসবে এডিপির প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬৪.৩ শতাংশ আর বাকি ৩৫.৭ শতাংশ আসবে বৈদেশিক ঋণ থেকে।

মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার কারণে বর্তমানে বৈদেশিক ঋণ কাঠামোতে রেয়াতি ঋণের অংশ ক্রমান্বয়ে কমছে আর সুদের হার ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে; ঋণের শর্তও কঠিনতর হচ্ছে (যেমন, ঋণ পরিশোধের সময়— গ্রেস পিরিয়ড ও ম্যাচুরিটি পিরিয়ড— হ্রাস পাচ্ছে)। একই সঙ্গে বৈদেশিক ঋণ পরিষেবার পরিমাণ টাকার অঙ্কে, টাকার বিনিময় হারের অবমূল্যায়নের কারণে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অভিঘাত বেশি অনুভূত হবে বৈদেশিক অর্থায়নে— প্রসূত যেসব প্রকল্প থেকে আয় হয় প্রধানত স্থানীয় মুদ্রায়,

সেসব বিনিয়োগে। বৈদেশিক ঋণ পরিষেবার জন্য রাজস্ব বাজেটের ব্যয়ের পরিমাণও ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। ২০২৩–২৪ অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণের দায় পরিশোধের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১২৩৭৬.০ কোটি টাকা, যা ২০২২–২৩ অর্থবছরের বরাদ্দের তুলনায় ৩২.৮ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনীতির বহুমাত্রিক চাহিদার নিরিখে বড় অঙ্কের উন্নয়ন ব্যয় অস্বাভাবিক নয়। এবং এ কথাও মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের সরকারি ব্যয় জিডিপির শতাংশ হিসেবে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম (মাত্র ১৫ শতাংশের কাছাকাছি)। নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি, বিভিন্নমুখী সরকারি সেবার প্রাপ্তি, কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি, ব্যক্তি খাতের উন্নয়ন ও বিনিয়োগ আকর্ষণ ও ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য সরকারি বিনিয়োগের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নসহ বিভিন্ন খাতে বড় ধরনের সরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজন আছে। স্কুল-হাসপাতাল নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, গ্যাস সরবরাহ, যোগাযোগ-পরিবহনের উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তির সম্প্রসারণ— এসবের অর্জন মূলত নির্ভর করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির গুণসম্পন্ন বাস্তবায়নের ওপর। কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, আয় ও সম্পদবৈষম্য হ্রাস করে সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মানসম্পন্ন বাস্তবায়নের বড় ভূমিকা রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের ১৭টি অভীষ্ট ও ১৬৯টি লক্ষ্য অর্জনের যে অঙ্গীকার বাংলাদেশের আছে, সে প্রেক্ষিত থেকেও এডিপির সুশাসনভিত্তিক বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ।

তবে প্রশ্ন থেকে যায়, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সরকার প্রণীত মধ্যমেয়াদি বাজেটারি কাঠামোর সঙ্গে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ, চলমান অর্থনৈতিক চাহিদার নিরিখে খাতভিত্তিক বণ্টনের যে অগ্রাধিকার নির্ধারিত হয়েছে তার যৌক্তিকতা কতটুকু সঠিক এবং সর্বোপরি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থ সঠিকভাবে ব্যয়িত হচ্ছে কি না, সময়মতো ব্যয় হচ্ছে কি না এবং সুশাসনের সঙ্গে ব্যয় হচ্ছে কি না, সেসব প্রশ্ন। স্বীকৃত সত্য যে, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রণীত হলে এবং মানসম্পন্নভাবে বাস্তবায়িত হলে তা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক ফল নিয়ে আসে। এটা নিশ্চিত করা গেলে প্রাক্কলিত আর্থিক রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন থাকে না এবং ঋণ পরিশোধের দায়ভার অর্থনীতিকে চাপে ফেলতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটলেই অর্থনীতি বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে— নাগরিক সুবিধার প্রাপ্যতা কমে যায়, ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ অনুৎসাহিত হয়, বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা স্তিমিত হয়ে পড়েন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং এর ফলে অভ্যন্তরীণ রিটার্নের হার, ইকোনোমিক রিটার্নের হার এবং ফাইন্যান্সিয়াল রিটার্নের হার

প্রাথমিক প্রাক্কলনের চেয়ে হ্রাস পায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতেই ঋণের টাকা পরিশোধ অর্থনীতির জন্য বোঝা হয়ে ওঠে। বৈশ্বিক উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এসব কারণে একটা পর্যায়ে কোনো কোনো দেশ ঋণের ফাঁদে (ডেট ট্র্যাপ) পড়ে এবং ফলে একটা সময়ে সেসব দেশ মধ্য আয়ের ফাঁদে (মিডল ইনকাম ট্র্যাপ) আটকে যায়। উন্নয়নের একটা পর্যায়ে উন্নিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে এসব অর্থনীতি দশকের পর দশক এক জায়গায় স্থবির হয়ে থাকে। বাংলাদেশকে সতর্ক ও সাবধান হতে হবে, যাতে এ ধরনের একটি ভবিষ্যৎ পরিহার করে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা যায়।

২০২৩–২৪ অর্থবছরের এডিপিতে মোট প্রকল্পের সংখ্যা ১২৫০টি; তার মধ্যে ১১৬৭টি বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ প্রকল্প। যোগাযোগ, শক্তি ও এনার্জি, শিক্ষা, বাসস্থান ও কমিউনিটি সার্ভিসেস এবং স্থানীয় সরকার ও গ্রামীণ উন্নয়ন— এই পাঁচ খাতে গেছে মোট এডিপির তিন-চতুর্থাংশ। রূপপুর আণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ আছে মোট এডিপির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (১৮.৪ শতাংশ)। অগ্রাধিকারের বিবেচনায় যেসব খাতকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন তার নিরিখে এডিপিতে খাতভিত্তিক বরাদ্দের প্রস্তাবনার যৌক্তিকতা আছে। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতির চলমান চ্যালেঞ্জসমূহের বিবেচনায় ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের নিম্নগতির বর্তমান বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিলে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ, বিশেষত যেসব বিনিয়োগে বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা তুলনামূলকভাবে বেশি, সে ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ২০২৩–২৪ অর্থবছরে হ্রাস টানার প্রয়োজন ছিল। তা করা হয়নি!

সিপিডির ২০২৩–২৪ অর্থবছরের বাজেট পর্যালোচনায় বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে একটি বড় অংশ (৪৭৩টি বা দুই-পঞ্চমাংশের বেশি প্রকল্প) আগেই সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল। মেয়াদকাল বৃদ্ধি করা হয়েছে এমন প্রকল্পের সংখ্যা ২০২১–২২ অর্থবছরে ছিল ৩৬৯, যা ২০২৩–২৪ অর্থবছরের জন্য দাঁড়িয়েছে ৪২৯-এ। এসব উদ্বর্ত (কেরিওভার) প্রকল্প ইতোপূর্বে বেশ কয়েকবার পর্যালোচিত হয়েছে; এগুলোর পেছনে ব্যয়ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে (কালক্ষেপণ মানেই ব্যয় বৃদ্ধি)। নীতিনির্ধারকরা বারবার এসব ব্যয় বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছেন। এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহের গড় বাস্তবায়নকাল ৪.৯ বছর। এক-চতুর্থাংশ প্রকল্পের (২৮৮টি) বয়স ৬ থেকে ১০ বছর। ৪৫০টি প্রকল্প এক থেকে চারবার সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে (৩৩৯টি একবার, ৮৪টি দুবার, ১৪টি তিনবার এবং ১টি চারবার)। ৮২০টি প্রকল্পের একটি আলাদা তালিকা রাখা হয়েছে, যেখানে কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নের শ্লথগতি ও বারবার সময় বৃদ্ধির ফলে অর্থনীতির ওপরে যে নেতিবাচক অভিঘাত পড়ে তা বহুমাত্রিক— প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায়;

ঋণ পরিষেবার ব্যয় বাড়ে; প্রাক্কলিত ইতিবাচক ফল প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয় এবং আর্থিক ও অর্থনৈতিক রিটার্নের হার হ্রাস পায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাজেট বাস্তবায়নের শ্লথ অগ্রগতিজনিত সমস্যাসমূহ সাম্প্রতিক সময়কালে প্রকটতর হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯০.০ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছিল। এর পরবর্তী সময়ে এ হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ হার ছিল ৮২.৬ শতাংশ; ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে বাজেট বরাদ্দের মাত্র ৫০.০ শতাংশ ব্যয়িত হয়েছে। ২০২৩-২৪-এর জন্য প্রস্তাবিত এডিপি বাস্তবায়ন করতে হলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় বাস্তবায়নের হার হতে হবে ৩০.০ শতাংশের বেশি। এই ব্যতিক্রমী ও উচ্চ বাস্তবায়ন হার অর্জন করার লক্ষ্যে কী কী সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হবে, তার কোনো পথরেখা অবশ্য বাজেটে উল্লেখ করা হয়নি।

এর আগে বলা হয়েছে যে, বাস্তবায়নের এই নিম্ন হারের ফলে পরবর্তী সময়ে ঋণ পরিশোধের দায়ভার বৃদ্ধি পায় এবং এই ক্রমবর্ধমান দায়ভার অর্থনীতির জন্য সংকট সৃষ্টি করে। তখন আদায়কৃত রাজস্বের একটি বড় অংশই ব্যয় করতে হয় ঋণ পরিশোধে, যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করে ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে দুর্বল করে তোলে। বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা ও সুশাসন আজ যেকোনো সময়ের তুলনায় তাই এত বেশি জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের অধীনে যে সংস্থাটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মানসম্পন্ন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, সেই আইএমইডি (ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুশন ডিভিশিন) তার বিভিন্ন পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনায় এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশকিছু সমস্যা চিহ্নিত করেছে। প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে চিহ্নিত মূল সমস্যাসমূহের মধ্যে আছে: প্রকল্প বাছাইকালে স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী ও উপকারভোগীদের মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়া; প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক ও সমন্বিত পরিকল্পনার অভাব; প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের (ফিজিবিলিটি স্টাডি) ক্ষেত্রে পেশাদারত্বের অভাব; প্রকল্প বাছাইয়ের পূর্বে জেলা প্রশাসন থেকে জমি অধিগ্রহণের প্রাথমিক অনুমতি না নেয়া; মধ্যমেয়াদি বাজেটারি কাঠামো কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ অনুমোদিত আর্থিক সিলিং না মেনে প্রকল্প প্রণয়ন; প্রকল্পের বেসলাইন তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ না করা; প্রকল্পের 'এক্সিট প্ল্যান' সঠিকভাবে প্রণয়ন না করা।

বাস্তবায়ন পর্যায়ে সমস্যার মধ্যে আছে: ডিপিপিতে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণ না করা; বাস্তবায়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব; প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব; প্রকল্প বাস্তবায়নসংক্রান্ত কমিটির সভা নিয়মিত না হওয়া; সক্ষমতার অভাব আছে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প বাস্তবায়নের কন্ট্রাক্ট দেয়া; সংশ্লিষ্ট কন্ট্রাক্টর কর্তৃক একাধিকবার বাস্তবায়ন সময়কাল দীর্ঘায়িত করার আবেদন; ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন; একই প্রকল্প পরিচালককে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ।

প্রকল্প বাস্তবায়ন-পরবর্তী পর্যায়ে চিহ্নিত সমস্যার মধ্যে আছে: আইএমইডি কাছে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর নির্ধারিত প্রতিবেদন দাখিল না করা; প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না রাখা; প্রকল্প বাস্তবায়নের পরবর্তী সময়ে প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সংরক্ষণ ও যথাযথ তত্ত্বাবধান না করা; প্রয়োজনীয় দক্ষ স্থানীয় জনবলের অভাবে বিদেশি কোম্পানির কাছে মধ্য-দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ভিত্তিতে বাস্তবায়িত প্রকল্পের পরিচালনা হস্তান্তর।

এসব সমস্যা ধারাবাহিকভাবে অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে। যার ফলে বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের (এআইআইবি) প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে চার লেনের একটি সড়ক (আরবান আর্টারি রোড) নির্মাণে গড় ব্যয় অন্যান্য দেশের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি: যেমন— ভারত থেকে ৪.৪ গুণ, তুরস্ক থেকে ৩.৭ গুণ, চীন থেকে ১.৬ গুণ ও পাকিস্তান থেকে ২.১ গুণ। অনেক সময় যুক্তি দেখানো হয় যে, জমি অধিগ্রহণে বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য দেশ থেকে বেশি ব্যয় এবং নদীমাতৃক বাংলাদেশে ব্রিজ-কালভার্টের সংখ্যা অনেক বেশি রাখতে হয়। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির পেছনে এগুলো অন্যতম কারণ। এসব কিছুকে বিবেচনায় নিলেও বাংলাদেশে সড়ক নির্মাণে ব্যয় যে তুলনামূলকভাবে বেশি, বুয়েটের একটি গবেষণা থেকে তার সত্যতা মেলে। সাম্প্রতিক অতীতে বুয়েট কর্তৃক পরিচালিত এই গবেষণা কার্যক্রমে ব্যয় মূল্যের হিসাব করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশে একটি চার লেনের সড়ক নির্মাণে কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় (তখনকার হিসাবে) হওয়া উচিত ১২.০ থেকে ১৫.০ কোটি টাকা (১.৪ থেকে ১.৮ মিলিয়ন ডলার)। এর বিপরীতে দেখা যায় যে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণে কিলোমিটারপ্রতি প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২১.০ কোটি টাকা (২.৪৭ মিলিয়ন ডলার) এবং রংপুর-হাটিকুমরুল মহাসড়কের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটারের জন্য ব্যয় হয়েছে ৫৫.০ কোটি টাকা (৬.৪৭ মিলিয়ন ডলার)। নির্মাণাধীন ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ক্ষেত্রে এ ব্যয় ধরা হয়েছে ৬০.০ কোটি টাকা (৭.০৬ মিলিয়ন ডলার)।

অবশ্য বিষয়টি কেবল সড়কের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জ্বালানি তেল, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের কিলোওয়াটপ্রতি মূলধনী ব্যয় বৈশ্বিক গড় ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন— গ্যাস টারবাইন প্রযুক্তিতে চালিত প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কিলোওয়াটপ্রতি মূলধনী ব্যয়ের বৈশ্বিক গড় ৫৫১.০ ডলার, যেখানে বাংলাদেশের সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষেত্রে কিলোওয়াটপ্রতি ব্যয় ১১৭৭.০ ডলার আর বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষেত্রে এ ব্যয় ৮১৯.০ ডলার।

যদিও এ কথা ঠিক, সাম্প্রতিক সময়ে ডিপিপি ফরমেটের উন্নত সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়েছে; একই সরকারি কর্মকর্তা যাতে একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বে না থাকেন এবং প্রকল্প পরিচালক যাতে ঘন ঘন পরিবর্তন না হয়, সে জন্য মন্ত্রণালয়গুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ যাতে ডিপিপি প্রণয়নের সঙ্গে সমান্তরালভাবে পরিচালনা করা যায়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। প্রকৃত তথ্য উদঘাটনকে প্রণোদিত করার লক্ষ্যে ‘হুইসেল ব্লোয়ার’ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে। অর্থ ছাড়ের জটিলতা নিরসনে নীতিমালা পরিবর্তন করা হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক বাইরের পরামর্শক নিয়োগ-প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আরও অনেক কিছু করার প্রয়োজনীয়তা থেকেই যাচ্ছে, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত পরিস্থিতির অবনমন হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উন্নত (ওইসিডিভুক্ত) দেশসমূহ অবকাঠামো বিনিয়োগে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সরকারি বিনিয়োগের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি কাঠামো প্রস্তুত করেছে এবং এই কাঠামো অনুসরণ করে সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কাঠামোতে ১০টি স্তম্ভ আছে: যেমন— অবকাঠামো নির্মাণে কৌশলগত অভীষ্ট নির্ধারণ; অবকাঠামো নির্মাণের প্রাধিকার নির্ধারণ; সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায় ও বিভাগের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয় বিধান; বিনিয়োগ কার্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; সম্ভাব্য বিভিন্ন উপকারভোগী গ্রুপের সঙ্গে মতবিনিময়ের ও তাদের বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডের পরিবীক্ষণ কাজে সংশ্লিষ্ট করার কাঠামো; ‘গুড ভেল্যু ফর মানি’ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; প্রকল্পসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সেগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ; বিনিয়োগকে টেকসই করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। প্রতিটি পিলারে তিনটি প্রশ্নসাপেক্ষে বিভিন্ন সূচকের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগের মান উন্নত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন তিনটি হলো— সংশ্লিষ্ট পিলারটি কেন অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ; পিলারের সঙ্গে সম্পর্কিত নীতিমান্যতার মূল বিষয়সমূহ কী; এবং সংশ্লিষ্ট পিলারের নিরিখে বাস্তবায়ন-সম্পর্কিত সূচকসমূহ কী। এ সুশাসন কাঠামো বা ফ্রেমওয়ার্ক ৪৭টি সূচকের মাধ্যমে উল্লিখিত ১০টি পিলারের প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নে

সুশাসন ও মানগত উৎকর্ষের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এসব সূচক প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল্যায়নেও সহায়তা করে। বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সমন্বয় করে বাংলাদেশেও এ ধরনের একটি 'সুশাসন ফ্রেমওয়ার্ক' বা 'সুশাসন কাঠামো' প্রস্তুত করতে উদ্যোগ নিতে পারে এবং এ কাঠামোর নিরিখে সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি প্রকল্পের দীর্ঘসূত্রতার একটি বড় কারণ বাস্তবায়নকালে আইনি জটিলতার সৃষ্টি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষে আইনি লড়াই পরিচালনার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই পরামর্শক আইনজীবীদের সহায়তা নেয়া হয়ে থাকে, যা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন আইনজীবীর অনুপস্থিতিতে এসব মামলা দীর্ঘায়িত হয়, ফলে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। এ সমস্যার প্রশমনে বৃহৎ আকারের সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়সমূহের নিজস্ব আইন ক্যাডার গড়ে তোলার কথা ভাবা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় প্রতিবছর যে 'বার্ষিক পারফরমেন্স অ্যাগ্রিমেন্ট' (এপিএ) স্বাক্ষর করে থাকে, সে প্রক্রিয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ইস্যুকে কার্যকরভাবে সংশ্লিষ্ট করার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তাদের প্রণোদনা ও পদোন্নয়নের সঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়ন দক্ষতার বিষয়টিকে কার্যকরভাবে যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

আইএমইডি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পর্যালোচনার আলোকে যেসব পরামর্শ উঠে এসেছে, তা বিবেচনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। আইএমইডি কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়ার এখন সময় এসেছে বলে মনে হয়। সরকারি এই প্রতিষ্ঠানের জনবল ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন, প্রয়োজন নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং ল্যাবটেস্টিং সক্ষমতা বৃদ্ধি। আইএমইডির কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্তের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ কর্মকাণ্ডে প্রযুক্তির ব্যবহার শক্তিশালী করতে পারলে প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা ও মান বৃদ্ধি পাবে এবং সাশ্রয়ীভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। অন্যান্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে, তার মধ্যে আছে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের তাদের স্ব-স্ব এলাকার প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যকরভাবে যুক্ত করা; বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; স্থানীয় সরকারের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা; প্রকল্পের উপকারভোগী জনগোষ্ঠীকে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যবেক্ষণ-প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান ও এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও নীতিমালা প্রণয়ন।

প্রারম্ভিক মন্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহের নিরিখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মান উন্নীত করা অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে আরও জরুরি হয়ে পড়েছে। স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, এক টাকা বাড়তি আয় ও এক টাকা ব্যয় সাশ্রয় শেষ বিচারে একই কথা। এটা ব্যক্তির জন্য যেমন সত্য, সরকারের জন্যও। আগামীতে বাংলাদেশের উন্নয়ন-চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে; জনগণের করের টাকায় বাস্তবায়ন করা সরকারি বিনিয়োগও সমান্তরালভাবে বাড়বে। বিনিয়োগ কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা, প্রকল্পের মানসম্মত বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সকল পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করার ওপরই অনেকাংশে নির্ভর করবে দ্বৈত উত্তরণকালীন (মধ্য আয় ও এলডিসি গ্রাজুয়েশন) বাংলাদেশের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার টেকসই বাস্তবায়ন, ঋণের ফাঁদ এড়িয়ে মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে অব্যাহত যাত্রা, এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহের বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রূপান্তরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

খবরের কাগজ
১৯ অক্টোবর, ২০২৩

সংঘাত আরও ঘনীভূত হচ্ছে

রওনক জাহান

কয়েক মাস ধরেই আমাদের মনে এ আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে উঠছিল যে দেশের বড় দুটি দল আলোচনার মাধ্যমে তাদের বিরোধের সমাধান করতে পারবে না। মারামারি, হানাহানি, সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। একই দিনে কর্মসূচি, পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি এবং সামনে আরও কঠোর কর্মসূচি দেখে মনে হচ্ছে, সংঘাত আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

আমাদের দেশের ইতিহাসে আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসা বা সমাধান করার তেমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই। কিন্তু এখন ভাবার সময় এসেছে। আমরা কি সব সময় সেই পুরোনো পথেই হাঁটব? রাস্তায় শক্তি প্রদর্শন করে কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার চেষ্টা করব? কেন আমাদের বড় দুটি দল আলোচনার মাধ্যমে একটি সহাবস্থানে পৌঁছাতে পারবে না?

দলের নেতা-কর্মীদের বাইরে দেশের জনসাধারণ তো শান্তিপূর্ণ উপায়ে সব বিরোধের সমাধান চায়। সবাই চায় দেশে একটি শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করুক। যে পরিবেশে সবাই খোলামনে ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে মত প্রকাশ করতে পারবে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

আগামী নির্বাচনে একটা অর্থবহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে, যেখানে জনগণ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে— দেশে সে রকম একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করার দায়িত্ব সব রাজনৈতিক দলের। তবে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব তো সরকার ও সরকারি দলের। তারা দেশ পরিচালনার

দায়িত্বে আছে। তাদেরকেই দূরদর্শিতা দেখাতে হবে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ তাদেরকেই বের করতে হবে।

প্রথম আলো
৩০ অক্টোবর, ২০২৩

ইচ্ছে পূরণের নির্বাচন শুভ ফল দেবে না

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সঞ্চালক: বালাদেশী এবং বাংলাদেশের বাইরের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে দেখছেন আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য। সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আজকে আমাদের সাথে আছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ সিপিডির ডিস্টিংগুইশড ফেলো অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্বাগত আপনাকে। আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে মাস ছয়েক আগে এই অনুষ্ঠানে আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছিলো এবং তখন আপনি বলেছিলেন ত্রিমুখী সংকটে বাংলাদেশ। এই বক্তব্যকে দিয়েই আমরা শিরোনাম করেছিলাম সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছয়মাস পরে সেই সংকট কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে। নির্বাচন আসলেই মানুষের মধ্যে বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। আমি আপনার কাছে থেকে বুঝতে চাই যে, সেই সংকট কতটা উত্তরণ করতে পারলাম আমরা এই ছয়মাসে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ জিল্লুর। দুইদিন আগে আপনার জন্মদিন গেছে। শুভ জন্মদিন আপনাকে এবং এবছর আমরা যারা বন্ধু হিসেবে আপনার সাথে আছি তাদেরও যেনো শুভ হয় এই বছর। ছয় মাসে আগে বলেছিলাম ত্রিমুখী সংকটে দেশ। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট। এক কথায়, এই তিনটা সংকটই আরো গভীর ও ঘনীভূত হয়েছে এবং এই তিন সংকটেরই আরো নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। সেহেতু এইগুলা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা আরো বেড়েছে বলে আমি মনে করি। অর্থনৈতিক সংকটের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হলো মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছেছে। এটা সরকারি হিসেবে দশ শতাংশের কাছাকাছি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো খাদ্যমূল্যর সূচক এর চেয়ে অনেক

বেড়েছে। আর এরসাথে যেটা বেড়েছে, আগে মনে করতাম গ্রামে কোনো মূল্যস্ফীতি নাই সবই শহরেই কিন্তু এখন এটা সত্য না এখন। সরকারি হিসাবই বলছে যে গ্রামে এখন মূল্যস্ফীতি আরো বেশি। মূল্যস্ফীতি কি কমবে? না কমবেনা। যত বেশি টাকার মূল্যমান কমবে তত বেশি আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি আমাদের এখানে আসবে। এটা বিশ্বে মূল্যস্ফীতি বাড়ার জন্য না টাকার মূল্যের অবনমনের কারণ এটা। অপরদিকে যেটা দাঁড়াচ্ছে সরকার এখন ব্যয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অপারগ। সেহেতু আপনার রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় প্রথম চার পাঁচ মাসে শতাংশের হারে স্মরণাতীত কালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুধু বন্ধ হয়নি, রাজস্ব ব্যয় পরিপালন করার জন্য যে ব্যয় থাকে যেটা সরকার নিজস্ব টাকায় করে এটা সম্ভব হচ্ছেনা। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্নভাবে নির্বাচনকে সামনে রেখে যে কাজকর্মগুলো করতে চান, সেগুলো ওভাবে হচ্ছে না। হয়তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিতে চাইছেন ৫০ হাজার টাকা সেখানে সেটা কমে যাচ্ছে অথবা যে সমস্ত ঠিকাদারদের কাজে আপনি অর্থায়ন করতে চাচ্ছিলেন তাদের বলা হচ্ছে আরো ছয়মাস অপেক্ষা করতে বা শেষ ত্রৈমাসিকে এটা দেখা যাবে। এইটা একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সাথে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি ব্যক্তি বিনিয়োগ কমে গেছে।

ব্যক্তি বিনিয়োগ কমে যাওয়ার বড় কারণ হলো আপনি এখন আপনার প্রকল্প অনুযায়ী আমদানি করতে পারছেন না এবং সেটার ফলে যে সুবিধাটা সরকারের হচ্ছে, সেটা হলো আমদানি কমার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনে কিছুটা হলেও ভারসাম্য আনার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। যদি এই সময়কালে সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধি হয়েছে রপ্তানি খাতে। সেহেতু রপ্তানি বাড়ছে কিছুটা কিন্তু আমদানি এএক-চতুর্থাংশ কমে গেছে। আপনি যেকোনো জায়গায় গেলে লক্ষ্য করে দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী আমদানি করা যাচ্ছেনা। এমনকি ওষুধ পত্র আমদানি করার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে। উলটো দিকে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, সরকারের বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক ব্যয় আরো বেড়েছে এবং স্বল্পমেয়াদি ঋণ নেয়ার প্রবণতা বেড়েছে যেটাকে আমরা ট্রেড ক্রেডিট বলি যেটার মূল্য অনেক বেশি। এর সাথেই বেশ কিছু বড় বড় প্রকল্পে ব্যয় পরিশোধের সময় চলে এসেছে অর্থাৎ সাশ্রয়ী সময় যেটা তিন বা আট বছর ছিলো সেটা পার হয়ে গেছে। এইযে আমরা বঙ্গবন্ধু টানেল করলাম যা বাংলাদেশের জন্য নিসন্দেহে বড় অর্জন যে নদীর তলায় টানেল দিয়ে আমরা গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করেছি। এটার জন্য যে ঋণ নিয়েছি সেটা টানেল খোলার আগেই শুরু হয়ে গেছে। রূপপুর যখন চালু হবে আএ দুইবছর পর তখন ৫০০ মিলিয়ন ডলার প্রতি বছর দিতে হবে সেহেতু ছয় মাসে যা দাঁড়িয়েছে....

সঞ্চালক: সেটা কি দুইবছর পর থেকে দিতে হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দুইবছরের ভিতর থেকেই মূল সুদ শুরু হবে। অর্থাৎ এখন আপনার দুই থেকে আড়াই বিলিয়ন ডলার বছরে আপনার পরিশোধজনিত ব্যয়। যেটা আগামী বছর তিন হবে। তার পরের বছর এটা সাড়ে তিন হবে। এটা লম্বাভাবে হচ্ছে। কিন্তু এটা মিটানোর মতো বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের নাই। যেটুকু রেমিট্যান্স ছিলো সেটাই হিসেবের গরমিলের কারণে আমাদের হচ্ছে না। অর্থনীতি নিয়ে আরো দীর্ঘ আলোচনা আমি আপনাদের সাথে করতে পারি কিন্তু অর্থনীতিটা খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। সমস্যাটা এতো বড় হওয়ার কথা ছিলোনা যদি মনযোগ পেতো। যদি তথ্য-উপাত্তের বিনিময়গুলো আরো স্বচ্ছতার সাথে হতো এবং সেটা একধরনের পরিস্থিতি দিতো। সরকার একটা তিনমাসের অর্থনীতি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে এবং নির্বাচনের আগে কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপে যাবে না কিন্তু তারা যেটা করছে সেটা হলো অর্থনীতিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে। অর্থাৎ আদার দাম আপনি রাখতে পারছেন না, ওখানে পুলিশ পাঠান। আপনি পেঁয়াজের দাম রাখতে পারছেন না, আপনি ওখানে একটা হানা দেন। এটাতো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার অংশ না। আপনি প্রশাসনিক ব্যবস্থা দিয়ে বাজার ব্যবস্থাপনাকে ধরে রাখতে চাচ্ছেন। আবার বলছেন সিন্ডিকেট আছে কিন্তু সরকারের হাতে এন্টি ট্রাস্ট ল থেকে অনেক কিছু থাকার পরেও তারা ব্যবহার করছে না।

এইযে প্রশাসনিক মনোভাব দিয়ে আমি সবধরনের সমাধান খুঁজবো এবং আমি রাষ্ট্রকে নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহার করবো এই আচরণ অর্থনীতিতে চলে না। আরো করা যায়না বৈদেশিক সম্পর্কে। সেটিই আমি পাঁচ ছয় মাস পরে এসে বলছি অর্থনীতির অবস্থা আরো করুণ হয়েছে এক ধরনের অবহেলার কারণে। এই অবহেলা এই নিদারুণ অর্থনীতি কতদিন সহ্য করতে পারবে এটা একটু ভাবার বিষয়। মূল্যস্ফীতি, সুদের হার বাড়ছে এবং আরো বাড়বে কিনা, কোনো একটা সময় কোনো একটা ব্যাংকের প্রতি আস্থার সংকট দেখা দেবে কিনা, পুঁজিবাজারের ক্ষেত্রে শেয়ারবাজারে বড় ধরনের উত্থান পতন হবে কিনা এবং কোনো জায়গা থেকে আসবে জিনিসটা সেইটা, কোনো জায়গা থেকে বৈদেশিক দায় শোধ করতে আমরা অপারগ হয়ে যাবো কিনা অথবা যে ডেফার্ড পেমেন্ট আছে তেল আনার ক্ষেত্রে সেখানে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলোকে কিভাবে মোকাবিলা করবো সেগুলো রয়েছে। এর বাইরে বৈদেশিক সম্পর্কে নতুন উপাদান শ্রমের বাজারে আন্তর্জাতিক যে তিরস্কার পাচ্ছি সেটা আছেই।

সঞ্চালক: এই জায়গায় আপনি নতুন কোনো উপাদান দেখেন কিনা যেমন আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি এরা কেউ আমাদেরকে রেসকিউ করার চেষ্টা করতে পারে কিনা। ডলারের অবস্থাটা আপনি বলেলনি। সেটা একটা ফ্যাক্টর হিসেবে বলেছেন। কিন্তু এই

টাকার যে অবনমন সেটা কতটা অব্যাহত থাকবে এবং রিজার্ভ কমে গেছে এটা একটু ইস্যু। চীন ইতোমধ্যেই বলেছে সরকার চাইলেই রিজার্ভে সহায়তা করতে পারে। এই জায়গাগুলোকে আপনি কিভাবে দেখছেন? কিংবা কেউ কেউ বলেন পাচার হয়ে যে টাকাগুলো বাইরে গেছে কোনোভাবে তার কিছু অংশ যদি রেজিম ইন্টারেস্টে ক্ষমতা প্রলম্বিত করার স্বার্থে ফেরত আনা যায় কিনা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই মুহূর্তে বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফের পক্ষ থেকে যা করা উচিত সেটা তারা করেছে। কতগুলো চুক্তি করেছে এবং আমরা শর্তগুলো পরিপালন করবো বলেছিলাম। শেষ যেই মূল্যায়নটি হয়েছে খুব পরিষ্কার। দুইটা জায়গায় আমরা পারিনি। একটা, রাজস্ব আদায় করতে পারিনি। দুই, বৈদেশিক মজুদ রক্ষা করতে পারিনি। এই দুটো না পারার বড় কারণ হলো টাকার বিনিময় হারের যে বাজারভিত্তিক করার কথা ছিলো সেটা আমরা করিনি। সরকার ভয় পেয়েছে যে এটার ফলে মূল্যস্ফীতি আরো বাড়বে এবং সেই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে সুদের আর বাড়াতে হবে। সুদের হার বাড়াতে গেলে আমাদের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী অখুশি হবে। একইভাবে যেহেতু ব্যাংকিং খাতে তারা কোনো সংস্কারের ভিতরে যায়নি সেহেতু সঞ্চালন করার ক্ষেত্রে যে তারল্য সেটাও আনতে পারেনি। এখন বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের থেকে আগামী তিন চার মাসে আর চাওয়ার মতো কিছু নেই। যেটা আছে, পরবর্তী প্রাপ্য কিস্তি যেটা নভেম্বরে হওয়ার কথা সেটা কোনো কারণে সবচেয়ে বড় যে শেয়ারহোল্ডার আছে তারা যদি কোনো কারণে অন্য মনোভাব পোষণ করে তাহলে সেটার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ এই মুহূর্তে আপনি সবচেয়ে বড় মালিকের সাথে একটা দ্বন্দে জড়িয়ে যাচ্ছেন। তারা যদি তাদের প্রতিষ্ঠান দিয়ে আপনাকে কোনো শিক্ষা দিতে চায়? আপনিতো নিজেই বলেছিলেন তারা পদ্মা ব্রীজের টাকা আটকে দিয়েছিলো। তারা যদি এটা পারে, যদি ওই বয়ান পূর্ণভাবে সত্য বলে আমি মনে করিনা। এটা একটা বড় জায়গা। এই মুহূর্তে একটা উদ্ধারের বড় জায়গা হলো যত জায়গা থেকে আপনি পারেন, বাজেট সাপোর্ট আনবেন। এই মুহূর্তে সাড়ে তিন/চার বিলিয়ন ডলারের মতো আমরা বাজেট সাপোর্ট পেয়েছি। বাজেট সাপোর্ট এর সমস্যা হলো এটা কোনো প্রকল্পতে যায় না কিন্তু ঘাটতি মেটানোর জন্য আপনি ব্যবহার করবেন। কিন্তু এটা খুব কম সময়কালের জন্য দেয়া হয়।

সাম্প্রতিককালে আমাদের সিপিডির অনুষ্ঠানে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা এসেছিলেন। তার ভিতর শ্রীলঙ্কার গভর্ণর এসেছিলেন। যিনি এ পেয়েছিলেন আমরা যেখানে ডি পেয়েছিলাম। সেখানে উনি একটা কথা বলেছেন যেটা আমরাও বলি সবসময় সেটা হলো ঋণ করে ঋণের টাকা শোধ করুন। আপনি যদি এটা করেন তাহলে আপনি আরো বড় জালের ভিতরে ঢুকে যাবেন। এটা একটা সাধারণ বুদ্ধির বিষয়। আমরা এটাই করছি। আমরা ঋণ করছি ঋণ শোধ করার জন্য বা অন্য কোনো প্রকল্পের দায় শোধ

করার জন্য। জবাবদিহিতা যখন না থাকে তখন আপনি এখতিয়ারের বাইরে যেয়ে দায় সৃষ্টি করেন। আপনি দায় সৃষ্টি করছেন আপনার সন্তানের জন্য ও তার সন্তানের জন্য যেটার আপনার কিন্তু কোনো ক্ষমতা নেই। আমরা আন্তপ্রজন্ম দায় সৃষ্টি করছি যেটার অধিকার নেই। এটা অন্যায় কাজ হচ্ছে। যদি সাংবিধানিক অধিকার থাকতো তবে এটা নিয়ে মামলা হতো। আপনি ঋণ করে ঘি খাচ্ছেন এবং পেটের কষ্ট হবে আপনার সন্তানের। এইটা একটা বড় সমস্যা।

সঞ্চালক: আমি অর্থনীতি নিয়ে আরেকটু জানতে চাচ্ছি যেটা হলো,প্রধান হলো কৃষি, রেমিট্যান্স, রপ্তানি, তৈরি পোশাক খাত বড় বড় জায়গা সাম্প্রতিকসময়ে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকরা আন্দোলনে রক্ত দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। বন্দী হয়েছে অনেকে। সবচেয়ে বড় যেটি, যুক্তরাষ্ট্র তাদের গ্লোবাল লেবার রাইটস ঘোষণা করেছে এবং এই বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বক্তৃতা করছিলেন সেখানে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ এসেছে এবং কি ধরনের ব্যবস্থা তারা নিতে পারে সেটাও তারা বলেছে। এতো দেশ থাকতে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ সেখানে আসলো এবং ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের পোশাক খাতে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। আপনি এখানে আরো বড় কোনো সংকট দেখেন কিনা?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি দেখি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশ এখন একটা দ্বন্দ্বের সম্পর্কে চলে গেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আমরা যে ধরনের বাক্য ব্যবহার করি সেটা কোনোভাবেই একটা শালীন কূটনীতিক সম্পর্কের জন্য অনুকূল না। এটা আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। সাম্প্রতিককালে দ্বন্দ্বের যে জায়গাগুলো আমরা লক্ষ্য করি সেগুলোর একটা বড় জায়গা হলো গণতান্ত্রিক মানবাধিকারের বিষয়। দ্বিতীয়, বিশ্বব্যাপী যে কলুষিত অর্থ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশকে ব্যবহার করা। তৃতীয়, শ্রমের মান। সেটার সাথেও মানবাধিকারের বিষয় যুক্ত আছে। যেকোনো গণতান্ত্রিক সরকার আপনি যদি দেখেন তাহলে সর্বদাশ্রমের বিষয়টি এক নম্বরে ছিল। আপনার যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের বৈধতার সম্পর্ক দেখেন সেখানেও কিন্তু শ্রমের বিষয়টি এত বড় বিষয় ছিল এবং আপনি যদি ফিরে দেখেন আমাদের রপ্তানিমূলক শিল্প প্রসারের কারণে শিল্পায়ন হচ্ছে না এবং শ্রমের প্রতি যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণাচরণ না করে এর সাথে যুক্ত হচ্ছে আরেকটি বিষয় যদি এখনো আসেনি কিন্তু আগামীতে আসবে সেটি হলো পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়। পরিবেশ, নারীর অধিকার, শ্রমের অধিকার তার সাথে মানবাধিকার এই জিনিসটা চক্রাকারে ডেমোক্র্যাট সরকারের ভিতরে কাজ করে। এই বিষয়টি এখন আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ একটা নব্য দ্বিকেন্দ্রিক যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সেহেতু এই নব্য দ্বিকেন্দ্রিক আদর্শিক যুদ্ধের ভিতর অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়াবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের ক্ষেত্রে মানবাধিকারের বিষয়টি, মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়টি। অনেক অনেক

কিছুই বলবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি হয় কি না হয়। আমরা বর্তমান নিয়ে আলোচনা করছি। ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলে আরেক রকমের আলোচনা হবে। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতিতে এটাই বাস্তবতা এটাই আপনাকে মেনে নিতে হবে যে বাংলাদেশ যেহেতু বহু দিক থেকে বিপন্ন অন্যান্য যে কোনো দেশের তুলনায় মধ্যপ্রাচ্যের কাতারে ফুটবল খেলা নিয়ে স্টেডিয়াম বানানো বলেন অথবা ল্যাটিন আমেরিকাতে বিভিন্ন খনিতে করার কথা বলেন বা আফ্রিকাতে অন্যান্য শিল্পে যারা কাজ করেন আপনি তাদের কথা বলেন। তাদের চেয়ে বাংলাদেশ অনেক বেশি মনোযোগের কেন্দ্র আছে। আমরাই তাকে মনোযোগের কেন্দ্র বানিয়েছি।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এটা কিভাবে আসবে? রাজনৈতিক নাকি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দিয়ে? যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে সেহেতু কংগ্রেস না অন্য কিছুতে আইন পাশ করে কিছু হবে না। যেটা হবে ঈশ্বর না করুক যেন না হয় বিদ্যমান আইনের অধীনে আদেশবলে হবে। সেটা ছয় মাস দেড় বছর পরে একেক জনার একেক রকম সময়কালে ওটাকে পরবর্তী সময়ে ভূতাপেক্ষ বৈধতার ভিতরে যাবে। অর্থাৎ এখন কিন্তু ডোনারলুর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে চলে এসেছে। কিন্তু যখন রোনাল্ডো চিঠি দেয় তখন এটা মনে করার কারণ নেই যে কেউ একজন বললেন ওনারা তো সরকারি ব্যবস্থা বা উঠে পর্যায়ের কেরানী একজন কথাটা বলেছেন। সেহেতু এখন তারা অধিকারপ্রাপ্ত আইন অনুযায়ী কাজ করবেন। এই সমস্ত আইনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় উনারা একটা টেস্ট কেস বের করেন যেটা দিয়ে উনারা ঝি কে বউকে মেরে শেখায়। সেহেতু বাংলাদেশ কিন্তু লঙ্গনের ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ে না, নিম্ন পর্যায়ে। কিন্তু আঘাতটা হয়তো তার ওপরেই আসবে অন্যদের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এই মুহূর্তে আমরা যে আচরণগুলো দেখি সেটার র‍্যাবের ওপরে যে স্যাংশন এসেছিল সেরকমই আমরা দেখেছিলাম। সেটা হলো ওনারা অনেকবার অনেক সংকেত দেন যেমন: 'না এটা তো কিছু না আমরা তো কিছু করবো না' তখন আমরা কোনো প্রক্রিয়ার ভেতরে ঢুকি না কোনো উদ্যোগের ভেতরে ঢুকি না। এটাতো বাংলাদেশকে বলেনি পৃথিবী কে বলেছে। পৃথিবীর সবাই কি করে খায় এখানে? সেই জায়গাতে একটা বড় বিষয় রয়ে গেছে।

সঞ্চালক: পৃথিবীতে তো আরো অনেক কল্পনার মতো নারী নেত্রীরা বা শ্রমিক নেতারা আরো আছে। তাদের প্রসঙ্গ আলোচনায় আনা যেতো।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটাতো হঠাৎ করে আসেনি। কল্পনা তো কল্পনা না। এই কল্পনা তো বাস্তব। এই বাস্তব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ওনার নামটা ওখানে প্রকৃতি ভাবে এসেছে। উনি জানেন যে কি হয়েছে না হয়েছে আমি তো অনুষ্ঠানে বসে এটা বলার প্রয়োজন মনে

করি না। আমরা কে কি ধরনের সমস্যার ভেতর দিয়ে জীবন যাপন করি এটা যারা করে তারা সবাই জানে।

সঞ্চালক: মোটামুটি একটু ধারণা পাওয়া গেল যে কি হতে পারে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এখানে যেটা বোঝার ব্যাপার অনেকে মনে করেন যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নির্বাচন ইত্যাদি ইত্যাদি আসলে নির্বাচন তিন নম্বরে।দুই নম্বরে আছে হলো ময়লা অর্থ। এক নম্বরে আজ হলো শ্রমের বিষয়টি। এইটা আপনাকে পরিষ্কার ভাবে মনে রাখতে হবে। কিন্তু ওনারা একসময় এটা যুক্ত করবেন সেটা হলো, শ্রমিকের অধিকার কি আসলেই কোনো ভ্যাকুয়ামের মধ্যে হয়? আপনার যদি নাগরিক অধিকার না থাকে, ভোটের অধিকার না থাকে তাহলে আপনি ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার কিভাবে দিবেন? এই যে বড় বিষয়টি এটি ক্রমান্বয়ে আরো খোলসা হয়ে যায়।

সঞ্চালক: আমাদের আলোচনাটা বৈদেশিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক হলো কিন্তু আরো যদি বড় পরিসরে আলোচনা করতে চাই সেক্ষেত্রে আপনি কি দেখেন? মানে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই না তো ইউরোপীয় ইউনিয়ন আছে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা আছে অন্যদিকে রাশিয়া আছে চায়না সে ভারত আছে সবাই তো আমাদের অর্থনীতির সঙ্গে বলি বা রাজনীতির সঙ্গে বলি কমবেশি নানাভাবে জড়িয়ে গেছে। শ্রম অধিকারের যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করলাম সেখানেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সব মিলিয়ে আমি বুঝতে চাইছে সামগ্রিক বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কি দেখছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি ছোট্ট করে বলি, দেখুন অনেকে মনে করে যে এখানে একটা বিতর্ক আছে আসলে এরকম নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে আপনার খানকে তো ফলাফল আসে কি আসে না এবং অনেক সময় বলা হয়েছে দেখেন ইরান তো চলছে, মিয়ানমার তো চলছে, রাশিয়াও তো চলছে, ভেনেজুয়েলাও চলে কিন্তু তারা খেয়াল করেনি যদি কোনো কর্তৃত্ববাদী সরকার থাকে সে যদি এরকম স্যাংশনের অধীনে আসে তার একটা বড় বাঁচার উপায় হলো খুবই একটি সংকীর্ণগোষ্ঠীর কাছে যারা সাধারণভাবে কর্তৃত্ববাদী সরকার মার্কিন বিরোধী সরকার হিসেবে পরিচিত সেই গুহার ভিতরে ঢুকে যাওয়া। সেহেতু মিয়ানমার যতক্ষন চীন কিংবা রাশিয়া আছে ততক্ষণ অন্যকিছু নিয়ে চিন্তা করে না। ইরানের জন্য তেল সম্পদ এবং মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে থাকলে সে আর অন্য কিছুর জন্য চিন্তা করে না। সে সেটাকে মোকাবিলা করতে পারে এবং দেখেন এই পরিস্থিতিতে কিভাবে ৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে নিয়ে গেলো। এখন কথা হলেই দেশগুলোর ব্যাপারে

বাংলাদেশ কি তা পারবে? আজকের বাজার, রপ্তানি, রেমিটেন্স, প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বলে এবং সামাজিক যোগাযোগ শিক্ষা ছাত্রছাত্রী তার যে নির্ভরশীল পরিস্থিতি এটাতে তার পক্ষে কোনো গুহায় ঢুকে যা তার পক্ষে সম্ভব না। কারণ কর্তৃত্ববাদী সরকারেরও যেসব স্থায়ী ভিত্তি থাকে, এই ভিতরে স্তম্ভগুলো থাকে তাদের স্বার্থ কিন্তু তখন এর সাথে যুক্ত আছে। আমি আপনাকে সাধারণ একটা টেস্ট কেস দিয়ে যেতে পারি আজকে একটু আগে আপনি অর্থনীতির কথা জিজ্ঞেস করলেন না? ওয়ার্ল্ড ব্যাংক।

সবচেয়ে বড় উদ্ধারের জায়গায় সমস্ত ক্ষেত্রে আসে কোথা থেকে এ জায়গা গুলো আছে চীনের থেকে। চীন যদি আজকে ৫ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশকে দেয়, বৈদেশিক আর্থিক খতকে ঠেকা দেওয়ার জন্য এবং বাংলাদেশ সরকার যদি সেটা নেয় সেটা হবে একটা বড় সংকেত। এই যে বললাম গুহাতে ঢুকে যাবে কিনা এটার বড় সংকেত আসবে যদি চীনের পক্ষ থেকে বড় ধরনের টাকা নেওয়া হয়। লক্ষ্য করে দেখবেন, সাহায্য কিন্তু শ্রীলঙ্কাকেও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ঠেকানো যায়নি কারণ সমস্যা তা কাঠামোগত। এখানে এমন না যে কিডনিটা ফাংশন করছে না এজন্য কিডনিটা আপনি দেবেন, আপনার লিভার ফাংশন করছে না আপনাকে স্নায়ুতন্ত্র আছে সেটা কাজ করছে না। কারণ আপনি একটা অকার্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে গেছেন। আমি কিছুদিন আগে প্রথম আলো ঢাকা আলোচনায় বলেছিলাম সমস্যা হলো, এটা রাজনীতির সাথে প্যাঁচ খেয়ে গেছে। আপনি যদি রাজনীতি ঠিক না করতে পারেন তাহলেই অর্থনীতি ঠিক হবে না। আমি বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই কথা বলবো সেটা হলো আপনি যদি ইলেকশনের একটা করেন যেন তেন প্রকারে তারপরেও কিন্তু অর্থনীতিকে ঠিক করতে পারবেন না। কারণ যে সমস্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে যারা বেনামি টাকা নিয়ে গেলো, বেনামি বিনিয়োগ করলো দেশের ভিতরে, যারা আপনার ব্যাংকিং খাতকে ফোকলা করে দিল, যারা আপনার দশ টাকার প্রকল্পকে হাজার টাকা বানালো, সেই লোকগুলি যদি আবার ফিরে আসে, সেই লোকগুলো থেকে যদি বাংলাদেশের মানুষের কাছে কোনো জবাব দিতে না আসে তাহলে তো আপনার সমস্যাটা রয়ে গেল। এটা একইরকমভাবে সত্য আপনার বৈদেশিক সম্পর্কে। কারণ বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আপনি আগে একরকম ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় দেখে সবার সাথে মিলে চলতে চেয়েছেন সেইটা আপনি এখন আর থাকতে পারছেন না।

সঞ্চালক: কিন্তু যেটা আপনি বলছেন চীন যদি দুই বিলিয়ন তিন বিলিয়ন ডলার দেয় তাহলে তিন মাসের জন্য যদি আমরা রক্ষা পেতে চাই। আপতত আগে বাঁচি, সেভাবে

যদি বাঁচতে চাই তাহলে চীন কিভাবে আমাদের টাকাটা দিতে পারে? কত দিনের ভিত্তিতে তারাই দুই বিলিয়ন তিন বিলিয়ন ডলার দিবে এবং কোনো শর্তের ভিত্তিতে দিবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তারা তো অনেক কিছুই সেই অর্থ করতে পারে এবং সেটা করার তাদের সুযোগ আছে। যেমন ধরুন চীনের থেকে আমরা বড় ধরনের আমদানি করি সেই বড় ধরনের আমদানি টাকাটা সে সেখানে মিটিয়ে দিতে পারে। আপনার সাথে যদি একটা ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট চুক্তি হয় দ্য একটা বোঝাপড়া হয় ক্ষেত্রে আপনার এখানে কোনো টাকা আসার ও দরকার পড়বে না।

সঞ্চালক: সে টাকা তো শোধ দিতে হবে সেটা কিভাবে দিতে পারে সেটা আমি বললাম।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তাদের সমর্থনে যে টাকা আসে তার সুদের হার বেশি হয় এবং সাশ্রয়ী হার কম থাকে এবং খুব দ্রুততার সাথে পরিশোধ করতে হয়। সাধারণভাবেই দায়দেনা পরিস্থিতির আরো অবদমন ঘটবে। এটা সম্পূর্ণভাবে আইএফএফের এর সাথে সাংঘর্ষিক হবে।

সঞ্চালক: বোধহয় সম্পর্কে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমরা এক ধরনের টানাপোড়েন দেখছি কিন্তু চীন অসাধারণ কথা বলছে তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়গুলোকে হস্তক্ষেপ বলছে। ভারতও বাংলাদেশের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দেশ এবং সরকারের সাথে তার নানাভাবে ঐতিহাসিক সম্পর্ক। ভারত মাঝখানে রাজনৈতিক বিষয়ে বেশ কে ছিলো কিন্তু সম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের দুইটা ডায়লগের পরে কিছুটা খোলামেলা অবস্থান নিয়েছে। আপনি কি মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ভারতের জন্য বর্তমান সরকার সব থেকে বাহ্যিত সরকার এটা তো সকলেই বোঝে। সেরকম একটা সরকারকে কার্যকর সরকার হতে হলে যে ধরনের বৈধতা লাগে সেই বৈধ তাদের সরকারের নাই এটা আবার বোঝার ব্যাপার আছে। সেহেতু এটা একটা সংকটের জায়গা।

সঞ্চালক: ভারতের কাছে ভারতের বক্তব্য অনেক সময়, তাদের সামনে অপশন কি তাদের তো কোনো অপশন নাই আওয়ামী লীগের বাইরে তো তার কোনো অপশন নাই সে কি করবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনার অপশন ঠিক করার কে? অপশন তো ঠিক করবে বাংলাদেশের মানুষ। সেহেতু যদি আপনি সুষ্ঠু নির্বাচন হয় সেখানে মানুষ বেছে নেবে। যখন ভারতের

নির্বাচন হয় তখন আমার পছন্দ যদি কংগ্রেস সরকারও হয়, যদি মোদি সরকার ভোট পেয়ে আসে তাহলে আমি মোদি সরকার কেউ মেনে নিচ্ছি। বাংলাদেশেও যদি এমন কোনো সরকার আসে যেটা নির্বাচনের মাধ্যমে যারা বিভিন্নভাবে নতুন সম্পর্কে কে মূল্যায়ন করতে পারে। এটাতো হলো গণতান্ত্রিক অনুভবের ব্যাপার আপনার একটা আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষাকে আপনি চাপিয়ে দেওয়ার বা অন্য কোনো কার্যকর করার সুযোগ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে থাকার কথা না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু বারবার বলছে আমি কোনো সরকারের পক্ষে না। যখন ভারত সরকার বলল যে আমি গণতন্ত্রের প্রক্রিয়াতে অভ্যন্তরীণ ব্যাপার তখন তো একথা বললো না আমি কোনো দলের পক্ষে না। কথাটাকে এই জায়গাগুলোকে বুঝতে হবে।

সঞ্চালক: কিন্তু ভারত কতদূর ন্যাচার ডেমোক্রেটিক একটা কানট্রি তাদের ডিপ্লোমেসি তো অনেক এডভান্স আমাদের থেকে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ভারত সরকারের বাংলাদেশ নিয়েচিন্তার যৌক্তিক কারণ আছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হলো স্থানীয় স্থিতিশীলতার বিষয়। একটা তো সময় গেছে যখন বাংলাদেশে জমিন থেকে ভারতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের সশস্ত্র অভিযান তৎপরতা হয়েছে। এটা তো সত্য যে সেই সমস্ত লোকেদের অস্ত্র দেওয়ার জন্য ১০নপত্র আমাদের দেশ দিয়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে। তো একই রকমভাবে যে জিনিসটা আছে, আমাদের দেশের সাথে এখন যে ভূ-পাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্কগুলোকে তাদের চলমান রাখা তাদের আকাঙ্ক্ষার ভিতর আছে। এবং একই রকমভাবে আছো যে বাংলাদেশের ভিতরে যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা রয়েছে, ভারতীয় ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আছে এই দুটির কারণে এক দেশের সংখ্যালঘু আরেক দেশের কিন্তু সেই অর্থে সংখ্যাগুরু। তাদের ভেতরে সম্পর্ক নষ্ট হলে দেশের শান্তি নষ্ট হবে।

এই চিন্তাগুলো ওনাদের ভিতরে আছে সে তো আমাদের বিবেচ্য বিষয় হলো এই সমস্ত সম্পর্কগুলোকে যেমন ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাথে, ইউরোপের সাথে এমন কি চীনের সাথে ভারতের সাথে এক ধরনের দ্বিপাক্ষিক ও দ্বি দলীয় সমঝোতাতে যেতে হবে। এডিপাক্ষিক সম্পর্কগুলো যেন উত্থান পতন না হয়। ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক মনমোহন সিং নিউক্লিয়ার দিয়ে করেছে। মোদি সাহেব সেটাকে কোনো পর্যায়ে নিয়ে গেছে সরকার বদলের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাথে তাদের কোনো সমস্যা হয়নি। বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে কংগ্রেসের সাথে। আওয়ামী লীগ সরকারের কিন্তু এখন কি মোদি সরকারের সাথে ওনারা কম করছেন? সেহেতু দেখেন ওনারা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আমরা কি করি? আমরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কোড চলে ফেলে দিই। ফলাফলটাকে দাঁড়ায় ও না না

ওনাদেরটা নিয়ে যায় আমরা আমাদেরটা আদার আদায় করতে পারি না আমরা দুর্বল হয়ে যাই। এখন এই মুহূর্তে বিদেশিরা এরকম করতে পারছে এটার একটা বড় কারণ হলো আমাদের অভ্যন্তরের দুর্বলতা এবং আমাদের ঐক্যমতের অভাব ইত্যাদি।

আমি এখন পর্যন্ত দেখছি না এই নির্বাচনের যে পথে আমরা আগাচ্ছি এইটা দিয়ে বাংলাদেশ যে মৌল সমস্যা সে সমস্যা সমাধান হবে। নির্বাচন হলেও হতে পারে কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক সমস্যার জায়গা হলো দুইটা। অনেকভাবে বলা যায় কিন্তু আমি দুইটা বেশি মনে রাখতে পারি না প্রথম সমস্যাটা হয়েছে বৈধতার সমস্যা। আমাদের সাংবিধানিক বৈধতা হয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক বৈধতা ছিল না এবং রাজনৈতিক বৈধতা না থাকার সাথে সাথে নৈতিক বৈধতা ছিল না। একটা সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা আছে কিন্তু আর রাজনৈতিক বৈধতা যদি না থাকে এবং তার যদি একই সাথে নৈতিক বৈধতা তার পক্ষে দেশের জন্য সর্বাপেক্ষা ভালোটা করা সম্ভব হয় না। সেটা ভেতরের সাথে হয় না ভাইয়ের সাথেও হয় না। এইটা আমার বড় সমস্যা এই সমস্যাটা উল্টাপিঠে আছে বাংলাদেশে এত উন্নয়নের পরেও বৈষম্য বাড়লো? এত উন্নয়নের পরেও কেন আমরা বাজার ব্যবস্থাকে সমাধান করতে পারি না? কেন প্রকল্পের টাকা আদায় করতে পারি না অথবা ট্যাক্সের টাকা আদায় করতে পারি না অথবা ব্যাংকের যে খেলাপি ঋণ আছে এগুলা আদায় করতে পারিনা। এটার বড় কারণ হলো যে আমি যে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা দিবো সেই জায়গা নাই। যেহেতু বৈধতা নাই সেহেতু আমি জবাবদিহিতা দাবি করতে পারি না তখন আমার ওখানে কলুষ সম্পর্ক যেতে হয়। তখন আমার সমঝোতাতে যেতে হয় তখন আমার এমন শক্তির সাথে যেতে হয় যে শক্তি আসলে মৌলিকভাবে আমার আদর্শের বিরুদ্ধে এটাই হলো বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা।অর্থাৎ আপনি যাই করেন ভেতর দিয়ে আপনার মৌল সমস্যা সমাধান হবে না। বৈধতা এবং জবাবদিহিতা সমাধান হবে না। এটার জন্য যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দরকার, যে আন্তর্জাতিক সমর্থন দরকার এবং এটার জন্য যে অর্থনৈতিক সংস্কার দরকার এটা একটা বড় বিষয়।

সেহেতু এটা কোনো এক নির্বাচনের ব্যাপার না। বাংলাদেশের ভবিষ্যতের দিকে যখন আমরা তাকাই তখন অনেকেই শুধু নির্বাচন দেখেন। বাংলাদেশের ৭০/৮০ শতাংশ মানুষ যারা বসবাস করেন তারা স্বাধীনতার পরের জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাদের জন্য আমি প্রত্যেকদিন মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে পারি এই কথাতে তাদের এক ধরনের দেশপ্রেম জাগবে। কিন্তু তাদের এই ধরনের দেশপ্রেম কর্মপ্রেমে সৃষ্টি হতে হলে অন্য রূপকল্প সামনে আনতে হবে। ২০৪১ আর কথা বলবো কিন্তু একই সাথে আমি দুর্নীতির ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিব না ফোনে কথা বলার ক্ষেত্রে আমার অত্যাচার নির্যাতন হবে।

আপনি নির্বাচন করার জন্য সাড়ে সাত লক্ষ উর্দি পরায়ক বন্দুক ওয়ালা মানুষকে আপনার রাস্তায় নামাতে হবে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব করার জন্য এটা কি সম্ভব? এর সমাধান তো আমার আনতে হবে। এভাবে তো বাংলাদেশকে আমরা সামনে নিতে পারব না। এই জায়গাটা অনুভব করার ব্যাপার এবং এই অনুভূতিটা আমাদের নতুন প্রজন্মকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। যদি না নিয়ে আসি তাহলে প্রতিমুহূর্তে আমরা একটা অনিশ্চয়তার জীবনযাত্রার ভেতর দিয়ে যাবো। আমার বিনিয়োগ ঘাটতি হবে। কর্মসংস্থানে সমস্যা হবে। বাজারে তেল, মরিচ, আদা পেঁয়াজের দাম বাড়তে থাকবে।

সঞ্চালক: আপনি মোটা তাকে বললেন রাজনৈতিক সংকট টাকে কিন্তু বিস্তারিত বা মাইক্রো লেভেলে বলতে পারবেন যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট টা কি এবং এটা সমাধানের উপায় কি? বা সামনে নির্বাচন নিয়েও যে সংকট। কিন্তু এখন তাহলে করণীয় কি? যেটা ক্ষমতাশীলরা অনেকেই বলে থাকেন যে তাদের আসলে তো ভালো নির্বাচন দিবেন। যেটা অনেকে বিশ্বাস করে না। যেটার ফলাফল হয়তো অন্যরকম হতে পারে। সেটা তো তারা একটা ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। বিরোধীরা মনে করা যায় তাদের দেয়ালের ঠেকে গেছে। উপায় কি আসলে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শেষ বিচারে তাও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। গণতন্ত্রের চর্চার ভেতরে আসতে হবে, মানুষের চেতনার ভিতরে আসতে হবে, আন্দোলন সংগ্রামের ভেতরে আসতে হবে। আমাদের যেটা সমস্যা হয়েছে যেহেতু বৈধতার সংকট হয়েছিল সেহেতু আপনি রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ছেড়ে দিয়ে যেকোনো কর্তৃত্ববাদী সরকারের যেটা হয়ে যায় সেটা হলো, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র তন্ত্রের অন্যান্য জিনিসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যান আপনি।

বিরোধীদলের সমস্যাটা হলো তারা তো রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে নাই। তাদের রাজনৈতিক দলকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে না। তাদের রাষ্ট্রকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। উনাদের জন্য আমি সহানুভূতি নিয়েই বলছি যে নাগরিক হিসেবে যে, আপনি পুরা নেতৃত্বকে জেনে নিয়ে গেলেন এটার কি কারণ এবং সেটার কারণ দেওয়া হচ্ছে সেটাও গ্রহণযোগ্য না। মির্জা ফখরুল ইসলামকে যদি এখন প্রধান বিচারপতির বাসায় আগুন দেওয়ার জন্য নিয়ে যান উস্কানি হিসাবে তাহলে এগুলো যুক্তির হতে হবে। যেদিন যাবেন হবে সেদিন যদি উকিল মহাদে অসুস্থ থাকেন তাহলে তাকে আরো কয়েকদিন জেলের ভেতরে থাকতে হবে। আপনি একদিকে আলোচনা করবেন অন্যদিকে বিচারব্যবস্থা দিয়ে তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা নেবেন এটাও গ্রহণযোগ্য না। আপনি পিতাকে ধরতে না পারলে সন্তানকে ধরে নিয়ে যাবেন এটা গ্রহণযোগ্য না। চিন্তা করে দেখুন, আপনি গ্রেফতার করে

নিয়ে গেছেন এবং বাইরে এসে বলছেন যে, সে তো স্বীকার করেছে এই কাজ করেছে। এটা কি করার আপনার কোনো অধিকার আছে আইনগতভাবে? আপনি একটা আইন রক্ষাকারী বাহিনীর লোক। আপনি নাকি ওখানে তাকে হাত বুলিয়ে স্বীকারোক্তি করেছেন সেটা বলার জন্য সত্য মিথ্যা যাচাই করার কোনো সুযোগ নাই। অর্থাৎ আপনি এমন একটা বিভেদ সৃষ্টি করবেন যেখানে আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চা করার ন্যূনতম কোনো সুযোগ নেই। তাহলে নির্বাচনকে আপনি অর্থবহ করতে পারবেন না সেহেতু যারা বলেন যে নির্বাচনে ভোট দিব তাদের বোঝার ব্যাপার আছে যে এখানে মানুষের একটা মত প্রকাশের ব্যাপার রয়েছে। একটু সাহস করে কথাটা বলি আমি মনে করি, ৮০ শতাংশ মানুষ এই মুহূর্তে একটা সুষ্ঠু ভোটের জন্য অপেক্ষা করে আছে এবং এবং তাদের একটা বড় অংশ মনে করেন যে বর্তমান কাঠামোর ভেতরে এটা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব না। সেহেতু ঐ মানসিকতার ভিতরে থাকলে অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা তথাকথিত নির্বাচন এগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে সাধারণভাবে সংশয় থাকবে। এগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে যদি আমরা ঐক্যমতের সৃষ্টি করতে না পারি তাহলে হবে না।

কষ্টের জায়গা হলো আমরাই ঐক্যমতের এই জায়গাটি সৃষ্টি করেছিলাম। ১৯৯৬ এ একটা খারাপ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি'র পার্লামেন্ট সরকারের মাধ্যমে আমরা কেয়ারটেকার সরকার আনলাম। এই কেয়ারটেকার সরকারকে আমরা পঞ্চদশ সংশোধনী দিয়ে বাতিল করে দিলাম। কি করলাম, কখন করলাম এটাও খুব অদ্ভুত। যেখানে ওখানে বলা ছিল আরো দুই মেয়াদ থাকতে পারে এবং পঞ্চদশ সংশোধন এটি পাস হলো পুরো জাজমেন্ট বের হওয়ার আগে। যেহেতু ওখানেও কিন্তু সংশয় রয়ে গেছে সেহেতু আরো একটা নিষ্পত্তির দরকার পড়বে। যেখানে আপনাকে এই জায়গাটা ফিরিয়ে আনতে হবে। শাসকদলের নিজস্ব স্বার্থে এটা করা উচিত। অন্য দুটো দলের নাম ধরে তারা বলেছে তারাও এখানে থাকবে না। আমি তো বলি কোনো দলে থাকবে না কারণ হলো হয়তো থাইল্যান্ডের মতো হবে। দেখুন ওই নতুন ইয়াং ছেলেটা নতুন দল করে যেতেও হতে পারলো না। কারণ হলো ওখানে সেনাবাহিনী যেভাবে কাঠামোকে যেভাবে দখল করেছে এবং ক্ষমতার বিন্যাস করেছে। তারপরে গণতান্ত্রিক মতামত সেই স্বার্থকে ভাঙতে দিবে না। এখন আপনি এমন সমস্ত কায়েমের স্বার্থগোষ্ঠী তৈরি করেছেন আপনি ভাঙতে চাইলেও ভাঙতে পারবেন কিনা এটাই তো একটা সন্দেহের ব্যাপার হয়ে গেছে এবং এই ভাঙ্গার প্রক্রিয়াটা বড্ড ভয়াবহ। এই যে মৌলিক সমাধানের জায়গাটা যত দেরিতে আমরা করব তত বেশি আমার এটার জন্য মূল্য দিতে হবে।

এই মূল্য দিতে হবে আমাদের বিনিময়কে ফেলে দিয়ে, রপ্তানিকে ফেলে দিয়ে, যুব সমাজের কর্মসংস্থানকে ছাড় দিয়ে, বৈষম্য বাড়িয়ে, অর্থ পাচার বাড়িয়ে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের নিজস্ব অস্তিত্বকে সংশয়ের ভিতরে ফেলে দিয়ে। এখন একটা সময় হলে

বড় চিন্তার সময়। যদি একা একটা নির্বাচনের বৈতরণী হিসেবে চিন্তা করেন তাহলে এটা সেই সময় না। বাংলাদেশ ৫২ বছরে অনেক দূর এসেছে তাকে নিয়ে যায় তারপর পরবর্তী ধাপের সমূহ সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাই। সেই সম্ভাবনা দ্বারও উন্মোচিত হয়েছে। সেগুলোকে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন আমাদের উপরে পড়ে। আশা করে থাকি আমরা যাতে না একটু বৃন্দের দিকে উনাদের আলোকে তো চিন্তার দিকে কিন্তু উনারা যদি প্রতি মুহূর্তে এমন বয়ান তৈরি করেন যার সত্যতা নিয়ে বিভিন্ন মানুষের মনে সংশয় থাকবে তাহলে ওই বয়ানের সবচেয়ে বড় শিকার ওনারা একদিন হবেন।

সঞ্চালক: পলিটিক্সের ল্যাংগুয়েজে তো এখন খুব নিম্ন মানে এবং নিম্ন রুচিতে চলে গেছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যখন মানুষ খুব সুরুচিপূর্ণ ব্যবহার করে না তখন বুঝতে হবে সেই মানুষটি নিজেই সমস্যার মধ্যে জর্জরিত আছে। ওই সমস্যা যদি অনুভব করি আমরা তাহলে আলোকিত চিন্তার জায়গাটা সবচেয়ে বড় জায়গা। যে মানুষ ওই বড় সমস্যায় থেকে ওই আলোকিত চিন্তা করে ইতিহাস তাকে সবচেয়ে বেশি মনে রাখে। আমরা যখন কোনো উত্তরাধিকার রেখে যেতে চাই তখন সেটা বড় চিন্তার উত্তরাধিকার হয়। পদ্মা ব্রিজ বা টানেল দিয়ে সেটা রক্ষা করা যায় না। আমাদের ওই চিন্তার জায়গাটাতে নিতে হবে। আপনি ইতিহাসে দেখেন না বঙ্গবন্ধুর জীবন নিয়ে যখন আমরা কথা বলি তখন ওই বড় চিন্তাটা তো উনি করেছিলেন তাই না? লাহোরে রাউন্ডটেবিলে যাচ্ছেন তখন তিনি এটা করেছেন, উনি যখন ভুট্টোর সাথে নেগোসিয়েশনে বসছেন তখন এটা করেছেন আবার যেদিন স্বাধীনতার ডাক হয় সেদিন এই চিন্তাটা করেছেন, তার আগে সময় করে বলেছেন এমন ভাবেই বলেছেন আপনি যা বোঝার বুঝে নিয়েছেন আপনার সাথে আপনি বুঝেই নিয়েছেন ৭ই মার্চের কথা। এটাই নেতৃত্বের ইতিহাস এটাই মনে রাখে। কেউ কি মনে রাখবে বঙ্গবন্ধুর সময় আমরা কি অর্থনৈতিক কষ্ট ছিলাম, কত সমস্যার ভিতরে ছিলাম? মনে রাখবে, মানুষটা জীবন দিয়ে গেছে দেশের জন্য। এটাই সময় আমাদের সবচেয়ে বড় নেতৃবৃন্দের চিন্তা করার। আলোকিত একটা চিন্তা করার যেখানে নিজেকে নিজেই অতিক্রম করে যাওয়া যায়। নচিকেতার গান আছে,

“একদিন ঝড় থেমে যাবে; পৃথিবী আবার শান্ত হবে। আকাশ আবার উঠবে ভরে, জীর্ণ মতবাদ সব যাবে উড়ে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে”। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ আবার শান্ত হবে, ঝড় থেমে যাবে। আমাদের বসতি এবং আমাদের গোলার ধান ভরে উঠবে।

সঞ্চালক: ঝড় কবে থাকবে? মানুষের মধ্যে অনেক প্রশ্নই আছে যে নির্বাচন কি ৭ই জানুয়ারি হবে নাকি পিছিয়ে যাবে নাকি এই দফায় হবেই না। ২০০৭ সালে ২২ জানুয়ারি

আপনার খেয়াল আছে নির্বাচন বাতিল হলো, পরিস্থিতি পাল্টে গেলো বা নির্বাচন যদি হয়ও চৌদ্দ এর পাঁচ বছর টিকলো আঠারোর পরে পাঁচ বছর টিকলো। চব্বিশের পরে আমরা কি আশা করতে পারি সরকার পাঁচ বছর টিকে যাবে নাকি দুরাশায় পরিণত হবে কি মনে করছেন আপনি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমাদের একটা ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমি আছে এখন বর্তমানের একটা ভিত্তিভূমি আছে। দেখুন যখন কেটলিতে জল গরম হয় যতক্ষণ পর্যন্ত জল না ফুটে ততক্ষণ পর্যন্ত তাপ চলে। এটা মার্ক্সসীয় দর্শনে বলবে কোয়ান্টিটি ও কোয়ালিটি রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টি। পরিমাণ যখন গুণগত মানে পরিবর্তন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিশ্লেষণে করতে পারব কিন্তু আমাদের কাছে অনেক কিছু দৃশ্যমান হবে না। আমরা আন্দাজ করতে পারবো কিন্তু আমরা প্রাক্কলন করতে পারবো না। সেরকম পরিস্থিতি আপনার আছে। ছয় মাসের পরিস্থিতি আরো নাজুক হয়েছে।

বর্তমান সরকারকে এই পরিস্থিতি নিয়ে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আগের চেয়ে আরো অনেক কঠিন। এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। এবং সেক্ষেত্রে অন্যান্য যে চলক থাকে সে চলকগুলোর ভূমিকা আগামী দিনে কি হবে সেটা ভাবার বিষয়। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি একটা বড় ধরনের সমাবেশ করেছে কিন্তু তাদের সমাবেশ কে ভন্ডুল করে দেয়া হয়েছে। তারা আন্দাজও করতে পারি নাই যে এরকম হতে পারে। এটা বলা হয় একটা থিওরিতে সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না যে সরকারকে করতে পারে এটা ওনারা দেখেছেন কিন্তু এটাও তো সত্য যে মানুষ ভোট দিতে যাচ্ছে এত সহমর্মী। কিন্তু মানুষ তো সেই অর্থে রাস্তায় নামা বা অন্য কোনো কিছু প্রকাশ করছে না।

আপনি বলতে পারেন একটা ভীতির সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে এই ভীতির সংস্কৃতি ভিতর দিয়ে এখন এই মুহূর্তে অংশগ্রহণ করছে না। কিন্তু ভোট দিতে গেলে তাহলে তার কোনো জায়গাতে ঝুঁকি এবং লাভের ভারসাম্যটা রক্ষিত হবে। যদিও লাভের জায়গাটা হয়তো শেষ বছরে রাজনৈতিক হবে না শেষ বিচারে অর্থনৈতিক হবে। কারণ হলো তত্ত্ব বলে একটা কর্তৃত্ববাদী সরকার থাকে ততদিন যতদিন পর্যন্ত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি যদি বিকাশমান থাকে। আপনি যদি মধ্যবিত্তদের খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করে রাখতে পারেন তাহলে সে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে চিন্তিত থাকে না।

কিন্তু যখন তার আর্থিক পরিস্থিতিটা এক ধরনের বিপন্নতার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে এবং শুধুমাত্র মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়ে সেটা বলতে গেলে সেটাও বিপন্ন হচ্ছে তখন কিন্তু পরিবর্তনের জায়গাটা অনেক দ্রুত হয়ে যায় এটাই অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা বলে। যারা দেশ চালাচ্ছেন করে তারা রাজনীতিতে যতটা না বিনিয়োগ করলেন তারা দল

ভাঙার ক্ষেত্রে এবং নির্বাচনে আনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রণোদনা আনা হলো তার থেকেও যদি বেশি আরেকটু মনোযোগ দিতো আদা, পেঁয়াজ, ডিমের দাম, শাক-লতাপাতার দাম নিয়ন্ত্রণ রাখায়, তাহলে বোধহয় উনারা রাজনৈতিক সুফল আরো অনেক বেশি পেতো। উনারা যেই কাজগুলো করছেন এখন সেগুলো পৃথিবীতে আরো আগেও করেছেন।

ওয়ান ইলেভেনের সময়ও দল ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে যে আমাদের এই নেত্রী বা ঐ নেত্রী কারোরই দল ভেঙে খুব একটা সুবিধা হয়নি। আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু লোকজনদের দিয়ে তথাকথিত রাজার দল তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটাতেও খুব একটা কাজ হয় না মানুষের আগের অভিজ্ঞতা আছে। বাঙালিকে কোনো সময় ছোট মনে করবেন না। বাঙালি কিন্তু সব লক্ষ্য করছে। সে তো একদিন না একদিন এটা প্রকাশ্যে আসবেই। আমি মনে করি একদিন ঝড় থেমে যাবে, আবার শান্তি ফিরে আসবে।

সঞ্চালক: অনেক ধন্যবাদ ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আপনাকে।

তৃতীয় মাত্রা, চ্যানেল আই
সঞ্চালনায়: জনাব জিল্লুর রহমান
১১ নভেম্বর, ২০২৩

রাজনৈতিক ও নৈতিক বৈধতা ফিরে আসবে এমন নির্বাচন দরকার

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বেশ কিছুদিন ধরে ত্রিমুখী সংকটে রয়েছে দেশ। রাজনীতি, অর্থনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক– এই তিন সংকট আরও গভীর হয়েছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা। এ রকম একটি সময়ে আগামী জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এখন সময়টা বড় চিন্তার। নির্বাচনের প্রসঙ্গে আসি। নির্বাচনের যে পথরেখা দেখা যাচ্ছে, তাতে বাংলাদেশের মৌল সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। নির্বাচন হলেও হতে পারে, কিন্তু তাতে আমি বৈধতা ও জবাবদিহির সমস্যার সমাধান দেখি না।

মৌলিক সমস্যা সমাধানে যত দেরি হবে, দেশকে তত মূল্য দিতে হবে। সমস্যা সমাধানের জন্য যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দরকার; যে বৈদেশিক সমর্থন দরকার; যে অর্থনৈতিক সংস্কার দরকার; তার জন্য শুধু একটি নিয়ম রক্ষার নির্বাচন বিষয় নয়। প্রয়োজন এমন একটি নির্বাচন, যার মাধ্যমে সাংবিধানিক বৈধতার সঙ্গে রাজনৈতিক ও নৈতিক বৈধতায়ও ফিরে আসবে। শেষ বিচারে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া এবং জবাবদিহি প্রতিষ্ঠাই আসল বিষয়। কম-বেশি হলেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আসতে হবে। মানুষের চেতনার মধ্যে আসতে হবে। পেশাজীবীদের এবং একই সঙ্গে সামাজিক আন্দোলন লাগবে। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে এর বিকল্প নেই।

অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে মূল্যস্ফীতির কথাই আগে আসে। মূল্যস্ফীতি সাম্প্রতিক কালের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সরকারি হিসাবেই যা ১০ শতাংশের কাছাকাছি। তবে খাদ্য মূল্যসূচক এর চেয়ে অনেক বেশি। খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১২ শতাংশ ছাড়িয়েছে। লক্ষণীয়

বিষয়, গ্রামে মূল্যস্ফীতি শহরের চেয়ে খানিকটা বেশি। মূল্যস্ফীতি নিকট মেয়াদে কমবে বলে মনে হয় না। কারণ, টাকার দাম কমার প্রবণতা রয়েছে, যা আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি করবে। বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম কমলেও মূল্যস্ফীতি কমানোর পথে যা বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

অর্থনীতির আরেকটি সংকট হলো সরকারের আয় ও ব্যয় দুটোই কমে যাওয়া। এর ফলে সরকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ঠিকমতো বাস্তবায়ন করতে পারছে না। রাজস্ব ব্যয় করতেও টাকার সমস্যায় পড়ছে। নির্বাচন সামনে রেখেও গ্রামে সরকার যেসব কাজ করতে চায়, সেগুলোও ঠিকমতো হচ্ছে না। সরকারি বিনিয়োগ যেহেতু কমে গেছে, ব্যক্তি বিনিয়োগও কমেছে। উদ্যোক্তারা ঠিকমতো এলসি খুলতে পারছে না।

একই সঙ্গে সরকারের ঋণজনিত ব্যয় বিশেষত স্বল্পমেয়াদি দায় বেড়ে গেছে। এর পাশাপাশি কিছু বড় প্রকল্পে ঋণ পরিশোধের সময় হয়ে গেছে। কর্ণফুলী টানেল চালুর আগেই ঋণ পরিশোধ শুরু হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ঋণ পরিশোধ আগামী দুই বছর পর শুরু হবে। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ আগামী কয়েক বছরে ন্যূনতম ৫০০ মিলিয়ন ডলার করে বাড়বে। এই বর্ধিত ঋণ পরিশোধে আমাদের অর্থনীতির সক্ষমতা নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে। সরকার আইএমএফসহ বিভিন্ন উৎস থেকে যেসব বাজেট সহায়তা নিচ্ছে, তার জন্যও পরিশোধের বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে। সরকার এখন এক অর্থে ঋণ করে ঋণ পরিশাধ করছে।

আমাদের রেমিট্যান্স ও রপ্তানির জায়গায় যে শক্তি ছিল, তা টাকার বিনিময় হারসহ বিভিন্ন নীতির কারণে দুর্বল হয়েছে। যথাযথ মনোযোগ দিলে সামষ্টিক অর্থনীতির অবস্থা এত করুণ হতো না। সরকার এখন অর্থনীতিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিবেচনাহীন এবং সমন্বয়বর্জিত ব্যবহার অর্থনীতিতে চলে না।

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কিছুটা হলেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে একটি দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে যে ধরনের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার একটা বড় জায়গা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার। আরেকটি জায়গা শ্রম অধিকার এবং শ্রমের পরিবেশ। এর সঙ্গে মানবাধিকারের বিষয়টি যুক্ত হয়েছে। একই সঙ্গে এসব দেশ তাদের দেশে অন্যদেশ থেকে আসা নোংরা অর্থ প্রতিহত করার বিষয়েও তৎপর হয়ে উঠছে। আগামীতে আসবে পরিবেশ-সংক্রান্ত বিষয়। পরিবেশ, নারীর অধিকার, শ্রমের অধিকার এবং তার সঙ্গে মানবাধিকার চক্রাকারে যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট সরকারের ভেতরে কাজ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শ্রম অধিকার নিয়ে একটি মেমোরেন্ডাম অনুমোদন

করেছে। শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের কারণে বাংলাদেশের ওপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আসবে কিনা, তা নিয়ে উদ্বেগ থেকে যাচ্ছে।

অনেক সময় বলা হয়, ইরান, মিয়ানমার, ভেনেজুয়েলা, বেলারুশের মতো দেশ মার্কিন তথা বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞা নিয়েও তো চলছে। তবে এসব দেশের প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনীয় নয়। মিয়ানমার যতক্ষণ চীন এবং রাশিয়া আছে, ততক্ষণ অন্য দেশ নিয়ে চিন্তা করে না। বেলারুশের সঙ্গে রাশিয়া থাকলে সে অন্য কিছু চিন্তা করে না। ইরান ও ভেনেজুয়েলা তাদের তেলসম্পদ নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। আর বাংলাদেশের রপ্তানির বাজার, রেমিট্যান্স ও বৈদেশিক বিনিয়োগের উৎসে মার্কিন প্রাধান্য সর্বজনবিদিত। এছাড়া আছে আমাদের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর পড়তে যাওয়া; আরও আছে প্রতিরক্ষা সহেযাগিতা। এগুলোকে অবহেলা করে বাংলাদেশ যদি কোনো পদক্ষেপ নেয় তাহলে অন্ধকার গুহায় ঢুকে যাবে। এ রকম পদক্ষেপের উদাহরণ হতে পারে বৈদেশিক লেনদেনের চলমান সংকট মেটাতে চীন থেকে স্বল্পমেয়াদে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ। এ ধরনের সাহায্য শ্রীলঙ্কা নিয়েও উদ্ধার পায়নি। এর কারণ সমস্যাটা কাঠামোগত, মৌসুমি নয়।

এবার রাজনীতি ও অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনায় আসি। এই মুহূর্তে অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সংস্কার একটি অকার্যকর রাজনৈতিক পরিস্থিতির কাছে জিম্মি হয়ে গেছে। রাজনীতি ঠিক না হলে অর্থনীতি ঠিক করা কঠিন হবে। যেনতেন নির্বাচন করে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল ও বেগবান করা কঠিন হবে। যারা বেনামি টাকা নিয়ে গেল; পুঁজিবাজার থেকে টাকা লুট করল; ব্যাংকিং খাতকে ফোকলা করে দিল এবং যারা ১০ টাকার প্রকল্প ব্যয়কে হাজার টাকা বানালো; তাদের ওপর জবাবদিহি নিশ্চিত করা না গেলে সমস্যা থেকেই যাবে। অংশগ্রহণ ও প্রতিযোগিতাহীন নির্বাচন প্রয়োজনীয় বৈধতা দেবে না– মানে মূল সমস্যা মিটবে না। আর সেরূপ বৈধতা না থাকলে এসব কায়েমি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে কার্যকর জবাবদিহির আওতায় আনা যাবে না।

সমকাল
২৮ নভেম্বর, ২০২৩

রাজনীতিবিদরা ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীরা রাজনীতিবিদ হয়ে গেছে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সঞ্চালক: সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত সবাইকে সালাম স্টিল এই সময়ে। আমি জহিরুল আলম আপনাদের সঙ্গে আছি। প্রিয় দর্শক সারা পৃথিবীতে নানা ধরনের অশান্তি বিরাজ করছে এবং আমাদের দেশও পার করছে একটি অশান্ত সময় নির্বাচনকে ঘিরে। ট্রেনে আগুন দেওয়ার মতন দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। খুব দ্রুত পুলিশ প্রশাসন এই ঘটনার জন্য আন্দোলনকারীদের দায়ী করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আগুন দিয়ে সরকার হটানো যাবে না, ভোটের আয়োজন নিয়ে নির্বাচন কমিশন এগিয়ে চলেছে, নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ভয় দেখিয়ে নির্বাচন ঠেকানো যাবে না আগুনের জন্য বিচার বিভাগে তদন্ত চেয়েছে বিএনপি বিরোধী পক্ষ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে নানা ভাষায় এটাকে অভিহিত করছেন পাতানো বলছেন, একতরফা নির্বাচন বলছেন, ভাগাভাগি নির্বাচন বলছেন। সরকার চাইছে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন। এজন্যই ঈগলের লড়াই, লাঙ্গলের লড়াই নৌকার লড়াই লাঙ্গলের সাথে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আইনের প্রক্রিয়ায় বিএনপি সরকারকে ছেড়ে দেওয়ার একটি চেষ্টা ছিল। বিএনপি সেটা মানেমি এটি তিনি পরে তার নিজের মতো ব্যাখ্যা দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। এবং এটি তার নিজের ব্যাখ্যা এটা জানাবো ওবায়দুল কাদের ও স্বয়ং তার নিজের প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন। সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে বাঁধা দেখিয়ে আগামীতে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ভয় কেউ দেখাচ্ছে অথবা কেউ ভয় দেখছেন বিভিন্ন মতামত এবং বিশ্লেষণে সেগুলো উঠে আসছে। আবার রাশিয়া আরব বসন্তের মতো কিছু ঘটনার কথা বলছে যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে। যুক্তরাষ্ট্র এসব নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। বিএনপি ভোট বর্জন এবং অসহযোগের ঘোষণা দিয়েছে। নীরব বসন্তের কথা বলছে তারা তাদের নেতারা এখন জেলে অধিকাংশ বিচারব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রযন্ত্রগুলো সরকারের অনুকূলে কাজ করছে বলে

তারা অভিযোগ করছেন আর এই কারণেই তারা নির্বাচনের বাইরে থাকার শ্রেয় মনে করছেন। সিইসি বলেছেন যে ভোট সুষ্ঠু না হলে এর দায় সরকার কেউ নিতে হবে আর ইলেকশন কমিশনারের জনাব আলমগীর বলেছেন যে ভোটকেন্দ্রে যেতে কেউ নিষেধ করলেও সেটিও শান্তিপূর্ণভাবে করতে হবে। এমন একটি বাস্তবতায় আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদ গণনীতি বিশ্লেষক সিপিডি ডিস্টিংগুইশড ফেলো ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ।

সঞ্চালক: আমি অনেক বড় ভূমিকা করে ফেললাম।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি তো ভূমিকার ভেতরে বরং প্রেক্ষিত এবং প্রেক্ষাপট দুটোই খুব ভালো সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরেছেন।

সঞ্চালক: আমি আপনার বিভিন্ন বক্তব্য যতটা দেখেছি পড়েছি বা শুনেছি। আপনি এটার উপর জোর দিচ্ছেন যে ২০১৪ এর নির্বাচন। ২০১৮ এর নির্বাচন এর মতো ২০২৪ এর নির্বাচন এক ধরনের সাংবিধানিক বৈধতার দৃষ্টিতে দেখা যায়। কিন্তু এর সঙ্গে রাজনৈতিক বৈধতার একটি প্রশ্ন জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে নৈতিক কিছু বৈধতার প্রশ্ন জড়িত থাকে ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপনার বক্তব্য দিতে দেখা যায়।সাংবিধানিক বৈধতার সঙ্গে রাজনৈতিক বৈধতার সম্পর্ক কিভাবে দেখছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন সংবিধানিক বৈধতার বিষয়টা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিভিন্ন বার এসেছে ৯৬ হলেও কিন্তু সাংবিধানিক বৈধতার বিষয়টা উঠেছিল যে আমরা যেকোনো কারণেই হোক সময় হয়েছে আমাদের এটা করতে হবে বাধ্যবাধকতা আছে। এবং সেই ভাবে হয়েছিল এবং দেখুন সাংবিধানিক বৈধতার ভেতর দিয়ে একটি কেয়ারটেকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনও কিন্তু পাশ হয়েছিলো। যদিও বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত একটি নির্বাচন ছিলো। কিন্তু সেটা সবাই গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ সংবিধানের বৈধতা ছিল বলেই তারা যেই আইনটা পাস করেছে সেই আইনটা ফলভোগী হতে কারো কোনো আপত্তি হয়নি। বর্তমান সরকারও এই সংবিধানিক বৈধতাকে নিয়ে আগামীতে দেশের বৃহত্তম স্বার্থকে মাথায় রেখে আইন প্রণয়ন করে বর্তমানে যে রাজনৈতিক সংকট আছে সেটা থেকে উত্তরণের জন্য তাহলে সেটা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু এই যে নির্বাচনটা হচ্ছে এই নির্বাচনের ভিতর বাংলাদেশের অন্যতম বড় শক্তিগুলো অংশগ্রহণ করছে না। অনেক সময় সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে উল্লেখ

করা হয় যে ২০০৮ এর নির্বাচন যদি ভালো হয়ে থাকে সেই নির্বাচনে বিএনপি তো মাত্র ৩০ আসন পেয়েছিলো তাহলে তারা এমন বড় কি?

আসলে সেই আমলেও কিন্তু এটা সংসদীয় গণতন্ত্রের একটা বড় ভেলকি যে আপনি আসন কম পাবেন কিন্তু ভোটের অনুপাত আপনার অনেক বেশি। ওখানেও ৩২% এর মত বিএনপি ভোট পেয়েছিলো এবং অন্যান্য দল ৩৫/৩৬ শতাংশ হবেই। তার মানে হলো আপনি অন্য যদি সবাইকে বাদও দেন এ সময় কালে মনোভাবের পরিবর্তন যা হয়েছে সেটাও যদি বাদ দেন আপনি ন্যূনতম আকৃতি অংশ মানুষের ওপর মূলধারার রাজনৈতিক শক্তিকে আপনি নির্বাচনে আনতে পারলেন না। তারা আসলো না বা তারা নেই। এইটা যদি না থাকে কারণ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক বৈধতা থাকে এবং রাজনৈতিক বিতর্কের ভিতর দিয়ে কিন্তু এই সংসদ তখন সেই বৈধতা টাকে উন্মোচন করে। সেটা যদি না থাকে তাহলে আপনার অনেক কিছুই সমস্যা সমাধান করা মুশকিল হবে। তৃতীয় যেটা আসে সেটা হলো নৈতিক বৈধতা। এটা হলো আপনাকে বারবার বলতে হচ্ছে কোনোদিন কিন্তু ভোট ছাড়া ক্ষমতায় আসিনি তারমানে আপনি নৈতিক বিষয়টিকে আপনি বিবেচনার বাইরে ফেলতে পারছেন না। সেটা সত্য হোক মিথ্যা হোক এই বয়ানটাকে আপনার বলতে হয়েছে এবং বলতে কি আপনি ২০১৪ বা ১৮ উল্লেখ করেন না আপনি ২০০৮ উল্লেখ করেন বারবার তার মানে হলো যে আর যে সাধারণ নাগরিক আছে। যারা চলমান রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন না তারা আপনাকে কিন্তু খুব প্রশংসা করছে না। তারা মনে করছে ত্রুটিপূর্ণ একটি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এই নির্বাচনটা হচ্ছে। সেটার লক্ষণ আমাদের চারপাশেই দৃশ্যমান। এখন বিষয়টা হলো যদি রাজনৈতিক বৈধতা এবং নৈতিক বৈধতা না থাকে তাহলে আপনি শুধু সংবিধানিক বৈধতা দিয়ে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে আছে বা আগামি দিনে যে সম্ভাবনা গুলো আছে সেগুলোকে আপনি কিন্তু সমাধান করতে পারবেন না।

আমি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছি, বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা একটি অসার অবস্থায় চলে গেছে তাহলে সংকটের কারণে বিশেষ করে শরিয়া ভিত্তিক ব্যাংকগুলোতে। যখন আপনি ক্ষমতায় এসেছিলেন তার থেকে এখন এই ব্যাংকগুলোতে দেড়গুণ বেশি অনাদায় ঋণ এখন এগুলো সুবিধাভোগী কারা সেগুলো আমরা জানি এজন্য নির্বাচন যদি একটা হয় আমি নির্বাচন বলি না এটা সীমিত আকারে নির্বাচনের প্রক্রিয়া বা একটা বিশেষ নির্বাচন প্রক্রিয়া একটা মুভমেন্ট হিসেবে আসবে সেটা হলো যে আপনি কি পারবেন ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে। আপনার যদি বৈধতার সমস্যা থাকে তাহলে আপনি জবাবদিহিতা অন্যের থেকে আদায় করতে পারেন না কারণ আপনি দুর্বল থাকেন। তখন আপনাকে সমঝোতা করতে হয়।

আপনি লক্ষ্য করে দেখেন, ফলে জ্বালানি খাতে আমরা যে টাকা দিয়ে যাচ্ছি ক্যাপাসিটি চার্জ। সেটা কি আমরা বন্ধ করতে পারবো? পারবো না। কারণ ওই সত্যিই কিন্তু আপনাকে বর্তমানে রাজনৈতিক বৈধতা আনার ক্ষেত্রে সমর্থন দেবে অর্থায়ন করবে। তারাই নির্বাচনে দাঁড়াবে আপনি কি একই সাথে কখনো পারবেন এই যে চার টাকার জিনিস ৪০০ টাকায় কিনছে এই সরকারি প্রকল্প এগুলোকে প্রতিযোগিতা ভাবে করতে পারবেন? পারবেন না। কারণ আপনি সুবিধা তার নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে ব্যক্তিকে সেগুলোকে আপনি মোকাবিলা করার জন্য নির্বাচন দিয়ে আসতে পারবেন? বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে নেওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি, আইনের শাসন বা গুণগত সুশাসন দরকার এগুলোই তো পারবেন না। সে জন্য আমি বলছি রাজনৈতিক এবং নৈতিক বৈধতা না থাকলেও আপনি সাংবিধানের বৈধতা পেলেও কার্যকর ভাবে বাংলাদেশের সমস্যা সমাধান করার সম্ভাবনা কে বাস্তবায়ন করার জন্য আপনি কার্যকর নাও হতে পারেন।

সঞ্চালক: ২০১৪-এর পরেও আগেও এ সংকটগুলো কথা আপনারা বলেছেন আসো কোনো গুলোর কথা আপনারা বলেছেন ১৮ এর আগেও বলেছেন এখন ২৪ এর আগেও বলছেন কিন্তু ট্রেডিশনালে দেখা গেছে যে ওই ধরনের ক্রান্তিকালের পরে সরকার যখন নির্বাচনটা করে, করার পর পুনরায় সংকটগুলো কাটানোর চেষ্টা করে। একটা বিপর্যয়ের কথা আশঙ্কা করা হয় যে অনেক সংকট তৈরি হবে কিন্তু আস্তে আস্তে সেগুলো কেটে যাবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন কোনোটা বিপর্যয়ের কোনোটা বিপদ এখানে ব্যাখ্যার ব্যাপার আছে। আপনি কি মনে করেন ২০১৪ এর পরের থেকে বা ২০১৮ এর পরের থেকে আমার বিশ্লেষণ হলো ২০১৩ এর পরের থেকে সেটা হলো এ সরকার যতখানি অর্থনৈতিক অগ্রগমনের জন্য যে শক্তি ছিল সেটা ন্যায্যভাবে ন্যায়পরায়ণভাবে গরিব মানুষের পক্ষে পেছনে থাকা মানুষের পক্ষে পেরেছে? আপনি দেখুন, বর্তমান অর্থনীতির পরিস্থিতি যেটা হয়েছে এ সময়কালে সবাই ব্যাংক নিয়ে চিন্তিত সবাই মূল্যস্ফীতি নিয়ে চিন্তিত। এমনকি সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে নিরাপত্তা এবং দুর্ভিক্ষের কথা বলা হচ্ছে। অর্থনীতিটা যে একটা স্থিতিশীল অবস্থায় নেই সেটা তো এখন সকলেই স্বীকার করে।

সঞ্চালক: এটাতে আমি একমত হবো না কারণ আমাদের এখানে যে ডিভাইসে মাইন্ড সেট আপনি হয়তো বলছেন যে সংকটটা যেভাবে আপনি দেখছেন। আপনি সরকারি দলের কোনো নেতাকে জিজ্ঞাসা করেন

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না। আপনি এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের কথা শুনেন যিনি সবচেয়ে আমলাদের ভিতরে একজন শক্তিশালী সরকারের পক্ষের মানুষ। উনি বলছেন

আমি এত সমস্যা কখনো আগে দেখিনি। আপনি বলছেন নির্বাচনের পরে এসব ঠিক করা হবে। আইএমএফ এর সাথে আলাপ আলোচনার ভেতরে যে মূল্যায়ন গুলো এসেছে টাকার মূল্যমান ধরে রাখার ব্যাপারে সুদের হার ধরে রাখার ব্যাপারে নমনীয় করার ব্যাপারে বা মূল্য স্থিতি করার ব্যাপারে সেগুলো পড়লেই বুঝবেন। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমতের জায়গায় নেই।

সঞ্চালক: কিন্তু রিজার্ভ একটু বেড়েছে তো

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অর্থনীতিতে কখনো কোনো একক ভালো বা একক খারাপ হয় না এটার ভালো মন্দ দুই দিকেই থাকে সবসময়। আপনি রেজাল্ট বেরিয়ে টাকাটা আনলেন এখন সে টাকাটা তো আপনার এখন শোধ দিতে হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা আপনার কাছে নেই। প্রকল্প গুলো তো বাস্তবায়ন হচ্ছে না। বুঝতে পারছ না আমার মনে হয় অর্থনীতি একটা সমস্যার সংকুল অবস্থার ভিতরে আছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এত বড় কারণ হলো এরকম হওয়ার কথা ছিল না। কথা ছিল না এ কারণে সময় যে সংস্কারগুলো কথা ছিল সেই সংস্কারগুলো সরকার করতে পারেনি কারণ হলো নৈতিক বা রাজনৈতিক বৈধতার না থাকার কারণে কায়েমি অর্থের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। প্রত্যেকটা চায়ের দোকানে যে মানুষটার নাম উচ্চারিত হয় বিরুদ্ধে আপনি কায়েমের ব্যবস্থা নিতে পারেন না।

সঞ্চালক: কিন্তু আপনি যখন দেখেন যে আইএমএফ তাদেরকে স্কোর অফ কন্ডিশন দিয়েছে লোন অ্যাপ্রুভ করার জন্য। কয়েকটা মিনিট অবস্থায় থাকার পরেও কিন্তু দিতেও কি চিঠি পাওয়া যায়। অনেকে তো বলেছে যে আই এম এফ কিস্তি দিবে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আইএমএফ এর যে দুটো বড় শর্ত পূরণ হয়নি একটা হলো মধুদের হিসাব আরেকটা হলো আইন। সেই ক্ষেত্রে বুঝার ব্যাপার আছে বড় প্রেক্ষাপটে এবং ছোট প্রেক্ষাপটে। পৃথিবীতে আর যদি দশটা দেশ সংকট হয়েছে তার তুলনায় কি বাংলাদেশ আরও বেশি সংকটে আছে? সম্ভবত না। সেক্ষেত্রে আইএফএফের সাথে অন্য দেশের সাথে যে ধরনের আচরণ হয় সচেতন রাখতে চেয়েছে সেও তো রাজনৈতিক আচরণ করতে চায়নি। যদিও তার সবচেয়ে বড় অংশীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্য কোনোভাবে থাকতেও পারতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কি হয়েছে? তৃতীয় কিস্তিতে কি হবে সেটা দেখার বিষয়। কিন্তু এটার ফলে যে কাঠামোগত সমস্যা গুলো আছে, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের সমস্যা। সেখানে আপনার দ্বিপাক্ষিক স্বল্প মেয়াদী ও বিভিন্ন ধরনের ঋণ বেড়ে গেছে। মাথাপিছু দায়দেনা দুই গুণ হয়ে গেছে। আমের আগেও বলেছি ঘি খাচ্ছে একজন কিন্তু শোধ দিতে হবে আর একজনের।

সঞ্চালক: কিন্তু ফিন্যান্স ডিভিশন থেকে যে টাকা ধারনা হয়েছে সেগুলো কিস্তি তারা সেতু বিভাগকে দেখলাম কয়দিন আগে এসব করেছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: একটা অর্থনীতি বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সম্ভাবনা থাকে বিভিন্ন কাজ আমরা যা করি সেটা সামগ্রিক বিচারে কোথায় এসে হবে। আপনি হয়তো পদ্ম প্রকল্পের টাকা শোধ করতে চাচ্ছেন অভ্যন্তরে উৎস থেকে তার মানে হলো আপনার সীমিত অর্থ থাকার কারণে আপনি বার্ষিক উন্নয়নে কর্মসূচি করার কথা ছিল সেটা করতে পারছেন না। এগুলো গ্রামের ছেলেমেয়েদের চিকিৎসা শিক্ষা এগুলো ক্ষেত্রে হবে। আপনি সামাজিক সুরক্ষার জন্য যে টাকা দেওয়ার কথা বলেছিলেন যেটাকে আপনি কয়েক বছর ধরে সম্প্রসারণ করতে পারছেন না তাদের টাকার পরিমাণ আপনি বাড়াতে পারছেন না দেখতে পাচ্ছেন তো ঘোষিত নীতির ক্ষেত্রে উনার সীমাবদ্ধতা চলে আসছে। তার চেয়েও বড় কথা রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে ভঙ্গুর বা সংবেদনশীল বিষয়টি। আপনি তো বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। ইউক্রেনের উদ্যোগে তো আপনি এটা ব্যাখ্যা করতে পারবেন না এটা খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে যে বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে তথ্য লাগে যে রাজনৈতিক শক্তি লাগে, যে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি লাগে এবং সবচেয়ে বড় হলো রাজনৈতিক শক্তি নাই। আপনি অনেক সিন্ডিকেটওয়ালাদের কোনো বড় ব্যবস্থা নিতে পারেন না। কারণ হলো তারা আপনার রাজনৈতিক মিত্র। বৈধতার অভাবে আপনি শক্তিশালী পদক্ষেপে যেতে পারেন না তখন এই রাজনৈতিক শক্তিকে সব সম্প্রদায়ের সাথে সংশোধন করতে হচ্ছে এটা হয়তো মৌলিকভাবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মানুষ। এটা খুব ঈর্ষণীয় একটা পরিস্থিতি না।

সঞ্চালক: আপনি সাংবিধানিক রাজনৈতিক এবং নৈতিক বৈধতা নিয়ে কথা বললেন জবাবদিহিতা সংকট কিভাবে তৈরি হতে পারে এ নিয়ে বিশ্লেষণ দিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের যে বাস্তবতা এখানে একটি পক্ষ কিন্তু তাদের কারণ দেখিয়ে তারা নির্বাচন থেকে দ্বিতীয়বারের মতো তারা বাইরে রয়ে গেল এবং সেই নির্বাচনটিও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে নানাভাবে। এখন এই রাজনৈতিক সংকটে যে জবাবদিহিতার কথা বলেন সেখানে আরো বড় ক্রাইসিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে অনেকে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অনেকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্তমানে পরিস্থিতিতে বিশ্লেষণ করতে চান বিশ্লেষণের উৎস বিন্দু হলো নির্বাচন এবং নির্বাচন কিভাবে হচ্ছে এবং কিভাবে হচ্ছে না। আসলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বায়েটার ধারাবাহিকতার সাথে আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের সম্পর্কটা দেখতে হলে আরো বড় কাঠামোর মধ্যে দেখতে হবে।বড় কাঠামোটা হলো এত সময়ের পরে একটা টেকসই জনসমর্থন পূর্ণ একটা নির্বাচনের প্রক্রিয়া আমরা দাঁড় করাতে পারি নাই। এটা একটা রাজনৈতিক ব্যর্থতা আমাদের জন্য। মানে প্রতি পাঁচ

বছর পর পর এরকম একটা ভির্মি খাওয়ার মত অবস্থা হবে, প্রতিটা শাসকগোষ্ঠী মনে করবে তারা ক্ষমতা ছাড়লে পরে এক রাতের মধ্যে তাদের মেরে ফেলবে এটা কোনো সভ্য মধ্যে আয়ের দেশে সম্ভব না। আফ্রিকাতে যে সমস্ত সংকটাপন্ন দেশ আছে, যুদ্ধ করে সম্পদ নিয়ে মারামারি করে তাদের সাথে মানায়।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যের ইতিহাস এবং আমাদের অগ্রগতির সাথে এটা সম্পূর্ণ মানায় না। এই জায়গাটাতে চিন্তা করতে হবে। এটা শুধু নির্বাচনের ব্যাপার না। আমাদের রাজনৈতিক কাঠামো আছে এটা নিয়ে আমাদের নতুন করে চিন্তা করতে হবে। একটা নতুন রাজনৈতিক নিষ্পত্তি লাগবে অনেকে জিজ্ঞেস করে রাজনৈতিক নিষ্পত্তি কি জিনিস। ইংরেজিতে আমরা বলি পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট। যারা বাংলাদেশের অগ্রগতির সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী তারা তাদের ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টকভাবে, দেশের পক্ষে রেখে কিভাবে অর্জন করবে তাদের উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো রাজনৈতিক উচ্চবর্গের এবং একইসাথে সমাজের অর্থনৈতিক উচ্চবর্গের ভিতরে বিভেদ একসময় ছিল সে বিভেদটা চলে গেছে। যার ফলে রাজনীতিবিদরা ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীরা রাজনীতিবিদ হয়ে গেছে। যে যার গোষ্ঠী স্বার্থকে ঠিক মতন পালন করে না। যার ফলে আমাদের দেশের অগ্রমনের ক্ষেত্রে নতুন কোনো সম্মেলনটা হয় না। এর কারণে নাগরিক উচ্চবর্গরা এর মধ্যে কোনো নতুন ধরনের সমঝোতা খুঁজে পায় না।

সঞ্চালক: এখানে অন্য ইন্সটিটিউটগুলোর অবস্থা কি রকম?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অন্য ইন্সটিটিউটে যেটা হয়, যখন আপনি অস্তিত্বের সংগ্রামের ভিতরে থাকেন তখন আপনি রাজনৈতিক শক্তি ফেলে দিয়ে প্রশাসনিক শক্তির উপরে নির্ভরশীল হন। এটাই হলো বিভিন্ন কর্তৃত্ব পূর্ণ দেশের অভিজ্ঞতা। এর ফলে একদিকে নির্বাচন হবে অন্যদিকে বিরাজনীতি করন হবে। যে নির্বাচনটা হচ্ছে এটা কি রাজনীতি? সবাই বলবে এটা রাজনীতি না। এটা ভাগ বাটোয়ারা হচ্ছে, লোকজন দাঁড় করানো হচ্ছে, কাউকে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে, তথাকথিত রাজারানীর দল তৈরি করা হচ্ছে। সকলেই সকলের বুঝছো যে ফলাফলটা হবে সেটা আপনি আমি বুঝতে পারবেন কি হবে না হবে। আমরা বলি ইরর মার্জিন। রাজনীতি মানে হলো আপনি ইস্যু নিয়ে বিতর্ক করবেন। এই যে সরকার তুমি আমার জানা যাচ্ছে এবং যে প্রক্রিয়াতে বিরাজ নীতিকরণের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে এটাতো সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু তারা হলো।

দুটো উদাহরণ বলি, প্রথমটা তো বলে এসেছে রাজনৈতিক বৈধতা না থাকলে তারা এমন রাজনীতি উচ্চ গর্ভে তারা জিম্মি হয়ে গেছে কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাছে। নাম না। নাম আপনি আরী ভালো জানেন। তাদের নীতি প্রণয়ন এবং নীতি বাস্তবায়ন সংস্কারকে

নিয়ন্ত্রণ করছে। ব্যাংকের লাইসেন্স, করের হার থেকে ঋণখেলাপের সুদ মওকুফ পর্যন্ত সব তারা নিয়ন্ত্রণ করছে। সকালবেলা শ্রমিকদের বেতন বাড়াবেন না এবং বিকেল বেলা আপনি তাদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করছেন। তাহলে আপনি কোনো ব্যবস্থার ভিতরে ঢুকতে পারছেন না যে এদেরকে অতিক্রম করে মোকাবিলা করব। আরেকটা হলো আপনি কিন্তু শেষ বিচারে নিজে একটা রাজনৈতিক সংকটের ভিতরে ঢুকছেন। কারণ হলো আপনি রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিতরে এমন সব সত্যি শক্তি তৈরি করছেন। ওখানে তো ওয়াকিগার্ক বানালেন এখানে আপনি বুড়োক্রেসি দিয়ে এমন একটি উর্দি পরা এবং উর্দি পরাদের এমন স্বার্থ তৈরি করছেন যাতে আপনি চাইলেও ছাড়তে পারবেন না। এতে তাদের জীবনের ওপর একটা বিপর্যয় আসবে।

সঞ্চালক: তারা শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করছে না তারা অন্য স্টেইক হোল্ডারদের কেউ....

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তারা রাষ্ট্র যন্ত্রকে মোকাবিলা করছে তারা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে প্রতিযোগিতা করছে না। এজন্যই তো আমি বলছি পরিস্থিতি কিন্তু একটি শাসক তাদের জন্য চিন্তা হওয়া উচিত। আপনি বিভিন্ন দামে ক্যান্ডিডেট বানাচ্ছেন থেকে আরম্ভ করে এখন আপনি বিভিন্ন ধরনের সবাইকে জেলে নিয়ে যাচ্ছেন, জামিন দিচ্ছেন না, সুলতানকে না পেলে বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন এগুলো কোনো সভ্য দেশের মধ্যে আচরণবিধি হতে পারে না এবং আপনি এমন একটা বয়ান দিচ্ছেন নাশকতা এবং আগুন সন্ত্রাসের সেটা রেললাইন বলেন বা অন্য কিছু সেগুলো মানুষ খুব গ্রহণ করছে এটা আপনাকে বলবো না। কারণ বাসগুলো সবই পুরনো আমলের বাস যেগুলোয় আগুন জ্বলে। সেটাও একটা সমস্যা কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এরকম একটা প্রক্রিয়ার ভেতরে নৈতিক বৈধতা যদি না থাকে তখন আপনি বিরাজনীতিকরণের দিকে চলে যান। অর্থাৎ আপনি রাজনৈতিক দলের চেয়ে প্রশাসনের দলের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে যান। মানে আগামীকাল যদি আপনি ছেড়েও দিতে চান একটা বড় আলোকিত চিন্তার একটি নতুন সংলাপ সম্ভব হবে কিনা। এইদিকে ওলিগার্করা আছ্র আর ঐদিকে প্রশাসনের নতুন স্বার্থভোগীরা আছে।

সঞ্চালক: গত বছরগুলোতে বিএনপি চেষ্টা করেছে আগুন সন্ত্রাস করতে এভাবে তাদের লেভেলিং হয়েছে তারা যেভাবে কালার রয়েছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মাধ্যমে সেখান থেকে বিএনপি চেষ্টা করেছে তাদের নিজেদেরকে উত্তোলন করে বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ ধাপে ধাপে এগিয়ে আসার জন্য এখন আবার তাদের উপরে আসছে। বিএনপি বলেন আর অন্যরা বলেন তাদের সামনে আর কি কি পথ আছে বলে আপনি মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিএনপি তাদের সম্বন্ধে দুটো চরিত্রায়ন থেকে বের হতে চেয়েছে। একটি তারা তাদের সব কার্যক্রম থেকে তাদের দূরে রাখতে চেয়েছে। অপরদিকে তারা মৌলবাদী দলের সাথে যুক্ত এরকম রাজনৈতিক ব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে সেটা কিন্তু তারা সামর্থ্য হয়েছে আপনি দেখেছেন ২০ দলীয় জোট ভেঙ্গে গেছে। তারপরে কি হলো? ২৮ তারিখ ওনারা বোকা হয়ে গেছেন। উনারা এত বড় জমায়েত করে সেটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে এটা তো তারা ভাবতে পারেনি। তার চেয়ে বড় কথা হলো এরপর আপনি যে পদক্ষেপ বলতে গেলেন অবরোধ এবং এখন বলছেন অসহযোগ মানে এগুলো কি বাস্তবসম্মত? হরতাল কি আপনি কার্যকর করতে পেরেছেন? মানুষ তো হাজার চাইলেও নিজে জীবনের বন্ধ রাখতে পারবে না। এরকম উপলব্ধি আমরা আশির দশক থেকে চাইলেও বের হয়ে এসেছিলাম। এগুলোকে কার্যকর করার জন্য রাস্তায় যে সাংগঠনিক শক্তি থাকে সংগঠনিক শক্তি আপনি দেখাতে পারেননি। তথাকথিত অবরুদ্ধ একটি হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই অসহযোগ যেটা দিয়েছে আমি মনে করি এটার কোনো কার্যকারিতা আছে। এটার বিপরীতে কিছু হলে অবশ্যই দৃশ্যমান জমায়েত লাগবে। এত বড় দল বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গাতে কোনো কর্মসূচি করতে পারবে বলে মনে হয় না। আর একটা জিনিস হলো বয়ানের প্রতিযোগিতায় ও তারা হেরে গেছে। নয়ন তারা আগুন দেয় নাই কিন্তু কথাগুলো খুব জোরে সোরে স্থাপন করতে পারছে?

বলবেন তাদের উপরে আমি অত্যাচার হচ্ছে যে সবাই চলে গেছে। কিছু নেতা বিদেশে আছে কারণে নেতা তো এখানে আছে। সেহেতু সাংগঠনিক শক্তি কোথাও তারা অব্যাহতভাবে দৃশ্যমান করতে পারেনি। কারণ এই সমস্ত যুদ্ধে অপতথ্য হলো সব থেকে বড় শক্তি। তারা অপতথ্য কে মোকাবিলা করতে পারছেন না তারা নতুন তথ্য দিতেও পারছে না। মানুষ ও সংবাদপত্র রা এক্ষেত্রে অনেক আগ্রহী ছিল। কিন্তু সেটা সরবরাহটা নেই। এক, জমায়েত, দুই, অপতথ্য নিয়ে মোকাবিলা, আপনাকে শেষ বিচারে বলতে হবে আপনি বিকল্প হিসেবে কি দিচ্ছেন আমাকে। আপনি যে আপনাকে সুশাসন দিবেন এটার কি নিশ্চয়তা আছে আপনারও তো একটা ইতিহাস আছে। ওই ইতিহাস কাটানোর জন্য আপনি তেইশ দফার কর্মসূচি তৈরি করলেন। আপনি কি দেখেছেন তাদের ২৩ দফা কর্মসূচি তাদের রাজনৈতিক বক্তব্যের ভিতরে কোনো জায়গায় সামনে এসেছে? এ কর্মসূচি তে আছে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ। এটা রাজনৈতিক নিষ্পত্তির একটা সমাধান হতে পারতো। তাহলে তারা অন্তরর্তীকালীন ছায়া হয়ে কাজ করতে পারতো। এই কথাও তারা ভালো করে প্রচার করেন নি। সেহেতু তাদের মেধা, বুদ্ধি, জনসম্প্রীতি...

সঞ্চালক: কৌশল হিসেবে কি এটা হতে পারে যে বিএনপিতে তাদের পরের ধাপের জন্য দ্বিকক্ষ সংসদ। কিন্তু তারা চলছে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবে এবং তারপর সব আলোচনা হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এমন কিছু কর্মসূচি লাগে যে কর্মসূচিতে তারা উদ্দীপনা পায়। বর্তমান পরিস্থিতির থেকে উন্নত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দেখে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটা আত্ম উপলব্ধির জায়গা থাকে। পুরনো রাজনীতি থেকে সে নতুন কি দিবে। আগের আমলের যে দুর্নীতি নিয়ে মূল্যায়ন নাই। ব্যাংক বাণিজ্য নিয়ে যে সমস্যা এগুলোর কোনো স্বীকারোক্তি করেন না। এমনকি নতুন যেটা করবেন সেটার ও প্রচার করেন না ঠিকমতো। মানুষতো ইস্যুতে জমায়েত হয় সেটা যে একটা ইস্যু যে কেন একটা নির্বাচন লাগবে এবং এই নির্বাচন নিয়ে যে আমি বললাম কষ্টটা কোথায় দেখেন, বর্তমান সরকারও এই নির্বাচন দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কারণ তারা পনেরো বছরে ছোট বড় মিলিয়ে যায় কাজ করেছিল তার কিন্তু কোনো ক্রেডিট নিতে পারল না।

সঞ্চালক: এখানে যে বুদ্ধি ভিত্তিক লড়াইয়ের কথা আপনি বলছেন। আপনি কিছুটা ইঙ্গিত করলেন পরিকল্পনার মধ্যে কি ছিল। জনগণ দেখছে তারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন তারা একটা অবজারভিং সিটে আছে। ড্রাইভিং সিট...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আসলেই কি ড্রাইভিং সিট আছে? সে তো খুব সোজাভাবে ড্রাইভ করছে না। যে সরকার কখনো সেনাবাহিনীকে আসতে দিতে যায় নাই ১৪ এবং ১৮ তে সেই সরকার সেই সরকার সেনাবাহিনী নামাচ্ছে নির্বাচনকে সুস্থ করার জন্য।

সঞ্চালক: নির্বাচন মাঠে আশঙ্কার জায়গাটা কোথায় মানে ধরে নিলাম বিএনপি একটা আপনি আর কি মনে করছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আর হলো সরকারি দলের ভিতরে যে তৎপরতা। ১৪ এর নির্বাচনে আপনি ১৫৩ ভোটের একটি পার্লামেন্ট বানিয়েছিলেন। পরে ২০১৮ তে আজকের ভোট আগে করে ফেলেছিলেন। তাহলে এবারের বৈশিষ্ট্য কি? এবারের বৈশিষ্ট্য হলো দামী ক্যান্ডিডেট বিদ্রোহী ক্যান্ডিডেট। এর ফলে আপনি চিন্তা করে দেখেন এরকম একটা রাজনৈতিক দলের গভীর বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে না ক্ষমতার প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে হচ্ছে এটা। তারা কেন ক্ষমতার প্রতিযোগিতা করবে না কারণ হলো তারা দেখেছে ওখানে যদি তাহলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের তাদের আবার অধিকার আসে শুধু তারাই এই রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে থাকবে। নাগরিকদের কোনো অধিকার

নাই। সে একটা মধ্যবর্তী অংশ হয়ে এগুলো করবে। সেজন্য সে এরকম জীবন পণ করে এমপি বা সংসদ সদস্য হতে চায় কেন সংসদ সদস্য হতে চায়? এটাই হলো বিষয় তাহলে দলের ভিতরে একটা গভীর ক্ষত বহুদিন ধরে সৃষ্টি হচ্ছে। ওই যে মাঝে মাঝে বলে না ওয়ান ইলেভেনে তারা কি করেছিল ঠিক এরকম একটি বিতর্কের উৎস বিন্দু হয়ে আগামী দিনে এটা থাকবে।

সঞ্চালক: বিরোধীদলের কী হতে পারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা তোর জাতীয় ঐক্যের একটা সংসদ হবে। সকলেই মন্ত্রী হয়ে যেতে পারে। তাতেও কোনো সমস্যা হবে না। একদলীয় শাসনের ঘটনা আমরা এর আগেও দেখেছি। আমি যেটা বলতে চাইছি এমন অবস্থায় যার জন্য আপনি জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন।রাষ্ট্রীয় সম্পদের অধিকার পাবেন বা খুব প্রান্তিক হয়ে যাবেন। এটা তো শুধু প্রতিযোগিতা না এটা খুনাখুনি মারামারি জীবন অবসান এগুলো হওয়া খুব একটা অস্বাভাবিক না।

সঞ্চালক: কিন্তু ইলেকশন কমিশনের উপরে একটি আস্থার সংকট ইস্যু ছিলো আছেও। তা স্বত্তেও ইলেকশন সাম্প্রতিকালে অনেক বয়ান দিচ্ছে। তারা অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন বদলির সিদ্ধান্তগুলো যেমন তারা ভোট বন্ধ করে দিবেন তারা কঠোর সিদ্ধান্ত নেবে ইত্যাদি অনেক কথা বলছো মনে হচ্ছে না তারা ভোট বন্ধ করার ব্যাপারে অনেক সিরিয়াস?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিষয়টা নির্বাচন প্রক্রিয়া না এটা মূলত একটি রাজনৈতিক সংকট। অনেকে এটা নির্বাচনী সংকট হিসেবে দেখে কিন্তু আমি এটাকে নির্বাচনী সংকট হিসেবে দেখিনা। এটা থাকবে এবং এ নির্বাচন হয়ে গেলে এই সংকট থাকবে। এই নির্বাচন হয়ে গেলে কি আপনি নিরাপদ বোধ করবেন? সাধারণ নাগরিক নিরাপদ বোধ করবে? সে কি চাইলেই একটা মামলা করতে পারবে? মামলাটা নিবে কিনা মামলাটা উপর থেকে অনুমোদন দেবে কিনা? সেই হলো বন্ধু দিনের ভিত্তিতে যে কোনো ক্ষমতাসীন মানুষকে কোনো বিচারের আওতায় আনা হবে? আসলে পরে সে শাস্তি পাবে? সেই শুনানি হবে না? এ অবস্থায় নাগরিক হিসেবেও আপনি বিপন্ন বোধ করেন। কারণ যখন ভালো রাজনৈতিক অংশগ্রহণমূলক প্রতিযোগিতা পূর্ণ থাকে তখন আপনি ভালো বোধ করেন। যে শিক্ষাগুলা পান ভালো শিক্ষা ভালো স্বাস্থ্য এগুলোকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দেশের...

সঞ্চালক: সেক্ষেত্রে যারা নির্বাচন করছে না আপনার কি মনে হয় এটা বাস্তবসম্মত? Getting on board? ১৮ তে কোনোভাবে এসেছেন ২৪ এও থাকছেন না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নাগরিকরা আমরা দুই দিকেই একটা অবস্থায় আছি। একদিকে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার ভেতরে রাজনৈতিক দল ঢুকে গেলো। আর বিরোধীদল বলে যারা আছে তারা এমন কোনো জমায়েত করে আমাদের মনোভাবকে সামনে নিয়ে আসতে পারলোনা যেটার ভিত্তিতে একটা প্রকাশিত আস্থা থাকে। দেখেন, উনারা বিরোধী দল নিয়ে যে কথাগুলো বলেন, সেই কথার সাথে ৭০% একমত হয়তো হবেন। কিন্তু কেউই ঝুঁকি নিয়ে তার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে না। তাদেরও এখানে একটা বৈধতার সংকট রয়ে গেছে। যদি তারা এই মানুষগুলোকে একটি দৃশ্যমান করে আনতে পারলো না। এই জিনিসটা আপনার বুঝার ব্যাপার সেহেতু একটা সংকট থাকে। এটা নিয়ে একটা উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে যাওয়ার জন্য চেষ্টা লাগে সেটা আপনি পারবেন না। সবচেয়ে বড় কথা জায়গাটা হবে যুব সমাজ। যুব সমাজের দরজা যারা তিন কোটি চার কোটি ভোট দিতে পারল না তারা আবার বিদেশে চলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। আমরা জড়িয়ে পড়েছি তারা যদি এক নম্বর চায় তারা কথা বলার অধিকার চায়। দুই নম্বর হলো তারা দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করতে চায়। তিন নম্বরে এসে তারা চাকরির কথা বলে কারণ তারা বুঝে গেছে চাকরি পাওয়াটা, ঘুষ দেওয়াটা এটার কারণ হলো তার স্বজনপ্রীতি দুর্নীতির কারণে। স্বজনপ্রীতি দুর্নীতি হচ্ছে কারণ প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি নাই। ব্যবসায় দিন বুঝার কথা প্রতিযোগিতা পূর্ণ রাজনীতি না থাকলে প্রতিযোগিতা পূর্ণ অর্থনীতি হবে না।

সঞ্চালক: ভোটের টার্ন আউট নিয়ে কি চিন্তা আপনার?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি বলতে পারবো না এটার ভিত্তিতে। আমি মনে করি যে সরকারি দল একটা পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং টিকে থাকার জন্য যারা স্থানীয়ভাবে বিরোধী রাজনীতি তারাও হয়তো কারো না কারো কিছু না কিছু দাঁড়াবে। কিছু কিছু হয়তো পালিয়ে যাবে এগুলোর ভিতর একটা থাকবে।

সঞ্চালক: রমেশচন্দ্র সেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলী সদস্য উনি বলছিলেন সামাজিক সুরক্ষা থেকে বের করে দেওয়ার কথা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মনোভাবের দিক থেকে বলছি উনি একজন প্রবীন নেতা। পিছিয়ে পড়া আদিবাসি মানুষদের নিয়ে আলোচনা করার জন্য উনার সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে মিটিং করেছি তিন চার দিন আগে সেহেতু উনাকে সম্মান রেখেই বলছি। সেটা হলো রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা ওই জবাবদিহিতা জায়গাটা ভুলে গেছি। আপনি ঐ লোকগুলোকে দিয়েছেন

এটার জন্য দেন নাই যে সে আপনার খুব কাছের মানুষ এবং আপনাকে ভোট দেবে বলে আপনি ওনাদের দিয়েছেন কারণ ওনারা একটা নির্দিষ্ট বিপন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ। সেই যৌক্তিকতা থেকে আপনি দিয়েছেন। এরা নাগরিক ও সাংবিধানিক অধিকারের অংশ। ভোট না দিলে এই সত্য ভাষণ নৈতিক ভাষণ না। আমি একটু আগে যে বললাম নাগরিকরা কেন বিপন্ন হচ্ছে কারণ তার মৌলিক অধিকার গুলো স্বাধীনতা সংগ্রাম করে মৌলিক অধিকার সংগ্রাম করে তারা যে জায়গাটা করেছিল সেটা তো বিপন্ন। এখন ভোট ও ভাতের সাথে নতুন প্রত্যয় দিতে হবে। ভোট, ভাত এবং নিরাপত্তা। নিরাপত্তাটা এখন অনেক মানুষের জন্য একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সঞ্চালক: বিএনপির একটাই দাবি, তারা একটি নির্বাচন চায় যেটা এই সরকারের অধীনে নয়। নাগরিক সমাজের মধ্যে থেকে অনেক কথা বলার অনেক কিছু চিন্তা করেন। What is your recipe?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এরশাদ সাহেবের ৮৮ এর নির্বাচন যখন হলো না এবং সকলে বয়কট করলো। এরপরে যে তিন দলেও রূপরেখা এটা কারা তৈরি করেছিল এটা পেশাজীবীদের দ্বারা তৈরি হয়েছে। ইতিহাস তো সকলের জানার কথা কেমন করে শাহাবুদ্দিন ভাইকে নিয়ে এসে মওদুদ ভাইকে পদত্যাগ করিয়া তার জায়গায় বসিয়ে নির্বাচন করা হলো। এই আলোচনা কই থেকে এসেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যেটার জন্য নেত্রী জীবন দিয়েছেন এবং তাএ ফলশ্রুতিতে নির্বাচন করে জয়ী হয়েছেন। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইনআনুগ ব্যাখ্যা কই থেকে এসেছে? এইবারো বিএনপি আওয়ামী লীগের সেটাকে আমলে নেয়নি। এটা বর্তমান সংবিধানের আলোকেও সুযোগ ছিল। বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যার মাধ্যমে একটা অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনী সরকার তৈরি করা যেটার অধীনে নির্বাচনের ভিতর যেতে পারতাম। সেহেতু সমাধান ছিলো না এবং নাগরিক সমাজ আপনাকে বলে নাই যে ইতিহাস আপনাকে স্বাক্ষী দেবে না।

দুঃখের জায়গা হলো দুই দলই বিষয়টাকে এমনভাবে ফ্রেমিং করেছে যেখানে আর কোনো সমাধানের জায়গা দেখলো না। রাজনীতি হলো আর্ট অফ ফিজিবল। যেটা সম্ভাব্য সেটা ধরে আগাতে হয়। তাহলে উনিও যান নাই এটা অগ্রহনমূলক হোক না বা আরেকজনও চান নাই এটা অংশগ্রহণমূলক হোক। মধ্য থেকে সাধারণ নাগরিকরা সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটা তো হওয়ার কথা ছিল না বইয়ের সমাধান আগামী দিনে আনতে হবে। আমি শুধু একটাই কথা বলি, পৃথিবীর ইতিহাস বলে যদি ব্যাপক সংখ্যক মানুষ কিছু না চায় সেটা দীর্ঘমেয়াদি টিকিয়ে রাখা যায় না। বাংলাদেশের ইতিহাসও তাই বলে। বাংলাদেশের মানুষ যখন প্রবলভাবে কিছু চেয়েছে তখন সেটা আনতে পেরেছে। তারপরে রাখতে পেরেছে বা ঠকে গেছে কিনা এটা নিয়ে কথা আছে। এরকম একটা দ্বন্দ্ব নিয়ে

একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা একটা সমাজব্যবস্থা। এই ওজন নিয়ে বেশি দূর উত্থান করা যাবে না আর আমাদের তো আরো উপরে উঠতে হবে। বাংলাদেশ আরও উপরে যাবে সেই বিশ্বাস আমার আছে।

সঞ্চালক: ধন্যবাদ ডক্টর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসে আপনার মূল্যবান মতামত আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। প্রিয় দর্শক আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করব নিশ্চয়ই দ্বন্দ্ব সংঘাত আছে। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে ভবিষ্যতের পথে আমাদের এগোবার সৃষ্টিশীল চিন্তা করতে হবে। যতই ঝুঁকি থাকুক সেই ঝুঁকি গুলোকে অতিক্রম করে বিবাদমান গোষ্ঠীগুলো সুবুদ্ধি ও সদিচ্ছার পথে এগোবে এই আশাবাদ এবং নির্বাচনের যে পথ তৈরি করছে সরকার সেটা কোথায় দিয়ে শেষ হয় এবং রাজনীতির যে আর্ট অফ কম্প্রোমাইজের কথা বলা হচ্ছে, এটাই সকলে মিলে যায় শান্তিপূর্ণমূলক সাধারণ মানুষ এখানে স্বস্তিবোধ করে নিরাপত্তার কোনো ঘাটতি না হয়। অর্থনীতি যাতে বিনীত না হয় সেসব চিন্তা নিয়ে সমাধানের পথ হয় তো আগামী দিনে বাংলাদেশ খুঁজে পাবে সেই আশাবাদ রেখে আজকের আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে পরের অনুষ্ঠানে।

এই সময়, এনটিভি
সঞ্চালনায়: জহিরুল আলম
২০ ডিসেম্বর, ২০২৩

নির্বাচন শব্দটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমার একটু দ্বিধা আছে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সবাইকে সুপ্রভাত। জিল্লুর এবং সিজিএসকে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি প্রথমেই বলতে চাচ্ছি সম্প্রতি ইউরোপে একটি বড় দেশ একটি ছোট দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকেছে এবং সেখানে উনারা বলছে এটা যুদ্ধ না, এটা আগ্রাসন না এটা স্পেশাল মিলিটারি অপারেশন বা বিশেষ সামরিক তৎপরতা। আমি মনে করি বাংলাদেশের নির্বাচনটা আপনারা অনেকে নির্বাচন বলছেন আমি বলবো এটা বিশেষ নির্বাচনী তৎপরতা। নির্বাচন শব্দটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমার একটু দ্বিধা আছে।

আমি আজকে এ আলোচনা যেটা হচ্ছে সেখানে আমি মূলত তিনটি ছোট ছোট বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। এক নাম্বার হলো সমস্যাটার উৎস কী? সমস্যাটার চরিত্রটা কি এটা আমার বোঝার ব্যাপার। দুই নাম্বার হলো এ সমস্যার তাৎপর্য কী? এ সমস্যা যদি অব্যহত থাকে এর ফলাফলটা কী? তৃতীয়ত, এটা থেকে সমাধান বলি না আমি নিরসনের কোনো পথ আছে কিনা।

প্রথম যেটা হয়েছে ক্রান্তিকাল শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে ঠিকই আছে। ইংরেজিতে এটা ট্রানজিশন বলে, বাংলা আরো হতে পারে উত্তরণ বা উত্তরণকালীন হতে পারে। তো উত্তরণ হতে হলে আমাদের অর্থনীতির ভাষায় লোয়ার ইকুইলিব্রিয়াম থেকে হায়ার ইকুইলিব্রিয়ামে যাওয়াটা হলো বিষয়। অর্থাৎ, নিম্নস্তরে যে ভারসাম্য আছে এটা থেকে অতিক্রম করে উচ্চস্তরে আমার যেতে হবে। এটিই হলো উত্তরণ। তাহলে এ উত্তরণের ক্ষেত্রে আমাদের যে পথ রেখাটা হবে তার জন্য দরকার প্রথমেই আমাদের বোঝা যে আসলে এ সমস্যার

উৎসটা কি, পয়েন্ট অফ ডিপার্চার ইংরেজিতে যেটাকে বলে। অর্থাৎ, উৎসবিন্দুটা আমার বের করতে হবে। উৎসবিন্দুটা আমার সাধারণ বুদ্ধিতে হলো যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভেতরে যদি বৈধতার সংকট দেখা দেয় তাহলে এই রাষ্ট্র কাঠামো ঠিকমত কাজ করতে পারে না। বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে দুটি বড় বড় নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা সাংবিধানিক বৈধতা রক্ষা করেছি কিন্তু আমরা রাজনৈতিক বৈধতা রাখতে পারিনি। অনেকে বলেন শুনেছি আমি উচ্চ পর্যায় থেকে যে ২০০৮ এর নির্বাচনে বিরোধী শক্তি মাত্র ২৯টি আসন পেয়েছিলো। তাহলে তাদের সে অর্থে বড় কোনো বিষয় না উনাদের মনোভাব। উনারা যেটা দেখেন না সেটা হলো সংসদীয় গণতন্ত্রে আপনার আসন সংখ্যা দেখার সাথে সাথে ভোটের সংখ্যাটাও দেখার বিষয় আছে এবং সেটা ৩২ শতাংশের উপরে ছিলো বিরোধী দলের প্রায় ৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ, আপনি যদি জনগণের এক তৃতীয়াংশকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় নির্বাচনী ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেন তাহলে সে নির্বাচনী ব্যবস্থার রাজনৈতিক বৈধতা আসে না।

আর দুই নাম্বার হলো এটার অংশ হিসেবে যে সমস্ত নাগরিক শক্তি এ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি করে তারা যদি এটাতে সন্তুষ্টি না পায়, বৃহত্তর মিডিয়াসহ আমাদের সাংবাদিকরা, পর্যবেক্ষকরা যদি সন্তুষ্টি না পায় তাহলে তার নৈতিক বৈধতা থাকে না। তাহলে আপনি সাংবিধানিক বৈধতা দেখেছেন কিন্তু আপনার রাজনৈতিক এবং নৈতিক বৈধতাতে বড় ধরনের ঘাটতি রয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, পলিটিকাল লেজিটিমিসি, অনেকে আবার বৈধতা শব্দটা লিগ্যালিটি করেছিলেন তাদের আমি বলতে চায় এটা লিগ্যালিটি নয়, ল্যাজিটিম্যাসি। এখন এ দুটোতে যদি ঘাটতি থাকে এর ফলাফলটা কি হয়? এর ফলাফলটা হয় এই যে দেশের ভেতরে প্রতিষ্ঠান থাকে, প্রক্রিয়া থাকে কিন্তু তার কোনো জবাবদিহিতা থাকেনা। যে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতাটা দরকার পরে একটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নাগরিকের প্রতি, ন্যায় এবং ন্যায্যতা, এখানে জাস্টিস এবং ফেয়ারনেস শব্দ দুটো হবে। এ দুটো দেয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যে সাংবিধানিক অঙ্গীকার সেটা সে দিতে পারে না। এই ন্যায় এবং ন্যায্যতা না পাবার কারণে, জবাবদিহিতা না থাকার কারণে রাষ্ট্রের দক্ষতা কমে যায়, রাষ্ট্রের কার্যকারিতা কমে যায়, রাষ্ট্রের ঐ উত্তরণকালীন সক্ষমতা কমে যায়।

উত্তরণের সমস্যার ব্যাপারে আমি আসছি। এটার সাথে সাথে যেটা আসে সেটা হলো রাষ্ট্রযন্ত্র একচেটিয়াভাবে রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগ করতে পারে। অর্থাৎ, দ্যা মনোপলি এক্সারসাইজ অফ স্টেট পাওয়ারের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, কোনো জবাবদিহিতার জায়গাটা থাকে না। রাষ্ট্রের শক্তির একতরফা এবং একচেটিয়া প্রয়োগ হয়। এটা হলো সমস্যার মূলটা আমি দেখছি। এর তাৎপর্যটা কী? তাৎপর্যটা হচ্ছে বাংলাদেশে যে বায়ান্ন

বছরে আমাদের অগ্রগমন এবং অগ্রগমন তো হয়েছে এটা কেউ অস্বীকার করবে না। বাংলাদেশে এ মুহূর্তে এমনকি দেড় দশকে আমরা যে ধরনের বড় বড় কিছু মাইলস্টোন আমরা পার করে এসেছি এটা কে অস্বীকার করে?

এই যে আমার সাদাকালোতে জীবন দেখার বয়ান, এটা একটা ভুল বয়ান। পৃথিবীতে ঈশ্বর আমাদের সাদা এবং কালোর বাইরে অনেক রঙ দিয়েছেন, এ রঙগুলোকে এগুলোর সাথে মিশিয়ে দেখতে হবে। ওটার ভেতরে ছায়া থাকে, উপছায়া থাকে এটা বুঝতে হবে। লালও থাকে, সবুজও থাকে, নীলও আছে। তো অনেক রঙের পরিচয় যদি আপনি পাবেন তাহলে বাংলাদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাথাপিছু আয় ইত্যাদি আছে। আমাদের প্রবৃদ্ধির হার নিয়ে আমাদের সংশয় আছে কিন্তু প্রবৃদ্ধি হয়েছে এটা কেউ অস্বীকার করবে না। আমাদের মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত হিসাব দেয়া হয় তাতে আমাদের সংশয় আছে, কিন্তু তা বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন হয়েছে তা কেউ অস্বীকার করবে না। বিষয়টা অন্য জায়গায়। সেটা আবার ন্যায় এবং ন্যায্যতার বিষয়। সেটা হলো সকলের কি সমানভাবে হয়েছে?

উল্লেখ করলেন যে এ মুহূর্তে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন তাদের শত শত গুণ কাঁচা টাকা ঘরের ভেতরে। উনারা ব্যাংকেও রাখেন না লক্ষ্য করে দেখেন। তাহলে এ টাকার সাথে আন্দোলন করে যে শপথনামা বা হলফনামা এনেছি তাহলে সেখানে তো একটি বড় ঘাটতি রয়েছে। সেটা হলো উনাদের আয়করের হিসাব কেনো থাকবে না? উনাদের শুধুমাত্র ব্যাংকের খেলাফির টাকা আমরা নিবো, কর খেলাফি ইত্যাদি। আমার মনে হয় এটা আমাদের নাগরিক সমাজের চিন্তা করে উচিত। আমরা এটা আমাদের চোখের সামনে দেখছি, যারা জনগণের প্রতিনিধি হবে তাদের মধ্যে এটা দেখছি। কিন্তু এর জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র কোনো পদক্ষেপ নিলো না। এ মানুষগুলো আমাদের প্রতিনিধি হয়ে যে আমাকে ন্যায় এবং ন্যায্যতা দিবে এটা কিভাবে বিশ্বাস করি? এটা আমাকে কিভাবে বিশ্বাস করতে বলেন?

এই রাজনৈতিক সংকট যদি আমি সমাধান করতে না পারি, এ বৈধতার এবং জবাবদিহিতার সংকট যদি আমি সমাধান করতে না পার আমি যে শুধু একটা কার্যকর রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারবো যেটার ভেতরে আমার মানুষেরা সুষম উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে যেতে পারবে সেটি বড় ধরনের হুমকির মুখে পড়বে। দেখুন বাংলাদেশ নিম্ন মধ্য আয়ের দেশে আছে। আমি যেতে চাই উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে। উচ্চ মধ্য আয়ের দেশে যেতে হলে যদি প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি ঠিক না থাকে, যদি আমার বিচারব্যবস্থা কার্যকরভাবে সব নাগরিককে সমান ভাবে ন্যায় না দেয়, যদি আমার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সকলকে সুষমভাবে

উন্নয়নের সুযোগ না করে দিতে পারে, যেভাবে বৈষম্য বেড়েছে, যেভাবে প্রান্তিকীকরণ বাড়ে যদি সেটা অব্যহত থাকে তাহলে আমি কোথায় যাবো? আমি অর্থনীতির দিক থেকেই বলি যে, যদি আপনি বিদেশে রপ্তানি করেন এবং সে রপ্তানিকারক পণ্যের উৎস সম্পর্কে যে সার্টিফিকেট পাবেন তার জন্য বিশ্বাসযোগ্যতা যদি না থাকে তাহলে কিভাবে আমি পরবর্তী ধাপে রপ্তানি সম্প্রসারণ করবো? আমি যদি আমার এখানে মেধাস্বত্ব আইনকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে না পারি সেখানে আমি পরবর্তী ধাপে কি বিদেশি বিনিয়োগ, কিভাবে এখানে আনবো। যদি আমি দুর্নীতি সমাধান না করতে পারি তাহলে কেমন করে সম্ভব হবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের দক্ষতা, বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি?

আমরা অর্থনীতিবিদরা বুঝি এটা যেটা অন্যেরা বুঝতে চাননা সেটা হলো রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে যে বৈপরীত্যের ভেতরে দেখেন এটা দেখার সুযোগ নেই, এটা একটার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং তৃতীয় যে অংশটি জড়িত হয়েছে সেটি হলো বৈশ্বিক সম্পর্ক। এ বৈশ্বিক সম্পর্ক শুধু বাজার না, বিনিয়োগ না, এ সম্পর্ক আমার আন্তর্জাতিক শান্তিবাহিনী পর্যন্ত প্রলম্বিত। এ বৈশ্বিক সম্পর্ককে যদি এই রাজনীতি, এই অর্থনীতির সাথে আমরা মিলিয়ে না দাড় করাতে পারি সুষ্ঠুভাবে তাহলে তা বাংলাদেশের যে পরবর্তী ধাপে যাবার সমূহ সম্ভাবনা আছে সেটাকে আমরা কিন্তু ব্যর্থ করে দিতে পারি।

এবার আমি যেটা বলবো যে নিরসনের পথ কোনো আছে কিনা। অনেকে আপনারা নিরসনের পথ এখানে দেখেন। পৃথিবীতে বাংলাদেশের এ ঘটনা প্রথমবার হয়নি। বাংলাদেশে এ ঘটনা আপনার ১৯৮৮ এর নির্বাচনের কথা আপনাদের মনে আছে। ১৯৮৮ সালের নির্বাচন এরকমভাবে করতে যেয়ে টেকানো সম্ভব হয়নি। আপনাদের ১৯৯৬ এর নির্বাচনের কথা মনে আছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রেই আপনারা দেখবেন ৯৬ এর নির্বাচন এর পরে একটা রাজনৈতিক সমঝোতা অর্থাৎ যেটাকে পলিটিকাল সেটেলমেন্ট বলে সে জায়গা আসে। সে রাজনৈতিক সমঝোতা যেটা এসেছিলো সেটা আমরা বাতিল করে দিয়েছি পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। এই সমঝোতার জায়গাটা আবার নতুনভাবে আনতে হবে যেখানে আমরা সকলে মিলে অংশগ্রহণ করে এর ভেতর দিয়ে দেশে একটি কার্যকর, অংশগ্রহণমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনী কাঠামো তৈরি করতে পারি। অনেকে প্রশ্ন করে কে করবে? আমি ভরসা রাখতে চাই রাজনীতিবিদদের উপর। যে রাজনীতিবিদরা দেশকে এতদূর নিয়ে এসেছেন তারা যদি উত্তরাধিকার নিয়ে আসতে চান, তারা যদি স্বরিত হতে চান আগামী দিনের ইতিহাসে তাহলে অবশ্যই তাদের প্রাজ্ঞ হতে হবে, তাদের এখানে আলোকিত হতে হবে এবং অনেক বেশি প্রশস্ত মনের জায়গা নিয়ে আসতে হবে।

আমি এ কথাটা বলে শেষ করতে চাচ্ছি যে, পৃথিবীর ইতিহাস মনে রাখে সে মানুষদের যারা সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে গুণগত পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে টেকসই পদক্ষেপ নিতে পারে। সেটা সবসময় পদ্মা ব্রিজ, টানেল দিয়ে হয়না, এর জন্য রাজনৈতিক আলোকিত পদক্ষেপ লাগে। আমি এখনো আশা করে বসে আছি এ পদক্ষেপটি বাংলাদেশের জাতি পাবে এবং এটা তারা ন্যায্যতা এবং ন্যায়ের অংশ হিসেবেই পাবে বলে আশা করি।

সিজিএস কর্তৃক আয়োজিত ‘ক্রান্তিকালে বাংলাদেশ: নির্বাচন, অর্থনীতি ও বহিঃসম্পর্ক’ শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকের বক্তব্যের অংশবিশেষ
২০ ডিসেম্বর, ২০২৩

ইতিহাসের কাছে নাগরিকদের দায় বেড়ে গেলো

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

যে যতবার নির্বাচন করেছে তার আয় গাণিতিকভাবে তত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। মানে বৃদ্ধির হারের সাথে নির্বাচনের অংশগ্রহণের বা নির্বাচিত হবার একটি ইতিবাচক সম্পর্ক। যে যতবার নির্বাচিত হয়েছে তারটা তত বেশি বেড়েছে। আপনারা এবার বোঝেন তাহলে কেনো সবাই নির্বাচিত হতে চায়, পাগল হয়ে গিয়েছে কেনো। কারণ রাষ্ট্রীয় সম্পদে অধিকার পাবার নাগরিক অধিকার আসছে ওই যে তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে ঢুকতে পারলে অ্যাকসেস টু স্টেট রিসোর্সেস এটাই হলো সবচেয়ে ভালো রাস্তা। আর আপনি যদি তার সাথে থাকতে পারেন তাহলে ভাগ-বাটোরাতে আপনি কিছু অংশ পাবেন, নাগরিক হিসেবে পাবেন না। আপনি ওই অংশের অংশ হিসেবে পাবেন। অর্থাৎ, পুরো রাষ্ট্রকে আপনি কিভাবে অধিকারহীন করে দিয়ে সংকীর্ণগোষ্ঠীকে আপনি অধিকার আর মালিকানা দিচ্ছেন। এই হলো নির্বাচনের এই চরিত্রের সবচেয়ে বড় কুফল। বহুত্ববাদহীন, প্রতিবাদহীন নির্বাচনের সবচেয়ে বড় কুফলের জায়গাটা।

এ ধরনের নির্বাচন আমরা আগেও দেখেছি। আমরা ৮৮ এর নির্বাচন দেখেছি, আমরা ৯৬ এর নির্বাচন দেখেছি। যেটা আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে নির্বাচন আসবে যাবে কিন্তু নির্বাচন যদি আমার মৌলিক রাজনৈতিক সমাধান দিতে না পারে তাহলে বহু মানুষের প্রভাবকে অস্বীকার করে সে নির্বাচনের ফলাফল টিকিয়ে রাখা কষ্ট হয়। বাংলাদেশের ইতিহাস এটিই বলে। আপনি সেটার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মৌলিক সমস্যার যে উৎস, গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার যে অভাব সেটা যদি সমাধান করতে না পারি তাহলে আগামী দিনে এ মুহূর্তে বাংলাদেশের অর্থনীতি যে জটিল থেকে জটিলতর অবস্থায় যাচ্ছে যেখানে শুধু আমার নিজের টাকা না, আমার বিদেশের টাকা আমি শোধ করতে পারছি না দেখে

আমার এখন জ্বালানি নিয়ে আসার সমস্যা দেখা দিচ্ছে, মূল্যস্ফীতি আগামী দিনে কি দাঁড়াবে সেটা বুঝে উঠতে পারছি না সেখানে একটা কঠিন রাষ্ট্র, একটা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র সেটাকে কিভাবে মোকাবিলা করবে সেই উৎকণ্ঠা আমাদের সকলের মধ্যে আছে। সেটার ভেতরে যখন আমরা ঢুকছি তখন আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের ভূমিকা আগের চেয়ে অনেক বাড়ে। মানে নির্বাচন আসবে যাবে কিন্তু দেশ তো থাকবে, মানুষ তো থাকবে। তাহলে এ মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব থাকে, সে দায়িত্বটা আমাদের অব্যহত রাখতে হবে এবং সেটা থেকেই আমি আপনাদের বলছি যে দেশের যা অবস্থা আপনারা বলেন নির্বাচন আমি বলি বিশেষ নির্বাচনী তৎপরতা। তো যেভাবেই আপনারা বলেন এটায় নির্বাচনী মতামত দেয়ার প্রয়োজন নেই এটা বাংলার মানুষ ভালো জানে। আমি মনে করি, আগামী দিনে প্রথাগত গণতান্ত্রিক কাঠামো যদি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে আপনার আমার ভূমিকা আগামী দিনে আরো বাড়াতে হবে। ইতিহাস বলে যে আগে থেকে অনেক বেশি বাড়বে। এটা মনে রাখতে হবে।

আমি যেটা শেষ করি এই বলে যে, ইতিহাসের কাছে গরীবদের দায় আরও বেড়ে গেলো, ইতিহাসের কাছে নাগরিকদের দায় বেড়ে গেলো। চুপ থাকার সময় এটা না। কেউ যদি মনে করি আমি চুপচাপ নিভৃতে নীরবে থাকবো, নিরাপদে আর ওই আটলান্টিকের পাশ থেকে কেউ এসে আমার দেশের সমস্যা সমাধান করে দিয়ে যাবে তার থেকে বোকা আর কেউ হতে পারে না। আমার দেশের সমস্যা আমার সমাধান করতে হবে এবং সেজন্য নীরব থাকবো, নিরাপদ থাকবো এবং কেউ আমার জন্য এসে কাজ করে দিয়ে যাবে এর থেকে ভ্রান্ত ধারণা আর হতে পারে না, আমি সেটা বিশ্বাস করিনা। সেজন্যই আজকে আমি এখানে এসেছি এবং এটিই শেষ না।

চ্যানেল আই নিউজে প্রচারিত
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩

প্রচণ্ড আস্থার সংকটের মধ্যে আছি

রওনক জাহান

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র সম্মাননীয় ফেলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. রওনক জাহান সমকাল-এর সঙ্গে কথা বলেছেন নতুন বছরে দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা নিয়ে। সেখানে উঠে এসেছে আগামী নির্বাচন, রাজনীতিতে বিভাজন, ভূরাজনীতির বিভিন্ন দিক। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শাহেরীন আরাফাত

আমরা একটি নতুন বছরে প্রবেশ করছি। একপক্ষ নির্বাচন করছে, অন্যপক্ষ সরকারের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলন করছে। সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আপনার মতামত জানতে চাইছি।

অনেক দিন ধরেই আমাদের দেশে এ রকম একটি রাজনৈতিক অবস্থান চলছে, যেখানে একপক্ষ নির্বাচন করছে, অপরপক্ষ সরকারের পদত্যাগ দাবি করছে। বহু বছর ধরে রাজনীতি আমাদের সমাজে একটা বিরাট বিভাজন ও সংঘাতময় পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে, যেখানে দুটি পক্ষ একদম বিপরীতমুখী রয়েছে। দুই পক্ষই সচেষ্ট কেমন করে প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে পারে।

স্বাধীনতার পর আমরা ভেবেছিলাম, এর আগের ২৫ বছরে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা রাষ্ট্রের চার মূল নীতি– গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা– বিষয়ে একটি জাতীয় মতৈক্য সৃষ্টি করতে পেরেছি। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক শাসকরা সেই জাতীয় মতৈক্য ভেঙে দিল।

১৯৯১ সালের পর যখন আমরা আবার গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করলাম, তখন ভেবেছিলাম দুটি প্রধান দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য থাকবে কিন্তু গণতন্ত্রের মূল বিষয়গুলো— যেমন নির্বাচনী ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হাতবদল, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবধিকার— এসব বিষয়ে সব দলের মধ্যে একটা মতৈক্য সৃষ্টি হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা প্রায় ৩০ বছরে এটি করতে পারেনি। দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের প্রতিবেশী সব দেশেই নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে সব পক্ষের মধ্যে মতৈক্য আছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে নেই। তারা সবাই নির্বাচন করতে পারছে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল হচ্ছে। কিন্তু ২০০৮ সালের পর থেকে আমরা একটা সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে পারিনি। আমরা এখন পর্যন্ত একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারিনি, যেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতিগুলো সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। যদি কোনো দেশে ক্ষমতাসীন দল অগণতান্ত্রিক উপায়ে বিরোধী দলকে নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে তো সে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। গণতন্ত্রের মূল কথাই হলো বহুমত, বহুদলের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

নতুন বছরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোনো দিকে যাচ্ছে?

এখন রাজনৈতিক সমস্যা, সংকট আরও তীব্র হচ্ছে। সরকার একটা নির্বাচন করে ফেলতে পারে, কিন্তু এই নির্বাচন তো আমাদের রাজনৈতিক সমস্যা, সংকটগুলোর সমাধান করবে না। যতদিন পর্যন্ত আমরা একটা সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারব ততদিন পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক সংকট চলতেই থাকবে। রাষ্ট্রযন্ত্র ও দলীয় শক্তি ব্যবহার করে দেশে একরকম শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু রাজনীতির মূল সমস্যাগুলোর সমাধান না করলে রাজনৈতিক অস্থিরতার একটা আশঙ্কা থেকেই যায়।

অর্থনীতিতে এই রাজনৈতিক অস্থিরতার কেমন প্রভাব পড়বে?

এখন আমাদের অর্থনীতি প্রধানত বেসরকারি খাতভিত্তিক। বেসরকারি খাত চাইবে কোনোরকম রাজনৈতিক অস্থিরতা যেন না হয়। যতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের সব দলের মধ্যে একটি রাজনৈতিক বোঝাপড়া না হয়, বিশেষ করে নির্বাচন প্রশ্নে, ততদিন পর্যন্ত ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা দুঃশ্চিন্তা থাকবেই। আমাদের দেশে ব্যবসায়ীরা অতীতে অনেক অস্থিরতার মধ্যেও ব্যবসা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা তেমন বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারিনি। এখন আমরা নানা দিক থেকে অনেক

অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। সেগুলো সমাধানের জন্য বেশ কিছু সংস্কারের প্রয়োজন হবে। অনেক শক্তিশালী গোষ্ঠী এসব সংস্কারের বিপক্ষে থাকবে। যদি গণতন্ত্র, সুশাসন, আইনের শাসন, মানবাধিকার এসব প্রশ্নে রাজনৈতিক ঐকমত্য থাকে, তাহলে এসব সংস্কার করা কিছুটা সহজ হবে।

অর্থনীতি নিয়ে সরকারি দল ও বিরোধীদের মধ্যে বিতর্ক আছে। সরকারের দাবি, তারা দেশের ব্যাপক উন্নতি করেছে। আবার অনেক বিশ্লেষকের মতে, শুধু অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকৃত অর্থনীতির উন্নয়নকে নির্দেশ করে না। আপনার বিশ্লেষণ জানতে চাইছি।

দেশে উন্নয়ন হয়েছে। এটা অস্বীকার করার কিছু নেই। জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন হচ্ছে, সেটাও আমাদের প্রবৃদ্ধির জন্য দরকার। তবে এ উন্নয়ন নিয়ে যেসব বিতর্ক করা হচ্ছে, সেটাও ঠিক। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে বৈষম্যও বেড়েছে। আমাদের শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতের গুণগত মানের দিকে তেমন নজর দেওয়া হচ্ছে না। আমরা আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারছি না। দুর্নীতি দমন হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে পড়ছে। আমাদের উন্নয়নকে স্থিতিশীল করতে হলে বৈষম্য দূর করতে হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের মান বাড়াতে হবে। দুর্নীতি দমন, আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে একদিকে যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ; অন্যদিকে চীন, ভারত, রাশিয়া। আগামী বছর ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ওপর বিদেশিদের কেমন প্রভাব থাকবে?

বিদেশিদের প্রভাব আগামী বছরও চলবে। ভূরাজনীতি এখানে নতুন একটা মোড় নিচ্ছে– চীন ও যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও চীনের মধ্যে দারুণ একটা প্রতিযোগিতা চলছে, সেটা অচিরেই থেমে যাবে না। এটা চলবে। চাপ প্রয়োগ করে তারা নিজেদের স্বার্থে বাংলাদেশকে পাশে রাখতে চাইবে। যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ করে কয়েকটি ইস্যুকে ব্যবহার করছে— নির্বাচন, শ্রমিক অধিকার, মানবাধিকার, গণতন্ত্র। নির্বাচন হয়ে গেলেও শ্রম অধিকার, মানবাধিকার, গণতন্ত্র— এসব ব্যাপারে বাংলাদেশ যে পশ্চিমা দেশগুলোর চাপে আছে, তা থেকে যাবে। সেটা কমার কোনো লক্ষণ আমি দেখছি না। ভূরাজনীতিতে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, রাশিয়ার মধ্যে যে সংঘাত, সেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে না; বরং আরও তীব্র হচ্ছে। ফলে আমাদের ওপর চাপ কমবে না।

সস্তা শ্রম বিদেশিদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ বা বাংলাদেশ থেকে উৎপাদিত পণ্য নেওয়ার একটা বড় কারণ ছিল। তবে বর্তমান বাজারমূল্য ও নিত্যপণ্যের লাগাতার ঊর্ধ্বগতি সেই বাস্তবতা অনেকখানি বদলেছে। শ্রমিকদের মজুরি কাঠামোর দাবি ও বর্তমান বাস্তবতাকে কীভাবে দেখছেন?

আমাদের দেশে শ্রমিকদের যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে, সেটা প্রতিযোগী অন্যান্য দেশ থেকে অনেক কম। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ভারত আমাদের থেকে অনেক বেশি মজুরি দেয় শ্রমিকদের। অতএব, শুধু সস্তা শ্রম দিয়ে আমরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকব— এই নির্ভরতা কমিয়ে বরং আমাদের ভাবতে হবে, আমরা কী করে আমাদের কারখানাগুলো আরও বেশি আধুনিকীকরণ করতে পারব, বিদেশি ক্রেতাদের সঙ্গে আরও দরকষাকষি করে আমাদের শ্রমের দাম বাড়াতে পারব— এসব দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। শুধু শ্রম সস্তা করে শিল্পের বিকাশ সম্ভব হবে না। এখন জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়েছে, তাতে এই মজুরি দিয়ে শ্রমিকরা তাদের সংসার চালাতে পারছেন না। আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলো যদি শ্রমিকদের বেশি মজুরি দিয়ে প্রতিযোগিতা করতে পারে, তাহলে আমরা কেন করতে পারব না?

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বা বরাদ্দ চাহিদা অনুযায়ী বাড়েনি। এর কেমন প্রভাব পড়তে পারে?

আমাদের মনে রাখতে হবে একদিকে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ ও বরাদ্দ অপ্রতুল, অন্যদিকে আমাদের বাজেটে সরকার যে বরাদ্দ দিচ্ছে তাও অনেক সময় সঠিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না। স্বাস্থ্য খাত অনেক সময় বাজেটের বরাদ্দের অর্থ খরচ করতে পারছে না। অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য যেসব খাতে অর্থ খরচ করছে, যেমন অবকাঠামো নির্মাণে, এগুলো দিয়ে গুণগত মান বাড়ানো যাচ্ছে না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের মান উন্নয়ন করার তেমন পরিকল্পনা নেই। সুশাসনের অভাব। আমাদের দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য যেমন প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার তার অভাব রয়েছে। দেশে ও বিদেশে শ্রমবাজারে কী পরিবর্তন আসছে, কেমন চাহিদা, তার সঙ্গে সমন্বয় করে আমাদের এখানে শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। আমরা যদি জনশক্তি খাতকে শক্তিশালী করতে চাই, তাহলে আমাদের জনশক্তি খাতকে আন্তর্জাতিক মানের হতে হবে। শুধু অর্থ বরাদ্দ বাড়িয়েই এসব খাতের সমস্যার সমাধান হবে না। গুণগত মান বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে।

শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। কিন্তু গত কয়েক বছরে নারী নির্যাতনও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এর কারণ কী?

নারী নির্যাতন শুধু যে বাংলাদেশেই বেড়েছে তা না, পৃথিবীর অনেক দেশেই আমরা দেখেছি নারীর প্রতি সহিংসতা বাড়ছে। আগের তুলনায় শ্রমবাজার বা রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে, কিন্তু নারীদের এই অগ্রসরতার পর অনেক দেশে, সমাজে আবার একটা পশ্চাদপসরণ হয়েছে। এখন একটা রক্ষণশীল ধারা দেখা যাচ্ছে। সেটা যে শুধু আমাদের দেশে তা নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, এমনকি আমেরিকাতেও আমরা দেখি নারীরা সত্তর ও আশির দশকে যেসব অধিকার পেয়েছিলেন, তা এখন আবার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। ফলে নারীদের অধিকার আবার সংকুচিত হচ্ছে। আসলে নারীর সমঅধিকার যেসব দেশে ভালোভাবে সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়েছে, সেখানে পুরুষদের আচরণ ও রুচিরও পরিবর্তন এসেছে। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস এসব দেশে নারীর অনেক ক্ষমতায়ন হয়েছে। সেখানে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গিও অনেক পাল্টেছে। আমরা যদি নারীদের ক্ষমতায়ন করতে চাই, শুধু মেয়েদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বাড়ালেই চলবে না, তার সঙ্গে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন করতে হবে। নারী নির্যাতন জিরো টলারেন্সে আনতে হবে। এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে ব্যাপক প্রচারণা ও অন্যান্য কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

আমাদের তরুণ অনেকেই গত দুই নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাননি। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতা তরুণদের চিন্তা-চেতনায় কেমন প্রভাব ফেলবে?

আমাদের তরুণ সমাজও রাজনৈতিক বিভাজনের দ্বারা বিভক্ত। একটা ভাগ আছে, যারা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত। যারা ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে আছে, তারা নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। বর্তমানে যে ব্যবস্থা চলছে, এর সঙ্গে তারা মানিয়ে নিয়েছে। আর যে তরুণরা দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়, তারা দেশের ভবিষ্যতের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না, তারা যে কোনো মূল্যে বিদেশে চলে যেতে যাচ্ছে। এটা আমাদের দেশের জন্য একটা বিরাট প্রশ্নের ব্যাপার। আমরা যতই বলি আমাদের দেশের উন্নয়ন হচ্ছে, কিন্তু আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে যে দেশে যদি এতই উন্নতি হয়ে থাকে, তরুণরা কেন দেশে না থেকে বিদেশে যেতে চায়? মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া থেকে তো তরুণরা যে কোনো উপায়ে বিদেশে চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করছে না। তারা ভাবছে, তাদের দেশের মধ্যেই অনেক সুযোগ আছে তাদের জন্য। তরুণদের যদি আমরা দেশের মধ্যে না ধরে রাখতে পারি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি কী করে হবে?

আগামী বছর নিয়ে আপনার চাওয়া সম্পর্কে জানতে চাই।

আমি চাইব আগামী বছর যেন আমাদের বহু বছরের পুঞ্জীভূত সমস্যাগুলোর সমাধানের কিছু পথ আমরা বের করতে পারি। আমাদের দেশের এবং বিশ্বের প্রায় অনেক দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে খুব একটা তাড়াতাড়ি যে কোনো সমস্যার সমাধান হবে তা নয়। তবে আমরা যে পথে হাঁটছি তা থেকে ভিন্ন পথে হাঁটা আরম্ভ করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে যারা ধনী তাদের আরও বেশি ধনী হতে হবে। বরং আমি চাইব যারা ধনী নয়, তাদের জীবনের মান আরও উন্নত হবে। আমি চাইব আমাদের রাজনীতি যেন প্রভাবশালীদের বলয় থেকে মুক্তি পায়, যেন দেশের জনসাধারণের নাগরিক হিসেবে সমঅধিকার দৃশ্যমান হয়। আমি চাইব যাতে দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সবাই নির্ভয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা পায়। আমি চাইব আমাদের তরুণ সমাজ শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি কিংবা ব্যবসায় সাফল্যের কথা না ভেবে ভাবতে শুরু করে কেমন করে তারা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজকে একটি আলোকিত পথের দিকে নিয়ে যেতে পারবে। বর্তমানে আমরা একটি প্রচণ্ড আস্থার সংকটের মধ্যে আছি, যেখানে জনসাধারণ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর শ্রদ্ধা এবং আস্থা রাখতে পারছে না। বর্তমান অবস্থান থেকে আগামী বছর ভালো হবে, এমন স্বপ্ন দেখতে হলে প্রথমেই আমাদের সেই আস্থার জায়গাটি সৃষ্টি করতে হবে।

সমকাল
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩

অধ্যায় ৩

শিল্প, বাণিজ্য এবং বাজার ব্যবস্থাপনা

দেশে চামড়া ফেলে দেওয়া হয় অন্যদিকে আমরা চামড়ায় আমদানি নির্ভর হয়ে পড়ছি

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র গবেষণা পরিচালক। দীর্ঘদিন ধরে চামড়াশিল্প নিয়ে তিনি গবেষণামূলক কাজ করছেন। এ শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি, সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে প্রথম আলো। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রাফসান গালিব।

প্রথম আলো: এবার চামড়ার যে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে, তা কতটা বাস্তবসম্মত মনে করছেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আমাদের এখানে বহু বছর আগে থেকে চামড়ার একটি বেজ প্রাইস (ভিত্তিমূলক মূল্য) ধরে রাখা হয়েছে। সেটির ওপর ভিত্তি করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রতিবছর চামড়ার একটি মূল্য নির্ধারণ করে দেয়।

আমার ধারণা, এই মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়ার ভেতরে চামড়ার যে বাণিজ্যিক মূল্যের বিষয়টি রয়েছে, সেটি তেমন বিবেচনায় নেওয়া হয় না। এখনো এটি কোরবানি দানের পণ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং দানের পণ্যের ক্ষেত্রে আর্থিক মূল্য যেহেতু একেবারে ন্যূনতম মাত্রায় ভাবা হয়, ফলে চামড়ার মূল্য নির্ধারণও সেভাবে ঘটে।

কিন্তু বাজারের ভিত্তিতে দরদাম করা এবং কাঁচামাল হিসেবে এর যে মূল্য থাকা উচিত, সে বিষয়গুলো এখানে উপেক্ষিত থেকে যায়। ফলে সব সময় এটির নিম্নমূল্য নির্ধারিত হয় এবং প্রকৃত বাজারমূল্য অনুসারে চামড়ার মূল্যায়ন হয় না।

এ বছর ঢাকায় লবণযুক্ত প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়ার মূল্য ৫০–৫৫ টাকা এবং ঢাকার বাইরে তা ৪৫–৪৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এবার সামান্য বেড়েছে যদিও। সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে, এখানে ৬ শতাংশের মতো মূল্য সমন্বয় করা হয়েছে। অথচ এখন মূল্যস্ফীতি ৯ দশমিক ৯ শতাংশের মতো। সে বিবেচনা করলেও চামড়ার মূল্য হওয়ার কথা ছিল ৫২–৫৭ টাকা।

রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে বিবেচনা করলে ডলারের বিনিময়ে টাকা অবমূল্যায়িত হওয়ার কারণে রপ্তানিকারকেরা হয়তো বেশি টাকা পাবেন। তবে টাকার অবমূল্যায়ন এবং মূল্যস্ফীতি যদি ১৫ শতাংশও হয়, তাহলে চামড়ার মূল্য ৫৪–৬০ টাকা হওয়ার কথা ছিল। সেদিক থেকে এবার যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, তাতে আসলে স্বাভাবিক সময়ে যে ন্যূনতম সূচকগুলো থাকে, সেগুলোও বিবেচনা করা হয়নি। এটিকে যদি আমি কাঁচামাল হিসেবে বিবেচনা করি, আমার ধারণা এটির মূল্য আরও বেশি হওয়ার কথা।

প্রথম আলো: একটা সময় সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে চামড়া বেচাকেনা হতো, গত কয়েক বছরে ঘটছে উল্টোটা। এমনকি মানুষ চামড়ার দাম না পেয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। এবারও কি দাম না পাওয়ার পরিস্থিতি দেখতে হবে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: একটা সময় সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে চামড়া বিক্রি হওয়ার বিষয়টি ছিল। তখন চামড়ার চাহিদার কারণে সেটি হতো। সে সময় চামড়া রপ্তানিতে ধারাবাহিক একটি প্রবৃদ্ধি ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রবদ্ধির ওঠানামা চলছে।

এমনকি চামড়াজাতীয় পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে উচ্চমাত্রার যে প্রবদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, সেটিও আমরা রাখতে পারছি না। গত বছর সন্তোষজনক ছিল না বলে যতটুকু মনে পড়ে, এ বছরও হয়তো তেমনটি দেখতে হবে। ফলে পণ্য রপ্তানি যদি নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে থাকে বা সন্তোষজনক না হয়, তাহলে প্রস্তুত চামড়া বা গুদামজাত পণ্য জমতে থাকে। এতে যারা জুতা বা অন্যান্য চামড়াজাত পণ্য তৈরি করে, তাদের কাছে তখন চামড়ার চাহিদা কমে যায়। তখন এর একটি ধারাবাহিক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে গোটা শিল্পের ওপর, বিশেষ করে ট্যানারিগুলোতে, তারাই যেহেতু যারা চামড়া প্রস্তুত করে এবং

পণ্য তৈরি করে, তাদের কাছ থেকে চামড়ার চাহিদা নিয়ে থাকে। ফলে তাদের কাছ থেকে চাহিদা পড়তি থাকলে ট্যানারিতেও চামড়া সংগ্রহ কম হয়।

এ বছর যে পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং যে চাহিদা দেখানো হয়েছে, এসবের প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ না–ও থাকতে পারে ট্যানারিগুলোর পক্ষ থেকে।

এক্ষেত্রে দুর্বলতা মূলত আমাদের বাজারকাঠামোর। আমরা চামড়ার বাজারটিকে একেবারে অভ্যন্তরীণ একটি ক্যাপটিভ মার্কেটে পরিণত করেছি। বড় স্বার্থের কথা বলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা আগে মেটানোর জন্য বাজারকে এমন করে রাখা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, এটি করতে গিয়ে চামড়ার যে স্বাভাবিক কেনাবেচা বা উচ্চ মূল্য নির্ধারণের যে সুযোগ, সেটিও রুদ্ধ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে গত বছর সীমিত পর্যায়ে কিছু কাঁচা চামড়া বা ওয়েট ব্লু রপ্তানির সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আমরা মনে করি, এ বছরও সে সুযোগ উন্মুক্ত রাখা উচিত সরকারের। এমনকি ওয়েট ব্লুর আগের পর্যায়ে লবণ দিয়ে রাখা হয় যে চামড়া, সেটিকেও রপ্তানির সুযোগ দেওয়া উচিত। তাতে চামড়ার অভ্যন্তরীণ যে অবনমিত বাজার রয়েছে, সেটির বিপরীতে আমাদের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বাজারটি খুঁজতে পারবে।

এমনটি করা গেলে আমাদের এখানে চামড়া নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে। এতে চাহিদাও তৈরি হবে এবং প্রকারান্তরে সেটি হলে চামড়া বেশি মূল্যে বিক্রিরও সুযোগ তৈরি হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া উচিত আরও আগে। চামড়া কতটা মজুত রয়েছে, চাহিদা কত, জোগান কেমন হবে, কী পরিমাণ নতুন চামড়া কেনা যাবে বা হবে, বাজার কতটা উন্মুক্ত করতে হবে না হবে— সেসব বিবেচনা করেই মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হতো। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উচিত, এসব বিবেচনায় রেখে গুরুত্বসহকারে বিষয়টি ভাবা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া।

প্রথম আলো: কোরবানি ঈদকে ঘিরে আমাদের দেশে চামড়াশিল্পের বড় একটা সম্ভাবনা আছে। শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই বলছেন, ইউরোপের ক্রেতারা বেশি দামে এখানকার চামড়া কিনে নেয়। কিন্তু তারা কেনে কম। তার মানে কি চামড়ার রপ্তানির বাজার তৈরিতে সরকার বা মন্ত্রণালয়ের মনোযোগ কম বা এখানে নীতিনির্ধারণে কোনো সীমাবদ্ধতা কাজ করছে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: এখানে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো আমাদের নিজস্ব বিপুল কাঁচামাল থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিকভাবে চামড়ার বাজারে এখন পর্যন্ত

আমরা ফুটস্টেপ তৈরি করতে পারিনি। আমরা চামড়া রপ্তানিতে কখনো বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাই আবার কখনো সেখান থেকে পিছিয়ে পড়ি। অথচ বলা হয়ে থাকে, বিশ্বজুড়ে চামড়ার ৩০০–৪০০ বিলিয়ন ডলারের বাজার রয়েছে। অথচ আশির দশকেও কিন্তু তৈরি পোশাকের ওপরে ছিল চামড়াশিল্পের অবস্থান। দীর্ঘদিন ধরে আমরা চামড়া বা চামড়াজাত পণ্যের বাজারটি তৈরি করতে পারিনি। এখানে সরকার, উদ্যোক্তা, ট্যানারিমালিক, চামড়া প্রস্তুতকারক, চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী—সবারই দায় রয়েছে।

এখানে মনে রাখা দরকার যে চামড়া প্রস্তুত করা ও চামড়াজাত পণ্য তৈরির ক্ষেত্রে মূল নির্ণায়ক পরিবেশসম্মতভাবে তা করা। আমাদের এখানে পরিবেশসম্মতভাবে চামড়া প্রস্তুত করা হয় না। চামড়া প্রস্তুতের ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিকভাবে লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (এলডব্লিউজি) সনদপ্রাপ্ত মাত্র চারটি লেদার ফ্যাক্টরি রয়েছে এখানে, তা–ও তারা নিজস্ব উদ্যোগে সেটি করেছে। কিন্তু এখানে জাতীয়ভাবে যে বিসিক শিল্পনগরী রয়েছে সাভারে, তা মোটেই এমন মানসম্পন্ন নয়। আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের চামড়ার মান এখন পর্যন্ত পরিবেশসম্মত না হওয়ায় চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী মূল প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে এ চামড়া ব্যবহার না করে, এমনটা বলে দেওয়া হয়ে থাকে।

আরও দুর্ভাগ্য হচ্ছে, প্রতিবছর আমাদের এখানে চামড়া আমদানি বাড়ছে। অথচ আমাদের এখানে অভ্যন্তরীণভাবে চামড়া নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ফেলা দেওয়া হয়, পুঁতে ফেলা হয়। নিজেদের কাঁচামাল থাকা সত্ত্বেও বিদেশ থেকে চামড়া আমদানি করা হচ্ছে এবং প্রতিবছর সেটির পরিমাণ বাড়ছে। এলডব্লিউজি সনদে প্রস্তুত হওয়া চামড়া আমাদের বড় বড় কারখানামালিক বা কোম্পানিগুলো আমদানি করছে। তার মানে আমরা যত দিন পর্যন্ত এলডব্লিউজি সনদপ্রাপ্ত হব না, তত দিন আমরা বৈশ্বিক চামড়ার বাজারে ঢুকতে পারব না। এখন আমরা চামড়ার বাজার উন্মুক্ত করে দেওয়ার কথা বলছি। সেটি হলে দেখা গেল, আমাদের চামড়াগুলো নিয়ে ভারত, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান বা চীনের মতো দেশগুলো প্রস্তুত করছে এবং তারা সেখান থেকে সেগুলোকে তাদের ব্র্যান্ড হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করছে। অথচ সেটি আমরা করতে পারছি না। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কী আছে।

প্রথম আলো: এমনিতেই আমরা অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানিনির্ভর দেশ হয়ে পড়েছি। দেশে কাঁচামালের বিপুল জোগান থাকা সত্ত্বেও এখন চামড়া খাতেও আমরা আমদানিনির্ভর দেশ হয়ে পড়ছি কি না? এটি তো শঙ্কার বিষয়।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: অবশ্যই এটি শঙ্কার বিষয়। আমাদের এখানে দক্ষ শিল্পপ্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও চামড়ার গুণগত মান নিশ্চিত না করার কারণে আন্তর্জাতিক

বড় যেসব ব্র্যান্ড আমাদের এখান থেকে চামড়াজাত পণ্য তৈরি করে নেয়, তারা তাদের পণ্যে ব্যবহারের জন্য চামড়া বাইরে থেকে আমদানি করার জন্য বলে থাকে। তথ্যমতে, **২০২০-২১** সালে সম্ভবত **১১১** মিলিয়ন ডলারের চামড়া আমদানি হয়েছে। প্রতিবছর সেটি **১০-১২** শতাংশ হারে বাড়ছে। সুতরাং এখানে আমদানিনির্ভরতা তৈরি হচ্ছে।

এখান থেকে সরে আসার জন্য যে পর্যাপ্ত উদ্যোগ প্রয়োজন, সেসব নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার ও উদ্যোক্তা— উভয়েরই ঘাটতি রয়েছে। সাম্প্রতিক কালে ট্যানারিমালিকেরা কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন, তাঁরা এলডব্লিউজি সার্টিফায়েড হওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক কিছু সংস্থার সঙ্গে কাজ করছেন। কিন্তু এ উদ্যোগগুলোর সঙ্গে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এতে আন্তর্জাতিক সনদ অনুযায়ী প্রস্তুত চামড়ার উৎপাদন ব্যয় বাড়বে। এর জন্য যে বড় বিনিয়োগ করতে হবে, এটির জন্য আমাদের ট্যানারিমালিকেরা এবং চামড়া প্রস্তুতকারীরা প্রস্তুত নন। এ বিনিয়োগটুকু না করলে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য এলডব্লিউজি সার্টিফায়েড হতে পারব না।

আর আমাদের বিসিক শিল্পনগরীর যে ইটিপি রয়েছে, সেটিও কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে মানসম্পন্ন নয়। এটিকেও সেই মানদণ্ডে নিয়ে যেতে সেখানে আরও বিনিয়োগ দরকার।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের চামড়ার বড় একটি বাজার হচ্ছে অভ্যন্তরীণ এবং আমাদের ট্যানারিমালিকেরা এখন পর্যন্ত এ অভ্যন্তরীণ বাজারকেই বেশি গুরুত্ব দেন, এমনকি উৎপাদকেরাও। অভ্যন্তরীণ ভোক্তারা আসলে এ পরিবেশ মানদণ্ডের চামড়া নিয়ে সচেতন নন। ফলে তাদের কাছে এটির তেমন কোনো মূল্য নেই। ফলে একই ট্যানারি যখন অভ্যন্তরীণ ও বাইরের বাজারের জন্য চামড়া প্রস্তুত করে, তারা তখন একই মানদণ্ডে করে ফেলে। ফলে বাইরের মানদণ্ডে এটি আর টেকে না। এখন রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য আলাদা রকমের ট্যানারি কারখানা করা অবশ্যই জরুরি। সেটি অবশ্যই আন্তর্জাতিক সনদপ্রাপ্ত এবং অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকবে। আলাদাভাবে সেখানে চামড়া প্রস্তুত বা উৎপাদিত হবে, এ রকম আলাদা শিল্পকাঠামো দরকার।

প্রথম আলো: আপনি বলছেন চামড়ার চাহিদা না থাকার কারণে এর দাম পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সাধারণ মানুষকে বলতে শোনা যায়, অমুক কোম্পানির এক জোড়া চামড়ার জুতা কিনতে কয়েক হাজার টাকা খরচ হয়। অথচ কোরবানির চামড়া নামকাওয়াস্তে বিক্রি করতে হয় বা ফেলে দিতে হয়। বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আপনি আসলে ঠিকই বলেছেন। কাঁচামাল থেকে চামড়া প্রস্তুত করা এবং পণ্য তৈরি পর্যন্ত যে সাপ্লাই চেইন, আমাদের এখানে এখনো তা

পুরোপুরি বাণিজ্যিকভাবে হয় না। যে কারণে বলছিলাম, কাঁচা চামড়াকে এখানে এখনো দানের পণ্য হিসেবে দেখা হয়, শিল্পপণ্য হিসেবে দেখা হয় না। এই চামড়াগুলোকে অভ্যন্তরীণ বাজারে আটকে রাখা হয়েছে, যাতে বাইরের বাজারে যেতে না পারে। ফলে সেগুলো নিম্নমূল্যে বিক্রিতে মানুষ বাধ্য হচ্ছে। এটি একটি বড় দুর্বলতা।

আবার এ চামড়া ব্যবহারকারী যে কয়েকটি কোম্পানি রয়েছে, তাদের সংখ্যাও কিন্তু বেশি নয়, বড় ৮–১০টি কোম্পানি রয়েছে। তার মধ্যে এক-দুটির মার্কেট শেয়ারই ৬০–৭০ শতাংশ। যদি তা–ই হয়ে থাকে, এ রকম একটি বাজারকাঠামোতে একধরনের মনোপলি বা একচেটিয়া বাজারের প্রভাব তৈরির আশঙ্কা থাকে। এতে চামড়া প্রস্তুতকারী বা পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান উচ্চ মূল্যে ভোক্তার কাছে পণ্য বিক্রির একটি সুযোগ নিয়ে থাকে। সম্ভবত আমাদের এখানে তেমনটি ঘটছে।

যদি এখানে সুষম বাজারকাঠামো থাকত, তাহলে কাঁচামালের মূল্যও বেশি পাওয়া যেত এবং এখন ভোক্তারা যে মূল্যে পণ্য কিনছেন, সেই মূল্যে কিনতেও তাদের তেমন আপত্তি থাকত না। চামড়ার মূল্য আরও বেশি পেলে সাপ্লাই চেইনে থাকা সবাই উপকৃত হতো। অথবা এ বাজার যদি ক্যাপটিভ না হয়ে আরও উন্মুক্ত হতো, তাহলে ভোক্তা পর্যায়েও চামড়াজাত পণ্যের মূল্য আরও কমে আসতে পারত।

আমরা দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের স্বার্থে সুবিধা দিতে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু সেই সুবিধা ভোক্তা পুরোপুরি নিতে পারছেন না। সেই অর্থে যারা চামড়া সংগ্রহকারী বা বিক্রয়কারী, তারাও সেই সুবিধা নিতে পারছে না। মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকা কিছু উৎপাদনকারী এ সুবিধা নিয়ে নিচ্ছে।

প্রথম আলো: ট্যানারিমালিকেরা বা একধরনের একটি সিন্ডিকেটের কথা শোনা যায়, যারা চামড়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সে ব্যাপারে কী বলবেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: এ সমস্যা আমাদের সব খাতেই কমবেশি রয়েছে। বিশেষ করে বড় খাতগুলোতে আমরা দেখি, বড় বড় ব্যবসায়ী বা শিল্পমালিকেরা বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন। চামড়াশিল্পের ক্ষেত্রেও ট্যানারিতে বা যারা চামড়া প্রস্তুত করে বা যারা পণ্য উৎপাদন করে—এ জায়গাগুলোতে একধরনের সিন্ডিকেট তৈরি হওয়ার সুযোগ থাকে। সিন্ডিকেট আছে, এমন অভিযোগ অমূলকও নয়।

এ সমস্যা থাকার মূল কারণ হচ্ছে এ শিল্প এখনো ফরমালাইজড বা আনুষ্ঠানিক মার্কেট কাঠামোতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। চামড়া বা চামড়াজাত পণ্যের সাপ্লাই চেইনে এখনো

ইনফরমালাইজেশন বা অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড থেকে গেছে এবং সেটি বড় অংশে। রেজিস্টার্ড লেনদেনকারীর বাইরেও আনরেজিস্টার্ড লেনদেনকারী বা মৌসুমি বিভিন্ন রকমের ক্রেতা-বিক্রেতার আগমন ঘটে। এদের একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আনা হচ্ছে না বা উদ্যোগও নেই। এমনকি যে লেনদেনগুলো হচ্ছে, সেখানেও অস্বচ্ছতা থেকে যাচ্ছে। ফলে চামড়ার বাজারে ব্যাংকগুলো যে ঋণ দেয়, তা খেলাপি হয়ে যায়। এমনকি সেই ঋণের টাকাও অনেক সময় উঠে আসে না। ফলে এখানে সিন্ডিকেট বা নানা ধরনের সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে হলে ফরমাল বা আনুষ্ঠানিক কাঠামোতে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

এ বাজারে কাঁচামাল থেকে শুরু করে প্রস্তুত চামড়া তৈরিতে প্রতিটি পর্যায়ে যারা কাজ করে, তাদের রেজিস্টার্ড বা নিবন্ধিত হতে হবে। তাদের লাইসেন্স থাকতে হবে। সেগুলোর ভিত্তিতেই কেবল তারা লেনদেন করতে পারবে। মৌসুমি ক্রেতা-বিক্রেতা হলেও তার জন্য একধরনের লাইসেন্স থাকতে হবে। যে লেনদেনগুলো হবে, সেগুলো উপযুক্ত রসিদের মাধ্যমে হবে এবং বড় লেনদেনগুলো অবশ্যই মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) বা ব্যাংকের মাধ্যমে হতে হবে। যাতে লেনদেনগুলো দৃশ্যমান থাকে। এর ভিত্তিতে ব্যাংকও ঋণ দিতে চাইবে।

এ রকম একটি ফরমাল মার্কেট কাঠামোতে আমরা যেতে পারিনি। অথচ এক বিলিয়ন ডলারের মতো পণ্য এখানে রপ্তানি হচ্ছে। এত বড় একটি রপ্তানিমুখী শিল্প, এর মার্কেটটি এখনো ইনফরমাল বা ট্র্যাডিশনাল কাঠামোতে থেকে গেছে। এ ধরনের কাঠামোতে পণ্য ও লেনদেন ট্রেস বা ট্র্যাক করা যায় না। বাইরের কোম্পানিগুলো যদি আমাদের কাঁচামালের উৎস ও প্রস্তুত সম্পর্কে নিশ্চিত বা সন্তুষ্ট না হয়, তারাও এখানে লেনদেনে উৎসাহী হয় না। সুতরাং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই রেজিস্টার্ড আর স্বচ্ছ ট্র্যাকিং ও ট্রেসিং সিস্টেমে যেতে হবে এবং ধাপে ধাপে ইনফরমাল বাজারকাঠামো থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

প্রথম আলো: দেশে ট্যানারিশিল্পকে ঢেলে সাজানোর বড় প্রকল্প নেওয়া হলো, প্রচুর অর্থও সেখানে ব্যয় হলো, এরপর এই শিল্প টেকসই হলো না। এখানে সরকার, মন্ত্রণালয় বা শিল্পসংশ্লিষ্ট সবার সদিচ্ছার অভাব ছিল নাকি তাদের দায়িত্বহীনতা ও ব্যর্থতাকে দায়ী করবেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আসলে এর সঙ্গে এই সবকিছুই কমবেশি জড়িত। প্রথমত, ট্যানারিশিল্প আধুনিকায়নের জন্য যে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, তা বিবেচনা করেই প্রকল্প ঠিক করা ও বাস্তবায়ন করা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। এলডব্লিউজির মানদণ্ডের ভিত্তিতে

যদি সাভারে আমাদের ট্যানারির শিল্পনগরীটি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হতো, তাহলে শুরু থেকে সেভাবে বিনিয়োগ করা, সেভাবে সিইটিপির জন্য জায়গা রাখা, প্রয়োজনীয় উন্মুক্ত জায়গা রাখা, সবুজায়ন ও পরিবেশবান্ধব রাখা, ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করা, শক্ত বর্জ্য প্রক্রিয়ার জন্য স্থাপনা তৈরি করা— এসবই সেখানে থাকত বা হতো। এখন সেগুলো ছাড়াই যখন শিল্পনগরীটি হলো, তখন এটি মোটেই চাহিদাসম্পন্ন হয়নি। এলডব্লিউজির মানদণ্ডের ধারে কাছে এটি নেই। ফলে বাইরের বায়ার বা ক্রেতাদের বাংলাদেশের চামড়া খাত নিয়ে যে আগ্রহ-উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, তা আমরা ধরে রাখতে পারিনি।

এ জায়গায় সরকারের দায়বদ্ধতা আছে। কিন্তু একই সঙ্গে বেসরকারিভাবে এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএ); বাংলাদেশ প্রস্তুত চামড়া, চামড়াপণ্য ও জুতা রপ্তানিকারক সমিতিসহ (বিএফএলএলএফইএ) আরও যেসব সংগঠন আছে, তাদের দিক থেকেও উচিত ছিল সরকারকে সচেতন করা। কেননা সরকার নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলাপ-আলোচনা না করে এখানে প্রকল্প করার ব্যাপারে পূর্ণ সিদ্ধান্তে যায়নি। ফলে সেখানে এসব সংগঠন বা পক্ষ পর্যাপ্ত সহযোগিতা করেছে বলে আমার মনে হয় না। তবে এখন আমার মনে হয় যে বিটিএ থেকে কিছু ঘুরে দাঁড়ানোর উপলব্ধি তৈরি হচ্ছে। যদিও আন্তর্জাতিক মানে নেওয়ার জন্য বিনিয়োগ করা, এর বিনিয়োগের জন্য মালিককে প্রস্তুত করা— সেসবের প্রতি আগ্রহের যথেষ্ট ঘাটতি আছে। ফলে বিটিএর উদ্যোগ আরও জোরালো হওয়া দরকার।

আমাদের অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানিমুখী বাজারের জন্য আলাদা আলাদা ট্যানারি ও শিল্পকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। জামালপুরে সরকার আরেকটি ট্যানারিপল্লি করার চিন্তাভাবনা করছে, সেটিকে রপ্তানিমুখী ট্যানারি বা শিল্প হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত হবে। সেটিকে যদি শুরু থেকে এলডব্লিউজি মানদণ্ডে গড়ে তোলা হয়, তাহলে আমরা কিছু সুবিধা পেতে পারি।

তবে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে আন্তজাতিক সার্টিফায়েড এজেন্সি প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডগুলোরও সহযোগিতা নেওয়া উচিত হবে। তাদের মতামত ও মূল্যায়নগুলো নেওয়া উচিত এবং কারিগরি সহায়তাও বাইরে থেকে নেওয়া। ব্যক্তিগতভাবেও এখানে এলডব্লিউজি সনদ অনুসারে ফ্যাক্টরি গড়ে তুলতে চাইলে সে সুযোগ তৈরি করতে হবে। তারা যাতে সে অনুসারে বিনিয়োগ করতে পারে, এর জন্য ব্যাংকঋণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

একই সঙ্গে সাভার শিল্পনগরীতেও কেউ যদি এমন মানসম্পন্ন কারখানা করতে চান, এর জন্যও সুযোগ করে দিতে হবে। সেখানে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা থাকলে উদ্যোক্তারা আগ্রহ দেখাবেন। তবে সবচেয়ে বড় কথা, আমরা যদি সত্যিকার অর্থে পোশাকশিল্পের

মতো চামড়াকেও আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্পপণ্য হিসেবে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে সেটির সুযোগ বা সম্ভাবনা এখনো রয়েছে। এর জন্য বড় বিনিয়োগ ও ব্যয়কাঠামো মেনে নিয়েই এগোতে হবে। দেশীয় বাজারকে মাথায় রেখে যদি উদ্যোগগুলোর ভেতরে একধরনের লুকোচুরি বা গোঁজামিলের চেষ্টা করা হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে আমরা কখনো অবস্থান তৈরি করতে পারব না।

প্রথম আলো: আপনাকে ধন্যবাদ

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আপনাকেও ধন্যবাদ

প্রথম আলো
২৮ জুন, ২০২৩

চালের বাজার সামলাতে করণীয়

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

এ সময়ে চাল আমদানি ব্যয় বেড়েছে। সেটিও বাজারে প্রভাব রেখেছে, বলা যায়। এরই মধ্যে চাল রপ্তানিতে ভারতের নিষেধাজ্ঞায় বাজারে নতুন করে প্রভাব পড়ার ভয় রয়েছে। উৎপাদন ভালো হলেও বাজারের স্বার্থে বাংলাদেশকে প্রতিবছর কমবেশি চাল আমদানি করতে হয়। এর সিংহভাগই জোগান দেয় প্রতিবেশী দেশটি। ভারতের নিষেধাজ্ঞার খবরে ইতোমধ্যে দেশের মিল মালিক ও বড় ব্যবসায়ীর কেউ কেউ বেশি লাভের সুযোগ খুঁজছেন বলে সংবাদমাধ্যমে এসেছে। আবার ইউক্রেন-রাশিয়ার চুক্তির মাধ্যমে যে গম রপ্তানি হতো; 'গ্রেইন ডিল' নামক সেই চুক্তি নবায়ন না হওয়ায় ইউক্রেন থেকে গমের আমদানি বন্ধ। ফলে চাল এবং গম উভয়ের আমদানি কমার লক্ষণ স্পষ্ট। এ অবস্থায় সরকারের উচিত হবে চালের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন যেন কোনোভাবে ব্যাহত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা। গ্যাস সংকটের কারণে সারের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। সারের এই ঘাটতি যে কোনোভাবে হোক পূরণ করতে হবে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের চালের বাজারে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা স্পষ্ট। অথচ এবার বোরো ধানের রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন হয়েছে। ইতোপূর্বে আমনের উৎপাদনও ভালো হয়েছে। সব মিলিয়ে আমাদের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন যথেষ্ট ভালো। তবুও বাজারে এ সময়ে চালের উচ্চমূল্যই দেখা যাচ্ছে। বাজার বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, মোটা চালের মূল্য ছিল ৪৮ থেকে ৫২ টাকা। এর আগেও তার মূল্য ছিল ৪৮–৫০ টাকা। যদিও অন্যান্য বছর এ সময়ে এর চেয়ে কম মূল্যে চাল কেনা যেত।

দেশে চালের উৎপাদন সন্তোষজনক হওয়া সত্ত্বেও বাজার কেন অস্থিতিশীল? এর কয়েকটা কারণ স্পষ্ট। চাল এবং গম বাংলাদেশে প্রধান খাদ্যশস্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এগুলো একে অপরের পরিপূরক। গমের সরবরাহ কমে গেলে আটার মূল্য বেড়ে যায়; মানুষ তখন চালের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে। আবার চালের মূল্য বাড়লে আটায় ঝোঁকার প্রবণতাও রয়েছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যখন ইউক্রেন থেকে গমের সরবরাহ কমে যায় তখন অভ্যন্তরীণ বাজারে গমের মূল্য বেড়ে যায়। সরবরাহে অনিশ্চয়তা এবং অন্যান্য দেশে গমের অতিরিক্ত চাহিদার কারণে বাংলাদেশ সংকটে পড়ে। গমের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রায় সম্পূর্ণ আমদানিনির্ভর। একই সঙ্গে যখন ডলারের সংকট দেখা দেয়, অর্থাৎ টাকার মূল্য কমে যায়, তখনও গমের বাজার ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। এ অবস্থায় চালের বাজারের ওপর চাপ বেড়েছে বলে আমাদের ধারণা। স্বাভাবিক সরবরাহ দিয়ে এই বাড়তি চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে চালের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

তবে এটা বলা দরকার, এ সময়ে প্রায় সব খাদ্যদ্রব্যেরই উচ্চমূল্য দেখা গেছে। এক বছরের বেশি সময় ধরে আমরা মূল্যস্ফীতি দেখেছি। এ সময়ে মানুষ তুলনামূলকভাবে কম মূল্যের পণ্য দিয়ে জীবন নির্বাহ করেছে। মানুষ আমিষ থেকে সরে শাকসবজিতে গিয়েছে। কিংবা কেউ শাকসবজি থেকে সরে গিয়ে শর্করায় নেমে এসেছে। এর কারণেও অনেক ক্ষেত্রে অনুমান করা যায়, চালের ভোগ বেড়েছে।

এ সময়ে চালের চাহিদার কারণে দাম বেড়েছে। এর মধ্যে মনে রাখতে হবে, এ সময়ে অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা মেটানোর জন্য চালের আমদানিও হয়েছে। গমের ঘাটতি এবং চালের চাহিদার উল্লম্ফনের কারণে চালের বাজারে স্থিতিশীলতা আনতে কিছু বেগ পেতে হয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশের চালের বাজার; সে চাল আমদানি করা হোক কিংবা অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত– চালের বড় ব্যবসায়ী অর্থাৎ রাইস মিলারদের একটা প্রভাব রয়েছে এবং বড় আকারে ধান উৎপাদনকারী যারা রয়েছে, বাজারে তাদেরও একটা প্রভাব রয়েছে বলে মনে করি। এই অলিখিত প্রভাব থেকে তারা বাজারে সরবরাহ কমিয়ে দিলে খুচরা পর্যায়ে মূল্যের ওপর তার প্রভাব পড়ে।

আমাদের দেশে অন্যান্য পণ্যের মতো চালের সাপ্লাই চেইন এখনও আনুষ্ঠানিক নয়। এ কারণে এই সাপ্লাই চেইনে কারা বাজারে পণ্য ছাড়ছেন, কারা মজুদ করছেন কিংবা বাজারে কত মূল্যে তারা বিক্রি করছেন এসব তথ্যউপাত্ত সরকারের পক্ষে জানা কষ্টকর। ইনফরমাল বা অনানুষ্ঠানিক সাপ্লাই চেইনের কারণে এ ধরনের বাজার তদারকি অসম্ভব হয়ে যায়। এই দুর্বলতার কারণে বাজারে মূল্য বৃদ্ধির ঘটনা ঘটে। অনেক সময় এটা বলা হয়ে থাকে, এ ধরনের ব্যবসায়ী সামগ্রিক বাজারের সাপ্লাই চেইনের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ধান-চালের মতো বাজারে যার ১ শতাংশ হিস্যা রয়েছে,

তিনি এই ১ শতাংশ কমিয়ে বাড়িয়েও বাজারে প্রভাব তৈরি করতে পারেন। আমরা আগে দেখেছি, সাপ্লাই চেইনে থাকা ব্যবসায়ীরা, বাজারে তাদের অংশ যা-ই হোক, চালের মূল্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।

বাজার স্থিতিশীলতা রক্ষায় সরকার কোনো দেশের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করতে পারে। এ ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সব মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। বাজার মনিটরিং ব্যবস্থায় কোনোভাবেই শিথিলতা কাম্য নয়। আমাদের ভবিষ্যৎ ঝুঁকিগুলোও মাথায় রাখতে হবে। ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশও যদি রপ্তানি বন্ধ করে দেয় কিংবা কোনো দুর্যোগময় পরিস্থিতি তৈরি হয়, তা মোকাবিলায় প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।

সমকাল
২৪ জুলাই, ২০২৩

পোশাককর্মীদের ব্যয়ের খাত নিয়ে কী ভাববে মজুরি বোর্ড

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বিগত মজুরি বোর্ডগুলোতে বেশ কিছু দুর্বলতা দেখা গেছে। এসব দুর্বলতা কাটাতে বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রকাশ, বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ, আইএলওর সুপারিশ করা মজুরি নির্ধারণের পদ্ধতি গ্রহণ, কর্মীদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের খাত নতুন করে নির্ধারণের মতো বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গত ৯ এপ্রিল রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড ঘোষণা করেছে। সার্কুলার অনুযায়ী, মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মনোনীত প্রতিনিধিরা মজুরি বোর্ডের তিন স্থায়ী সদস্যের সঙ্গে আলাপ–আলোচনা ও দর-কষাকষির মাধ্যমে নতুন ন্যূনতম মজুরি প্রস্তাব করবেন। এ জন্য তাদের ছয় মাস সময় দেওয়া হয়েছে।

পরে তাদের প্রস্তাব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সম্ভবত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হয়ে গেজেট আকারে জারি হবে। তার মানে আগামী অক্টোবর নাগাদ পোশাক খাতে নতুন মজুরি ঘোষণার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অবশ্য জরুরি ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হলে সময় বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে নিয়মিত বিরতিতে ২০০৬, ২০১০, ২০১৩ ও ২০১৮ সালে তৈরি পোশাক খাতে ন্যূনতম মজুরি ঘোষিত হয়েছে। সর্বশেষ তিনবার ঘোষণা করা হয়েছে বর্তমান রাজনৈতিক সরকারের মেয়াদকালে। এ সময়ে মজুরি নির্ধারণের

প্রক্রিয়ায় যেমন আংশিক উন্নতি হয়েছে, তেমনি মজুরি নির্ধারণে দুর্বলতাও দেখা গেছে; বরং বলা চলে, মজুরি নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় দুর্বলতার পাল্লাই ভারী।

বিগত দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু বিষয়ে পরিবর্তন-পরিবর্ধন জরুরি। নতুন মজুরি বোর্ড এক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে পারে। এপ্রিলে মজুরি বোর্ড ঘোষণার পর কেবল একটি বৈঠক হয়েছে। আরও কয়েকটি বৈঠকের পর মজুরিসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বোর্ড। মজুরি নির্ধারণে দুর্বলতাগুলো প্রচলিত কাঠামোর মধ্যেই বিবেচনার সুযোগ রয়েছে। আলাপ-আলোচনা করে তারা এগুলো সংশোধনের উদ্যোগ নিতে পারে।

বোর্ডের সভার কার্যবিবরণী প্রকাশ

মজুরি বোর্ডে মালিক, শ্রমিক ও সরকারের প্রতিনিধি কী আলাপ করেছেন, কোন পক্ষের প্রতিনিধি কী বক্তব্য দিয়েছেন, তার ভিত্তিতে বোর্ডের চেয়ারম্যান কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তা জনসমক্ষে জানার সুযোগ থাকে না। এতে বিভিন্ন পক্ষ দর-কষাকষিতে কী ভূমিকা নিচ্ছেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। এমনকি যৌক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে কি না, নাকি কোন কোন পক্ষের অবাঞ্ছিত চাপ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করছে– তা সংশ্লিষ্ট সবার জানা উচিত। তাই, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির দৃষ্টিতে মজুরি বোর্ডের উচিত প্রতিটি বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রকাশ করা।

বোর্ডে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে মতামতের জন্য আমন্ত্রণ

শ্রম আইন অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি ১২টি বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারণের কথা বলা হলেও প্রায় প্রতিবারই মজুরি নির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনা মাত্র তিন বা চারটি বিষয়ের মধ্যে আটকে থাকে। যেমন মূল্যস্ফীতি, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, রপ্তানির পোশাকমূল্য ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় ইত্যাদি। এর বাইরে আরও যে সাত–আটটি সূচক নিয়ে পর্যালোচনা করার কথা আইনে বলা আছে, তা বিবেচনা করা হয় না। এর মধ্যে রয়েছে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা, অন্যান্য তুলনীয় খাতের মজুরি, অন্যান্য দেশের ন্যূনতম মজুরি, মজুরিজনিত উৎপাদন ব্যয় ও মালিকপক্ষের মুনাফা ইত্যাদি। এসব বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্যের ঘাটতি ও গবেষণালব্ধ উপাত্তের ও বিশ্লেষণের যে প্রয়োজন, তা মজুরি বোর্ডের কাছে প্রায়ই থাকে না। এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত দিতে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা গবেষককে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

সঠিক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন

বোর্ডের আলোচনা সম্পর্কে জানা যায়, বিভিন্ন পক্ষ থেকে বিভিন্ন নির্ধারিত সূচকের ওপর সীমিত পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত আলোচনায় উপস্থাপন করা হয়। এসব তথ্য-উপাত্ত প্রায়ই আংশিক বা খণ্ডিত থাকে। পাশাপাশি যৌক্তিক অন্যান্য বিচার্য সূচকের তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হয় না। ফলে আলোচনায় প্রায়ই ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝুঁকি থাকে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের ব্যাপারে চেয়ারম্যানের নির্দেশনা দেওয়া জরুরি।

মজুরি নির্ধারণে গ্রহণযোগ্য হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার

বর্তমানে বোর্ডে যে প্রক্রিয়ায় মজুরি নির্ধারিত হয়, তাতে কোনো নিয়মবদ্ধ হিসাবপদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। ফলে নির্ধারিত মজুরির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে আইএলওর সুপারিশ করা মজুরি নির্ধারণের পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে মজুরি নির্ধারণে চার সদস্যের একটি পরিবারের খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত মাসিক আর্থিক প্রয়োজন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয়ের সুযোগ বিবেচনা করা হয়। পরিবারের উপার্জনকারী সদস্য একাধিক হলে তা–ও বিবেচনা করা হয়। পদ্ধতিটি আন্তর্জাতিকভাবে ‘অ্যাংকর পদ্ধতি’ হিসেবে পরিচিত।

সিপিডি ২০১৩ ও ২০১৮ সালে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে গ্রেড–৭–এর শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরির প্রাক্কলিত হিসাব করেছিল। মজুরি বোর্ড তাদের আগামী বৈঠকে এই হিসাবপদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

দেখা যায়, আমাদের দেশে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার পাশাপাশি গ্রেডভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি স্কেল ঘোষণা করা হয়। কারখানার সক্ষমতা, শ্রমিকের দক্ষতা, পণ্যপ্রতি বাড়তি আয় ইত্যাদি বিবেচনা করে স্কেলের বাইরে শ্রমিকদের ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার সুযোগ থাকলেও বর্তমান কাঠামোয় তা বিবেচনা করা হয় না। এক্ষেত্রে মজুরি স্কেলের বাইরে কারখানার নিজস্ব বিবেচনায় ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার সামর্থ্য থাকলে তা বাস্তবায়নের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও সরকারের কলকারখানা অধিদপ্তরের এসব সুবিধা বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা দরকার।

মজুরিকাঠামো ক্রমে দুর্বল হয়েছে, নজরে আনা দরকার

আগে মজুরিকাঠামো বিশ্লেষণে দেখা গেছে, শ্রমিকদের সার্বিক মজুরি বাড়লেও মজুরিকাঠামো দুর্বলতর হয়েছে। ২০০৬ সালে মজুরিকাঠামোতে সপ্তম গ্রেডের শ্রমিকদের মূল মজুরি সামগ্রিক মজুরির ৬২ শতাংশ নির্ধারিত হলেও ২০১৮ সালের মজুরিকাঠামোতে তা কমে ৫১ দশমিক ২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

এতে শ্রমিকদের অতিরিক্ত কাজের পাওনা, যা মূল মজুরির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, তা ইউনিটপ্রতি কমে গেছে। শুধু তাই নয়, মূল মজুরির ভিত্তিতে নির্ধারিত অন্যান্য পাওনা, যেমন মাতৃত্বকালীন আর্থিক সুবিধা, গ্র্যাচুয়িটি ইত্যাদিও আগের তুলনায় কমে গেছে। তবে ২০১৮ সালের মজুরিকাঠামোয় মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সংগতি রেখে প্রতিবছর ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইতিবাচক।

তবে বর্তমানের উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় এই হার যথেষ্ট নয়। আবার এই ইনক্রিমেন্ট পেতে তিন বছর টানা একই কারখানায় কাজ করার শর্ত শিথিল করে ছয় মাস করা যেতে পারে।

শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় মজুরিকাঠামোয় থাকতে হবে

১৯৮০ বা ১৯৯০-এর দশকে একজন শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয়ের মূল অংশ খাদ্য খাতে ব্যয় হলেও এখন খাদ্যবহির্ভূত খাতে বেশি ব্যয় হচ্ছে। ২০১৮ সালে সিপিডি পরিচালিত জরিপে পোশাকশ্রমিকদের খাদ্যবহির্ভূত ব্যয় পাওয়া গেছে প্রায় ৫০ শতাংশ।

এ ধারা অব্যাহত থাকলে, ভবিষ্যতে খাদ্যবহির্ভূত ব্যয়ই প্রধান হয়ে উঠবে। অথচ বিগত মজুরি কাঠামোগুলোতে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। যেমন মূল বেতন, খাদ্য ভাতা, বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা অপরিবর্তিত খাত হিসেবে রয়ে গেছে।

সিপিডির জরিপে দেখা গেছে, বর্তমানে একজন শ্রমিকের পরিবারে সন্তানের শিক্ষাব্যয়, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যয়, যোগাযোগ ও বিনোদন ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় হিসেবে যুক্ত হয়েছে। সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা এবং শ্রমিকের বিশেষত, নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যজনিত ব্যয় অনেক বেড়েছে। বর্তমান মজুরি কাঠামোয় এসব বিষয় একেবারে অনুপস্থিত। আশা করি, মজুরি বোর্ড এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে মজুরি কাঠামো পুনর্নির্ধারণ করবে। একই সঙ্গে শ্রমিকদের বিভিন্ন খাতে পরিবর্তিত ব্যয়ের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখবে।

গ্রেড–৭-এর নিচে বেতন ঘোষণা বন্ধ করা উচিত

বিগত দুটি সার্কুলারে দেখা গেছে, গ্রেড–৭ সর্বনিম্ন গ্রেড ঘোষণার পর নিচে একটি নোট যুক্ত করে 'শিক্ষানবিশ' হিসেবে আরেকটি গ্রেড যুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮ সালের মজুরিকাঠামোয় সপ্তম গ্রেডে ৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি ছিল, 'শিক্ষানবিশ' ক্যাটাগরিতে ৫ হাজার ৯৭৫ টাকা মাসিক মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরন্তু ২০১৮ সালে শিক্ষানবিশ ক্যাটাগরিকে একটি পূর্ণাঙ্গ স্কেলে রূপান্তর করা হয়েছে। শিক্ষানবিশকে আলাদা গ্রেড হিসেবে বিবেচনার সুযোগ নেই। এর সময়কাল কোনোভাবেই এক মাসের বেশি হওয়া উচিত নয়। নতুন মজুরি ঘোষণাকালে এ নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।

নিয়মবহির্ভূত সাব–গ্রেড বন্ধ করা

তৈরি পোশাক খাতে সাতটি গ্রেড চালু রয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন গ্রেডে বিশেষ করে ৫, ৪ ও ৩ নম্বর গ্রেডে সাব–গ্রেডের প্রচলন দেখা যায়। যেমন এ, বি, সি ইত্যাদি নামে একই গ্রেডে সাব–গ্রেডের প্রচলন প্রকৃত অর্থে শ্রমিকের পরবর্তী গ্রেডে উত্তরণকে শ্লথ করার নামান্তর। এতে শ্রমিকেরা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্য গ্রেড বা স্কেল থেকে বঞ্চিত হন। উপরন্তু পোশাক খাতে বিভিন্ন গ্রেডে দক্ষতার পার্থক্য খুব বেশি নয়। বিশেষত ৬ ও ৫ নম্বর গ্রেডের শ্রমিকদের দক্ষতাজনিত পার্থক্য বেশি না থাকায় এ দুটি গ্রেড একত্র করে একটি গ্রেড ঘোষণা করা যায়।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের এসব বিষয় ঘনিষ্ঠভাবে তদারক করে সাব–গ্রেড বন্ধের ব্যবস্থা নিতে পারে। এক্ষেত্রে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সার্বিক সহযোগিতা দরকার। মজুরি বোর্ড এ ক্ষেত্রে অনুশাসন দিতে পারে।

নতুন মজুরি বাস্তবায়নে ক্রেতাদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা জরুরি

সরকারঘোষিত আইনি কাঠামো পরিপালনে বিদেশি ক্রেতারা (ব্র্যান্ড বা বায়ার) নীতিগতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। ইতিপূর্বে দেখা গেছে, অনেক ক্রেতা সরকারঘোষিত নতুন মজুরি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন না।

সুতরাং নতুন ঘোষিত মজুরি কাঠামো আইনগতভাবে পরিপালনে ক্রেতাদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা থাকা প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে সব আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের প্রতিনিধি, বায়ার্স ফোরাম এবং ব্র্যান্ডগুলোর কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের ঘোষণা দেওয়া উচিত। ২০১৮ সালে মজুরি ঘোষণার পর কিছু ক্রেতা এমন ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

ঘোষিত নতুন মজুরির বাড়তি অংশের ব্যয় এককভাবে যেন মালিকদের ওপর চাপানো না হয়, সেই ঘোষণা ক্রেতারা দিতে পারেন। একই সঙ্গে ক্রেতাদের দেওয়া বাড়তি মজুরির মূল্যাংশ যেন শ্রমিকের পান, সেটি নিশ্চিত করার ঘোষণা থাকা প্রয়োজন। এসব বিষয় যথাযথভাবে বাস্তবায়নে শ্রমিকদের মজুরিসহ পাওনা ডিজিটাল বা অনলাইনভিত্তিক হওয়া জরুরি।

শ্রমিক–অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও বিনোদনকেন্দ্র

শিল্পশ্রমিক–অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ করে গাজীপুর, সাভার, টঙ্গী, শ্রীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম ইত্যাদি এলাকায় সরকারি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি কম। ফলে শ্রমিকদের বাড়তি ব্যয়ে বেসরকারি স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, কলেজ, কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র, মাদ্রাসা ইত্যাদিতে সন্তানদের পড়াশোনা করাতে হয়। বেশি ব্যয়ে বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে স্বাস্থ্যসেবা নিতে হয়।

জনঘনত্বের কারণে এসব এলাকায় সরকারি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান বেশি বেশি প্রয়োজন। এসব সরকারি প্রতিষ্ঠান থাকলে, কম খরচে সেবা পেলে শ্রমিকদের পারিবারিক ব্যয় অনেক কমে যাবে। এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে তাদের বেশি মজুরির প্রয়োজন পড়ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় শ্রমিক–অধ্যুষিত এলাকার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারে। এ বিষয়ে মজুরি বোর্ডের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে অনুরোধ জানানো যেতে পারে।

প্রথম আলো
৩ আগস্ট, ২০২৩

অভিযানে বাজার ঠিক করা যাবে না

মোস্তাফিজুর রহমান

গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর সম্মানীয় ফেলো প্রফেসর ড. মোস্তাফিজুর রহমান। মূল্যস্ফীতির মধ্যে দেশের বাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রথমবারের মতো সরকার কর্তৃক কয়েকটি পণ্যের দাম বেঁধে দেওয়াসহ নানা বিষয়ে দেশ রূপান্তরের সঙ্গে কথা বলেছেন এই অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সম্পাদকীয় বিভাগের সাঈদ জুবেরী

দেশ রূপান্তর: প্রথমবারের মতো ডিম, আলু ও পেঁয়াজের দাম বেঁধে দিল সরকার। এর আগে সরকার নির্ধারিত মূল্যতালিকা টানিয়ে রাখার নির্দেশসহ নানা ধরনের পদক্ষেপ নিলেও মূল্যস্ফীতির লাগাম টানা সম্ভব হয়নি।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: সরকারের এই উদ্যোগের মধ্যে হয়তো একটা ভালো কিছু করার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। কিন্তু এটার বাস্তবায়ন কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ রিটেইল বা খুচরা পর্যায়ে যদি এটা বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে সেটা খুবই কঠিন। দেশে লাখ লাখ রিটেইল পয়েন্ট আছে। সেখানে এটা কার্যকর করা খুবই মুশকিল। আমার মনে হয় আমদানি এবং উৎপাদন স্তর থেকে খুচরা পর্যায় হয়ে ভোক্তা পর্যন্ত আসতে আসতে দেখা যাচ্ছে বাজারকে প্রভাবিত করার এক ধরনের মেকানিজম দাঁড়িয়ে গেছে। সেখানে এক রকম একচেটিয়াকরণ হচ্ছে। আসলে ওই জায়গাগুলোতে বেশি নজর দিতে হবে। রিটেইল লেভেলে নজর দিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণের মতো সেই সক্ষমতা সরকারের নেই। মানে প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায়, আনাচে কানাচে বিভিন্ন পয়েন্টে খুচরা পর্যায়ে বেচাকেনা হয়, সেটা কি নজরদারি করা সম্ভব? প্রথমত, হোলসেল এবং আমদানি স্তর থেকে রিটেইল লেভেল পর্যন্ত বাজারকে

অযৌক্তিকভাবে প্রভাবান্বিত করা হচ্ছে কিনা? দ্বিতীয়ত, সমস্যা তো আসলে একদিনে সৃষ্টি হয়নি, সমাধানও এক সিদ্ধান্তেই হবে না। আমাদের আসলে উৎপাদন কত, সরবরাহ কত, ঘাটতি কত, আমদানি কখন করতে হবে, কখন আমদানিকে উৎসাহিত করতে হবে, স্টক কত রাখতে হবে এ বিষয়গুলোতে গবেষণাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপার আছে। এই জায়গাতেই আমাদের আসল সমস্যা রয়েছে বলে আমার মনে হয়।

দেশ রূপান্তর: বাজার ব্যবস্থাপনায় এই দাম বেঁধে দেওয়ায় কি প্রভাব পড়বে?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনা তো দুর্বল এবং আমাদের ভোক্তা অধিকার বলি আর কম্পিটিশন কমিশন বলি, খুবই রিয়েক্টিভ। কিছু একটা হলো, তখন তারা যায় অভিযানে। যেমন ভোজ্যতেল বা পেঁয়াজ এসব ক্ষেত্রে দেখা গেল, তারপর পোলট্রি ফার্ম নিয়ে দেখলাম কম্পিটিশন কমিশন অনুসন্ধানে নামল। যখন কোনো একটা সমস্যা হাজির হয় তখন এসব তৎপরতা দেখা যায়। কিন্তু এগুলোকে একটা সার্বক্ষণিক তথ্য-উপাত্তভিত্তিক নজরদারির মধ্যে রাখার ক্ষেত্রে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা রয়েছে। মূল সমস্যা মনে হয়, যখন কিছু একটা হয় তখন আমরা স্বল্পমেয়াদে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করি। কিন্তু বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তো আসলে ধারাবাহিক এবং সার্বক্ষণিক নজরদারির একটা ব্যাপার আছে। সেখানে যেটা বললাম আর কী, তথ্য-উপাত্তভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেই অনুযায়ী আমদানিটা কখন করতে হবে, স্টক কখন ছাড়তে হবে এসব বিবেচনা নিতে সার্বক্ষণিক লেগে থাকার একটা ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু যখন কিছু হয় বা ঘটে যায় তখন তার রিয়েক্ট করে আমরা একটা সিদ্ধান্ত চাপানোর চেষ্টা করি। এটা ফলপ্রসূ হবে না।

দেশ রূপান্তর: খাদ্য মূল্যস্ফীতি সাড়ে ১২ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। বিবিএসের হিসাবে, যা গত ১১ বছর ৭ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। কিন্তু মূল্যস্ফীতি আরও বেশি বলে অনেকে বলছেন। আপনার পর্যবেক্ষণে বর্তমানে মূল্যস্ফীতি কী পর্যায়ে আছে?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: আমরা তো এ ধরনের তথ্য-উপাত্তের জন্য বিবিএসের ওপরই নির্ভর করি। কারণ এত বিস্তৃতভাবে আর কেউ করেও না। সুতরাং এটাকেই আমরা মেনে নিতে পারি। আর এটা তো কোনো ভালো চিত্র নয়, যেখানে বৈশ্বিক পর্যায়ে সব দেশেই মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাচ্ছে, সেখানে আমাদের দেশেই এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, খাদ্য মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মান ও ক্রয়ক্ষমতার সরাসরি একটা সংযোগ আছে। সুতরাং এই সাড়ে ১২ শতাংশ মূল্যস্ফীতি যদি আমরা ধরেও নেই, তাহলে সেটা একটা নৈরাশ্যজনক চিত্র। একই সঙ্গে এই সাড়ে ১২ শতাংশ যে মূল্যস্ফীতি, এটা তো হলো গড় হিসাব। কিন্তু যারা নিম্ন আয়ের মানুষ,

তাদের জন্য যে মূল্যসূচক সেখানে কিন্তু অন্য চিত্র দেখা যাবে। যেমন চালের দামের গুরুত্বটা অনেক বেশি। নিম্ন আয়ের মানুষ যেগুলো ভোগ করেন, সেসব পণ্য যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু মূল্যস্ফীতির হিসাব আরও বাড়বে। বিবিএসের যে প্রাইস ইনডেক্স বা ভোক্তা মূল্যসূচক সেখানে চালের গুরুত্ব হলো ২০ শতাংশ। কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষের যে কনজাম্পশন, ভোগ্যপণ্যের যে বাস্কেট সেখানে চালের গুরুত্ব এই ২০ শতাংশ থেকে অনেক বেশি।

দেশ রূপান্তর: খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেশি বেড়েছে গ্রামীণ এলাকায়। সেখানে এর পরিমাণ ১২.৭১ শতাংশ। গত জুলাইতে এটি ছিল ৯.৮২ শতাংশ। এর কারণ কি আপনি যেটা বললেন নিম্ন আয়?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: হ্যাঁ। কিন্তু আমি বলছি নিম্ন আয়ের মানুষ, সেটা তিনি শহরের হোক বা গ্রামের। বিবিএসের সূচকের যে কাঠামো, যেমন চালের কথা বললাম, ২০ শতাংশ গুরুত্ব। কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষের ভোগ্যপণ্যের যে ব্যয়, সেখানে তার মোট ব্যয়ে চালের গুরুত্ব ৪০ থেকে ৩৫ শতাংশ। সেভাবে যদি আমি হিসাব করি তাহলে যে মূল্যস্ফীতির গড় সেটা কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষের ক্ষেত্রে ভিন্ন হবে। অনেক ক্ষেত্রেই সেটা আরও অনেক বেশি হবে। তবে এই প্রেক্ষিতে তৃতীয়ত যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, আমরা যদি দেখি রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি পাওয়া শুরু করে। সুতরাং মূল্যের স্তরটা কিন্তু ওপরে উঠে গেছে এবং এর ওপর ভিত্তি করে আমরা এখন মূল্যস্ফীতি হিসাব করছি। অর্থনীতিতে যেটাকে বলে বেজ ইফেক্ট। তো সেই বেজ ইফেক্টটা কিন্তু থেকে যাবে। আগামী সাত-আট মাসে মূল্যস্ফীতিটা যদি সাড়ে ১২ থেকে কমে আট শতাংশে নেমে আসে তাহলে আমরা হয়তো বলতে পারব যে, মূল্যস্ফীতি কমেছে, সেটা ওপরের একটা জায়গা থেকে হবে। ধরেন ১০০ টাকারটা ১১২ টাকা হয়েছে। তারপর মূল্যস্ফীতি যদি কমে আট শতাংশ হয় তাহলেও ওই ১১২ টাকারটা হবে তখন ১১৭ টাকা। তার মানে কি ১০০ টাকারটা হলো ১১৭ টাকা। তো এখন যদি আমি বলি যে মূল্যস্ফীতি কমেছে কিন্তু সেটা তো স্বস্তিকর না, কারণ ইতোমধ্যে মূল্য বেশ উপরের স্তরে আছে এবং সেখানে হয়তো মূল্য বাড়ার হারটা কমেছে। দাম কমছে না, বৃদ্ধির হারটা কমছে।

দেশ রূপান্তর: চাল ও চিনি ছাড়া বিশ্ববাজারে প্রায় সব খাদ্যপণ্যের দামই কমেছে। তবে উল্টোচিত্র বাংলাদেশে। কেন?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: এটা একটা বড় প্রশ্ন। আমাদের আশপাশের দেশগুলোতেও কমেছে। এখানে শ্রীলঙ্কার কথা বাদ দিলেও, মানে সেখানে তো ৬০ শতাংশের ওপরে মূল্যস্ফীতি চলে গিয়েছিল, পরে তারা সেটা কমিয়ে নিয়ে এসেছে। আমরা বিশ্ববাজারে

দেখি, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরুর পর জুলাই-আগস্ট পর্যন্ত মূল্য বাড়ার একটা প্রবণতা ছিল। তারপর আমরা চিনি, ফুয়েলের মতো দু-একটি পণ্য ছাড়া বাকি সবগুলোরই মূল্য কমেছে। মানে আমাদের আমদানিকৃত পণ্যগুলোর দাম কমার কথা। কিন্তু সেটা হয়নি। আমাদের স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রেও তাই। দেখা যাচ্ছে আমাদের উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত উভয় পণ্যের ক্ষেত্রেই মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতাটি রয়েই গেছে। এর পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে বলে মনে হয়। এর মধ্যে কয়েকটা আছে সরকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। আর কয়েকটা রয়েছে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি একটি কারণ হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা। এটা একটা বড় কারণ। উৎপাদন এবং আমদানি স্তর থেকে ভোক্তা স্তরে যেতে যে হাতবদলটা হয় সেখানে আমরা দেখছি যে, কিছু মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে এই বাজারটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সেখানে সরকারের কিছু কিছু সংস্থা মাঝে মাঝে চেষ্টা করছে। যেমন ভোক্তা অধিকারের কথা প্রথমেই বলেছি।

দেশ রূপান্তর: ভোক্তা অধিকার এখন ডাব বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে, খুচরা বিক্রেতার ভ্যানে রেইড দিচ্ছে। এর আগে দেখলাম ভোজ্যতেল বা পেঁয়াজের ক্ষেত্রে, তারপর ডিম..., এর পেছনে বাজার ঠিক রাখার চেয়ে কি ট্রেন্ডের দিকে ছোটার প্রবণতা রয়েছে?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: বিভিন্ন সময়ে তারা রেইড দিচ্ছে, সিচুয়েশন তৈরি হলে অভিযান চালাচ্ছে। এখন অভিযান চালিয়ে তো আর বাজার ব্যবস্থাপনা ঠিক করা যাবে না। রেইড বা অভিযান এক জিনিস আর বাজার ব্যবস্থাপনা আরেক জিনিস। এ দুটো একদমই আলাদা। একটা আইনি প্রয়োগ থাকতে হবে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বাজারে নজরদারি, খবরদারি করবে সেটা একটা। কিন্তু আমাদের কম্পিটিশন কমিশন বা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ধারাবাহিকভাবে এগুলোকে পর্যবেক্ষণে রাখা এবং কোনটা যৌক্তিক, কোনটা অযৌক্তিক সেটা বের করে সে অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা তৈরিতে সহায়তা করার যে জায়গাটা থাকার কথা সেটা কিন্তু আমরা দেখছি না। আগেই বলেছি আমাদের তথ্য-উপাত্তের বড় ধরনের অভাব আছে। আর কম্পিটিশন কমিশন যে আছে, সেটা তো আমাদের আগে নজরেই আসেনি। সম্প্রতি দেখলাম যে ডিমের বাজার নিয়ে তারা একটু চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। এসব কমিশন, সংস্থার কাজ কিন্তু অভিযান করা না। তাদের কাজ হচ্ছে এখানে মূল্য কতটা যৌক্তিক আছে সেটা দেখা এবং অযৌক্তিক মূল্য থাকলে, সিন্ডিকেট থাকলে অবশ্যই সেখানে তারা হস্তক্ষেপ করবে। এখানে আরেকটা বিষয় হলো, কোনটা অযৌক্তিক অভিযান আর কোনটা যুক্তিসংগত সেটা বোঝা যায় না। কারণ, তথ্য-উপাত্ত আমরা পাই না।

দেশ রূপান্তর: সিন্ডিকেটের বিষয়টা তো ওপেনসিক্রেট। সর্বোচ্চ মহলে এ নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে আসছে না, এটা কি রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: আমার মনে হয়, এখানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা দায়ী। অবশ্যই সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক উদ্যোগ ও উদ্যমের অভাব রয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বগুলো পালন করার প্রায়োগিক সক্ষমতাও দুর্বল। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা বড় একটা কারণ। এই বাজার ব্যবস্থাপনার মধ্যে কিন্তু তথ্য-উপাত্ত, গবেষণা করে সমস্যা ও সমাধান বের করার বিষয় রয়েছে। ভারতে অ্যাগ্রিকালচারাল কমোডিটির জন্য পারমানেন্ট প্রাইস কমিশন আছে, কারণ খাদ্যনিরাপত্তার বিষয়টি খুবই সেনসিটিভ, সরবরাহ থাকলেই হবে না, ক্রয়ক্ষমতারও ব্যাপার আছে।

দেশ রূপান্তর: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: আপনাকে ও দেশ রূপান্তরকেও অনেক ধন্যবাদ।

দেশ রূপান্তর
১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

বড় উদ্যোক্তারা সফল না হলে বাংলাদেশের রফতানি আজকের জায়গায় পৌঁছত না

মোস্তাফিজুর রহমান

রফতানি খাতে বড় উদ্যোক্তাদের ভূমিকা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

রফতানির ক্ষেত্রে আমাদের বড় উদ্যোক্তারা ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন। তৈরি পোশাক শিল্প তো আছেই, সেই সঙ্গে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস, হোম টেক্সটাইলসহ অন্যান্য পণ্যও রফতানি হচ্ছে। ছোট উদ্যোক্তাদেরও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। কিন্তু বড় রফতানিকারকরা উৎপাদনের সঙ্গেও জড়িত। তাই তারা রফতানি আয়ের পাশাপাশি কর্মসংস্থানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। রিজার্ভ ও মুদ্রামান স্থিতিশীল রাখা এবং বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়ানোর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছেন। বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি ব্যতিক্রম। আমাদের রফতানির প্রায় ৯০ শতাংশই শিল্পপণ্য। অন্যান্য দেশ বেশির ভাগ কাঁচামাল, ফুয়েল, তেল, মিনারেল রিসোর্সেস ইত্যাদি রফতানি করে। কিন্তু বাংলাদেশে যেহেতু শিল্পপণ্যের রফতানি বেশি, সেক্ষেত্রে শিল্পায়নেও বড় উদ্যোক্তাদের ভূমিকা আছে। বাংলাদেশ যে ৮০-৯০ দশকের বৈদেশিক সহায়তানির্ভর একটি দেশ থেকে বাণিজ্যনির্ভর একটি দেশে রূপান্তরিত হয়েছে, তার পেছনে তাদের ইতিবাচক ভূমিকা আছে।

রফতানি পণ্যের বৈচিত্র্যকরণে বড় উদ্যোক্তাদের ভূমিকা কী?

আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে তারা রফতানি পণ্যের বৈচিত্র্যকরণে আরো ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন। বিভিন্ন দেশের রফতানিকারকদের দেখা যায়, তারা একই পণ্য বিভিন্ন রেঞ্জে

রফতানি করেন। এতে তারা বাজার সম্পর্কে জানেন। বায়ারদের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক তৈরি হয়। তখন তারা অন্যান্য পণ্যও রফতানি করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এতে তাদের লাভ আরো বেশি হয়। কিন্তু আমাদের দেশে দেখছি, অনেক বড় উদ্যোক্তা দীর্ঘ সময় ধরে একই পণ্য রফতানি করছেন। এমনকি অন্তঃতৈরি পোশাক বৈচিত্র্যকরণেও তারা তেমন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু তৈরি পোশাকের মধ্যেও তো আরো বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। আরো বেশি ভ্যালু অ্যাডিশন করা যায়। ডিজাইন ও ফ্যাশনে বৈচিত্র্য আনা যায়। আমাদের দেশে সম্প্রতি বড় উদ্যোক্তাদের মধ্যে রফতানি পণ্য বৈচিত্র্যকরণের কিছু প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সুতরাং, পণ্য বৈচিত্র্যকরণের ব্যাপারে আমি বলব যে তৈরি পোশাকের ভেতরেও বৈচিত্র্য আনতে হবে। একই সঙ্গে তৈরি পোশাকের বাইরেও সম্ভাবনাময় রফতানি পণ্য খুঁজতে হবে।

তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে আমাদের তিন-চতুর্থাংশই কটন বেজড। কিন্তু গ্লোবাল মার্কেটে তিন-চতুর্থাংশই হলো মেন মেড ফাইবার। আমি আশা করি, আমাদের উদ্যোক্তারা আরো বেশি হারে মেন মেড ফাইবারের দিকে ঝুঁকবেন। এক্ষেত্রে সরকারের প্রণোদনা কাঠামোয় পরিবর্তন আনার মাধ্যমে রফতানি পণ্য বৈচিত্র্যকরণকে উৎসাহিত করতে হবে। তৈরি পোশাকের বাইরে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালস, প্লাস্টিক ও চামড়া খাতেও বড় ধরনের সুযোগ আছে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। আমরা যেহেতু তুলা উৎপাদন করি না, সেহেতু তৈরি পোশাক খাতে আমাদের নিট ভ্যালু অ্যাডিশন কিন্তু তুলনামূলক কম। কিন্তু পাট ও পাটজাত দ্রব্য, ফার্মাসিউটিক্যালস, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় মূল্য সংযোজন অনেক বেশি। শতকরা ৮০-৯০ ভাগ। ১০০ ডলার যদি আমি বিক্রি করি ৮০–৯০ ডলার আমার দেশে থাকে। যেখানে তৈরি পোশাকে থাকে মাত্র ৫৫–৬০ ডলার। তো নিট রফতানি তৈরি পোশাক ছাড়া অন্যান্য খাতে কিন্তু অনেক বেশি। আমি আশা করি, এসব জায়গায় উদ্যোক্তারা আরো সামনের দিকে এগিয়ে আসবেন। দেশের স্থানীয় মূল্য সংযোজন বেশি হলে কর্মসংস্থানও বেশি হয়। রফতানির ক্ষেত্রে সেবা খাতের উদ্যোক্তা তৈরিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে এখনো সেবা খাতের রফতানি অনেক কম। ভারত ১৫ হাজার কোটি ডলারের আইসিটি-নির্ভর সেবা রফতানি করে। অথচ আমরা ২০২৫ সালের মধ্যে মাত্র ৫০০ কোটি ডলারের আইসিটিনির্ভর সেবা রফতানি করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। গত বছর আমরা মাত্র ২০০ কোটি ডলারের মতো আইটি অ্যানাবলড সেবা রফতানি করেছি। সেবা খাতে উদ্যোক্তাদের আরো ভালোভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। ভারতের পরে আমাদের দেশেই ফ্রিল্যান্সার সবচেয়ে বেশি। সে তুলনায় কিন্তু আমাদের রফতানি এখনো অনেক কম। আবার টাকার অবমূল্যায়নের কারণে উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাও বেড়েছে। সেক্ষেত্রে তাদের একটি বাড়তি সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের রফতানির মাত্র ১২ শতাংশ যায় দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয়। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর রফতানি আয়ের

একটি বড় অংশই তো এশিয়া থেকে আসার কথা। এটিকে বলা হয় এশিয়ান সেঞ্চুরি। সেসব দেশের বাজারে কিন্তু আমরা এখনো উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবেশ করতে পারিনি। এসব বাজার থেকে আমরা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আমদানি করি। কিন্তু রফতানি মাত্র ১২ শতাংশ। এ জায়গাগুলোয় আমাদের কাজ করার সুযোগ আছে। এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত। এসব দেশের বাজারে রফতানি বাড়াতে হলে আমাদের যোগাযোগ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ— তিনটি বিষয়কে সমন্বয় করে সুযোগগুলো সৃষ্টি করতে হবে। পাশাপাশি ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ বাড়ানোর মাধ্যমে আমরা নিট রফতানি আয় বাড়াতে পারি। একই সঙ্গে আমাদের ফরোয়ার্ড লিংকেজ তথা মার্কেটিং বাড়াতে হবে। ভারত ও ভিয়েতনাম এরই মধ্যে সেখানে শক্ত অবস্থানে আছে। আমরাও ফরোয়ার্ড লিংকেজ নিশ্চিত করতে পারলে আরো বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারব।

রফতানি খাত শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কতটুকু সহায়ক হয়েছে? তারা কতটা উপকৃত হচ্ছে?

বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকদের শ্রমের ওপর রফতানি খাত দাঁড়িয়ে আছে। তাদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ ও শোভন মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। প্রথম দিকে যখন এ শিল্প গড়ে ওঠে, তখন অনেক ধরনের সমস্যা ছিল। ২০১৩ সালে আমরা রানা প্লাজার মতো ট্র্যাজেডি দেখেছি। কিন্তু তারপর কারখানার কর্মপরিবেশ, ফ্যাক্টরির নিরাপত্তা, আগুন, বিদ্যুৎ, অবকাঠামো ইত্যাদি বিষয়ের উন্নতি হয়েছে। এটি অবশ্যই ইতিবাচক। কিন্তু অনেক জায়গায় ট্রেড ইউনিয়ন নেই। এটি কিন্তু শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার। তা কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় স্বীকৃত নয়, আবার অনেক জায়গায় বাস্তবায়ন হয়নি। অনেক জায়গায় এটিকে নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করা হয়। এগুলো নেতিবাচক দিক। আর মজুরির ক্ষেত্রে বলতে হয়, শ্রমিকরা যে ন্যূনতম মজুরি পান, তা কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার খরচের তুলনায় অনেক কম। এটি একটি চ্যালেঞ্জ। কারণ রফতানিকারকদেরও মুনাফা করতে হবে, আবার শ্রমিকদের জন্যও শোভন মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে ও রফতানিতে ভ্যালু অ্যাডিশন করে এগুলো সমাধান করতে হবে।

শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের বেতন প্রতি বছর ৫ শতাংশ হারে বাড়বে। কিন্তু আমাদের তো এখন খাদ্য মূল্যস্ফীতিই সাড়ে ১২ শতাংশ। তার মানে তার ক্রয়ক্ষমতা অনেক কমে যাচ্ছে। এখন আবার নতুন মজুরি কমিশন গঠন করা হয়েছে। তারা ডিসেম্বরের মধ্যে হয়তো একটি নতুন মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করবেন। এটি মাথায় রাখতে হবে যে শ্রমিকদেরও সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হবে। কারণ তারা ভালো না থাকলে তো উৎপাদনও বাড়বে না। আরেকটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের বায়াররা কিন্তু

শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে খুবই সচেতন। এলডিসি গ্রুপ থেকে উত্তরণের পর এসব নজরদারি আরো শক্তিশালী হবে। এরই মধ্যে আইএলও আমাদের কর্মপরিবেশ নিয়ে বেশকিছু আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। এসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রমিকদের প্রতি যেন কোনো অন্যায়-অবিচার না হয়। শ্রমিকদের ভালোভাবে রাখতে পারলে আমাদের রফতানিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

রফতানি খাতে নতুন উদ্যোক্তাদের কী ধরনের সুযোগ দেয়া প্রয়োজন?

নতুন উদ্যোক্তারা যেন প্রতিযোগিতা সক্ষমভাবে করতে পারেন, সে পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। সেটি সামষ্টিক অর্থনীতির ওপরও নির্ভর করে। যদি মূল্যস্ফীতি অনেক বেশি হয়, তাহলে কিন্তু নতুন উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করতে অনুৎসাহী হবেন। তাই সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমরা দেখছি যে উদ্যোক্তারা বেশি ঋণ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করছেন। কারণ তারা বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন না। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে শ্রমিকরা অনেক বেশি মজুরি দাবি করছেন। ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তখন তাদের আর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা থাকে না। তাই সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হবে। মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি, ব্যবস্থাপনা, সুশাসন ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের প্রণোদনা কাঠামোকেও পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। মানসম্মত বিদ্যুৎ ও গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। ওয়ানস্টপ সার্ভিস অ্যাক্ট অনুযায়ী তরুণ উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আবার সেবা খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বড় সমস্যা আমাদের ইন্টারনেটের কম গতি এবং বেশি খরচ। সেক্ষেত্রে ইন্টারনেটের গতি ও গুণগত মান বাড়াতে হবে।

বণিক বার্তা
২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সরকার সিন্ডিকেটকে ধরতে চায় কি না, সেটিই প্রশ্ন

ফাহমিদা খাতুন

ড. ফাহমিদা খাতুন, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র নির্বাহী পরিচালক। ব্র্যাকের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান আটলান্টিক কাউন্সিলের নন-রেসিডেন্ট সিনিয়র ফেলো। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টডক্টরাল করেছেন। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সংকট ও উত্তরণের পথ নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।

প্রথম আলো: বিগত অর্থবছর সামগ্রিক অর্থনীতির জন্যই ইতিহাসের অন্যতম খারাপ অর্থবছর হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সরকার আসলে কী করছে?

ফাহমিদা খাতুন: সরকারের পক্ষ থেকে কিছু কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেগুলো আসলে সীমিত পদক্ষেপ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ওই পদক্ষেপগুলো যে আবার সঠিক, তা–ও নয়। সমস্যা অনুযায়ী যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ছিল, সেগুলোর প্রতিফলন অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাইনি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে সময়োপযোগী পদক্ষেপ না নেওয়া। দেখা যাচ্ছে, সমস্যা তৈরি হয়ে এত ঘনীভূত হয়ে গেছে, তারপর আমাদের হুঁশ হয়েছে যে কিছু একটা করা দরকার। সেদিক থেকে আমি মনে করি, যথেষ্ট পরিমাণে উদ্যোগ বা পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

প্রথম আলো: শ্রীলঙ্কা চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছিল। মূল্যস্ফীতি ৬৯ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এখন তা তারা ৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে এনেছে, যা আমাদের চেয়েও কম। শ্রীলঙ্কা পারল অথচ আমরা পারছি না কেন?

ফাহমিদা খাতুন: সংকট মোকাবিলায় শ্রীলঙ্কা এখন একটা মডেল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। সমস্যা যখন তৈরি হয়েছিল, সেটি যেমন ছিল একটা উদাহরণ, আবার সমস্যা থেকে তারা যেভাবে বের হয়ে এসেছে, সেটাও একটি উদাহরণ। সংকট মোকাবিলায় শ্রীলঙ্কা মূলত দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে—মুদ্রানীতি ও আর্থিক নীতি। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পৃথিবীজুড়ে আমরা দেখেছি যে সবাই মুদ্রানীতিকে ব্যবহার করেছে। মূল্যস্ফীতি বেড়ে অত্যন্ত বেশি হয়ে গেলে মুদ্রানীতিটাকে ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ ঋণের সুদের হারের ওপর হাত দিতে হয়। সেটিকে বাড়াতে হয়।

শ্রীলঙ্কাসহ অন্যান্য দেশ তা-ই করেছে। তারা সবাই ঋণের সুদের হার বাড়িয়ে দিয়েছে, যাতে বাজারে অর্থ কম যায়। টাকা মানুষের কাছে গেলে তারা তখন তা খরচ করতে থাকবে, যা মূল্যস্ফীতিকে আরও উসকে দেয়। সেখানে একটা লাগাম টেনে ধরতে হয়। কিন্তু আমরা সেটি করিনি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে একক কোনো পদক্ষেপ নিয়ে কিন্তু সমস্যার সমাধান করা যায় না, বিশেষ করে বহুমুখী সমস্যার ক্ষেত্রে। শ্রীলঙ্কা আর্থিক নীতি ব্যবহার করার পাশাপাশি রাজস্ব আদায়ের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। সেই সঙ্গে প্রশাসনিক ও সরকারি ব্যয় কমানোর দিকে মনোযোগ দিয়েছে।

প্রথম আলো: কয় দিন আগে এক প্রতিবেদনে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি কমে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ হবে। এডিবির এ পূর্বাভাসে আপনি কতটা আশাবাদী?

ফাহমিদা খাতুন: আমি খুব একটা আশাবাদী নই। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথমবারের মতো তাদের মুদ্রানীতিতে একটা কাঠামোগত পরিবর্তন এনেছে। সেটি হচ্ছে, এত দিন পর্যন্ত তারা মুদ্রা সরবরাহকে টার্গেট করে মুদ্রানীতি করত। কিন্তু এবার জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে মুদ্রানীতিটা করেছে, সেখানে তারা সুদের হারকে টার্গেট করেছে। মানে ওখানে হাত দিয়ে তারা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে। এখন সেপ্টেম্বর শেষ হতে চলেছে, মূল্যস্ফীতির হার কিন্তু আরও বাড়ছে এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়ে সাড়ে ১২ শতাংশে পৌঁছে গেছে। আগামী কয়েক মাসে যদি এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে, তাহলে পরিস্থিতি পরিবর্তন হবে বলে মনে করি না। তা ছাড়া শুধু সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি

ব্যবহার করে ফল আসবে না, যদি সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতি ব্যবহার করা হয়। আমাদের এখানে সেটিই ঘটছে। মুদ্রানীতি ও আর্থিক নীতির মধ্যে সমন্বয় নেই।

আরেকটি বিষয় যে মুদ্রানীতি তো স্থির কোনো বিষয় না। মুদ্রানীতি করা হলো, ঋণের সুদের হার বাড়ানো হলো, সেটি যদি আরও বাড়ানোর প্রয়োজন হয়, তা করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপের অনেক দেশে এমন পরিস্থিতিতে সুদের হার বাড়িয়ে দেওয়া হয়। আবার মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলে, কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখে। আবার যদি মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায়, সুদের হারের ওপর হাত দেয়। ফলে এভাবে অবস্থা বুঝে নীতি গ্রহণ করতে হবে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, বাজারে যদি পণ্যের সরবরাহ না থাকে, সুদের হার বাড়িয়েও তেমন কাজ হবে না।

দেশে উৎপাদিত আর বাইরে থেকে আমদানিকৃত দুই ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রেই কিন্তু দাম ঊর্ধ্বমুখী। দেশীয় উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহ আছে, কিন্তু উৎপাদক থেকে বাজার পর্যন্ত আসতে মধ্যস্বত্বভোগীদের কয়েকটি ধাপ পার হয়ে আসতে হয়। এতে দাম তো বাড়েই। এরপর কৃত্রিম সংকট তৈরি বা নানা কারসাজি করা হয়। আমদানির বেলায় দেখা যায়, গুটি কয়েক বড় কোম্পানি বা গোষ্ঠী পুরো বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। এখন এ বিষয়গুলোর জন্য বাণিজ্যবিষয়ক একটা নীতি গ্রহণ করতে হবে। আবার সব নীতির সমন্বয় না থাকলে মূল্যস্ফীতি রাশ টেনে ধরা মুশকিল হবে। আমদানির জন্য আরও কোম্পানিকে সুযোগ দিতে হবে। তখন স্বাভাবিকভাবে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি হবে। এতে পণ্যের মূল্য কমতে বাধ্য হবে। গত অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার ৯ শতাংশের ওপরে দেখেছি, সেখানে বাজারবিষয়ক অন্তর্নিহিত কারণগুলো ঠিক না করলে এ অর্থবছরে আগামী জুন মাসে মূল্যস্ফীতির হার নাটকীয়ভাবে নেমে আসবে না।

প্রথম আলো: জিনিসপত্রের মূল্য বেড়েই চলেছে। পণ্যের দাম বেঁধে দিয়েও ফল মিলছে না কেন? একেকটা সিন্ডিকেট বাজার থেকে শত শত কোটি টাকা তুলে নিচ্ছে। সরকার কিছু করতে পারছে না কেন?

ফাহমিদা খাতুন: সরকার চাইলে সবকিছুই করতে পারে, যদি সদিচ্ছাটা থাকে। কারা এই বাজার কারসাজি করছে, সরকার যে জানে না, এমন তো না। এখন তারা সিন্ডিকেট ভাঙতে চায় কি না, সেটিই প্রশ্ন। সেটি করতে গেলে আমদানিকারকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, পণ্য সরবরাহ, পণ্যের দাম ইত্যাদি একটি ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনতে হবে। এখন একটি পণ্যের দাম বাড়ল, তখন হইচই পড়ে গেল আর সেই পণ্যের জন্য দু-একটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এরপর আরেকটা পণ্যের দাম বাড়ে, এরপর আরেকটা। এভাবে চলতেই থাকে। এটি এ দেশে নতুন কিছু নয়। এখন সামগ্রিক একটা

ব্যবস্থাপনা বা কাঠামো থাকলে সিন্ডিকেটের সুযোগ নেওয়াটা কঠিন হয়ে যেত। সেই ব্যবস্থাপনা থাকলে, প্রয়োজনের মুহূর্তে দ্রুত পণ্য আমদানি করা সম্ভব হয়। কোন্ দেশের পণ্য আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে, কী ধরনের শুল্ক আরোপ করা হয়, কোন দেশ থেকে পণ্য আনতে কেমন সময় লাগবে— এ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। এখন পণ্যের দাম বাড়ে, আমদানির সিদ্ধান্ত ও দ্রুত পদক্ষেপ নিতে নিতেই ভোক্তার পকেট খালি হয়ে যায়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, পণ্যের দাম যখন অনেক বেড়ে যায়, তখন শুল্ক কমিয়েও পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়া যায়। তবে সেটার জন্য শক্ত নজরদারির প্রয়োজন হয়, যাতে সুবিধাটা ভোক্তারা পেতে পারে।

বাজার কারসাজি ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাও বাড়াতে হবে। যেমন প্রতিযোগিতা কমিশন বলে একটি প্রতিষ্ঠান আছে, যার কথা অনেকে জানে না। তাদের দক্ষতা ও মানবসম্পদ বাড়াতে হবে। আইনিভাবে এটিকে শক্তিশালী করতে হবে। তারা বিভিন্ন কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করে, কিন্তু সেগুলোর নিষ্পত্তি হয় না। সিন্ডিকেট করার কারণে শাস্তির বিধান থাকলেও তার বাস্তবায়ন আমরা দেখি না। শুধু জরিমানা দিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। আরেকটা হচ্ছে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরকেও শক্তিশালী করতে হবে, যাতে তারা কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। দোকানে দোকানে গিয়ে পাইকারি বা খুচরা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে তো লাভ নেই। দাম বেঁধে দেওয়া হলেও বেশি দামেই তাদের পণ্য কিনে আনতে হয়।

প্রথম আলো: বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা ছাপিয়েই যাচ্ছে। তা মূল্যস্ফীতিকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ ব্যাপারে অর্থনীতিবিদদের পরামর্শও তারা শুনছে না। টাকা ছাপানো ছাড়া কি আর কোনো পথ নেই?

ফাহমিদা খাতুন: আগে দেখতে হবে টাকা ছাপাতে হচ্ছে কেন। কারণ, সরকার বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে। সরকার তার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ কয়েকটি সূত্র থেকে যেমন বাণিজ্যিক ব্যাংক, সঞ্চয়পত্র বিক্রি থেকে টাকা নিয়ে থাকে। তবে সর্বশেষ পদক্ষেপ হচ্ছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে যাওয়া। কোনো সরকারই সেটি করতে চায় না। কারণ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া মানে সেটা টাকা ছাপিয়ে দিতে হয়। এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে কেন সরকারের ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ছে। কারণ, আমাদের আর্থিক নীতিটা হচ্ছে সম্প্রসারণমূলক। আমাদের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে বাড়তি ব্যয়ে। বিভিন্ন কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হয়, এতে ব্যয়ও বেড়ে যায়। জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কারণেও সেটি হয়, অপচয়ও হয়, দুর্নীতি-অনিয়ম তো আছেই।

আরেকটা হচ্ছে, সরকারের যে প্রশাসনিক ব্যয় বা পরিচালন ব্যয়, সেখানেও তো আমরা কোনো ধরনের কৃচ্ছ্রসাধন দেখি না। কৃচ্ছ্রসাধনের কথা বিভিন্ন সময় সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে বলা হয়েছিল কিন্তু তার কোনো প্রতিফলন আমরা দেখিনি। প্রায় সময় পত্রপত্রিকায় দেখি, বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ হয়নি, গাড়িসুবিধা বাড়ানো হচ্ছে, ভবন বানানো হচ্ছে, পদ না থাকলেও পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে। এখন সামনে নির্বাচন, তো এ সময় সরকার প্রশাসনের জন্য সন্তুষ্টিমূলক উদ্যোগ নিচ্ছে। ফলে সরকারের আকার যেমন বাড়ছে, ব্যয়ও বাড়ছে। এ ব্যয়ের ওপর লাগাম টানা হলে, সরকারকে তো ঋণ নিতেই হবে। এখন অন্যান্য ব্যাংক সরকারকে ঋণ দেবে নাকি ব্যক্তি খাতে ঋণ দেবে। এতে তারল্যের ওপর একটা চাপ তৈরি হয়। সে জন্য সরকার একটা সহজ উপায় বের করেছে, তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে চলে যাচ্ছে। এর জন্য টাকা ছাপাতে হচ্ছে, যা মূল্যস্ফীতিকে আরও উসকে দিচ্ছে।

প্রথম আলো: ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণে জর্জরিত। সরকারও ব্যয় মেটানোর জন্য ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নিচ্ছে। আবার ব্যাংকগুলোর সংকট সামাল দিতে তাদেরকে টাকা দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখানে যে তারল্যসংকট তৈরি হয়েছে, এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পথ কী?

ফাহমিদা খাতুন: কারণগুলোর মধ্যেই পথটা খুঁজে পাওয়া যায়। খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েই যাচ্ছে। বড় বড় ঋণগ্রহীতা, যাঁরা প্রভাবশালী, বিশেষ করে যাদের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগসূত্র তৈরি হয়েছে, তাঁদের কারণেই এটি বাড়ছে। তাঁরা ঋণ নিচ্ছেন এবং খেলাপি হচ্ছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁরা কি ব্যবসা করতে বা কোনো কলকারখানা গড়তে গিয়ে বা উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে ঋণখেলাপি হচ্ছেন? সেটা তো নয়। বরং আমরা শুনে থাকি, সেই ঋণের টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে। গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির প্রতিবেদন থেকে আমরা এই অর্থ পাচারের কথা জানতে পারি। কিন্তু সেটিও হালনাগাদ এবং সম্পূর্ণ তথ্য নয়। এত ঋণ নেওয়া হচ্ছে ব্যাংক থেকে, ব্যক্তি বা শিল্প খাতে এর বিনিয়োগের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। টাকাটা কোথায় যাচ্ছে আসলে?

খেলাপি ঋণের পরিমাণ বলা হচ্ছে ১ লাখ ৩১ হাজার কোটি টাকার মতো, কিন্তু চাপযুক্ত অর্থাৎ খুব দুর্বল অবস্থায় থাকা ঋণের পরিমাণ তো ৩ লাখ ৭৭ হাজার কোটি টাকার মতো। ব্যাংক খাতে মোট ঋণের পরিমাণের ২০ শতাংশের ওপরে খুব দুর্বল ঋণ। এর মানে আসল চিত্রটা বেশ কঠিন। এখন এ পরিস্থিতি থেকে বের হতে হলে প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। ব্যাংকগুলোকেও নীতি ও গাইডলাইন মেনে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে। এখন বিষয়গুলো সেভাবে হচ্ছে না, কারণ বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ থাকে। এর জন্য আসলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দরকার। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে সুদের হার ৯-৬ করে

বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, সেটি একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল। এখন যেটি মুদ্রানীতির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে এটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজেরই তো স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা।

প্রথম আলো: কিছুদিন আগে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'অর্থনীতি ভালো চলছে, সবার থেকে ভালো করছে। যাঁরা বলছেন দেশের অর্থনীতি ভালো নেই, তাঁরা অর্থনীতিই বোঝেন না।' এখন আবার সংকট নিরসনে অর্থনীতিবিদদের থেকে পরামর্শ নিতে তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে বসছে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়। বিষয়গুলো কীভাবে দেখছেন?

ফাহমিদা খাতুন: মনে হচ্ছে ওনার কাছে অর্থনীতি পড়তে হবে! অর্থনীতিবিদেরা তো অর্থনীতি বিশ্লেষণ করেন সরকারি তথ্যের ভিত্তিতেই। আর অর্থনীতির যে প্রতিঘাত তা কিন্তু সাধারণ মানুষ হাড়ে হাড়েই বুঝতে পারছেন। সাধারণ মানুষই ভালো বলে দিতে পারেন অর্থনীতি কতটা ভালো চলছে, কতটা খারাপ চলছে বা অর্থনীতি তাঁদের জীবনে কতটা প্রভাব ফেলছে। বাজারে গিয়ে দৈনন্দিনের পণ্য কিনতে যখন তাঁর পকেট খালি হয়ে যায়, বাজার তালিকায় কাটছাঁট করতে হয় বা অনেক কিছু না কিনে ঘরে ফিরতে হয়, তাঁরাই তখন বুঝে ফেলেন অর্থনীতিটা কেমন চলছে। যাঁরা চিকিৎসা বা পড়াশোনার জন্য বিদেশে যাবেন, তার জন্য যে ডলার প্রয়োজন, তা যখন পাওয়া যায় না, তখন তাঁরা বুঝতে পারেন অর্থনীতি কেমন চলছে। সুতরাং এখানে আমাদের নতুন করে বলার কিছু নেই। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য খুবই দুঃখজনক, অসংবেদনশীল ও বাস্তবতাবিবর্জিত।

এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করা শুরু হয়েছে, এটি খুবই ভালো উদ্যোগ। এটি আরও আগে শুরু করার দরকার ছিল। এখন অর্থনীতিবিদদের সুপারিশমালা তাদের নীতিমালায় প্রতিফলন ঘটবে, সেটাই প্রত্যাশা।

প্রথম আলো: আপনাকে ধন্যবাদ।

ফাহমিদা খাতুন: আপনাকেও ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রাফসান গালিব
প্রথম আলো
২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

গতিশীল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের শিল্পায়ন

ফাহমিদা খাতুন

মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল সম্পদে অপ্রতুল একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হিসেবে। কিন্তু নিন্দুকদের আশঙ্কা অসত্য প্রমাণ করে একের পর এক বাধা পেরিয়ে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। এই এগিয়ে যাওয়ার পথ রচিত হয়েছিল কিছু অভূতপূর্ব ঘটনা, অভিনব ভাবনা, ভবিষ্যৎমুখী পরিকল্পনা ও উদ্যোগে। আমরা ফিরে দেখছি বাংলাদেশের উজ্জ্বল সেসব মুহূর্ত।

গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতার সময় দেশটিকে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষির অংশ ছিল প্রায় ৬০ শতাংশ এবং শিল্প ও পরিষেবা খাতের অংশ ছিল খুব ছোট। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অংশ এখন ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশে নেমে এসেছে, যেখানে শিল্প ও সেবা খাতের অংশ যথাক্রমে ৩৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ এবং ৫৩ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশে শিল্পায়নের সাফল্যের কথা বলতে গেলে রপ্তানিমুখী, তৈরি পোশাকশিল্পের কথাই সবার আগে চলে আসে। রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোর মধ্যে তৈরি পোশাক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে বৈশ্বিক এবং দেশীয় নীতিমালা এ ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। শূন্য দশকের গোড়ার দিকে সরকার কয়েকটি শিল্পকে গুরুত্বপূর্ণ খাত (থ্রাস্ট সেক্টর) হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এর মধ্যে আছে সফটওয়্যার

এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, ফার্মাসিউটিক্যালস, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা এবং জাহাজনির্মাণ। রপ্তানিমুখী শিল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে এবং দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করেছে। নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করেছে তৈরি পোশাকশিল্প খাত। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২১–২৫) রপ্তানিমুখী শিল্প উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

যেসব ক্ষেত্রে সরকারি খাতের করপোরেশনগুলোর বিনিয়োগ বেশি ছিল, এমন ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ পরিচালনার দায়িত্ব বেসরকারি খাতকে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পনীতির উদ্দেশ্য কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে শিল্পায়নপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে খুবই দুর্বল জায়গা থেকে। ১৯৭০-এর দশকে বাংলাদেশ একটি আমদানি-প্রতিস্থাপন শিল্পায়ন কৌশল অনুসরণ করে। ১৯৭১–৭৫ সালে সরকারি খাতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয়। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প এবং বিদেশি শিল্পকে সরকারি খাতের বাইরে রাখা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের সংশোধিত শিল্পনীতিতে বিদেশি এবং স্থানীয় উভয় ক্ষেত্রেই বেসরকারি বিনিয়োগকারীকে সরকারি খাতের করপোরেশনগুলোর সঙ্গে সহযোগিতায় শিল্প স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যেখানে সরকারি এন্টারপ্রাইজগুলো প্রধান অবদান রাখতে পারত।

১৯৭৫ সালের পর শিল্পনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে উন্নয়ন ঘটানো। তাই উদার ঋণনীতির মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ১৯৭৮ সালের শিল্পনীতি সরকারি খাতকে সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডার হিসেবে বেসরকারি খাতের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। যেসব ক্ষেত্রে সরকারি খাতের করপোরেশনগুলোর বিনিয়োগ বেশি ছিল, এমন ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ পরিচালনার দায়িত্ব বেসরকারি খাতকে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

কাঠামোগত সমন্বয় নীতির অধীনে পরবর্তী দশকগুলোতে এসব শিল্পের বেসরকারীকরণ আরও গতি লাভ করে। ১৯৮২ সালের নতুন শিল্পনীতি এবং ১৯৮৬ সালের সংশোধিত শিল্পনীতি ও ১৯৯১ সাল থেকে বাণিজ্য উদারীকরণের পর্যায়ে শিল্পনীতিগুলো একটি বাজারভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির দর্শনের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল, যা রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির ওপর জোর দেয়। সরকারি খাতের ভূমিকা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছিল।

১৯৯৯, ২০০৫ ও ২০১০-এর শিল্পনীতিগুলো অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততাকে বাড়ানোর জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছিল। এই নীতির একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের বেসরকারীকরণ। এছাড়া

শিল্প খাতের রপ্তানিমুখীকরণ, শিল্পের প্রতিযোগিতার উন্নতি এবং শিল্প উন্নয়নের জন্য সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল, যাতে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপিতে) এই খাতের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো যায়। শিল্পায়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা, ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার সংস্কার, বাণিজ্য উদারীকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের উন্নয়ন, শিল্পায়নের সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, উৎপাদনশীলতা এবং পণ্যের মান বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির ওপর জোর দিয়ে শিল্পনীতি ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছিল।

একটি কার্যকর বাণিজ্যনীতি ছাড়া একটি সফল শিল্পায়ন সম্ভব নয়। তাই আমরা দেখতে পাই, শিল্পনীতিগুলো ক্রমে বাণিজ্যনীতির সঙ্গে পরিপূরক হয়েছে।

১৯৯০-এর দশকের পরের শিল্পনীতিগুলো শিল্প খাতের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বেশ কিছু কর্মসূচি চালু করেছিল। নীতি পদক্ষেপ এবং বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নীত করা হবে, এমন গুরুত্বপূর্ণ খাতের (থ্রাস্ট সেক্টরের) তালিকা প্রসারিত করা হয়েছে। এসব খাতকে বিশেষ প্রণোদনার মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়েছে। কৃষিভিত্তিক এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং কুটিরশিল্প মনোযোগ পেয়েছে। পূর্ববর্তী নীতির ধারাবাহিকতা হিসেবে, শিল্পনীতি ২০১৬-এর লক্ষ্য ছিল স্থানীয় চাহিদা মেটাতে এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রচারের জন্য আমদানি প্রতিস্থাপন শিল্প স্থাপন করা।

একটি কার্যকর বাণিজ্যনীতি ছাড়া একটি সফল শিল্পায়ন সম্ভব নয়। তাই আমরা দেখতে পাই, শিল্পনীতিগুলো ক্রমে বাণিজ্যনীতির সঙ্গে পরিপূরক হয়েছে। ১৯৮৫ সাল থেকে বাংলাদেশের বাণিজ্যনীতি বেশ পরিবর্তিত হয়েছে। বেশ কিছু বাণিজ্যনীতি সংস্কারের পর বাস্তবায়িত হয়েছে, যার মধ্যে বাণিজ্য, বিনিময় হার, মুদ্রা ও রাজস্ব নীতি প্রণোদনা অন্তর্ভুক্ত আছে। রপ্তানি উন্নয়নের জন্য রপ্তানি বাজারকে বৈচিত্র্যময় করার পরিকল্পনা করা, রপ্তানির গুণমান উন্নত করা, উচ্চ মূল্য সংযোজন রপ্তানিকে উদ্দীপিত করা, সংযোগ শিল্পের বিকাশ ঘটানো ইত্যাদি পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

এ ধরনের সংস্কারগুলো তৈরি পোশাকশিল্প খাতসহ বেশ কটি খাতের জন্য উপকারী ছিল। এসব সংস্কারের মধ্যে ছিল রপ্তানিকারকদের জন্য শুল্কমুক্ত উপকরণ আমদানি, ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিক প্রণোদনা, যেমন আয়করের ওপর ছাড় এবং আমদানিকৃত মূলধনি যন্ত্রপাতির ওপর শুল্ক রেয়াত প্রদান। ১৯৮০-এর দশক থেকে বাণিজ্য উদারীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের শুল্ক হার হ্রাস করা হয়। অশুল্ক বাধাগুলোও অনেকাংশে অপসারণ করা হয়েছিল, যেমন আমদানির ওপর পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি আমদানি করা যাবে না, এ রকম সীমারেখা অনেকাংশেই কমিয়ে আনা হয়।

বাংলাদেশে শিল্পায়নের অগ্রগতির প্রভাব অনেকভাবেই পড়েছে। জিডিপির প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি আয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এর অবদান উল্লেখযোগ্য। তবে এই খাতকে পরবর্তী পর্যায়ে যেতে হবে, যাতে অর্থনীতিতে এর মূল্য সংযোজন বাড়ে। এই রূপান্তর ঘটাতে হলে নীতিনির্ধারকদের বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রথমত, নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, দ্বিতীয় প্রজন্মের শিল্পনীতির প্রয়োজন আছে, যা একবিংশ শতাব্দীর উদীয়মান বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে। তাই শিল্পনীতিকে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নীতি, যেমন অর্থ, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ নীতির সঙ্গে সমন্বয় করা উচিত। যেহেতু বাংলাদেশ ২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হবে, তাই এসব নীতি পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং আরও কৌশলগত এবং বৈশ্বিক নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে, বিশেষ করে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে বাংলাদেশকে তার উৎপাদন পণ্যে বৈচিত্র্য আনতে হবে। এর জন্য আধুনিক খাতে বড় বিনিয়োগ প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত, বিনিয়োগবান্ধব নীতি থাকা সত্ত্বেও দেশি ও বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ খুব একটা বাড়ছে না। এটি আবারও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য শুধু নীতিই যথেষ্ট নয়। বিনিয়োগের সার্বিক পরিবেশ উন্নত করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্তগুলোর মধ্যে একটি হলো উন্নত ও পর্যাপ্ত অবকাঠামোসহ অন্য সীমাবদ্ধতাগুলো অপসারণ করা এবং লালফিতার দৌরাত্ম্য ও দুর্নীতি দূর করা। এসব ব্যবসার খরচ বাড়ায় এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমায়। অবকাঠামোগত ঘাটতি কমানোর প্রয়াসে সরকার বেশকিছু বড় প্রকল্প সম্পন্ন করেছে, কিছু চলমান। পদ্মা বহুমুখী সেতু এসব উদ্যোগের মধ্যে একটি, যা বিভিন্ন উপায়ে অর্থনীতির দক্ষতা বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এক শটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য এসবের দ্রুত সমাপ্তি প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, দক্ষ ও চৌকস মানবসম্পদ সরবরাহ জরুরিভাবে প্রয়োজন। আধুনিক শিল্পায়ন নির্ভর করে মানবসম্পদের মানের ওপর। সেখানেই বিনিয়োগ আসে, যেখানে দক্ষ লোক থাকে। বিপুল তরুণ জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে শিল্পের জন্য যোগ্য লোকের অভাব আছে। ফলে বেসরকারি সংস্থাগুলো প্রতিবেশী দেশগুলোর মানবসম্পদের ওপর ক্রমবর্ধমানভাবে নির্ভর করছে। অথচ দেশে বিপুলসংখ্যক বেকার যুবক আছে। শিক্ষা ও সক্ষমতা উন্নয়নে উচ্চতর সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ প্রয়োজন।

সবশেষে বলা যায়, ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে উৎপাদন এবং বিপণন একটি গতিশীল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এসব শ্রমবাজারকে ব্যাহত করবে। বিভিন্ন কাজে মানুষের শ্রমের প্রয়োজন সংকুচিত হচ্ছে। তাই মানবসম্পদকে পুনর্দক্ষ ও উন্নত করতে হবে, যাতে তারা বড় আকারের শিল্পায়ন থেকে উপকৃত হতে পারে। একই সময়ে ক্ষুদ্র শিল্পায়নে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য সহায়তা দেওয়া উচিত। এটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং দারিদ্র্য দূর করতে সহায়তা করবে।

প্রথম আলো
৫ নভেম্বর, ২০২৩

সস্তা শ্রমের পরিচয় নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে দীর্ঘদিন টিকে থাকা যাবে না

ফাহমিদা খাতুন

বাংলাদেশের অন্যতম আর্থ-উন্নয়নবিষয়ক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। তিনি বিশ্বের বৃহত্তম এনজিও ব্র্যাকের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য। এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাপ্রতিষ্ঠান আটলান্টিক কাউন্সিলের নন-রেসিডেন্ট সিনিয়র ফেলো। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের (আরএমজি) চলমান সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে সম্প্রতি বণিক বার্তার সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাবিদিন ইব্রাহিম।

চলমান বাজার পরিস্থিতি ও মূল্যস্ফীতি আমলে নিয়ে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি কেমন হওয়া উচিত?

বর্তমানে বাজারের অবস্থা এবং মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিলে প্রস্তাবিত ন্যূনতম মজুরি কাঠামোয় শ্রমিকদের জীবনধারণ সম্ভব নয়। অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ। খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত উভয় পণ্যের মূল্য আকাশচুম্বী। খাদ্য মূল্যস্ফীতি অক্টোবরে ১২ দশমিক ৫৬ শতাংশে পৌঁছেছে। সুতরাং বছরে ৫ শতাংশ হারে মজুরি বাড়িয়ে শ্রমিকদের জীবনধারণে স্বস্তি দেয়া যাবে না। বাজারে প্রতিদিনের পণ্যমূল্য দেখলে মূল্যস্ফীতির ভয়াল রূপটি উঠে আসে। আমরা নিম্নমধ্যবিত্তের বাজার সদাই পর্যালোচনা করে দেখেছি, মাছ-মাংস ছাড়াই খাবারের জন্য চার সদস্যের একটি পরিবারের মাসিক ব্যয় ৭ হাজার টাকার ওপরে। যদি সাধারণ খাবার খরচই এত হয় তাহলে বাড়ি ভাড়া,

যাতায়াত খরচ, শিক্ষা খরচ, চিকিৎসা ব্যয়সহ পরিবারের মোট ব্যয় কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! শ্রমিকরা ২৩ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি দাবি করেছিলেন। বাজারের সঙ্গে বিবেচনা করলে তাদের চাহিদা বেশি নয়। তবে মালিক পক্ষ বলছেন, তাদের তো মুনাফা বাড়ছে না। যেসব ক্রেতার কাছে তারা পোশাক বিক্রি করছে সেখান থেকে তারা বাড়তি দাম পাচ্ছেন না। যদিও ডলারের বিপরীতে টাকার যে অবমূল্যায়ন হয়েছে সেখানে তাদের রফতানি আয় বাড়ার কথা। কিন্তু তারা বলছেন কাঁচামালের আমদানি খরচ, পরিবহন ব্যয় বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ব্যয় ইত্যাদি বেড়েছে। তাই তাদের মুনাফা বাড়েনি। কিন্তু তাই বলে শ্রমিকের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম মজুরি বাজারের সঙ্গে সংগতি রেখে দেয়া যাবে না সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রমিকদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান ধরে রাখতে তাদেরকে একটি যৌক্তিক মজুরি না দিলে তৈরি পোশাক খাত টিকে থাকার ঝুঁকিতে থাকবে। কেননা পশ্চিমা দেশগুলো শ্রম অধিকার এবং মানবিক অধিকার নিয়ে সোচ্চার।

সম্প্রতি এক গার্মেন্টস মালিক বলেন, সরকারের প্রত্যেকটা বিভাগে, প্রতিটি জায়গায় ঘুস দিতে হয়। আগামীকাল থেকে বলুক যে ঘুস লাগবে না। আমরা শ্রমিকদের বেতন বাড়িয়ে দেব। ওই গার্মেন্টস মালিকের এ বক্তব্যের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

আমরা সবাই শুনে আসছি আমাদের দেশে ঘুস বা দুর্নীতির চর্চাটা অনেক বেশি এবং সরকারি সেবা পেতে সবাইকে অনেক কাঠখড় পোহাতে হয়। যদি কেউ ঘুস না দিতে চায় তাহলে তার কাজ বিলম্বিত হয় কিংবা কখনো কখনো কাজটা হয়ই না। এ টাকা দেয়াটাকে ঘুস না বলে অনেকে বলেন স্পিডমানি। নাম যা-ই হোক না কেন কাজ করাতে কিন্তু অর্থ দিতে হচ্ছে। এ ধরনের অর্থের লেনদেন বন্ধ করা এত সহজ নয়। যেহেতু এটা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। অনিয়মটাই নিয়মে পরিণত হয়েছে। এটা বন্ধ করতে হলে কঠোর হস্তে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অথচ সরকারি সেবার জন্য জনগণ তো কর দিচ্ছেই। তাহলে এ বাড়তি অর্থ কেন? পুরো প্রশাসনিক কাঠামোয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনতে হবে।

তৈরি পোশাক শিল্প খাত আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। কারণ আমরা শিল্পায়নকে এখনো বহুমুখী করতে পারিনি। আমাদের শিল্প খাত এই একটি খাতের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। শুধু শিল্প খাত নয়, আমাদের পুরো অর্থনীতির ভিত হচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের একটা বড় অংশ আসে এ খাত থেকে। এ খাতের বাধাগুলো দূর করতে না পারলে এবং খাতটিকে দুর্নীতি মুক্ত করতে না পারলে এ খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়বে না।

শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন না করলে মজুরি বাড়ে না কেন?

পোশাক কারখানার শ্রমিকদের জন্য একটি মজুরি বোর্ড গঠিত রয়েছে। যেখানে সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি থাকে। এই বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্য হলো, ত্রিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করা। প্রতি পাঁচ বছর পর পোশাক শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু দেখা যায়, শ্রমিকদের চাহিদার অনেক নিচে মজুরি বোর্ড মজুরি নির্ধারণ করে। আর এটি সরকার, মালিক ও শ্রমিকদের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় মজুরি বোর্ড হলেও শ্রমিকদের পক্ষে কেউ কথা বলে না। এমনকি সরকারও শ্রমিকদের পক্ষে থাকে না। সরকার মালিকদের চাপের মুখে শ্রমিকের স্বার্থ পুরোপুরি চায় না। তাই শ্রমিকদের রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হয়। কিন্তু তাতেও তাদের চাহিদাকে আমলে নেয়া হয় না। বরং দেখা যাচ্ছে শ্রমিকদের জীবনহানি হচ্ছে। শ্রমিকদের আন্দোলন বন্ধ করার জন্য সহিংস পথ অবলম্বন করা হচ্ছে। নিজের ঘাম আর শ্রমের বিনিময়ে পরিবার নিয়ে জীবনধারণের জন্য একটু বাড়তি মজুরি চাইতে গিয়ে জীবনটাই যদি চলে যায়— এর চেয়ে করুণ ঘটনা আর কী হতে পারে?

মালিক পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, তারা বিশ্ববাজারে বেশি দাম পাচ্ছেন না। এজন্য দাবি মোতাবেক বেতন বাড়াতে পারছেন না। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

যদি পোশাক কারখানার মালিকরা মুনাফা করতে না পারে তাহলে তাদের বিশ্ব ক্রেতাদের সঙ্গে দরকষাকষিতে যেতে হবে। বাংলাদেশের আর সস্তা শ্রমিকের দেশ হিসেবে বিশ্বে প্রতিযোগিতা করা উচিত নয়। সস্তা শ্রমের পরিচয় নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে দীর্ঘদিন টিকে থাকা যাবে না। কারণ শ্রমিককে ন্যায্য মজুরি দেয়া শ্রম অধিকার এবং কমপ্লায়েন্সের অংশ। কমপ্লায়েন্ট কারখানা মানে তো শুধু ভবনের নিরাপত্তা, আগুন-নিরাপত্তা, সবুজায়ন এসব নয়, শ্রমিকের নিরাপত্তাও এর অংশ। আমরা যদি শ্রম অধিকার আইন বাস্তবায়ন না করতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের রফতানি বাধার সম্মুখীন হবে। বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে। তখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি এবং এভরিথিং বাট আর্মস বা ইবিএর আওতায় বাজার সুবিধা চলে যাবে। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটার পরও যদি জিএসপি প্লাস সুবিধা পেতে চাই তাহলে আমাদের শ্রমিকের কল্যাণ, শ্রমিকের নিরাপত্তা, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। কিছুদিন আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধি দল এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পোশাক খাত কতখানি উন্নতি সাধন করেছে এবং সামনের দিনের প্রস্তুতি কেমন তা পর্যবেক্ষণ করতে এসেছিল। তারা যে সব ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেছে তা কিন্তু নয়। কেননা বাংলাদেশ এখনো

অনেক ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা তার মধ্যে অন্যতম। পাশাপাশি যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এ খাতের উৎপাদনশীলতাও বাড়াতে হবে। এর জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শ্রমিকের দক্ষতা বাড়াতে হবে। উন্নত ব্র্যান্ডের পোশাক তৈরিতে বিনিয়োগ করতে হবে।

আপনারা পোশাকের দাম বাড়ানোর কথা বলছেন? সেটা কীভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব?

আমরা শ্রমিক অসন্তোষ এবং বেতন বাড়ানোর ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে নিয়মিত আলাপ-আলোচনার ওপর জোর দিয়ে আসছি। এতে করে একে অন্যের মধ্যে আস্থার অভাব কমানো সম্ভব হবে। এ ধরনের আলোচনায় বিদেশি ক্রেতা ও ব্র্যান্ডদেরও আমন্ত্রণ জানানো উচিত যাতে তারা মাঠের বাস্তবতা ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে পারে। তারাও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে। নৈতিক ক্রয় এবং ন্যায্য মূল্য দেয়াটা তাদের নিজেদের কমপ্লায়েন্সের অংশ। ক্রেতারা যেন শুধু সস্তা পোশাক কেনার দিকে নজর না দেন। দেখা যায়, আমাদের নিজেদের পোশাক রফতানিকারকরাই নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে দাম কমিয়ে ক্রেতা আকৃষ্ট করেন। এ ধরনের প্রতিযোগিতা শুধু অসুস্থই নয়, তা শ্রমিকের কল্যাণবিরোধী। কেননা পোশাক কারখানার মালিকরা ক্রেতাদের কাছ থেকে দাম কম পাওয়ার অজুহাতে শ্রমিকদের কম বেতন দেয়ার যুক্তি তুলে ধরেন।

চলমান শ্রমিক আন্দোলন প্রলম্বিত হলে আমাদের কী কী ক্ষতি হতে পারে?

অবশ্যই! শ্রমিক আন্দোলন প্রলম্বিত হলে তো পোশাক শিল্পের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বেই। কারণ যে অর্ডারগুলো আছে সেগুলো তো সময়মতো পাঠাতে হবে। অর্ডারগুলো সময়মতো পৌঁছতে না পারলে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে, আমাদের বাজার হাত ছাড়া হতে পারে। মনে রাখতে হবে যে এখানে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ আছে। অনেকেই এ বাজারে ঢুকতে চাচ্ছে। তারা কিন্তু তাকিয়ে আছে কীভাবে বাংলাদেশের জায়গাটা নেবে। সুতরাং এ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে গেলে আমাদের চলবে না। কারণ এটা তো আমাদের অর্থনীতির একটা মেরুদণ্ড। সুতরাং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দেয়াটা অত্যাবশ্যক। যাতে তারা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারে। আরেকটা বিষয় দেখেছি, যখনই এ মজুরি নির্ধারণের সময় হয় তখনই সেটা প্রলম্বিত হয়। এবার ছয় মাস লেগে গেল মজুরি ঘোষণা করতে করতে। কিন্তু ছয় মাস তো জিনিসপত্রের দাম বসে নেই, মূল্যস্ফীতি বসে নেই। সুতরাং মজুরি ঘোষণার বেলায় কালক্ষেপণ বন্ধ করতে হবে।

সম্প্রতি ১২টি দেশ থেকে পোশাক প্রত্যাহারের খবর এসেছে গণমাধ্যমে। সরকারের পক্ষ থেকে যদিও তা অস্বীকার করা হয়েছে। এ রকম কোনো ঝুঁকি আছে কি?

এটা আমার কাছে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হয়। এর সঙ্গে অন্য কিছু যুক্ত করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশ এ শিল্পে নতুন নয়। যে রিটেইলার বাংলাদেশ থেকে পোশাক কিনেছে তার সঙ্গে অনেক দিনের ব্যবসা। যখন পোশাক বানানো হয় তখন কাপড়, রঙ, ডিজাইন, বোতাম, চেইন সবই তাদের নমুনা ও চাহিদা অনুযায়ী তৈরি হয়। হয়তো কোনো একটা অর্ডারে ত্রুটিপূর্ণ পোশাক গেছে। বিশ্বের বড় বড় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের গাড়ি কিংবা মোবাইল ফোনও তো ত্রুটিপূর্ণ হয়। বাজারে ছাড়ার পর তা বাজার থেকে তুলে ফেলা হয়। ঠিকঠাক করে আবার বাজারে ছাড়া হয়।

সম্প্রতি আপনারা সবুজ কারখানায় রূপান্তর নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। সবুজ কারখানা বলতে আপনারা কী বোঝাচ্ছেন?

সবুজ কারখানার ধারণাটি টেকসই পরিবেশের ধারণা থেকে এসেছে। আজকাল উন্নয়ন বলতে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোঝায় না। উন্নয়নটা কীভাবে হচ্ছে, এটি পরিবেশ নষ্ট করছে কিনা, সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে কিনা, সেগুলো বিবেচনা করতে হয়। কারখানার মধ্যে আলো-বাতাস ঠিকমতো আসছে কিনা, আশপাশে গাছপালা আছে কিনা, কারখানার সামনে জায়গা আছে কিনা, পানি অপচয় রোধে কারখানায় ব্যবহৃত পানি পরিষ্কার করে আবার ব্যবহার করা হয় কিনা, সেগুলো দেখতে হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কারখানায় কী ধরনের জ্বালানি ব্যবহার হচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে তারা নবায়নযোগ্য সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার বাড়াচ্ছে কিনা। এছাড়া কারখানা থেকে যে দূষিত পানি নদী-নালা-পুকুরে যাচ্ছে তা পরিষ্কার করার জন্য ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ইটিপি) রয়েছে কিনা তাও দেখতে হবে। কারখানা থেকে বের হওয়া পানি যাতে জনপদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব না রাখে। শুধু জনপদ নয়, খেয়াল রাখতে হবে যাতে পশুপাখি, কৃষিজমি নষ্ট না হয়। কারখানার মধ্যে যে কাপড় অবশিষ্ট থাকে তা থেকে ধুলো, বালি, ময়লা সৃষ্টি হয়। সেগুলো পুনর্ব্যবহার বা অন্য কিছু তৈরির ব্যবস্থা আছে কিনা, কারখানার বর্জ্য পরিষ্কারের ব্যবস্থা আছে কিনা—মোটা দাগে, এসব কর্মকাণ্ডই সবুজ পোশাক শিল্পের অংশ।

সবুজ কারখানা কী কারণে জরুরি বলে মনে করেন?

সবুজ কারখানা দুটো কারণে জরুরি। একটি হচ্ছে, আন্তর্জাতিকভাবে আমরা যেসব দেশে পোশাক পাঠাচ্ছি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সে দেশগুলোর অঙ্গীকার। জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বার্ষিক কনফারেন্স আয়োজন করে যেটিকে বলা হয় কনফারেন্স অব

পার্টির্জ বা কপ। সদস্য রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে উন্নত দেশগুলো ২০২১ সালে কপ২৬-এ প্রতিজ্ঞা করেছে যে ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনবে। কোনো কোনো উন্নয়নশীল দেশ ২০৬০ বা ২০৭০ সালের মধ্যে এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে চায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড মানুষের স্বাস্থ্য ও জীববৈচিত্র্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। বিশ্বের দেশগুলোর এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, কারখানা, নির্মাণ খাত, পরিবহন খাত, কৃষি, জ্বালানি—সর্বত্র কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব কমানোর উদ্যোগ চলছে। তারই অংশ হিসেবে পোশাক শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়া, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং বাজারজাতের সব ধাপে কার্বন নিঃসরণ কমানোর প্রচেষ্টা চলছে। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারেরও প্রতিজ্ঞা রয়েছে কার্বন নিঃসরণ কমানোর, যদিও বাংলাদেশের কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ খুবই কম। পরিবেশবান্ধব উৎপাদন এবং সর্বোপরি বাজার ধরে রাখার জন্য সবুজায়ন খুবই জরুরি।

সবুজ কারখানার সঙ্গে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার বিষয়ও জড়িত? শ্রমিক যদি সুস্থ না থাকেন তাহলে তিনি কাজ করবেন কীভাবে? সহকর্মীদের অসুস্থ করবেন এমনকি পুরো কারখানার কার্যক্রমও ব্যাহত করবেন। সবুজ কারখানায় তাই শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, ভালো খাদ্যের সংস্থান, তার সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও ডে-কেয়ার সুবিধা এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও স্বার্থ সংযুক্ত আছে কি সবুজ কারখানায়?

হ্যাঁ অবশ্যই। শ্রমিকের কল্যাণ সবুজ কারখানায় একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আসলে সবুজ কারখানা টেকসই উন্নয়নের একটি অংশ। টেকসই উন্নয়ন হতে হলে পোশাক খাতকে আরো উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে। যাতে রফতানি আয় বাড়ে, শ্রমিকের আয় বাড়ে। এটি টেকসই উন্নয়নের অর্থনৈতিক স্তম্ভ। দ্বিতীয় স্তম্ভটি হচ্ছে পরিবেশের উন্নয়ন। পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের লক্ষ্য হলো, প্রাকৃতিক সম্পদ যাতে বিনষ্ট না হয় এবং পরিবেশ দূষণ ও কার্বন নিঃসরণের ফলে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি না বাড়ে। টেকসই উন্নয়নের আরেকটি স্তম্ভ হচ্ছে মানবসম্পদের সামাজিক উন্নয়ন। অপরিচ্ছন্ন কারখানার ধুলোবালি, ময়লা শ্রমিকদের শ্বাসনালি ও ফুসফুসের সমস্যা সৃষ্টি করে। শ্রমিকের স্বাস্থ্যের কল্যাণ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া আরো বিষয় আছে। শ্রমিকের কল্যাণ বলতে তো শুধু এটিই নয়। তাদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার, শিক্ষার সুযোগ, পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার সুযোগ—এগুলোও টেকসই শিল্পের অন্যতম অনুষঙ্গ।

বণিকবার্তা
২০ নভেম্বর, ২০২৩

জ্বালানি রূপান্তরে দরকার রাজনৈতিক অঙ্গীকার

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
হেলেন মাশিয়াত প্রিয়তী

গত তিন দশকে বিশেষত এক দশককালে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উল্লেখযোগ্য অর্জনের মাধ্যমে শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করেছে। এরপরও খাতটি একটি কঠিন সময় পার করছে।

পাশাপাশি সবার জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা বজায় রেখে জীবাশ্ম জ্বালানির আধিপত্য থেকে জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ খাতকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কাঠামোতে রূপান্তরিত করার তাগিদ রয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানির আধিপত্যের কারণে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত বর্তমানে মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদি সংকটের সম্মুখীন।

এ সংকটগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অতিরিক্ত সক্ষমতা, আমদানি করা জ্বালানির আধিপত্য, আর্থিক বোঝা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতি ইত্যাদি। এসব সংকট মোকাবিলা করতে আগামী দিনে রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

জ্বালানির প্রাপ্যতা

বাংলাদেশ মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ২০২৩ সালে এখন পর্যন্ত মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬০৯ কিলোওয়াট ঘণ্টা। ২০২২ সালে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার ছিল ৪৬৪ কিলোওয়াট-ঘণ্টা।

নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বিদ্যুতের প্রাপ্যতা বেড়েছে। তবে যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সব মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা যাচ্ছে কি না, তা এখনো প্রশ্ন। কেননা সরকার কয়েক দফায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিশেষত গ্যাস, তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) এবং জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছে।

সরকার এ বছরের শুরুতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) আর্থিক বোঝা কমানোর জন্য বিদ্যুতের দাম তিন দফায় ৫ শতাংশ করে বাড়ায়। ইউনিটপ্রতি দাম ৭ টাকা ৪৯ পয়সা থেকে হয় ৮ টাকা ২৫ পয়সা। আমদানি করা এলএনজির বাজারদর বিবেচনা করে গত জানুয়ারিতে গ্যাসের খুচরা মূল্য ১৭৯ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর বোঝা ভোক্তাদেরই বহন করতে হচ্ছে।

জ্বালানি মিশ্রণ

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানি মিশ্রণে জীবাশ্ম জ্বালানির আধিপত্য রয়েছে। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনসক্ষমতার প্রায় ৯৬ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), কয়লা, ডিজেল, ফার্নেস অয়েলসহ বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য শক্তির অংশ ৪ দশমিক ৩ শতাংশ।

এ ধরনের জ্বালানি মিশ্রণ কোনোভাবেই জ্বালানি রূপান্তরে সরকারের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। অনেক আগে থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের সিংহভাগ ব্যবহার করা হয় বিদ্যুৎ খাতে। প্রাকৃতিক গ্যাসের অভ্যন্তরীণ মজুদ কমে যাওয়ার কারণে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোয় ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে।

দেশের গ্যাসক্ষেত্র থেকে ইতোমধ্যে ১৯ দশমিক ৯৪ ট্রিলিয়ন (লাখ কোটি) ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে। অবশিষ্ট মজুত ৮ দশমিক ৮২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, যা ১০ বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। অন্যদিকে গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আংশিকভাবে এলএনজি আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে এলএনজি সরবরাহ করা হয় মোট গ্যাসের চাহিদার প্রায় ২৬ শতাংশের সমপরিমাণ।

দেশীয় গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারমূল্যের চেয়ে কম। আমদানি করা এলএনজির দাম দেশীয় গ্যাসের তুলনায় অনেক বেশি।

দেশে আরও গ্যাস অনুসন্ধানের পরিবর্তে চাহিদা মেটাতে উচ্চমূল্যে এলএনজি আমদানির প্রবণতা রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে শুধু ১৯টি কূপ খনন করা হয়েছে, যা প্রয়োজনের

তুলনায় খুবই কম। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে বিপুল অঙ্কের অর্থ রয়েছে। তারপরও গ্যাস কূপ খননের কোনো বড় প্রচেষ্টা দেখা যায়নি।

সরকার ২০২৫ সাল নাগাদ নতুন ৪৬টি কূপ খননের পরিকল্পনা করেছে। সেটা হলে গ্যাস উৎপাদন ঘনফুট বাড়বে। এখন পর্যন্ত মাত্র আটটি কূপ (অন্বেষণ ও মূল্যায়নসহ উন্নয়ন) খনন হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ

বাংলাদেশে চলতি শতকের প্রথম দশকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্যাসের ওপর ভিত্তি করে করা হয়। তখন মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ছিল ৪ হাজার ২১০ মেগাওয়াট (জুন ২০০৪)।

২০০৬ সালে যখন রাজনৈতিক ক্ষমতার রদবদল হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন বিদ্যুৎ খাত বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সরকারি হিসাবে তখন চাহিদা ছিল প্রায় ৪ হাজার মেগাওয়াট। বেসরকারি হিসাবে তা ছিল প্রায় ৫ হাজার মেগাওয়াট। বিপরীতে গড়ে মাত্র ২ হাজার ৬৯৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো (২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারির হিসাব)।

২০০৯ সালের শুরুতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করে, তখন পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে গিয়েছিল। সেই সরকারের আমলে ১ হাজার ১৬৪ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে, অর্থাৎ গড় বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল ৩ হাজার ৬৪৬ মেগাওয়াট।

বিদ্যুতের ভবিষ্যৎ চাহিদা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে প্রধান অনুমান ছিল যে বাংলাদেশে প্রচুর অর্থনৈতিক ও শিল্প প্রবৃদ্ধি হবে, ফলে বিদ্যুতের চাহিদাও বাড়বে। তাই বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি–২০১৬) অনুযায়ী ২০২০ সালে বিদ্যুতের চাহিদা প্রক্ষেপণ করা হয় ১৩ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট। যার বিপরীতে ২০২০ সালে স্থাপিত উৎপাদনক্ষমতা ছিল ২০ হাজার ৩৮৩ মেগাওয়াট। সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল মাত্র ১২ হাজার ৭৩৮ মেগাওয়াট (নির্দিষ্ট একটি দিনে)।

২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ২৭ হাজার ৮৩৪ (অফ গ্রিড+অন গ্রিড) মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে আমাদের প্রয়োজনের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা

রয়েছে। কিন্তু জ্বালানিসংকটে তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তাই স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতার প্রায় অর্ধেক অলস বসে আছে।

বিদ্যুতের অব্যবহৃত উৎপাদনক্ষমতা ২০২৩ সালে ৩৬ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা ২০০৫ সালে মাত্র ৬ শতাংশ ছিল। অব্যবহৃত উৎপাদনক্ষমতার বিপরীতে পিডিবিকে বিপুল অর্থ ক্যাপাসিটি পেমেন্ট (ভাড়া) হিসেবে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে দিতে হচ্ছে। এই অর্থ অনেক ক্ষেত্রে সরকার সঠিক সময়ে পরিশোধ করতে পারছে না।

দেশে বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনের দৈর্ঘ্য বেড়েছে, তবে তা যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে, বিতরণ লাইন দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির হার বিগত বছরে কিছুটা ধীর হয়েছে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিসাবে, সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৬৭২ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইন দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ২৯ হাজার কিলোমিটারে।

সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন বৃদ্ধির মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে, এটাই দুর্বল লোড ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান কারণ। বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণের জন্য সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনকে শক্তিশালী করা জরুরি। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা আরও বাড়ানোর পরিবর্তে সরকারের উচিত 'স্মার্ট গ্রিড সিস্টেম' প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ করা, যাতে সৌর ও বায়ুর মতো পরিবর্তনশীল শক্তি গ্রিডে যুক্ত করা যায়।

ভর্তুকি ও আর্থিক দায়

বাংলাদেশের জ্বালানি খাত আমদানিনির্ভর হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার মজুতে চাপ পড়ছে। এ কারণে আমদানি করা জীবাশ্ম জ্বালানির মূল্য পরিশোধে সমস্যায় ভুগছে পেট্রোবাংলা। জ্বালানিসংকটের কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। বিদ্যুৎ খাতে বাড়তে থাকা ভর্তুকি সরকারের বোঝা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে, যা ভুল জ্বালানিকাঠামোর কারণে সৃষ্ট।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত জাতীয় বাজেট থেকে সর্বোচ্চ ভর্তুকি বরাদ্দ পেয়ে থাকে, যা মোট ভর্তুকির ৩৯ শতাংশ। এই ভর্তুকি মূলত ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি), ভাড়াভিত্তিক রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে বিপুল পরিমাণে 'ক্যাপাসিটি পেমেন্ট' দিতে নেওয়া হয়।

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ

নবায়নযোগ্য উৎস থেকে জ্বালানি উৎপাদনের বিষয়ে বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা–২০১০ অনুযায়ী, তখন নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ২৬৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছিল। সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ সরবরাহের ৫ শতাংশ এবং ২০২০ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য ঠিক করেছিল। যদিও তা এখনো অর্জিত হয়নি। বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ১ হাজার ১৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে, যা মোট সরবরাহের মাত্র ৪ দশমিক ৩ শতাংশ।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিষয়ে বাংলাদেশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার করেছে। প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের মধ্যে জ্বালানি রূপান্তরের মাধ্যমে ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি অর্জনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমন্বিত মহাপরিকল্পনার (আইইপিএমপি) খসড়ায় ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি অর্জনের প্রতিশ্রুতি সংশোধন করে '২০৪১ সালের মধ্যে ক্লিনার এনার্জি থেকে ৪০ শতাংশ' করা হয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তন সরকারের এ বিষয়ে অবস্থানকে দুর্বল করে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে।

অবশ্য বর্তমান সরকার ১ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২২টি নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ২০২৩ সালে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে প্রায় ৩৭ কোটি ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ পেয়েছে। তবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দ্রুত প্রসারের জন্য বাংলাদেশে আরও বেশি দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা প্রয়োজন।

নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে জ্বালানি রূপান্তর

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতসম্পর্কিত বেশ কয়েকটি মূলনীতি, আইন এবং বিধি রয়েছে। সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনা পাঁচ বছরের জন্য এই খাতের দিকনির্দেশনা ঠিক করে থাকে। মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে

বাংলাদেশের জ্বালানি স্বাধীনতা, সুরক্ষা ও নিশ্চয়তা অর্জন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্য অর্জন করতে প্রণীত হয়। এ পরিকল্পনায় ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য শক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সরকারের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ একটি ত্রুটিপূর্ণ আইন। কারণ, এ আইনের আওতায় সরকার প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়া ছাড়াই ঠিকাদার নিয়োগ করে। আইনটির ধারাবাহিকতা বাংলাদেশে অপ্রতিযোগিতামূলক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সৃষ্টি এবং জ্বালানি রূপান্তরে বাধা হিসেবে কাজ করছে।

সর্বোপরি, বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের নীতিকাঠামো এখনো ‘কার্বন লক-ইন’ (জীবাশ্ম জ্বালানিতে আটকে থাকা) সমস্যার পক্ষে রয়েছে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে উত্তরণসংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। একটি সংগতিপূর্ণ নীতি সংস্কার ছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে জাতীয় নির্ধারিত মানদণ্ডে (এনডিসি) উল্লিখিত নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার করে জ্বালানি রূপান্তর অর্জন করা সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে উত্তরণে নীতি পরিবর্তনের বিষয়ে চারটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর স্পষ্ট অবস্থান প্রয়োজন— ক. দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার, খ. স্পষ্ট নীতি নির্দেশনা, গ. নির্দিষ্ট দায়িত্বসহ একটি নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং ঘ. পরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষ বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ।

রাজনৈতিক দলগুলো জ্বালানিনীতি পরিবর্তন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী ধরনের পরিকল্পনা, নীতি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে, তা রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রথম আলো
১১ ডিসেম্বর, ২০২৩

অর্থনীতিতে চ্যালেঞ্জ অনেক, সমন্বয় জরুরি

মোস্তাফিজুর রহমান

দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, রেকর্ড খেলাপি ঋণ, ব্যাংক খাতে তারল্য সংকট, সরকারের ধারের প্রবণতা বৃদ্ধিসহ নানামুখী সংকট নিয়ে ঘটনাবহুল ২০২৩ সাল পার করছে বাংলাদেশ। এসব সংকট আগামী ২০২৪ সালেও রয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে, যা দেশের অর্থনীতিতে আরও বেশি ঝুঁকি বয়ে আনতে পারে। অর্থনীতির চলমান সংকট ও তা মোকাবিলার কৌশল নিয়ে দেশ রূপান্তরের নিজস্ব প্রতিবেদক ইমদাদ হোসাইনের সঙ্গে কথা বলেছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের সম্মানীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান।

দেশ রূপান্তর: দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশের বাজারে ডলারের যে সংকট চলছে তার নেপথ্য প্রধান কারণ কী?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: একটি দেশ বিদেশি মুদ্রা বিশেষ করে ডলার সংকটে তখনই পড়ে যখন মুদ্রাটির চাহিদা ও জোগানে মিসম্যাচ তৈরি হয়। আমাদের দেশে ডলারের যে সরবরাহ আসে সেটা মূলত রপ্তানি, প্রবাসী আয়, বিদেশি বিনিয়োগ, বিদেশি ঋণ থেকে। এগুলো আমাদের সরবরাহের জায়গা। আর চাহিদার দিকটা হলো আমাদের আমদানি, বিভিন্ন বিদেশি মুদ্রায় আমাদের যে পেমেন্ট করতে হয়, ঋণ পরিশোধ করতে হয় ইত্যাদি। এখন আমাদের সামষ্টিক অর্থনৈতিক যে চাপ সেটির কারণে দেখা যাচ্ছে যে, গত দেড় বছর ধরে চাহিদা এবং জোগানের মধ্যে একটি ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে। এটির প্রথম কারণ ছিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরে যখন হঠাৎ করে বিভিন্ন পণ্যের দাম

বেড়ে গেছে তখন আমাদের বাণিজ্য ভারসাম্য অনেক বেশি নেতিবাচক হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, সেটিকে আমরা কিছুটা সামাল দিলেও আর্থিক খাতে যে ভারসাম্যটা ছিল সেটির মধ্যে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এটি আগে ইতিবাচক ছিল। সেখানে যে বিদেশি মুদ্রা আসত, সেটি আমরা বিভিন্ন ক্রেডিটের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারতাম। কিন্তু সেখানে যে লেনদেন সেটি এখন ইতিবাচক থেকে ঋণাত্মকের ঘরে চলে গেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমাদের চাহিদা এবং জোগানের যে ভারসাম্যের মাধ্যমে বিদেশি মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যায় সেখানে জোগান তুলনামূলকভাবে কমে গেছে।

এর ফলে আমরা চাহিদা সংকোচন করছি এবং আমদানি সাত বিলিয়ন ডলার থেকে সাড়ে পাঁচ বিলিয়নের মধ্যে নামিয়ে নিয়ে আসছি। কিন্তু সেটিও আমরা সামাল দিতে পারছি না। এখন আমাদের রপ্তানি, প্রবাসী আয় বাড়িয়ে এটি সমন্বয় করতে হবে। কিন্তু বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হার অনেকদিন ধরে রাখার ফলে চাহিদা জোগানের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। এখন টাকার অবমূল্যায়ন করেছি অনেকটুকু, কিন্তু সেটিও যথেষ্ট পরিমাণে আমরা করিনি। যদি আরও অবমূল্যায়ন করি তবে চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্যহীনতা কিছুটা কমিয়ে এনে একটা স্থিতিশীলতায় আনতে পারব। ইতোমধ্যে কিছুটা দরপতন হয়েছে। এর ফলে আমদানি সংকোচনের একটা অভিঘাত পড়েছে। প্রভাব পড়েছে আমদানি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে। সামষ্টিক অর্থনীতিকেও একটি ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আমি বলব সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং সঠিক সময়ে টাকার বিনিময় হারের অবনমন না করার ফলে এ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি।

দেশ রূপান্তর: ডলার সংকট উত্তরণের করণীয় কী হবে?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে। টাকার অবমূল্যায়ন যতটুকু হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। বিনিময় হার বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করার যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে সেটি আরও অব্যাহত রাখতে হবে। দরপতনের ধারা আরও বজায় রাখতে হবে। এটার একটি কস্ট (ব্যয়) আছে, আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতিকে রাজস্ব নীতির সঙ্গে সমন্বয় করে সেটি কিছুটা সামাল দিতে হবে। সেটি অবশ্যই মুদ্রানীতি এবং রাজস্ব নীতির সমন্বয় করে। এখন বিদেশি মুদ্রার মানকে বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করার নীতিকে আরও সামনের দিকে নিতে হবে। এটার প্রভাব অবশ্যই আমাদের অর্থনীতিতে পড়বে। এটিকে মেনে নিয়েই কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সমন্বয় করছে, আরও সমন্বয়ের দরকার হবে। এটি আমদানিকেও আরেকটু সংকুচিত করতে সাহায্য করবে। টাকার অবমূল্যায়ন আরও করা হলে রেমিট্যান্সের ওপর একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। ডলারের দামের পার্থক্যের কারণে কিছু টাকা ইনফরমাল (অপ্রাতিষ্ঠানিক)

চ্যানেলে চলে গেছে, তা যদি প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যমে আনা যায় তাহলে সরকারের এবং ব্যাংকিং খাতের প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার মতো যে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে সেটিও আর লাগবে না। রপ্তানি সক্ষমতা বাড়বে। সুতরাং নতুন একটি ভারসাম্যে যেতে হবে। এটিতে পেইন আছে। কিন্তু সেটি বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করলে আরেকটি নতুন ভারসাম্যে পৌঁছাবে।

দেশ রূপান্তর: ব্যাংকগুলোতে তারল্য সংকট প্রকট, নতুন বছরে এই সমস্যা অব্যাহত থাকলে কী হতে পারে?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: তারল্য সংকট অব্যাহত থাকলে তো অবশ্যই অর্থনীতির ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বাড়বে। অর্থনীতির ঝুঁকি এড়াতে সুদ ও বিনিময় হারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলোকে যৌক্তিক পরিণতির কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। যদিও টাকার মূল্যমান বাজারের চাহিদা জোগানের সঙ্গে সমন্বয় করাসহ বেশকিছু সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সুদের হারকেও বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। কিছুটা বাংলাদেশ ব্যাংক করছে। কিন্তু এটি আরও বাজারমুখী করতে হবে। তাহলে সঞ্চয় বাড়বে। ইতোমধ্যে আমরা দেখছি যে, সঞ্চয়ের ওপর সুদের হার বাড়ার ফলে ব্যাংকিং খাতে একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। সেক্ষেত্রে এটিকে অব্যাহত রাখতে হবে। তবে এর অন্য দিক হলো— ঋণের সুদহার বাড়বে এবং বিনিয়োগের ওপরে তার একটা প্রভাব পড়বে। বিনিয়োগকারীদের অন্যান্য যেসব খরচ আছে তার মধ্যে সুদের হার কেবল একটা উপাদান। কস্ট অব ডুয়িং বিজনেসসহ ব্যবসার খরচের অন্য যেসব উপাদান আছে, চেষ্টা করতে হবে সেগুলোকে কীভাবে কমানো যায়। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, বিলম্ব হওয়া এগুলোকে চিহ্নিত করে অন্যান্য আরও কিছু খরচ আছে সেগুলো কীভাবে কমানো যায় তা ভাবতে হবে।

দেশ রূপান্তর: বাংলাদেশ ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তারল্য সংকোচনের যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তা সঠিকভাবে কাজ করছে কি না?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: তারল্য সংকটের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক একটা পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া বন্ধ করেছে। সরকারকে দেওয়া এই বড় ঋণের নেতিবাচক পরিণতির কারণে মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিচ্ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে সুদের হার বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করার মাধ্যমে চাহিদা এবং জোগানের নতুন ভারসাম্য সেখানে আনতে হবে। একই সঙ্গে সেটিকে সঞ্চয়ের মধ্যে অব্যাহত রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে প্রণোদনার বিষয়ে নেওয়া পদক্ষেপগুলোকে অব্যাহত রাখতে হবে এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ঋণ পেতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন যাতে না

হয় সেটিও খেয়াল রাখতে হবে। বাজারের সঙ্গে সুদের হার সমন্বয় করলে অবশ্যই ঋণ নেওয়ার খরচ হার বাড়বে। আমি বলব ক্ষুদ্র, মাঝারি যারা আছে তাদের যে স্কিমগুলো আছে সেগুলো চালু রাখতে হবে। ক্ষুদ্রঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের যে সহায়তা রয়েছে তা সমান্তরাল রাখতে হবে।

দেশ রূপান্তর: বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে সুদের হার বাড়ছে, এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে মূল্যস্ফীতি আরও উসকে দেবে কি না?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে। একদিকে সুদের হার বৃদ্ধির কারণে ব্যবসার খরচ বাড়বে। অন্যদিকে ঋণও কিছুটা সংকুচিত করবে। মূল্যস্ফীতির আরেকটা বড় কারণ টাকার মান কমে যাওয়া। তবে এসব কারণেই যে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে, তা নয়। আমদানি স্তর থেকে ভোক্তা স্তর, উৎপাদক স্তর থেকে ভোক্তা স্তরের যে সরবরাহ চেইনে প্লেয়াররা কাজ করেন তারাও নিজেদের ক্ষমতাবলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে দেন। নজরদারি, খবরদারি, প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা আইনের প্রয়োগ, প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যক্রম শক্তিশালী করা, ভোক্তা অধিদপ্তরের কার্যক্রম শক্তিশালী করার পাশাপাশি যারা এসবের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন সেসব মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে মূল্যস্ফীতির চাপ কিছুটা সামলে নিতে পারব আমরা। মূল্যস্ফীতির কারণে জনসাধারণ বিশেষত স্বল্প আয়ের মানুষের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। এর জন্য আমাদের সামাজিক সুরক্ষা নিয়ে কাজ করার আওতা আরও বাড়াতে হবে।

চাপটা কিছুটা আমরা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে পারব। চলমান যে নীতি ভারসাম্য তা স্বল্প আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপরে এটা একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ছেই সেটা তো সামাল দেওয়ার জন্য সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোকে আরও শক্তিশালী করারও প্রয়োজন পড়বে। চলমান যে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপরে সেটি বিভিন্ন রাজস্বনীতি এবং সরকারি সহায়তানীতি, সামাজিক সুরক্ষানীতি এগুলো দিয়ে সামাল দিতে হবে।

দেশ রূপান্তর: একদিকে সংকোচনমূলক নীতি অন্যদিকে ব্যাংকগুলোকে বিপুল অঙ্কের টাকা ধার দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সরকার মাঝখানে কয়েকদিন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়নি, এখন আবার সংকটে ঋণ নেওয়া শুরু করেছে। ফলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ ব্যাহত হবে কি না?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: কিছুটা তো সেটির ওপর প্রভাব পড়বেই। মাঝখানে কিছুটা কমিয়েছে, এটা এখন আবার ব্যাংকের তারল্য সংকটের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে

ঋণ নিচ্ছে। তবে যতটা সম্ভব চেষ্টা করতে হবে ব্যাংকের যে ঋণ মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিচ্ছে সেটাকে যতটুকু সংযত রাখা যায়। বরং সুদের হার বাড়ালে সঞ্চয়ের ওপর যে ইতিবাচক প্রভাবটা পড়বে ব্যাংকের যে তারল্য প্রবাহটা আসবে সেই বাজার সমন্বয় নীতি অব্যাহত রেখে সামাল দিতে হবে।

দেশ রূপান্তর: সরকারের ঋণপ্রাপ্তি কমে গেছে, প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বলতার কারণে অর্থছাড়ও করতে পারছে না। এটি কীভাবে দেখছেন?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীরগতি এটা আমাদের বৈদেশিক ঋণ হোক বা অভ্যন্তরীণ ঋণ হোক, তা তো আমাদের অনেক দিনেরই সমস্যা এবং এই সমস্যা বছরের পর বছর চলছে। তবে এই সময়ে দ্রুত বাস্তবায়ন, সঠিক সময়ে বাস্তবায়নের দিকে নজর দিতে হবে এবং এটা যাতে সুশাসনের সঙ্গে সাশ্রয়ী হয়। আমাদের কিন্তু বৈদেশিক ঋণ পরিষেবার চাপের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধের চাপও বাড়ছে। এই সময়ে সরকারি ব্যয়, প্রকল্প ব্যয় এগুলোর কিছুটা শর্ত সংকোচন করার নীতি সরকার নিয়েছে, আমার মনে হয় সেটি ঠিক আছে। যে প্রকল্পগুলো শেষ করার কথা সেগুলো দ্রুত শেষ করতে হবে এবং প্রকল্পের খরচ যাতে না বাড়ে সেটাও আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। পাইপলাইনে যেসব বিদেশি ঋণ আছে সেগুলো দ্রুত ছাড় করতে পারলে আমাদের ব্যালেন্স অব পেমেন্টস ও বৈদেশিক যে ভারসাম্য তাতে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টে ইতিবাচক একটি প্রভাব পড়বে। পাইপলাইনের প্রকল্পগুলো যাতে আমরা দ্রুত টাকা ছাড় করতে পারি, বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টের ওপর সর্বসাকুল্যে মোট ব্যালেন্সের ওপরই এর প্রভাবটা পড়বে। তবে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ঋণের পরিশোধের দায়ভার কিন্তু খুব দ্রুতহারে বাড়ছে সেখান থেকে নিজস্ব রাজস্ব আহরণ কীভাবে বাড়াতে পারি এবং সেটার উদ্বৃত্ত দিয়ে কীভাবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির একটা অংশ বাস্তবায়ন করতে পারি সেদিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

দেশ রূপান্তর: নতুন বছরে অর্থনীতির জন্য কী ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলো কীভাবে মোকাবিলা করা হবে?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: নতুন বছরে চ্যালেঞ্জ অনেকগুলো। প্রথমত, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসা। দ্বিতীয়ত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা। মনে রাখতে হবে মূল্যস্ফীতি ইতোমধ্যে উচ্চস্তরে চলে আসছে। সুতরাং মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা কমালেও মূল্য স্তর কিন্তু ওপরের দিকে থাকবে। সুতরাং সেখানে সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থান তাদের স্বস্তি দেওয়ার একটি বড় চ্যালেঞ্জ আমার মনে হয় থাকবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন সঠিক সময়ে দক্ষতার সঙ্গে করার চ্যালেঞ্জটাও থাকবে। বিনিময় হার, সুদের হার সেগুলোকে বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করা, সেগুলো থেকে ইতিবাচক ফলাফলগুলোকে নিশ্চিত করা, নেতিবাচক দিকগুলোকে সামাল দেওয়া এবং সামষ্টিক অর্থনীতিকে নতুন একটি ভারসাম্যের দিকে নিয়ে যাওয়াই হবে অন্যতম করণীয়। সেটি হবে বড় চ্যালেঞ্জ। এটি করতে যেসব প্রতিষ্ঠান নীতি বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত, প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত সেগুলোর ওপর জোর দিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংককে স্বাধীনভাবে তার মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করতে হবে। যাতে করে মূল্যস্ফীতিটা কমিয়ে ভারসাম্য এবং বৈদেশিক মুদ্রার ব্যালেন্স বাড়াতে পারি। এক কথায় সামষ্টিক অর্থনীতির যে ব্যবস্থাপনা আছে সেটার দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও উৎকর্ষতার দিকেও নজর দিতে হবে। সর্বস্তরের সুশাসন এবং সরকারি সেবা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা বাড়াতে হবে।

দেশ রূপান্তর: আইএমএফের যেসব সংস্কার প্রস্তাব ছিল সেগুলো কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে বলে মনে করেন?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: এখন আইএমএফের পরামর্শ ও শর্ত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন নিয়মনীতি প্রণয়ন করা, সেগুলো ডাইরেক্ট ট্যাক্স অ্যাক্ট, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্ট এবং ব্যাংকিং অ্যাক্টগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সুদের হার এবং বিনিময় হারকে বাজারের সঙ্গে সমন্বয় করার যে পদক্ষেপ সেটিকে এখন আরও দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে আইএমএফ পরামর্শ দিচ্ছে বলেই নয়, দেশের অর্থনীতির স্বার্থে এটা করতে হবে। আমরা যদি নিজেরা নিজেদের মনে না করি যেমন, ব্যাংকিং আইন আমরা পাস করলাম। ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে খুব ভালো কিন্তু এগুলো যদি আইএমএফের পরামর্শ হিসেবে নিই, নিজেরা যদি ব্যাপারটাকে নিজেদের স্বত্ব হিসেবে মনে না করি তাহলে বাস্তবায়নে দুর্বলতা থেকেই যাবে। কেবল আইন প্রণয়ন করলেই হবে না, সেটি প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে হবে এবং সেদিকটাতে মনে হচ্ছে বেশি নজর দিতে হবে। আইএমএফের শর্ত তো আছেই, সেটি আমাদের কিস্তি পাওয়ার জন্য দরকার। অন্যান্য যেসব বিদেশি আছেন তাদেরও যাতে আস্থা আমাদের ওপর থাকে। আমাদের ঋণ যেগুলো পাওয়ার কথা সেগুলো যাতে আমরা পাই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমরা নিজেরা যাতে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করি এবং বাস্তবায়ন করি। কারণ শুধু পরামর্শ হিসেবে নিলে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থেকে যায়। অতীতেও আমরা দেখেছি যে কাজটি করতে চাই সেটি আর করা হয় না। সেদিক থেকে আমাদের নিজেদের অর্থনীতি যে একটা ঝুঁকির দিকে আছে সেটিকে স্বীকার করে যেসব পদক্ষেপ সেসব বাস্তবায়নের জন্য আমাদের জোর অগ্রাধিকার দিতে হবে।

দেশ রূপান্তর: অনেকেই আশঙ্কা করছেন দেশের অর্থনীতি আরও প্রকট আকার ধারণ করবে, আপনার গবেষণা কী বলে?

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: আমরা যদি ঠিকভাবে পদক্ষেপ নিই, বিশেষ করে অনেক পদক্ষেপই সঠিকভাবে নিচ্ছি। চেষ্টা করতে হবে সেগুলো যাতে আমরা আরও দ্রুত বাস্তবায়ন করতে পারি। সেগুলো করলে এক ধরনের ফলাফল হবে। আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সেসব জায়গায় হাত দিতে হবে, যেমন রাজস্ব কীভাবে বাড়াতে পারি, বিশেষত ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশনের মাধ্যমে। দুর্নীতিগুলো কীভাবে কমাতে পারি, ব্যাংকে ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি যারা করেছে তাদের কীভাবে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে পারি, দুর্নীতি দমন কমিশনকে কীভাবে আরও শক্তিশালীভাবে কাজ করতে দিতে পারি, দেশ থেকে যারা অর্থ পাচার করছে তাদের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রোধ করতে পারি। এগুলো যদি ঠিকভাবে করতে পারি তাহলে একভাবে ফল হবে, আর যদি মনে করি সবই তো ভালোই চলছে তাহলে ফল হবে আরেক ধরনের।

দেশ রূপান্তর: সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান: দেশ রূপান্তরকেও ধন্যবাদ।

দেশ রূপান্তর
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩

অধ্যায় ৪

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

বাংলাদেশের ভূকৌশলগত অবস্থান বহুমাত্রিক এবং বহুস্তর বিশিষ্ট হতে হবে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সঞ্চালক: প্রিয় দর্শক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি news 24-এর অর্থনৈতিক ভাবনা অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানে আপনারা জানেন আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বা ব্যবসায়ী যারা অর্থনীতির সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত থাকেন এমন ব্যক্তিদের সাথে কথা বলে থাকি। আজকে আমাদের অতিথি হিসেবে এসেছেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ অর্থাৎ সিপিডির ডিস্টিংগুইশড ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্বাগত জানাই আপনাকে। সাধারণত আপনি এলে আমরা অর্থনীতির বিষয়গুলো সহজ করে বোঝার চেষ্টা করি। আসলে পরিস্থিতিটা কি কোনোদিকে চলেছে সেগুলো জানার চেষ্টা করি এবং নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করি। আশা করি আমাদের দর্শকেরাও সেটার একটা সুযোগ পাবেন। আমি শুরু করতে চাই এই মুহূর্তে ইন্ডিয়া ওশেন কনফারেন্স যেটা হচ্ছে ঢাকা শহরে এবং এই কনফারেন্সকে কেন্দ্র করে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো দেশের প্রতিনিধিরা এখানে এসেছেন এমনকি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মালদ্বীপের ভাইস প্রেসিডেন্ট আরো অনেকে এসেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে দেখলাম যে আমাদের ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটিজি ঘোষণা। যা, বাংলাদেশের জন্য বিরল ঘটনা। এই জাতীয় স্ট্র্যাটিজি ঘোষণা করবার ক্ষমতা আদৌ বাংলাদেশের ছিলো কি না বা হয়েছে কিনা সেটা একটা বিষয় এবং গ্লোবালি খেয়াল করছি যে ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর এই এরিয়ায় চায়নার দখল নেয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখল নিতে চাওয়া, ভারতের প্রভাব বিস্তার করে থাকার চেষ্টা সব মিলিয়ে একটা বড় ধরনের সামরিক, রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তাজনিত তৎপরতা এবং সেটার

সাথে অবশ্যই মূল কেন্দ্রে আছে অর্থনীতি। আপনি এই পরিস্থিতিটা যদি আমাদের একটু ব্যাখা করব শোনান যে আমরা কোন পরিস্থিতিতে আছি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রথমেই তোহ বোঝার ব্যাপার যে ভারত মহাসাগর এবং এই অঞ্চলের এবং সেই অর্থে ইন্দো প্যাসিফিক শব্দটাই আমরা ব্যবহার করি। ভারত মহাসাগর এবং প্যাসিফিক ধরে। বিষয়টি বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একটি কারণ, ভূকৌশলগত। সেটার ভিতরে সামরিক এবং নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সামরিক এবং নিরাপত্তার বিষয়টি আচ্ছাদনের ভিতরে থাকে। আসলে এর নিচে থাকা ভূঅর্থনৈতিক বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসটাই এই জায়গাকে এতো বেশি সংবেদনশীল করে তুলেছে। বিশেষ করে এই এলাকাতে দেশ নাই কিন্তু এই এলাকাতে অর্থনৈতিক স্বার্থ আছে এরকম দেশগুলো, অস্ট্রেলিয়া থেকে যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত এরকম দেশগুলো আছে এবং ইউরোপ তোহ আছেই। এদের এখানে সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণটা কোন জায়গায়? এদের কারণটা হলো এই মুহূর্তে পৃথিবীতে যত ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য হয় তার অনেকটা বড় অংশই কিন্তু সামুদ্রিক জাহাজের ভিতর দিয়ে চলাচল হয়ে থাকে এবং এই চলাচলের প্রায় ৫০/৬০ শতাংশ মতো ইন্দো প্যাসিফিক রাস্তাটার ভিতর দিয়ে আসে এবং এজন্য এই রাস্তাটাকে জাপান থেকে, অস্ট্রেলিয়া থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্ত্ররাজ্য, ইউরোপ পর্যন্ত নিরাপদ এবং নির্বিঘ্ন রাখার ব্যাপারে আগ্রহ অনেক বড় বড় দেশগুলোর রয়েছে এবং এই জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়ে যদি একটা আন্তর্জাতিক সমোঝোতা না থাকে, এখানে যদি সামরিক প্রতিযোগিতার জায়গা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে অর্থনীতি এটাতে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে। বিশেষ করে আমরা কোভিডের সময় দেখেছি পূর্ণ চলাচল ব্যবস্থা বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। এজন্য এই ব্যবস্থাকে চলাচল রাখার জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তারপরেও আমাদের বুঝতে হবে যে দেশগুলো এটা নিয়ে আসছে সেই দেশগুলোর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ কিন্তু এই এলাকাতে অবস্থিত সেটা হলো চীন এবং চীনের বিষয়টি হলো এই সাউথ চায়নার প্রভাবকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে এমনকি নতুন নতুন দ্বীপ কৃত্রিমভাবে তৈরি করেছে। এইখানে সবচেয়ে সংবেদনশীল জায়গায় হলো তাইওয়ানের অবস্থান। চীনের প্রভাবের বিষয়টি এখানে বড় উপাদান হিসেবে কাজ করছে। তখন আপনি যেটা বললেন, বাংলাদেশ তার অবস্থান থেকে প্রথমবারের মতো তার মনোভাবকে পরিষ্কার করে সামনে এনেছে।

প্রধানমন্ত্রী মহোদয় যখন গেছিলেন জাপানে তার পূর্বে আপনি যেটা বললেন কৌশলপত্র দিয়েছেন। আসলে বাংলাদেশের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন, উভয়েরই বড় ধরনের চাপ ছিলো এই বিভিন্ন জোটের ভিতরে যোগদান করা এবং বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত বলেছিলো আমরা আমাদের মতো করে কৌশল করে মোকাবিলা করবো। সেটার পদক্ষেপ

হিসেবেই বাংলাদেশ এটা করেছে। আমার মনে হয় এটি একটি নীতিবাচক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ হিসাবে এটাকে আমি ভালো বলে মনে করি। এটা আমাদের এক ধরনের নীতিগত সুরক্ষা দিতে পারবে বলে মনে করি এবং যদিও সেখানে বলা হয়েছে সাউথ চায়নার ভিতরে আর কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকা উচিত না। এখানে চলাচলের ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করা উচিত না এটা পরোক্ষভাবে কিছুটা চীনের বিরুদ্ধে যায়। সেই জায়গাটাতে আগামী দিনে কূটনীতি দিয়ে আমরা এই যে ইন্ডিয়ান ওশেনের যে বড় সম্মেলনটা করলাম এদের বিপরীতে চায়নাকে বাংলাদেশ পুরোটা অবজ্ঞা করতে পারবেনা। তার অর্থনৈতিক ভূমিকা বাংলাদেশে যা আছে তা দেখার বিষয়। এর পরবর্তীতে বাংলাদেশ তার বৈদেশিক নীতিতে ভারসাম্য রাখার জন্য কি পদক্ষেপ নেয় সেটার দেখার বিষয়। আপনারা লক্ষ্য করেছেন চীনের যে নতুন রাষ্ট্রদূত এসেছেন তিনি খুবই সচল, খুবই সরব। তিনি বারবার বলছেন বাংলাদেশ এখন আর আমাদের উন্নয়ন সহযোগী না, আমাদের কৌশলগত সহযোগী। এই কৌশলের জায়গায় আমরা কতটা কৌশলী হতে পারি সেটি দেখার বিষয়।

সঞ্চালক: সেই প্রেক্ষাপটে কি আপনার মনে হয়না ইন্ডিয়া সামিট টায় বক্তাদের বক্তৃতায় একটা অ্যান্টি চায়না ভার্শন আছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এইটা প্রকাশ্য না হলেও এটার অন্তর্নিহিত মর্ম আছে। এই মর্মটি হলো, চায়নার প্রভাবকে সীমিত করা বা মোকাবিলা করার বিষয়টি এখানে করেছে এবং এখানে যে দেশগুলো এসেছে সে দেশগুলো ভারত থেকে আরম্ভ করে তাদের ভূরাজনৈতিক অবস্থান তো বেশ পরিষ্কার এবং যেই জিনিসটা বুঝার ব্যাপার প্রত্যকটা দেশ কিন্তু চীনের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখবে কিন্তু আবার রাজনৈতিক ভূকৌশলগত প্রতিযোগিতাও করবে। এই দুটোকে আমাদের বুঝতে হবে। অনেক সময় আমরা সরলীকরণ করি যে ভারতের সাথে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক খুবই ভালো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের সম্পর্ক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অবদান আছে। তাদের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য সহযোগী কিন্তু ভূকৌশলগত জায়গার প্রতিযোগিতায় ওনারা ছাড় দিবেন না।সেহেতু এটা দেখার বিষয় বাংলাদেশের মতো ছোটো ছোটো দেশগুলো যারা স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করতে চায় তারা এইসমস্ত ক্রসফায়ারের ভিতর পড়ে যাওয়ার আশংকায় থাকে। এসমস্ত ক্রসফায়ার থেকে সুরক্ষা দিতে পারবে আপনার ঘোষিত নীতিকাঠামো। সেইজন্য বাংলাদেশ যে নীতিকাঠামো ঘোষণা করেছে এইটা নিঃসন্দেহে একটা ইতিবাচক সুরক্ষা দেবে বলে আমি মনে করি।

সঞ্চালক: এই প্রসঙ্গে বলি, আমরা যে ব্লু ইকোনমির কথা বলি সেইটার বেনিফিট কি আমরা এ্যাড করতে পারছি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সেটার দুটো জায়গা আছে। একটা হলো, আমার যেটুকু অর্থনৈতিক অঞ্চল আছে। ২০,২৫,৫০ নটিক্যাল মাইলের ভিতরে যা আছে বাংলাদেশ যা আছে এটা বাংলাদেশ নিবে। এটা যে পারিনি সেইটাতো বলা বাহুল্য কারণ এইটা জ্বালানি খাতের অবস্থা দেখলেই বুঝবেন। কারণ আমরা এইসময় কালে গভীর সমুদ্রে আমরা গ্যাস আবিষ্কারের চেষ্টা করিনি। আমরা বিদেশি কোম্পানিদের সাথে চুক্তি করিনি বলে আমরা কাঠামোগতভাবে বড় ধরনের পিছিয়ে গেছি এবং আজকের যে জ্বালানি সংকট তার একটা বড় কারণ হলো গ্যাসের নতুন উৎস আমরা সমুদ্র থেকে আনতে পারিনি। সাম্প্রতিক দেখলাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিকে বিনা টেন্ডারে দিয়ে দেয়ার একটা প্রস্তাব আছে। এটা আমার কাছে মনে হয় এক, চরম অবস্থান থেকে কিছু না করা থেকে আবার প্রতিযোগিতাহীনভাবে কোনো কোম্পানিকে দিয়ে দেয়া এবং আরেক অবস্থানে চলে গেলো এটাও খুব সঠিক ব্যাপার না। কিন্তু আরেকটু যেটা বোঝার ব্যাপার, সাম্প্রতিককালে জাতিসংঘের বহুদিন পর ৩০/৩৫ বছরের দর কষাকষির পর একটি নতুন চুক্তি হয়েছে এবং এই চুক্তির ফলে এই বিষয়টি বড় গুরুত্বপূর্ণ।

ধরুন আমার অঞ্চলের বাইরে যেই জায়গাটা আছে সেইটা সবার। সেইটা সাধারণ সম্পদ। তাহলে সেই সাধারণ সম্পদে যদি আমার যদি প্রযুক্তিগত ক্ষমতা না থাকে, আপনার থাকে তাতে আপনি একটা সুবিধা পাবেন। আপনি ওখানে সে সম্পদ হরণ করতে পারেন। এটা মাছ থেকে আরম্ভ করে খনিজ সম্পদ সবই আপনি নিয়ে যেতে পারেন। তখন কি হবে? এখানে সুবিধা বণ্টনের জন্য একটি চুক্তি হয়েছে। অর্থাৎ যারাই এর আশপাশে থাকবে তাদের সবাইকে আপনি যেই সম্পদই আহরণ করেন তার একটা ভাগ তাকে দিতে হবে কারণ এইটা সার্বজনীন সাধারণ বৈশ্বিক সম্পদ। এই বৈশ্বিক সম্পদে সকলের অধিকার আছে। এই বিষয়টিতেও বাংলাদেশ বড় ভূমিকা পালন করেছে। এইটার যে সমঝোতা হয়েছে নিউইয়র্কে এতো বছর ধরে এইটাকে বোঝার ব্যাপার আছে। এইটাকে আমি দুইভাগ করে বলছি। এক হলো আমার অঞ্চলের ভিতর বিনিয়োগ, এখান থেকে সুনীল অর্থনীতির আহরণ। এখানে গ্যাস থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য সামুদ্রিক সম্পদ মাছ ইত্যাদি। আরেকটা হলো, বাইরে যা আছে সেইটার প্রতি নজর রাখা। সেইটা যেনো কেউ নিয়ে না যায়। আমরা যে আন্তর্জাতিক অধিকার পেলাম, সেইটা যাতে কার্যকর করতে পারি।

সঞ্চালক: তারমানে ভারত যদি সার্বজনীন এলাকা থেকে কিছু আহরণ করে তার থেকে আমরা দাবি করতে পারবো?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দাবি না। এটা করার আগে একধরনের প্রাগসমোঝোতা লাগবে। এটি ভারত শুধু না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, জাপান থেকে আরম্ভ করে, নরওয়ে থেকে আরম্ভ করে সবাই এখানে আসবে। যে সমস্ত সামুদ্রিক এলাকায় করার সক্ষমতা রাখে। জাপান প্রচুর সক্ষমতা রাখে এখানে। কানাডা ও নরওয়েও সক্ষমতা রাখে। এইসমস্ত দেশগুলো এখানে আসবে। এদের উপরে একধরনের নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা কাঠামো সৃষ্টি হয়েছে। এইটার নিয়মনীতি পরিষ্কার হয়নি কিন্তু এইজায়গায়ও আমাদের মনযোগ দেয়ার ব্যাপার রয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের স্বার্থ রক্ষিত হয়, সেজন্য আমাদের পেশাদারি কুটনৈতিক রাও যাতে দায়িত্ব পালন করে এবং তারা যাতে আমাদের দেশের ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। এটা একটা আলোচনার বিষয়।

সঞ্চালক: ঝুঁকি কতটা আছে বাংলাদেশের? এই ইন্ডিয়ান ওশান এর ডিলে? কার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা না রাখা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ঝুঁকিটা তোহ হলো আমি যে ক্রসফায়ারের কথা বললাম। সেটা হলো যে বড় বড় দেশগুলো এটাকে সামাল দিতে পারে। ছোটো দেশগুলো এটাকে সামাল দিতে পারে না। আমরা বলি প্রতিটা দেশই স্বাধীন ও সার্বভৌম। প্রত্যেকের একটা করে ভোট আছে জাতিসংঘে। কিন্তু বাস্তবে একেক জনের সক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন। এই ধরুন, ভারত যেভাবে রাশিয়ার সাথে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার পরেও তেল কিনলো। আমরা কি পারলাম? আমরা তো রূপপুরের যন্ত্রপাতিগুলোও ঠিকমতো আনতে পারলাম না। আমরা এখন সেটার টাকা পরিশোধ করতে পারছি না। তাহলে ভারত যেটা পারে আমি সেটা পারি না। তো আমাদের মতো মধ্যবিকাশমান দেশগুলোর নতুন এক ধরনের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হয়। তখন আমার মতো দেশগুলোর সাথে একমত হয়ে এগুলো মোকাবিলার চেষ্টা করি। আমি তখন শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপের সাথে মিলাবো। দুঃখজনকভাবে আমি মিয়ানমারের কথা বলতে পারছি না। কিন্তু একইরকমভাবে ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশের সাথে মিলে তখন মাঝারি আকারের দেশগুলো তখন বড় দেশগুলোর সাথে মোকাবিলায় এক ধরনের অবস্থান নেয়। সেহেতু বাংলাদেশের ভূকৌশলগত অবস্থান বহুমাত্রিক এবং বহুস্তর বিশিষ্ট হতে হবে। একবারে বড়দের সাথে করা, একবারে একা একা করা। এরমধ্যে আরো অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। এটার জন্য দক্ষতা, মনভঙ্গি ও একধরনের রাজনৈতিক স্বাধীনতার দরকার পড়ে। যদি এককভাবে কোনো দেশের প্রতি আমরা নির্ভরশীল হয়ে

পড়ি তখন ওই দেশের চিন্তাভাবনাগুলো আমাদের দেশের পররাষ্ট্র নীতিতে নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। এটার ব্যাপারে সাবধান থাকার বিষয় রয়েছে। আমি বারবার বলছি ভারত যেটা পারে আমরা সেটা পারিনা।

সঞ্চালক: উচ্চতর কুটনৈতিক বিষয়ে আমরা চলে এসেছি। দর্শক আমরা একটা অসাধারণ বিষয়ে আলোচনা করলাম যে ইন্ডিয়ান ওশেন এরিয়া বা ইন্দো প্যাসিফিক এরিয়া যেটা। এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনীতির কেন্দ্রে অবস্থান করছে। সেইটা নিয়ে উনি কথা বলেছেন। আমার মনে হয় এই চুক্তিটা নিয়ে আমাদের আরো ইলাবরেটলি রিপোর্ট করা উচিত। আমরা করবো আশা করি। আমি একটু যেতে চাইছি যেহেতু বাজেট কাছে, নির্বাচনও কাছে। ফলে এইবছরের নির্বাচনে বাজেটের প্রভাব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সময়ে যে রেভিনিউ কালেকশন, মূল্যস্ফীতি সব মিলিয়ে বাজেটটা কেমন হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? আমরা এরমধ্যে আইএমএফ এর ও দারস্থ হয়েছি পরিস্থিতি সামাল দিতে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার কথাটা আপনার কাছে যদিও অনেক বেখাপ্পা শোনা যাবে। আমরা যে বাজেট তৈরি করি সেটা গতানুগতিক ধারাবাহিকতায় তৈরি করা হচ্ছে। এই বাজেটটা একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রস্তুত হচ্ছে। একটা কোভিড উত্তর পরিস্থিতি, বৈশ্বিক টানাপোড়েনের সময়। ইউক্রেন যুদ্ধ রয়েছে। এরমধ্যে আইএমএফের কাছে শর্ত মেনে ঢুকতে হয়েছে। এটাতো বাজেটে যতখানি না সংখ্যার বিষয়, তার চেয়ে অনেক বেশি হলো কৌশলের বিষয়। মানে আপনি কি লক্ষ্য মাত্রা দিলেন সেটাকে অনেক গুরুত্ব সহকারে নিতে আমার অস্বস্তি হয়। কারণ এই ধরনের লক্ষ্যমাত্রায় এর আগেও দশ শতাংশ, বারো শতাংশ বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সাংবাদিকদের প্রতি আমার অনুযোগ হলো ওনারা বাজেট ঘোষণা প্রকাশে যত মনোযোগী হয়, গত বছরের বাজেট বাস্তবায়ন নিয়ে ওনারা বাজেটের দিনও মনোযোগ দেন না। এখন যে বাজেট টি ঘোষণা হয়েছে সেটা ব্যাকরণ মেনে হয়েছে। অর্থাৎ আয় বাড়বে বেশি ব্যয়ের চেয়ে। যেই ব্যয় বাড়বে তারমধ্যে উন্নয়ন ব্যয় বাড়বে বেশি। চলতি ব্যয় কম হবে। ঘাটতি বেশি হবে না। তবে এবার ঘাটতির চেয়ে বৈদেশিক ঋণকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এটি দেখার বিষয়। কিন্তু এটাকে বাস্তবায়নের সাথে এটার কি সম্পর্ক হবে?

যেমন ধরুন বাংলাদেশ আপনাকে আধা শতাংশ জিডিপি বাড়তি আইএমএফ এর কাছে কর আহরণ করবেন বলে কথা দিয়েছেন। এখন যেই সংখ্যাটি আপনি দিলেন এই কর আপনি কোথা থেকে নিবেন? আপনি কি যেই মানুষগুলোর আয় কম তাদের উপর ভ্যাটের বিস্তৃতি করে নিবেন নাকি যার আয় আছে কিন্তু কর দেয় না তার কাছে যেয়ে নিবেন। যার শুধু আয় না অনেক সম্পদ আছে ওই সম্পদের উপর আপনি কর বসাবেন

কিনা যেইটা পৃথিবীব্যাপী করা হয়। এই কৌশলের জায়গাগুলো যদি আলোচনা না হয় তাহলে শুধু ওই সংখ্যা দিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। যেমন— ভর্তুকির সমন্বয় সাধন একটি বড় বিষয়। সরকার ভর্তুকির পরিমাণ বাড়াতে-কমাতে পারবে না। এইটা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবেচনায় সে বোঝে। কিন্তু সে সমন্বয়টা কোথায় করবে? ভর্তুকি বাড়ালে কারটা বাড়াবো, কোথা থেকে বাড়াবো এই বিষয়টাও আলোচনার বিষয় ছিলো। বিদ্যুৎ খাতে যে ক্যাপাসিটি চার্জ দিচ্ছে আপনি তাকে কমাবেন নাকি কৃষকের বিদ্যুৎ, কীটনাশক আর সারের জন্য বাড়াবেন? এই বিষয়গুলো আলোচনার বিষয় ছিলো। আপনাকে এখন গ্যাসের দাম বাড়াতে হবে, তেলের দাম বাড়াতে হবে। ভোজ্যতেলের দামও বাড়বে। কারণ টাকার দামের পতন হবে সামনে আরো বেশি। তখন আপনার আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি আসবে। এইগুলো মোকাবিলা করার জন্য আপনার পরিকল্পনা কি? এই কথাটি বলতে হবে। আমরা পরিকল্পনা দেখছি না। কতগুলো সংখ্যা দেখছি। এই পরিকল্পনা সর্বপ্রথম আলোচনা হওয়ার কথা ছিলো মন্ত্রী পরিষদে। কারণ এইটা একটা রাজনৈতিক বিবেচনা। কোনো আমলা বের হয়ে এসে বলবে না কেন তেলের দাম বাড়াতে হচ্ছে বা গ্যাসের দাম বাড়াতে হচ্ছে। সে বলবে এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। তাহলে রাজনীতিটা কোথায়?

আলোচনাটি মন্ত্রীপরিষদে হলো না। মন্ত্রীপরিষদে তো একটি অর্থনৈতিক উপকমিটি আছে। সেই উপকমিটি শুধুমাত্র এখন মিটিং হয় শুধুমাত্র টেন্ডারের জন্য প্রকিউরমেন্ট এর ইস্যু ছাড়া। সেইখানে কোনো নীতিমালা আলোচনা হয় না। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে আলোচনা হতে পারতো। অর্থনীতি, পরিকল্পনা, সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত, অনুনীতি কমিটি আছে। এরকম তোহ অনেকগুলো কমিটি রয়েছে। যেখানে আলোচনা হতে পারতো। কারণ সংসদে এই টেকনিক্যাল আলোচনা হয়না। সেখানে অনেক রাজনৈতিক বক্তব্য থাকে। এই টেকনিক্যাল আলোচনা কোথাও হলোনা। আরো পরিতাপের বিষয় যে এই আলোচনা গুলো ব্যতিরেকে আমরা আইএমএফ এর সাথে চুক্তি করলাম।এইযে চুক্তিটা করলাম, এখন যে ধাপে ধাপে দাম বাড়াছে। সামনে আরো বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। টাকার মূল্যমান আরো সমন্বয় করতে গেলে, ডলারে দাম বাড়লে এই দিকগুলো ব্যাখ্যা করবে কে? যে রাজনীতিবিদরা মাঠে যেয়ে রাজনীতি করেন, তারা এই সরকারকে নিয়ে নির্বাচনে যাবেন যেভাবেই নির্বাচনে যাক না ক্যানো। তখন কিভাবে তারা এটা ব্যাখ্যা করবে? তারা কি বলতে পারবে আমার হাতে এই পরিকল্পনাটি নিয়ে আগাচ্ছি আপনি সাময়িকভাবে কষ্ট করেন ছয় মাস পর এটার উত্তরণ হবে?

এখন যেটা হয়েছে দেখুন, আমলাতান্ত্রিক ভাবে হলে যেটা হয়, শুধুমাত্র আমার ঘাটতি মেটানোর জন্য আমরা একের পর এক ঋণ নিয়ে যাচ্ছি। এখন তোহ দুটো বড় ঘাটতি। একটা হলো, আর্থিক ঘাটতি; রাজস্ব আয়-ব্যয়ের ভিতরে এটার একটা বড় ঘাটতি।

আরেকটা হলো, বৈদেশিক লেনদেন এর ঘাটতি। বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি শুধু বাণিজ্যিক ঘাটতি না। এটা চলতি হিসাবের ঘাটতি যা রেমিট্যান্স দিয়েও পূরণ করতে পারছিনা এবং এখন আমার ফাইন্যান্স এ্যাকাউন্ট এর ঘাটতি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে কখনো এটা ছিলোনা। চলতি হিসাবের ও ছিলো কতদিন পর্যন্ত। এই ঘাটতি মেটানোর জন্য আমরা আইএমএফ এর কাছে থেকে আনতে চাচ্ছি ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট সাপোর্ট আর বিশ্বব্যাংক এবং এ্যাশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কাছে থেকে আনতে চাচ্ছি আমার আর্থিক ঘাটতি মেটানোর জন্য বাজেটের সমর্থন। দেখেন, আমলাতান্ত্রিক মানে রাজনৈতিক কৌশল বিবেচনা ব্যতিরেকে আপনি করেন এটা হলো সময় ক্ষেপন করার জন্য কিনে রাখার জন্য বা সময় কিনে রাখার জন্য।

সঞ্চালক: কখনোই কি এরকম রাজনৈতিক কৌশল আলোচনা করে আমরা বাজেট দেখেছি এ পর্যন্ত?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না। আপনার যদি একটা ক্রিয়াশীল মন্ত্রীপরিষদ থাকে এবং যদি যোগ্য ব্যক্তিরা সেখানে দায়িত্বে থাকেন তাহলে তারা সেই আলোচনাগুলো তাদের সহোযোগীদের সাথে করেন। উদাহরণ হিসেবে বলি, মুহিত সাহেব শেষ পর্যন্ত সবকিছুর পরেও সমস্ত সংসদীয় কমিটিকে ডেকে আলোচনা করতেন। অন্যান্যদের সাথে পেশাজীবীরা আছেই। কিন্তু উনি ওনার দলের ভিতরে আলোচনা রাখার জন্য এটা করতেন। এখন সেটা নেই। অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়াটি বিরাজনীতিকরণ হয়ে গেছে। আমার কাছে আশ্চর্য লাগে, প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমরা এভাবে জিনিসটা দিয়েছি। ওনার প্রতি অন্যায় হচ্ছে এটা। কারণ হলো এটা দায়িত্ব ভাগ করার বিষয় ছিলো। তাহলে আমরা একটা আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে এই জিনিসটা করছি। কিন্তু এটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে আমার নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত না থাকেন, স্থানীয় সরকার যদি এটার সাথে যুক্ত না হয়, তাহলে এটা শুধুমাত্র নির্দেশ দিয়ে হবেনা। এই কাঠামোটি আমরা দাঁড় করিয়েছি সবচেয়ে বড় ভাবে কোভিড সময়কালে। যখন আমরা রাজনীতিবিদদের সরিয়ে দিয়ে করেছি। একটা চিন্তাও ছিলো, দক্ষতার জন্য, দুর্নীতিহীনতার চিন্তা থেকে এটা হয়তো করেছিলাম। কিন্তু এটা সবসময় ব্যবহার করা উচিত হচ্ছে না।

সঞ্চালক: আপনি একটা কথা বলছিলেন বিদ্যুৎ এর ক্যাপসিটি চার্জ নিয়ে। এটা একধরনের রক্তক্ষরণ অর্থনীতির। এই জাতীয় কতগুলো ররক্তক্ষরণের জায়গা আছে বলে আপনি মনে করছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: একটার ভিতরেই দুই তিনটি আছে। যেমন— না ব্যবহার করলেও টাকা দিতে হচ্ছে। এটা তো আমরা তাদের সুরক্ষা আইন দিয়েছি। তারপর হলো,

ওইটাকাগুলো দিয়ে এখন যেহেতু ঘাটতি হয়ে গেছে, আমরা বিল পরিশোধ করতে পারছিনা। তার উপর আমার সুদ দিতে হচ্ছে। তারপর ধরুন, ওনাদের হিসাব ডলারে। ডলারের যখন দান পতন হচ্ছে, আপনি যখন বিল দিয়েছিলেন তখন একশো আট টাকা করে ছিলো, এখন একশো বারো টাকা হয়ে গেছে। তাহলে এই চার টাকার দায়িত্ব কে নিবে? তিন মাসের ভিতর যদি আপনি এই টাকা না দিতে পারেন তাহলে ওই টাকার উপরে আপনার আবার ভর্তুকি দিতে হবে।

সঞ্চালক: এটা কি চাইলে সরকার বন্ধ করে দিতে পারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: চাইলে অবশ্যই সরকার পারে। সরকার ভাগে ভাগে এই আইনকে নবজন্ম দিয়েছে। ওটা তোহ পাঁচ বছর প্রথম ছিলো, আমরা মরিয়া অবস্থানে ছিলাম, আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে করেছি। এখন তোহ বাইশ হাজার মেগাওয়াট স্থাপন করে বারো হাজার ব্যবহার করতে পারেন না। তাহলে যদি না পারি, এটার জন্য আমি ক্যানো এভাবে নবায়ন করলাম? তারমানে হলো, এইযে বিরাজনীতি করণ আমলাতান্ত্রিক বাজেট আপনি করলেন, এটার সাথে ব্যবসায়িক স্বার্থগোষ্ঠী রক্ষা করলেন। দুটো কিন্তু যুক্ত হচ্ছেম একটা নির্বাচনকালীন বছরে এটা কিভাবে সম্ভব? আমি এটার ভিতর কোনো রাজনীতি অর্থনীতি বুঝে উঠতে পারছি না। রাজনীতি অর্থনীতি বলে এই টাকার সবটাই গ্রামের মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো।

প্রধানমন্ত্রী গৃহ বানাচ্ছেন, এই গৃহ প্রোগ্রামে এটা সহায়তা করার কথা। দুর্নীতিকরণ করে বাঁশ দিয়ে না বানিয়ে সিমেন্ট দিয়ে করার কথা। দুইহাজার ডলার হলো মাথাপিছু আয়, আপনি এখানে দেন আট ডলার করে এটা বৈষম্যপূর্ণ। তাদের মাথাপিছু টাকা বাড়ানোর সময় এটা ছিলো। আমরা বলেছিলাম যে যুবসমাজকে এই সময়ে সমর্থন দিতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অসুবিধা হলো কোভিডের সময়, আপনি যেমন করে চাল ডাল মুড়ি মুড়কি দেন, আপনি এক গিগাবাইট করে ইন্টারনেট দেন প্রত্যেকটা ছাত্রকে। দেখবেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ইন্টারনেট বৈষম্য গড়ে উঠেছে, গ্রামাঞ্চলে ছেলেমেয়েরা তাদের স্মার্টফোন ব্যবহার নাই কিংবা তারা খরচ দিতে পারে না, বিদ্যুৎ থাকেনা, ব্রডব্যান্ড সাপোর্ট থাকে না। এই জায়গায় আপনি একটু বড় ভাবে দেন।

আমরা বলেছিলাম যে আপনি সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার মতো করে পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যাণার্জিও যেটা করেছেন, ভারতের অন্যান্য জায়গাতেও। সেটা হলো আপনি পাঁচ লক্ষ্যটাকার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে দেন। স্বাস্থ্যসেবার জন্য সেটা ব্যবহার করুক। এটা পরীক্ষামূলকভাবে সরকার করবে বলে শুনেছি। এইরকম জায়গায় আপনি টাকাটা নিয়ে আসবেন। যদি ভোটের প্রয়োজন মনে করেন যে, ভোট দিয়ে নির্বাচন করবো এবং সেই

মানুষগুলোর মনোরঞ্জন করবো, তাদের সন্তুষ্টি বিধান করবো তাহলে এগুলো করার ছিলো। এই আলোচনাটা যেহেতু হয়ই না এবং সংসদ সদস্যদের সাথে কথা বলে বুঝেছি ওনারাও এই আলোচনার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে নিশ্চিত না। উৎসাহ বোধ করেন না যে এটা ক্যামনভাবে গৃহীত হবে সেই জায়গাটি আমার মনে হয় বড় ঘাটতি। এটায় একটা বড় ধরনের রাজনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে।

সঞ্চালক: আপনি বলছেন, বাজেটে পলিটিক্যাল আউটলুকের কোনো রিফ্লেকশন থাকছে না। এটা নিতান্তই গতানুগতিক ধারার বাজেট এবং ইলেকশন ইয়ারে যে পরিকল্পনা করা হচ্ছে এটা আপনার মনে হচ্ছে একদমই যথাযথ নয়। সেই ক্ষেত্রে বাজেটে কোনো বিষয় গুলোতে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এরকম সময়কালে বাজেটে বরাদ্দ প্রতিফলিত হওয়া উচিত অগ্রাধিকারগুলোর থেকে প্রাঃঅধিকারগুলোতে। সেইটা যদি না হয়ে আপনি যদি ধারাবাহিকতার অংশ হয়ে প্রক্ষেপণগুলো করেন তাহলে সেইটার ভিতরে সমসাময়িকতার গুরুত্বগুলো প্রতিফলিত নাও হতে পারে। এখন সেক্ষেত্রে আমরা সংশয় প্রকাশ করছি কারণ যে পদ্ধতির ভেতর দিয়ে এটা করা হলো সেইটাতে ফাঁক রয়ে যাচ্ছে। এখন মনযোগ দেয়ার বড় বিষয় হলো মূল্যস্ফীতি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার হার, সুদের হার, বিনিময় হার, খাদ্য নিরাপত্তা। যেহেতু সরকারের পক্ষ থেকে একটি সংযত বাজেট করার চেষ্টা হবে অর্থাৎ আগের মতো সাত আট শতাংশ প্রবৃদ্ধি না বলে পাঁচ ছয় শতাংশের কথা বলা হবে তার মানে হলো বিনিয়োগ কম হবে। সরকারি ব্যয় কম হবে। গতবারের কাছাকাছি হবে প্রকৃতভাবে। তখন কর্মসংস্থানের অভাব দেখা দিবে, নতুন যুবসমাজের জন্য কি সুযোগ আসবে এই বিষয়গুলো থাকবে এবং মূল্যস্ফীতি হলে কিছু নির্দিষ্টগোষ্ঠীর মানুষের উপরে বেশি প্রভাব পড়ে যেমন স্বল্প আয়, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা এই সময়কালেই গড়ে উঠেছে।

সুতরাং এই সরকারের ফলাফলের কারণেই তারা বিকাশ লাভ করেছে। সেই জীবনগুলোর উপরে কি পড়বে, সেইটার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হবে? তখন সরকার মহার্ঘ ভাতার আলোচনা করছিলো এখন শুনছি সরকারি কর্মচারীদের জন্য। যদিও ছয় সাত বছর হয়ে গেছে তাদেরও একটা কষ্ট হতে পারে। কিন্তু আপনি সরকারি কর্মচারীদের ২০/৩০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দিবেন আর ব্যক্তিখাতের কেউ এইটার প্রতিষ্ঠা দেয়ার ক্ষমতা রাখেনা। আরেক ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হবে।

সঞ্চালক: সরকারি মহার্ঘভাতা প্রতিবছর ৫% করে.....

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ওইটাতো সব প্রতিষ্ঠানেই থাকে আনুষ্ঠানিকভাবে। কিন্তু মহার্ঘভাতাটি হলো যদি আপনি নিয়মিত সময়ে তিন বা পাঁচ বছর পরপর যদি আপনি এই কাঠামোকে পুনর্বিন্যাস না করতে পারেন তাহলে এককালীন এটা দিলেন এবং পরে এটার সমন্বয় করা হবে। সরকার এটা দেবে কোথা থেকে? সরকার যতবড় ঘাটতি নিয়ে অবস্থান করছে তার ভিতরে দেয়াটা কঠিন। যদি দেয়ও রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক বিবেচনায় তাহলে অন্য যারা আছে লক্ষ্য লক্ষ্য কোটি কোটি কর্মচারী ও কর্মকর্তারা তাদের প্রতি কি ব্যক্তিখাত দিতে পারবে? আমরা বলি ইংরেজিতে স্পিল ওভার। অর্থাৎ উচ্চ পরিমাণ চাপ আসে। অর্থাৎ পানি এক জায়গায় পড়লে অন্য জায়গায়গুলো ভিজে যায়। অন্য জায়গাগুলো ভিজে গেলে তারা কি করবে এই সমস্ত বিষয় ছিলো। যদি না করে থাকে তাহলে এক ধরনের রাজনৈতিক বিবেচনা আছে বলে মনে হবে। কারণ এইটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমি মনে করি এই জায়গাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসলে সরকারের বাজেটের ক্ষেত্রে আমার এতো বছরের অভিজ্ঞতা হলো, সংখ্যার পিছনে না দৌড়িয়ে এগুলোর দক্ষ বাস্তবায়নের প্রতি মনোযোগী হওয়াটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং যেই মানুষগুলোর জন্য আমরা এই প্রকল্পগুলো তৈরি করি তারা ঠিকমতো সুবিধাটা পেলো কিনা সেই মূল্যায়নটা যেন করি। আমি আবার অনুযোগ করি সাংবাদিক এবং নিজেদের প্রতি কারণ আমরা বাজেট মূল্যায়ন করি টাকা খরচ হয়েছে কিনা। ওই টাকা দিয়ে মানুষটার উপকার হয়েছে কিনা সেইটা মূল্যায়ন করি না। আইএমইডি যে হিসাবটা করেন যে, এতো শতাংশ বাস্তবায়িত। এটাতো টাকা খরচ করার বাস্তবায়ন। ওই টাকা যে প্রকৃত অর্থে পণ্য এবং সেবায় রুপান্তরিত হয়ে যে মানুষের জন্য এটা করা হয়েছিলো সেটা খেয়াল করছিনা।

সঞ্চালক: প্রচুর টাকা খরচ করলাম ইনফ্র্যাসস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এ কিন্তু যানযট কমলো কিনা সেটা খেয়াল করছি না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এবং ওইটার উপর দিয়ে আমাদের সাধারণ মানুষ যেতে পারছে কিনা এবং সেই সাধারণ মানুষ তার কর্মতৎপরতাকে আরো বেশি বেগবান এবং লাভজনক করতে পারছে কিনা.....

সঞ্চালক: আপনি আইএমএফের ঋণের কি সমালোচনা করছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: একটা বলেছি, নীতি সার্বভৌমত্ব একটু ক্ষুণ্ন হয়ে গেছে। কারণ রাজনৈতিক আলোচনা ব্যতিরেকে আমলাতান্ত্রিক উপায়ে এটি করা হলো। এটার ফলে

আমরা সিদ্ধান্তগুলো নিলাম না এটা একটা। আরেকটা পরিহাসের ব্যাপার, আইএমএফের কথাগুলো নতুন কিছু না। এগুলো সবই আমরা বলেছি গত দশবছর ধরে। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি। ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে তারপর বিদেশের ঠাকুরকে পূজো করলাম আমরা। এই জায়গাটায় আমাদের মনঃকষ্ট আছে। তবে যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছে সেগুলো বাস্তবায়ন করা হলো কিনা এটার দেখার বিষয়। যেমন হলো ব্যাংকিং খাতের সংস্কার। এটা যদি সরকার করতে পারে তাহলে এটা একটা রাজনৈতিক বিপ্লব হবে। কারণ যারা সুবিধাভোগী তাদের নাম ধরে চিহ্নিত তারা ওখানেই। এইটাতো ছদ্মবেশী কেউ না। আমরা সবাই জানি কে টাকা নিয়েছে, কে লুণ্ঠন করেছে, টাকা কোথায় গেছে এগুলো সবাই জানে। এটাকে আমরা পেপার ট্রেইল বলি। অর্থাৎ এই টাকায় কোথায় কি হয়েছে এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটকে জিজ্ঞেস করলে ওনারাই সব বলে দিতে পারবেন। এটায় কোনো দুদক বা কোর্টের দরকার পড়ে না। কিন্তু এইটাকে মোকাবিলা করার জন্য যে রাজনৈতিক শক্তির দরকার পড়ে একটা নির্বাচনের প্রাক্কালে সরকারে সেই সরকার এটা করার ক্ষমতা রাখে কিনা, সেই সাহসটা আছে কিনা এইটাই দেখার বিষয়।

সঞ্চালক: আইএমএফের ঋণ বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ঋণ এর কথাতেই বলি, প্রথম ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট যখন এদেশে এসেছিলেন তখন তাজউদ্দীন আহমদের সাথে একটি কথোপকথন ছিলো সেটাই বাংলাদেশের সঙ্গে আইএমএফের সম্পর্কের একটা প্রতিফলন হতে পারে। ওইসময় আমাদের প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন প্রফেসর নূরুল ইসলাম উনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে শেষ করতে চাই।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি প্রফেসর নূরুল ইসলামের কথা স্মরণ করেছেন এজন্য ধন্যবাদ। তিনি নিঃসন্দেহে আমাদের পেশায় একজন কিংবদন্তি ব্যক্তিত্ব। উনি ষাটের দশকের প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে পেশাজীবী মনোভাব নিয়ে যুক্ত হয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের মানুষ ওনারা ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে উনি, প্রফেসর সোবহান, প্রফেসর মোশাররফ হোসেন এই নামগুলো এখনকার প্রজন্ম ভালো করে জানেও না। প্রফেসর নূরুল ইসলাম ছয়দফা লেখার ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করেছিলেন। সত্তরের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রস্তুত করতে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চলে আন্তর্জাতিকভাবে রেহমান সোবহান, উনি পাকিস্তান যেন অর্থাৎ না করে এই আন্দোলনকে ওনারা সামনে এনেছিলেন এবং স্বাধীনতার পরে এই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে নতুনভাবে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে ওনারা বঙ্গবন্ধুর প্রেরণায় তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ওনারা সেই সময় নতুন বাংলাদেশের একটি বিকাশমান

অর্থনীতি অন্তর্ভুক্তিমূলক ন্যায়পরায়ণ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এটাই হলো ওনাদের প্রজন্মের অবদান।

সেজন্য ওনাদের মনে রাখতে হবে। ওনারা পচ্চাত্তর সালের প্রাক্কালে দেশ থেকে চলে গেছিলেন এবং ওনারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরে অবদান রেখেছেন। রেহমান সোবহান, আনিসুর রহমান বাংলাদেশে থেকেছেন। আনিসুর রহমান চাকরি করে ফিরে এসেছেন, প্রফেসর মোশাররফ হোসেন এখানে থেকে মারা গেছেন। উনি আবার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পেশাজীবীদের আরেকটি পরিচিত মুখ হিসাবে দাঁড়িয়েছেন। আমি ওনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এটুকুই আক্ষেপ করে বলবো, ওনার মৃত্যুর পর আমরা সরকারিভাবে কোনো শোকবার্তা দেখিনি এবং এতাগুলো সরকার গেলো, এতো মানুষকে আমরা সম্মান দেই, ওনার মতো মানুষকে আমরা স্বাধীনতা পুরস্কার দিতে পারিনি, যে স্বাধীনতার জন্য ওনারা বঙ্গবন্ধুর সাথে থেকে বড় অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস যখন আলোচিত আগামী প্রজন্মের সকলেই তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

সঞ্চালক: অসংখ্য ধন্যবাদ ড: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে আমাদের সময় দেয়ার জন্য এবং আমিও এটা মনে করি যে, যে দেশে গুণীর কদর হয়না সেই দেশে গুণী জন্মাতে পারে কম। তবে আশা রয়েছে তরুণ প্রজন্ম সবসময় অতীতে যারব দেশে গড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হলো সব থেকে বড় শ্রদ্ধা, রাষ্ট্রীয় শ্রদ্ধা যদি পাওয়া যায় সেটা ইতিবাচক। মরণোত্তর সম্মাননাও জানানো যেতে পারে আমরা সেই প্রত্যাশা রেখে শেষ করতে চাই। প্রিয়দর্শক, সবাই ভালো থাকবেন।

অর্থনীতি ভাবনা, নিউজ টুয়েন্টিফোর
সঞ্চালনায়: জনাব রাহুল রাহা
১৭ মে, ২০২৩

ব্রিকসে যুক্ত হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হবে

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই বিশ্ব মুদ্রাব্যবস্থায় যে অস্থিরতা শুরু হয়েছে তাতে বিভিন্ন দেশ বিকল্প মুদ্রায় বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকছে। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার জোট ব্রিকসের ধারণার মধ্যেও এই বিকল্প মুদ্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে ব্রিকস জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিকল্প কোনো মুদ্রা চালু হবে কি না তা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কারণ তারা এখনো নিজেদের মধ্যে বড় আকারে আন্ত মুদ্রা বিনিয়ম শুরু করেনি।

এই জোটের দেশগুলো এখনো ডলারের ওপরই নির্ভরশীল। বিকল্প মুদ্রা চালু হলে নিকট ভবিষ্যতে জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে লেনদেনে ডলারের ওপর নির্ভরতা কমতে পারে। বাংলাদেশসহ আরো কিছু দেশ ব্রিকস জোটে যুক্ত হতে আগ্রহ দেখিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ জোটে যাওয়ার ঘোষণাও দিল।

আগামী দিন এর সঙ্গে আরো উদীয়মান কিছু দেশ যুক্ত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেদিক থেকে এ রকম একটি অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জোটের সঙ্গে যুক্ত হওয়া বাংলাদেশের জন্য সামর্থ্য প্রমাণের সুযোগ। ফলে পুরো বিষয়টি ইতিবাচক বলা যায়। ব্রিকস জোট অর্থনৈতিক সহযোগিতার চমৎকার একটি উদাহরণ হতে পারে।

চীন ও ভারতের পাশাপাশি রাশিয়ার কাছ থেকে নানাভাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা নিচ্ছে বাংলাদেশ। সেই যুক্তিতে এ রকম একটি পদক্ষেপে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়গুলো আগামী দিনে নতুন ভিত্তি পাবে, যাকে আমরা বলি সহযোগিতার বহুমুখীকরণ।

আবার রাজনৈতিক জোটের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত যে ধরনের নির্ভরতা রয়েছে, উন্নত দেশনির্ভর জোটগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারলে আগামী দিনে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে নিজেকে বিস্তৃত করার সুযোগ পাবে। তবে এখন পর্যন্ত আমরা জানি না কোন মর্যাদায়, কিভাবে, বাংলাদেশ এই জোটের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। বিষয়গুলো হয়তো সামনে পরিষ্কার হবে।

বাংলাদেশ কি পূর্ণ সদস্য হবে, না সহযোগী সদস্য হবে, তাও দ্রুত জানা যাবে। সে হিসেবে তার কার্যক্রম নির্ধারিত হবে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় গত বুধবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট মাতামেলা সিরিল রামাফোসা বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, আগামী আগস্টে বাংলাদেশ ব্রিকসের সদস্য হতে যাচ্ছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশকে ব্রিকস ব্যাংকে যোগ দিতে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ব্রিকস বাংলাদেশকে সদস্য করবে। প্রধানমন্ত্রী আগামী আগস্টে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকস সম্মেলনে যাবেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, ব্রিকস আগামী দিনে আরো আটটি দেশকে সদস্য করবে। তার মধ্যে বাংলাদেশ, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইন্দোনেশিয়াকে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এটি অর্থায়নের আরেকটি ক্ষেত্র হবে।

ধারণা করা যায়, এ ধরনের জোট ভবিষ্যতে আমাদের অর্থনৈতিক, ব্যাবসায়িক ও বিনিয়োগ সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো বিস্তৃত করার সুযোগ সৃষ্টি করবে। ব্রিকস জোটের সদস্য হলে বাংলাদেশের আঞ্চলিক বাণিজ্য করার সুযোগ আরো বাড়বে। দেশভিত্তিক যে বাণিজ্য আমরা করতাম, জোটভুক্ত হলে যৌক্তিক কাঠামোর আলোকে আমাদের বাণিজ্য-বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডকে বিকেন্দ্রিকরণ করার সুযোগ তৈরি হবে।

বাংলাদেশ ব্রিকস জোটে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। এখন এ বিষয়ে জোটের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর আনুষ্ঠানিকভাবে একমত হওয়ার বিষয়ও রয়েছে। এ বিষয়গুলো খোলাসা হবে আগামী আগস্ট মাসের দিকে। বর্তমানে উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জোট, বিশেষ করে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার ব্রিকস জোট গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে বাংলাদেশের যুক্ত হওয়াটা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃত করবে।

কালেরকণ্ঠ
১৬ জুন, ২০২৩

ব্রিকসে যোগদানের সিদ্ধান্ত ইতিবাচক

মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশের ব্রিকসে যোগদানের সিদ্ধান্তকে আমি ইতিবাচকভাবেই দেখি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক আমরা যত বহুধাভিত্তিক করতে পারব, ততই ভালো। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থায়নে এটার একটি ভূমিকা থাকবে।

ব্রিকসের উদ্যোগে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা পাঁচটি দেশ হলো ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। পরে অল্প কয়েকটি দেশকে ব্যাংকটির সদস্য হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। বাংলাদেশ সেই সুযোগ গ্রহণ করে। এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকেরও (এআইআইবি) সদস্য হয়েছে বাংলাদেশ। এআইআইবির প্রথম ঋণ পেয়েছিল বাংলাদেশ।

মনে রাখতে হবে, জি-২০-এর (১৯ দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফোরাম) পরবর্তী তিন মেয়াদে সভাপতির পদ পাবে ব্রিকসভুক্ত তিনটি দেশ। প্রথমে ভারত, পরে ব্রাজিল, এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা।

ব্রিকসের পরবর্তী সম্মেলন আগামী আগস্টে হতে পারে। সেখানে মার্কিন ডলারের বিকল্প হিসেবে অন্য কোনো মুদ্রায় লেনদেন করা যায় কি না, তার সিদ্ধান্ত হতে পারে। বাংলাদেশ বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত থাকলে বৈদেশিক মুদ্রার মজুতকে (রিজার্ভ) বৈচিত্র্যপূর্ণ করতে পারবে।

ব্রিকসের ভূরাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। তবে সেটা পশ্চিমাদের সঙ্গে খুব সাংঘর্ষিক হবে বলে আমার মনে হয় না। ব্রিকসে ভারত আছে। ভারত আবার প্রশান্ত মহাসাগরীয় জোটে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আছে। ব্রিকসে চীন আছে, ভারত আছে।

বাংলাদেশকে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সম্পর্কের বহুধাকরণ করতে হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যের সুযোগ ও ঋণের প্রাপ্যতার সুযোগকে বিস্তৃত করতে হবে। বাংলাদেশ যে ভারসাম্যপূর্ণ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতে চাচ্ছে, সেটির সঙ্গে ব্রিকসে যোগদানকে আমি সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবেই দেখি।

বাংলাদেশ যে ব্রিকসে যোগদানের আবেদন করেছে, সেটা হঠাৎ করে নয়। কারণ, আগেই আমরা নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সদস্য হয়েছিলাম বড় অঙ্কের চাঁদা দিয়ে। সেটির অংশ হিসেবেই এখন ব্রিকসের সদস্য হওয়ার বিষয়টি যৌক্তিকভাবে এসেছে।

ব্রিকসের অনেকেই জি–২০–এর সদস্য। নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক যে ঋণ দিচ্ছে, তা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, সুশাসন আছে কি না, তা সামনে আসছে। ব্রিকস উন্নয়নশীল দেশগুলোর জোট হলেও গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা রক্ষা—এসব থেকে দূরে থাকতে পারবে তা নয়। ব্রিকসে এগুলো মানতে হবে। বাংলাদেশ ব্রিকসে যোগ দিলেও গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার ও বাক্‌স্বাধীনতা রক্ষা থেকে দূরে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না।

প্রথম আলো
২০ জুন, ২০২৩

অর্থনীতি নয়, ব্রিকসের পেছনে রাজনৈতিক কৌশল

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রশ্ন: ব্রিকসে যোগ দিতে ঢাকার আবেদনের খবর এমন সময়ে এল, যখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ আলোচনায় আছে। সৌদি আরবের মতো আরও কিছু দেশও ব্রিকসে যোগ দিতে চায়। ব্রিকসের সদস্যপদ বাংলাদেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশ কেন ব্রিকসে যোগ দিতে চাইছে, তা নিয়ে আমাদের ভালো করে বোঝার বিষয় আছে। একটা দিক হলো, এই মুহূর্তে বৈশ্বিক ব্যবস্থার সংস্কার দরকার, এ ব্যাপারে সবাই একমত। যুক্তরাষ্ট্রের কারণে অনেক বহুপক্ষীয় ব্যবস্থা কার্যকর নেই। স্বল্পোন্নত ও তুলনামূলকভাবে কম উন্নত দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত অধিকার আদায়ের জন্যও এটা খুব প্রয়োজনীয়। আবার একই সঙ্গে, দক্ষিণীয় জোটবদ্ধতার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভূমিকা বাড়ানোর চেষ্টার অংশও হতে পারে বাংলাদেশের এই আগ্রহ।কিন্তু মনে রাখতে হবে, ব্রিকসে যেসব দেশ রয়েছে, তাদের অভিলাষ অনেক বড়। তাই এটা পুল ফ্যাক্টর থেকেও হতে পারে, যে তারা বাংলাদেশকে চায়। আবার এটা পুশ ফ্যাক্টর থেকেও হতে পারে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশ পাশ্চাত্যের বড় দেশগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক অবস্থানে আছে। সে কারণে আরও কিছু বড় দেশের সংহতি লাভের জন্যও বাংলাদেশ সেখানে যেতে পারে। আমরা লক্ষ করছি, নির্বাচন তথা মানবাধিকারকে কেন্দ্র করে অনেক বড় দেশ বাংলাদেশের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের তিরস্কারমূলক ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। সে ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ করছি। এই প্রতিক্রিয়া দিয়েও ব্রিকসে যোগ দেওয়ার বর্তমান সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশ সার্ক, বিমসটেক, ডি-৮-এর মতো জোটে আছে। এসব জোটেরও লক্ষ্য ছিল নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক বাড়ানো। খুব লাভ হয়েছে আমরা তেমনটা দেখতে পাইনি। ব্রিকসের প্রধান দুই দেশ থেকে বাংলাদেশ প্রচুর কাঁচামাল আমদানি করে। তাহলে ব্রিকস থেকে আমরা কী সুবিধা পেতে পারি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সেই কারণে বোঝার ব্যাপার আছে আমরা আসলে ঠিক কী কারণে ব্রিকসে যাচ্ছি। এই কারণ কি রাজনৈতিক, না অর্থনৈতিক? না কি আমরা উন্নয়ন চিন্তা থেকে ব্রিকসে যাচ্ছি।

প্রশ্ন: সেটা কি পরিষ্কার নয়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন, বিষয়টি জটিল। এই মুহূর্তে ব্রিকসের সাফল্যের জায়গাটা বাণিজ্যে না, বিনিয়োগে না, প্রযুক্তি হস্তান্তরেও না। যা আছে তা হলো উন্নয়নের অর্থায়ন। নতুন উন্নয়ন ব্যাংক হয়েছে, বাংলাদেশ যার সদস্যও হয়েছে। ভারত ও চীন আমাদের আমদানির মূল উৎস, আর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের বাজার। এটা প্রতিযোগিতামূলক বাজার নয়, আমাদের জন্য বিশেষ সুবিধার বাজার। বিনিয়োগ, রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রেও তারা বড় ভূমিকা পালন করে। তাই রাজনৈতিক বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক বলেন, উন্নয়ন মাপকাঠিতে বলেন, এ ক্ষেত্রে একটা বিশেষ বিবেচনা কাজ করে।জি-৭ বাদ দিলে পৃথিবীতে কার্যকরভাবে যে জোট কাজ করছে, সেটি জি-২০। বাকিগুলো আড়ম্বরপূর্ণ সভা-সমাবেশ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই আমার জানতে চাওয়া, বাংলাদেশ যে ব্রিকসে যেতে চাইছে, তার আসল উদ্দেশ্যটা কী। আসল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক, এটা চটজলদি মনে হয় না। বাংলাদেশ আসলে একধরনের রাজনৈতিক সংহতি খুঁজছে।

প্রশ্ন: আপনি ব্রিকসের অর্জনের প্রসঙ্গে বলছিলেন। ব্রিকস গঠিত হয়েছে অনেক দিন। এখন পর্যন্ত ফলাফল কী কিংবা কতটা অগ্রগতি হয়েছে এই জোটের?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন, ব্রিকসের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অনেক বড়, কিন্তু এখন পর্যন্ত অর্জন সীমিত। কারণ, একভাবে তারা চায় চলমান বৈশ্বিক ব্যবস্থার সংস্কার, যেখানে দক্ষিণের কণ্ঠস্বর জোরদার হবে। একই সময়ে তারা বিকল্পও চায়। কিন্তু বিকল্প করার জন্য যে সামর্থ্য, শক্তি, সিদ্ধান্ত দরকার, সেটা তাদের নেই। ভারত, চীন, রাশিয়ার দিকে তাকালে তা বোঝা যায়। আবার ব্রাজিল কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকার পরিবর্তন হলে তাদের চিন্তায় পরিবর্তন ঘটে। এখন পর্যন্ত ব্রিকস একটি যৌথ দক্ষিণী কণ্ঠস্বর। এদের কারও কারও আকাঙ্ক্ষা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়া। তাহলে কি

দক্ষিণের কিছু দেশ উত্তরের অংশ হতে চাইছে? যদি তা-ই হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এখানে ছোটদের ব্যবহার করা হচ্ছে কি না।

প্রশ্ন: ব্রিকস মূলত বাণিজ্য জোট। জোটে ভারত আছে, চীন আছে। আছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভার মতো বামপন্থী নেতা। তাই এর রাজনৈতিক চরিত্র নিয়েও অনেকে কথা বলেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কোভিড অতিমারির সঙ্গে বৈশ্বিক টানাপোড়েন, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও সরবরাহব্যবস্থা ভেঙে পড়া, টিকার প্রাপ্যতা—এ সবকিছু মিলে নতুন ধরনের উপলব্ধি হয়েছে। উন্নত দেশগুলোর অপরাজেয় ইমেজে দাগ লেগেছে। বিকাশমান অর্থনীতির দেশগুলো তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করতে চাইছে। আমরা দেখছি, তারা বিকল্প মুদ্রা খুঁজছে, বিকল্প বাণিজ্যব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছে। তবে অর্থনৈতিক প্রত্যাশার দিক থেকে তারা একদিকে এগোলেও তাদের রাজনৈতিক ও ভূকৌশলগত অবস্থান বিপরীতমুখী। ফলে অর্থনৈতিক যে সম্ভাবনা রয়েছে, তা অর্জন করা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।বাংলাদেশের জন্য এটি একটি জটিল পরিস্থিতি।

এই মুহূর্তে ব্রিকসে বাংলাদেশের যাওয়ার প্রেরণা কোথা থেকে আসছে— আমি আবার বলি, এটা আসছে যতটা না অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, তার চেয়েও বেশি রাজনৈতিক কৌশলগত দিক থেকে। বর্তমানে সরকার উন্নত বিশ্বের দিক থেকে একধরনের চাপের মুখে অবস্থান করছে— রাজনৈতিকভাবে, গণতন্ত্রের প্রশ্নে, মানবাধিকারের প্রশ্নে, নির্বাচনের প্রশ্নে। এই প্রশ্নগুলোকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে দেশ হিসেবে যে আমরা একা নই, সেটা দেখানোর জন্য আমরা একত্র হচ্ছি। ব্রিকস কীভাবে সম্প্রসারিত হবে, তার নীতিমালা বা পদ্ধতি এখনো ঠিক হয়নি। কিন্তু যদি হতো, তাহলে আমাদের সঙ্গে উন্নত বিশ্বের এই মুহূর্তে যে বৈপরীত্য রয়েছে, তাকে কি আরও গভীর করে দিত? তাকে কি আরও বেশি সংকটপূর্ণ করে দিত? এই প্রশ্নগুলো সামনে আসছে।

প্রশ্ন: ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা প্রশ্ন তুলেছেন, ডলারের বাইরে আরেকটি মুদ্রা দিয়ে কেন বাণিজ্য করা যাবে না? ডি-ডলারাইজেশনের কথাবার্তা এখন জোরেশোরে হচ্ছে। ব্রিকসকে ঘিরে বিশ্ববাণিজ্যে কি একটা মার্কিন বিরোধী বলয় হতে যাচ্ছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ডি-ডলারাইজেশনের ব্যাপারটা বাস্তবের সঙ্গে ঠিক মেলে না। তবে একটা চেষ্টা আছে। আমরা অনেক সময় যেমনটা বলি, আওয়াজ দেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন: কিন্তু এ নিয়ে কথাবার্তা আছে, একধরনের রাজনৈতিক সুরও শোনা যায়। এর ফলে বাংলাদেশ কি কোনো ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যেতে পারে, বিশেষ করে রপ্তানির প্রধান গন্তব্য দেশগুলো যেহেতু ব্রিকসে নেই?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমরা বলি ব্রিকস। ওই যে বি, ওটা তো বাংলাদেশ না। ওই যে আর, সেটা তো রুয়ান্ডা না। মনে রাখতে হবে, দক্ষিণের ভেতরেও দক্ষিণ আছে। দক্ষিণের ভেতরে উত্তর আছে। অর্থাৎ এখানে ভারত আছে, চীন আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য পরস্পর নির্ভরশীল। আর আমার দেশের বাণিজ্য কিন্তু অনেকটাই পশ্চিমের ওপর নির্ভরশীল। বড়রা তর্ক-বিতর্ক করতে পারে, কিন্তু আমি আসরের কোন দিকে বসছি, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। এটাই ঝুঁকির জায়গা। ইতোমধ্যে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অংশগ্রহণের যে চাপ আমাদের ওপরে আছে, সেটা প্রকাশ পেয়েছে। ব্রিকসে যোগ দেওয়ার অভিলাষের কথা বলা হলেও আমাদের দেখতে হবে, বড়দের খেলায় অংশ নিয়ে আমি না আবার ক্রসফায়ারে পড়ে যাই। এই আশঙ্কাটা বৃদ্ধি পায়, যখন পাশ্চাত্য দেশগুলোর একধরনের বিপরীতমুখী আচরণের ভেতরে আমরা অবস্থান করছি।

প্রশ্ন: ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক জিডিপির অর্ধেকের বেশি ব্রিকসের দেশগুলো থেকে আসতে পারে বলে অনেকের ধারণা। সুতরাং এটাও তো ঠিক যে ব্রিকসের মতো জোটে যোগ দিলে ভবিষ্যতে পণ্য বিক্রির সুযোগ তৈরি হতে পারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাজার তো আছে, কিন্তু মূল বিষয় হলো আপনি কী তৈরি করেন। বাংলাদেশ যা তৈরি করে, সেটা ভারতও তৈরি করে, চীনও তৈরি করে। যদিও তাদের মজুরি বাড়ার কারণে আমাদের সস্তা কাপড় সেসব দেশে ঢুকতে পারছে। আমাদের মূল বাজার উন্নত বিশ্বে। আগামী দু-এক দশকে এটা পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরোনোর পরও আমরা এসব বাজারে সুবিধা পাব। দক্ষিণের দেশ থেকে কি আমরা এই সুবিধা পাব? চীন ও ভারত যে শূন্য শুল্কের সুবিধা অব্যাহত রাখবে, এই নিশ্চয়তা এখনো পাওয়া যায়নি।

প্রশ্ন: ব্রিকসের নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সদস্য বাংলাদেশ। ব্রিকসে আরও দেশ যোগ দিতে পারে। এই জোট থেকে বিনিয়োগের সম্ভাবনা কতটা থাকবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ব্রিকসের প্রধান দেশগুলোর জন্য আমরা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল খুলে বসে আছি। ভারতকে আমরা তিনটি অর্থনৈতিক অঞ্চল দিয়েছি। এখন পর্যন্ত তারা বেড়াটেড়া তুলেছে। কিন্তু বিনিয়োগ তো এল না। চীনের বিনিয়োগ আগের চেয়ে একটু বেশি এসেছে। আমি সাহায্যের কথা বলছি না বা সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের কথাও বলছি না।

আমি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের কথা বলছি। আরেকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউটিওর বাইরে যেসব মেগা রিজওনাল ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, যেমন আরসেপ (রিজওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ), এমন মহা আঞ্চলিক ব্যবস্থা অথবা বহুপক্ষীয় ব্যবস্থার জন্য আমার উৎপাদন সক্ষমতা আছে, এমন দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের জন্য মহা আঞ্চলিক অথবা বহুপক্ষীয় ব্যবস্থার চেয়ে নিঃসন্দেহে সর্বজনীন ব্যবস্থা উন্নততর। তুলনামূলক দুর্বল দেশগুলোকে ডব্লিউটিওর মতো ব্যবস্থাই সবচেয়ে ভালো সুরক্ষা দেয়।

প্রশ্ন: দক্ষিণ আফ্রিকায় আগস্টে ব্রিকসের সম্মেলনে বাংলাদেশের আবেদন বিবেচনা করা হতে পারে। চীন বলেছে তারা বাংলাদেশকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। বাংলাদেশের কৌশল তাহলে এখন কী হওয়া উচিত?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ব্রিকসে যারা সদস্য হতে চায়, তারাও দেখবে সদস্য হলে তাদের ওপর কী প্রভাব পড়তে পারে। মনে রাখতে হবে, ব্রিকসের একটি দেশ রাশিয়া, যার সঙ্গে অনেক দেশ এখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে লিপ্ত। কোনো কোনো দেশ আবার হয়তো রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে চাইবে। সুতরাং এখানে বহুবিধ আচরণ থাকবে।ব্রিকসে গেলে বাংলাদেশের মতো একটি দেশকে খুবই বিচক্ষণতা, দক্ষতা, তৎপরতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দিয়ে সামনে এগিয়ে নিতে হবে। আমরা যেটা বলি, আপনি কৌশলগত অংশগ্রহণ করবেন, আবার একই সঙ্গে কৌশলগত দূরত্বও বজায় রাখবেন। আমরা যে বলি, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়— এর বাস্তব প্রতিফলন কী হবে? এটা হবে, সবার সঙ্গেই অংশগ্রহণ করব, কিন্তু আবার কৌশলগত দূরত্বও বজায় রাখব।তবে দেশ যখন একটা অনিশ্চিত নির্বাচনী পরিবেশে ঢুকছে, একটা রাজনৈতিক উত্তরণের দিকে যাচ্ছে, তখন এ ধরনের কুশলী আচরণ আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়। তার জন্য সময় ও মেধা খরচ করতে হবে, একটি ধ্রুবতারা ঠিক করতে হবে। এর ওপর নির্ভর করবে আগামী দিনে কী কৌশল নিতে হবে। সে কারণেই বলছি, সময়টা খুব সহজ নয়।

প্রথম আলো
৫ জুলাই, ২০২৩

দুই দেশের সম্পর্ক কোনো শাসক দলের হাতে জিম্মি হতে পারে না

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রশ্ন: গত জুনে দিল্লিতে অনন্ত সেন্টারের সঙ্গে সিপিডি বাংলাদেশ-ভারত কৌশলগত সংলাপের আয়োজন করেছিল। এর প্রেক্ষাপট কী ছিল?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক শুধু মুক্তিযুদ্ধের কারণে নয়, এটা বর্তমান ও ভবিষ্যতের উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই উপলব্ধি থেকেই সিপিডি বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্কের বিষয়টিকে ধারাবাহিকভাবে একটি গঠনমূলক ও ইতিবাচক আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করার চেষ্টা করে এসেছে। আজকে সবাই বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে যে জায়গায় দেখছেন, এই চেষ্টাটা তাঁদের কাছে অকল্পনীয় মনে হতে পারে। বৈরী একটা পরিস্থিতির ভেতরে তথ্য ও নীতি পর্যালোচনাভিত্তিক সেই কাজটা করে যেতে হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই ভারতের বিভিন্ন চিন্তক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সিপিডি কাজ করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার অনন্ত সেন্টারের সঙ্গে দুই দিনের আলোচনাটা হয়েছে। এটি তাদের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের মতো আলোচনা।

প্রশ্ন: এবার এ সময়ে আলোচনা আয়োজনের কি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এ সময়ে সংলাপ আয়োজনের কারণ হলো উভয় দেশই নির্বাচনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ কারণে নির্বাচনের প্রাক্কালে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের একটা মূল্যায়নের ভেতর দিয়ে তারা যেতে পারে। নির্বাচনের পর এই সম্পর্কের সম্ভাব্য বিবর্তনের সম্ভাবনাও আলোচনায় চলে আসে। অর্থাৎ, দুই দেশের সম্পর্ককে একধরনের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে পুনর্বিবেচনার সময়ে আমরা উপনীত হয়েছি। এক দশক ধরে আমাদের

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত ও গভীর হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখার বিষয় হয়ে উঠেছে উভয় দেশের অভিন্ন স্বার্থের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে কি না। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা এবং অনুমানযোগ্যতা কতটা থাকতে পারে। দেখা দরকার, সম্পর্কের অর্জনকে টেকসই করা এবং কোনো সংস্কারের প্রয়োজন হলে তা নিশ্চিত করার সুযোগ আছে কি না। রাজনৈতিক কোনো ক্রান্তিকালে উপনীত হলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে কোনো পরিবর্তন আসবে কি না কিংবা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে সম্পর্কের সম্ভাবনা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়াবে কি না, তা মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন: তার মানে নির্বাচন সামনে রেখে এ আলোচনার আয়োজন কাকতালীয় নয়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যখনই বসি, তখন আলোচনার একটা পরিপ্রেক্ষিত থাকে। প্রথমবার অনন্ত সেন্টারের সঙ্গে আমাদের আলোচনাটি হয়েছিল ভার্চ্যুয়ালি। সে সময় আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল কোভিড মোকাবিলা এবং কোভিড–উত্তর পরিস্থিতিতে টিকাসহ নানা ধরনের ওষুধ, চিকিৎসাসামগ্রী, অক্সিজেন ও অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহসহ উন্নয়ন সহযোগিতার অভিজ্ঞতা আলোচনা। আশা করি, আগামী বছর আমরা ঢাকায় তৃতীয় আলোচনার আয়োজন করতে পারব।

প্রশ্ন: ২০১৪ সালের নির্বাচনে ভারতে বিজেপির জয়লাভের পর বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্কে পরিবর্তন আসতে পারে বলে ভাবা হয়েছিল। কারণ, কংগ্রেসের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক ঐতিহাসিক এবং প্রমাণিত। কিন্তু ভারতে ক্ষমতার পালাবদল হলেও দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে গেছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মনে করি, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ–ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনটি বড় অর্জন আছে। প্রথমটি হলো ১৯৯৬ সালে গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি সই। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ২০০৯ সাল থেকে এক দেশের ভূখণ্ড অন্য দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতা ব্যাহত করতে ব্যবহার হতে না দেওয়া। তৃতীয় হলো, ২০১৫ সালে স্থলসীমান্ত চুক্তির প্রটোকলের বাস্তবায়ন। ১৯৯৬, ২০০৯ ও ২০১৫ সাল— এই তিন সময়ে ভারতের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের এসব ঐতিহাসিক চুক্তি হয়েছে। অর্থাৎ, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের নীতি কেমন হবে, তা নিয়ে ভারতের দলমত-নির্বিশেষে রাজনৈতিক অবস্থান যথেষ্ট পরিষ্কার ও শক্তিশালী, যা সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। অথচ আমাদের দেশে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন অবস্থান অনুপস্থিত। লক্ষণীয়, গুরুত্বপূর্ণ এসব অর্জনের সময় বাংলাদেশে তিনবারই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র প্রতিবেশীর সঙ্গে ফলপ্রসূ এবং

কার্যকর সম্পর্ক অর্জন করতে চাইলে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিসরে শাসকদল ও বিরোধী দলের মতৈক্য অপরিহার্য। দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার কাঠামো ও উপাদান নিয়ে রাজনৈতিক মতৈক্য থাকা মানে এই নয় যে বাস্তবায়ন পরিকল্পনার খুঁটিনাটি নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারবে না।

প্রশ্ন: তার মানে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারতে যে রাজনৈতিক মতৈক্য আছে, বাংলাদেশে তার অনুপস্থিতিকে আপনি বড় সমস্যা হিসেবে দেখছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক মতৈক্যের বিষয়টি অনুপস্থিত। ২০১৪ সালে ভারতে কংগ্রেসের পরিবর্তে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর শুরুর দিকে আমাদের ভয়ভীতি কি কম ছিল? আমরা তো এই সম্পর্কের গতিময়তার ভেতর দিয়েই তার মধ্যে সামঞ্জস্য এনেছি। কংগ্রেসের প্রতি আওয়ামী লীগের একধরনের ঝোঁক থাকলেও পরে তারা বিজেপির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। এক দেশের বিশেষ কোনো দলের প্রতি অন্য দেশের অগ্রাধিকার বা পছন্দ থাকতেই পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিবেশে কোনো একটি দেশের মানুষই তার দেশের সরকার নির্বাচিত করবে। তাই ক্ষমতায় যে-ই আসুক না কেন, তার সঙ্গে যে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে হবে, এই মানসিকতা থাকতে হবে। দুটি দেশের সম্পর্ক কোনো একটি শাসকদলের হাতে জিম্মি হতে পারে না। আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে দুই নিকট প্রতিবেশীর সম্পর্কের বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক মতৈক্য গড়ে তোলার এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে অন্যান্য অংশীজনকে যুক্ত করা জরুরি। নইলে সম্পর্কের ইতিবাচক দিকগুলো টেকসই হবে না।

প্রশ্ন: দুই দেশের নির্বাচনে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশ বা ভারত যখন নির্বাচনে যাবে, তখন আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের পর্যালোচনা নির্বাচনী বিতর্কের অংশ হবে কি? আমার মনে হয়, দ্বিপক্ষীয় আর্থ-বাণিজ্যিক বিষয়াদি, সীমান্তের মানুষের জীবনের নিরাপত্তা কিংবা অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের মতো বিষয়গুলো নির্বাচন-পূর্ব আলোচনায় আসবে। পাশাপাশি ভূরাজনৈতিক বা ভূকৌশলগত যেসব জোট হচ্ছে, সেগুলোর আর্থরাজনৈতিক তাৎপর্য বিবেচিত হবে। বিশেষ করে এ অঞ্চলে চীনের ভূমিকার বিষয়টি মনোযোগে থাকবে। বিশ্ব এখন মূল্যবোধভিত্তিক আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক থেকে দেনা-পাওনার সম্পর্কে চলে গেছে। এর সঙ্গে আমরা তথাকথিত আত্মপরিচয়ের রাজনীতিতে (আইডেনটিটি পলিটিকস) ঢুকে গেছি। 'আমাদের' পরিবর্তে যখন 'আমি-তুমি' ভেদ হবে, তখন নিজ নিজ দেশের ভিন্ন ভিন্ন সত্তাকে বোঝানোর জন্য কোন ধরনের 'পরিচয়'-এর রাজনীতি হবে, তা ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট

হচ্ছে। সেই পরিচয় হবে মূলত বৃহত্তর ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর পরিচিতির ভিত্তিতে। কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ইস্যু হতে পারে? মনে রাখতে হবে, এক দেশে যারা সংখ্যালঘিষ্ঠ, প্রতিবেশী দেশে তারাই আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ। আবার অন্য দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠরা পাশের দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ। এই বিষয়ে যদি উপলব্ধি ও সংবেদনশীলতা না থাকে, তাহলে পুরো সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হবে। ভোটের সমীকরণ এমন জটিলতাকে উসকে দেয়।ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের কাঙ্ক্ষিত বিবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মনোভাব স্পষ্ট নয়। সে কারণে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের অনিষ্পন্ন এবং বিকাশমান বিষয়গুলো দায়িত্বশীলতার সঙ্গে বাংলাদেশের নির্বাচনী বিতর্কের ভেতরে আনতে হবে। আমাদের দেশেও নির্বাচনকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা যখন আরও স্পষ্ট হবে, তখন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলগুলোর প্রস্তাব তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে পরিষ্কারভাবে বলতে হবে। পাশাপাশি আমরা কীভাবে এই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উত্তরণ দেখতে চাই, সরকারকে সেটি স্বচ্ছতার সঙ্গে উত্থাপন করতে হবে। অন্যদের আলোচনায় এবং প্রক্রিয়ায় যুক্ত করে তাদের একধরনের অংশীদারত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। সরকার যেন ধরে না নেয়, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক তার একটি নিরঙ্কুশ অর্জন।

প্রশ্ন: ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে নতুন কী কী উপাদান আগামী দিনগুলোয় আসতে পারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নেপাল ও ভুটানের মতো বাংলাদেশের নিকটবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বিকাশের ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভারতের সঙ্গে সম্পর্কটা উপ-আঞ্চলিক কাঠামোর মধ্যে বিবেচনা করতে হবে। আমরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য আমাদের সব ধরনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছি। অথচ নেপাল বা ভুটানে পণ্য পাঠানোর যোগাযোগ সুগম করতে পারছি না। দ্বিপক্ষীয়ভাবে বিদ্যুৎ আমদানি করতে পারছি না। এখানে ভারসাম্য আনতে হবে। এরপর আসে ভারতের ঋণচুক্তির বিষয়টি। ঋণের আওতায় ৮০০ কোটি ডলারের অর্ধেকও কেন এক যুগ পরও খরচ করা গেল না? ঋণ ব্যবহার যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়, সে জন্য কি তা আটকে যায়? নাকি বাংলাদেশ এই ঋণ ব্যবহারে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করে না? এ বিষয়গুলো তথ্যভিত্তিকভাবে আলোচনা করতে হবে।এখন মিয়ানমারের সঙ্গে রোহিঙ্গা সমস্যার পরে নতুন করে যুক্ত হয়েছে কুকি–চীনের বিষয়টি। এসব বিষয় নানাভাবে সম্পর্ককে প্রভাবিত করছে। এতে তৃতীয় পক্ষ যুক্ত হয়ে জটিলতা বাড়াচ্ছে।দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখা থেকে এবং এর একদেশদর্শী প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন: দুই দেশের নির্বাচনের আগে সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়ন হওয়া কতটা জরুরি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নির্বাচনের পর সরকারে যে দলই আসুক না কেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে অবজ্ঞা, অবহেলা বা অস্বীকার করে তারা দেশের সর্বোচ্চ উন্নতি করতে পারবে না। সে কারণে নির্বাচনের আগে বিষয়টি মুক্তভাবে আলোচিত হবে বলে বিশ্বাস করি। সরকারের বাইরে অন্যদেরও আলোচনার প্রক্রিয়ায় যুক্ত রাখতে হবে। তাদের অংশীদারত্ব দিতে হবে। ভারত সরকার তার দেশীয় অংশীজনকে যুক্ত করে এর সুফল ভোগ করছে। আমাদেরও ঐক্যবদ্ধভাবেই সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে হবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের বিষয়ে ভারতের একধরনের উৎকণ্ঠা আছে। ভারতের নিরাপত্তার প্রেক্ষাপট থেকে যদি বিবেচনা করি তবে এই উৎকণ্ঠা বোধগম্য। বিশেষ করে দশ ট্রাক অস্ত্র চালানের ঘটনা কিংবা আগে যে তিনটি অর্জনের কথা বলেছি, এটা সেই পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করতে হবে। কিন্তু আমরা যদি অতীতে আটকে থাকি, তাহলে তো এগোনো যাবে না। তবে মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশে ভারতের ভাবমূর্তিগত সমস্যা আছে। এখানে যে বিশ্বাসের একটা ঘাটতি আছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।তাই এগোনোর জন্য আমাদের সম্পর্কের লোহিত রেখাগুলো (রেড লাইনস) নির্দিষ্ট করতে হবে। এই সীমারেখাগুলোর কোনো ব্যত্যয় করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত, নিজের দেশকে অন্য দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করতে ব্যবহৃত হতে না দেওয়া। দ্বিতীয়ত, চলমান ও সম্ভাব্য বাণিজ্য-বিনিয়োগ-যোগাযোগ ইত্যাদিতে বহুমাত্রিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখা। তৃতীয়ত, নিজ নিজ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের নিরাপত্তা ও বিকাশ নিশ্চিত করা।

প্রশ্ন: আপনি দেনা–পাওনার প্রসঙ্গ তুললেন। বিশ্বাসের ঘাটতির কথাও বললেন। দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নিতে হলে কী করা উচিত?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিশ্বাসের ঘাটতি পূরণ করতে হবে। দুই দেশের সম্পর্কের সৃষ্টিশীল পুনর্বিবেচনা দরকার। সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি আছে, তা পূরণ করে ভারসাম্য আনা প্রয়োজন। বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে এই সম্পর্ককে সামনে আনতে হবে। এ জন্যই নির্বাচনের আগে এই সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলা মনে তথ্য–উপাত্তভিত্তিক আলোচনা প্রয়োজন।

প্রথম আলো
৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

অধ্যায় ৫

শ্রদ্ধা ও স্মরণে

জাফরউল্লাহ চৌধুরী সৃষ্টিশীলতার একটি চমৎকার উদাহরণ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সঞ্চালক: চ্যানেল আই আজকের সংবাদপত্রে অতিথি হিসেবে আছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্বাগত দেবুদা আপনাকে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ মতিউর ভাই।

সঞ্চালক: আমরা গত দুদিন ধরে যে শিরোনাম দেখেছি তা হলো আমাদের সবার প্রিয় জাফর ভাইকে নিয়ে। আমি জানি জাফর ভাই এর সাথে আপনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো, আপনারা এক সাথে কাজ করেছেন। তার সম্পর্কে যদি আমি মূল্যায়ন করতে বলি আপনি কিভাবে তাকে মূল্যায়ন করবেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: গত কয়েকদিন জাফরউল্লাহ চৌধুরীকে দেশ এবং জাতি অন্যভাবে আবিষ্কার করেছে। কারণ উনার প্রয়াণকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত জিনিসপত্র সামনে এসেছে এটা অনেককেই চমকিত করেছে সেভাবে। বাংলার যুব সমাজ যখন সমসাময়িক পরিস্থিতিতে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব খুঁজে বেড়ায় তখন জাফরউল্লাহ চৌধুরী একটু আশীর্বাদ হিসেবে তাদের কাছে এসেছে। আপনি দেখেন এখানে আমি ব্যক্তিগত বিষয় বা অভিজ্ঞতা বলতে পারি কিন্তু তার চেয়ে বড় বিষয় নাগরিক সমাজের জন্য জাফর ভাই ছিলেন আমাদের সবচেয়ে বড় গৌরবের মানুষ, একটা অহংকারের মানুষ। এর কারণ হলো নাগরিক সত্তার ভেতরে যেটা থাকে সেটা হলো একটা প্রতিবাদী চিত্ত নাগরিকদের ভেতরে থাকে। অন্যায়, অবিচার এবং দুঃশাসন তার নাগরিক মন গ্রহণ করতে পারে না। তার ঐ প্রতিবাদী মনটা অনেক পরিষ্কারভাবে জাফরউল্লাহ চৌধুরীর মধ্যে দিয়ে বের হয়েছে।

কিন্তু অনেকেরই যেটা থাকে না প্রতিবাদী মনের সাথে সেটা হলো একটি সৃষ্টিশীল মনও এটার সাথে থাকে। জাফরউল্লাহ চৌধুরী সৃষ্টিশীলতার একটি চমৎকার উদাহরণ হিসেবে আমাদের সামনে এসেছে। সেটা উনি বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বলেন, ছাত্রাবস্থায় ছাত্র নেতা হিসেবে বলেন, স্বাধীনতা উত্তরকালে জনমানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর কথা বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে ক্রয়গ্রাহ্য এরকম ওষুধ নিয়ে আসার জন্য জাতীয় ওষুধ নীতির কথা যদি বলেন এবং পরবর্তীতে শুধু দেশের ভেতরে না দেশের বাইরে এটা আমার জানার সুযোগ হয়েছে, জানার সুযোগ হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে যে কিভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার যে মডেল তিনি স্থাপন করেছেন তা কিভাবে বৈশ্বিক পর্যায়ে সর্বজনীন করা এবং সামষ্টিক অর্থনীতি কিভাবে স্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে সেটার জন্য যে বৈশ্বিক পরিস্থিতি ছিলো তার একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে তিনি আমাদের কাছে ছিলেন। কিন্তু

সম্ভবত জাফরউল্লাহ ভাই আরো বেশি মনে থাকবেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ওষুধ নীতি ইত্যাদি তো আছেই, এছাড়াও যে কারণে মনে থাকবেন সেটা আমি আপনার এখানে বসে আকবর আলী খান সম্পর্কেও বলেছিলাম সাম্প্রতিক সময়ে উনি যে ধরনের নীতিবান অবস্থানে থেকে বিভিন্ন বিষয়কে মানুষের সামনে কোনো ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে তুলে ধরেছেন, সেটা সঠিক হোক বেঠিক হোক বা কারো মনের সাথে মিলুক বা না মিলুক এটা এক ধরনের জেদ বলেন বা প্রতিজ্ঞা বলেন এটা তিনি ভীষণভাবে সামনে নিয়ে এসেছেন। সেহেতু এই যে নীতিবোধ আমি যে বললাম দ্বৈত নাগরিক সত্তা, প্রতিবাদী ও সৃষ্টিশীল এবং তার সাথে এই দুটোরই প্রকাশ তিনি যেভাবে দাঁড়া করিয়েছেন এটা দেখার মত এবং উনার থেকে বুঝতে হবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশ, জাতি এবং বৃহত্তর সময়ের জন্য অবদান রাখতে হয়। প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে বাঁচার একটি ব্যাপার থাকে আর কি সেহেতু আমি মনে করি যে তিনি যে শেষ সময়ে নাগরিক আন্দোলনে গেছেন, যখন উনাকেও মাছ চুরির মামলাকেও মোকাবিলা করতে হয়েছে অথবা উচ্চ আদালতে উনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে শাস্তি নিয়ে সেসবকে অতিক্রম করে কোনো গ্লানিবোধের ভেতর তিনি ঢোকেননি এবং সামনের দিকে তিনি গেছেন। তাই আমি মনে করি যুব সমাজের জন্য সবচেয়ে বড় অবদান হিসেবে তিনি রেখে গেছেন একটি অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

একজন ক্ষণজন্মা মানুষ কেমন করে যেনো এই যে প্রজন্মটা ছিলো যারা স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশকে প্রস্তুত করেছে, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এবং নাগরিক সম্প্রদায়ের তারা স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশকে পুনর্গঠন এবং পুনরজ্জীবনের দায়িত্ব নিয়েছেন, পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্থান পতনের ভেতরেও হতাশ না হয়ে অব্যহত গতিতে এগিয়ে গেছেন এবং শেষ জীবনেও যারা শেষ সময়টুকু পর্যন্ত যুক্ত থাকতে চেয়েছেন তাদের

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো, এখানে যে কাজ তারা আমাদের জন্য রেখে গেছেন এবং প্রস্তুত করে গেছেন সবাই মিলে সেটাকে অব্যহতভাবে চালিয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে উনার তিরোধানের সময় সবচেয়ে বড় উপলব্ধি বলে মনে হচ্ছে। তিনি যেটা চেয়েছিলেন বাংলাদেশে একটি সুষম, বৈষম্যহীন অর্থনীতির স্বাধীনতার ভেতর দিয়ে আমরা যেটা অর্জন করেছি সেটাকে সামনে নিয়ে সে প্রতিষ্ঠার দিকে যাওয়া। এই প্রজন্মকে আমি আহ্বান জানাবো উনার সে কাজে যেনো আমরা সকলে যুক্ত থাকতে পারি আগামী দিনেও। সেটিই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা।

সঞ্চালক: এ সুযোগে কি দুই একটা ব্যক্তিগত ঘটনা বলবেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ঘটনার মধ্যে ধরেন নভেম্বর মাসে তিনি আমার পারিবারিক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন, আপনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হুইল চেয়ার নিয়েই তিনি এসেছেন, সকলে শ্রদ্ধার সাথেই আকর্ষণ করেছেন। এছাড়াও একাধিক সেটা ধরেন আপনি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময়, গণতন্ত্রের সংগ্রামের সময় এমনকি একাধিক দিন গেছে প্রেসক্লাবে আমরা এক সাথে একত্র হয়েছি বা অন্য কোনো জায়গায় শাহবাগের মোড়ে একত্রিত হওয়া এর ভেতরে একই সাথে পেয়েছি। আপনার গণতান্ত্রিক অধিকারকে সমুন্নত রাখার জন্য জনপ্রতিনিধিত্ব আইনকে সংস্কারের জন্য যেমন পেয়েছি, সাম্প্রতিককালে বৈষম্য বিরোধী যে আইনটি খসড়া রয়েছে সেটার জন্য যেমন পেয়েছি তেমন সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী আন্দোলনেও বড় ভাবে পেয়েছি। তিনি অসম্ভব রকমের অসাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন। সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর, পার্বত্য চট্রগ্রামের সংখ্যালঘুদের উপর যে অত্যাচার নিপীড়ন হয়েছে সেগুলোর বিচারহীনতার বিরুদ্ধেও তিনি আমাদের সভায় এসেছে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের, আর সিপিডির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উনি সর্বদাই অংশগ্রহণ করেছেন এবং আমরা সর্বদাই অপেক্ষা করে থাকতাম এই মুহূর্তে প্রথাগত কথার বাইরে জাফরউল্লাহ ভাই কোন কথাগুলো বলবেন, অনেকে হয়ত একমত হবেন না কিন্তু কথাগুলোকে মাথায় নিয়ে চিন্তা করতে করতে ফিরে যাবেন সেরকম ঘটনা অনেক আছি।

ব্যক্তি আলোচনা আমি পারিবারিকভাবে না করি আর কি। কিন্তু উনি এবং উনার পরিবার যথেষ্ট কাছের এবং উনি আপনাদের হয়ত মনে আছে যখন ইউনুস সাহেব একটি বৈশ্বিক সম্মেলন করতে চেয়েছিলেন এখানে তখন যখন জায়গা নিয়ে সমস্যা হচ্ছিলো, কোনো হোটেল উনাকে দিতে চাচ্ছিলোনা সে সময় দেখেছি জাফরউল্লাহ ভাই আবেদ ভাই এর সাথে কথা বলে উনার যে সাভারে অডিটোরিয়াম আছে সেটাকে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়ার। আসলে উনি একজন ক্ষণজন্মা মানুষ এবং বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের মনের থেকে আমরা দুই তিনজন এমন মানুষ পেয়েছি যেটা নিয়ে গর্ব করার আছে।

প্রফেসর ইউনুস আছেন, ফজলে হাসান আবেদ আছে, জাফরউল্লাহ চৌধুরী আছেন। তারা প্রত্যেকেই কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং এ বাংলাদেশের একটি নতুন পরিচয় তারা দিয়ে গিয়েছেন। উনাদের দেখলে পড়ে অনেক বাঁধার মধ্যেও আত্মশক্তি আসে, বিশ্বাস আসে যে বাংলাদেশের মানুষ আগামী দিনে আরো ভালো করবে।

সঞ্চালক: অনেক ধন্যবাদ। যেহেতু পাওনাকে পাওয়া গেলো অর্থনীতির বিষয়ে একটু আসি। আজকে সমকালের শিরোনাম হচ্ছে দারিদ্র্য কিছুটা কমলেও বৈষম্য বেড়েছে। আপনার কি মতামত এ বিষয়ে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: গতকাল তো বাংলাদেশের পরিসংখ্যার ব্যুরোর পক্ষ থেকে খানা জরিপ যেটা জাতীয়ভাবে করা হয় তা প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ৬/৭ বছর পরে, ২০১৬ তে শেষ ছিলো। ২০২২ সালের সময়কালে এটাকে নেয়া হচ্ছে। যেটা দেখা যাচ্ছে যে আয় বেড়েছে দ্বিগুণ, খরচও বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। আমাদের দারিদ্র্যের সংখ্যা কমেছে, হতদরিদ্রের সংখ্যাও সেভাবে কমেছে। মানে বছরে প্রায় গড়ে এক শতাংশের মত দারিদ্র্যের হার কমেছে। এটা বাংলাদেশের যে প্রব্রিদ্ধির হার তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। কিন্তু যেটা দেখার বিষয় সেটা হচ্ছে এ সময়কালে পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বৈষম্যও অনেক বেড়েছে। আমি বিশ্বাস করি এটা শুধু আয় বৈষম্য না, সম্পদের বৈষম্য আরো বেশি এবং সরকারের পক্ষ থেকে নানা ধরনের পদক্ষেপ নেয়ার পরেও, সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয়ার পরেও ভোগ বৈষম্য চরমভাবে বেড়েছে। আপনি যদি বাজারে যান তাহলে লক্ষ্য করবেন কিছু মানুষের হাতে প্রচুর খরচযোগ্য পয়সা আছে আবার কিছু মানুষের জন্য সামান্যতম প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে এই উচ্চমূল্যের বাজারে কিনে জীবনধারণ করা নিয়েও কষ্টকর অবস্থায় আছে। যে সংখ্যাগুলো দেখছেন সেগুলো গড়ে সংখ্যা, যেহেতু গড়ের সংখ্যা আমরা বিভাজিতভাবে কোন আয় গোষ্ঠীর কত বেড়েছে সেটা কিন্তু আলোচনায় আসেনি। অর্থাৎ সবচেয়ে যারা উচ্চবিত্ত তাদের ওখানে আয়ের কেন্দ্রীভূবন উপরের ১ শতাংশ কত আয় রাখে এবং নিচের ৫ শতাংশ কত আয় রাখে সেখানে আয়ের ভেতরে তাদের অধিকারটা কমেছে না বেড়েছে সেটা দেখার বিষয়। আর মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে যেটা আমরা অনেক সময়ে দেখি যে অনেক সময় উপরে তো বাড়েই, অনেক সময় নিচেও বাড়তে পারে। কিন্তু মধ্যখানে যে অংশটা থাকে যদি আমরা উচ্চ ২০ শতাংশ বাদ দিই আর নিচের ৪০ শতাংশ বাদ দিই মধ্যে যে ৪০ শতাংশ থাকে যেটাকে আমরা মধ্যবিত্ত বলি যাদের আয় হয়ত ৬০-৭০ হাজার টাকা থেকে এক বা দেড় লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে তাদের পরিস্থিতিটা এখানে বোঝার ব্যাপার।

আমাদের এটার সাথে মিলিয়ে দেখার আছে যে শুধু আয় বা ভোগ বা সম্পদের ব্যাপার না এটার সাথে দেখা যাবে আমি নিশ্চিত যে শিক্ষার ক্ষেত্রে সে অর্জনগুলো এ সমস্ত নিম্ন

আয়ের ক্ষেত্রে অনেক কম, তাদের বিদ্যালয় শেষ করার হার কম। প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করতে পারলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয় শেষ করতে পারছে না। তাদের ভেতরে মেয়ে ছাত্রীরা আরো অসুবিধার ভেতরে থাকছে। একইরকমভাবে আপনারা দেখবেন যে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে যে সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যসেবার উপর তারা নির্ভর করে তারা তো আর বিদেশে যেতে পারে না, সে সামর্থ্য তাদের নেই। সেহেতু স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও যেটুকু প্রাপ্য সেটা পায় না এবং সেখানে পকেটের থেকে তাদের খরচ অনেক বেশি দেখবেন। আরো যদি আপনি এটার ভেতরে দেখেন তাহলে লক্ষ্য করবেন যে, একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে আর অন্যদিকে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে, নারী প্রধান খানাগুলোর আয়ের ক্ষেত্রে তারা কি তুলনামূলকভাবে দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে কিনা এটাও দেখতে হবে। অর্থাৎ আমি মনে করি আগামী কয়েকদিন যত কাঁচা তথ্য আমরা পাবো, প্রস্তুত করা স্মারণী বা টেবিল নয় তখন আমরা এগুলোকে বিশ্লেষণ করে আরো ভালোমত বলতে পারবো পরিস্থিতিটা কি হচ্ছে। তবে এটা মনে রাখার ব্যাপার সকলের যে এটা গড়ের হিসাব হচ্ছে এটা সাধারণ মানুষের জীবনের হিসাব হচ্ছেনা।

সঞ্চালক: এই দুটোর পার্থক্যটা কি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: পার্থক্য হলো ধরুন আপনি আয় করেন দুই লক্ষ টাকা এবং আপনি আয় করেন বিশ হাজার টাকা। এখন দুই লক্ষ বিশ হাজারকে যদি ভাগ দিয়ে বলি যে গড় আয় আমরা এক লক্ষ দশ হাজার করে করি তাহলে এটা তো অংকে মিলবে কিন্তু এটা তো বাস্তবতার সাথে মিলবে না। এটাই হলো সাধারণ কথা যে আয় বেড়েছে কিন্তু সবার বাড়েনি। যেটুকু বেড়েছে সমান্তরাল হারে বাড়েনি, আনুপাতিক হারেও বাড়েনি। সেহেতু সে অর্থে বাংলাদেশ একটি অনেক বড় বৈষম্যপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। আর অর্থনীতির ইতিহাস বলে, আপনি যদি অর্থনীতির বৈষম্য চরমভাবে করেন তাহলে তা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে তো বৈষম্য তৈরি করেই, এমনকি আপনার নিরাপত্তা, নাগরিক অধিকার এগুলোর ক্ষেত্রেও অসুবিধার সৃষ্টি করে। একটি অত্যন্ত বৈষম্যপূর্ণ সমাজে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যহত রাখা খুবই সমস্যা হয় এবং এর ভেতরে সবচেয়ে বেশি সামাজিক যে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে এটার সুযোগ শুধু দেশের ভেতরেই যে সামাজিক অসন্তোষের জন্য হয়না এটা আমরা বিদেশের সাথে যে দর কষাকষিতে করি তখন আমার রাষ্ট্রকে অনেক বেশি দুর্বল করে দেয়। এখন এটার এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় যেটা হয়েছে সেটা হলো দ্রব্যমূল্যের পরিস্থিতি। দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতিতে কিনে খেতে হয়, দৈনিক আয় করতে হয় সেরকম মানুষদের ক্ষেত্রে এটা বড় সমস্যা। বাংলাদেশে ৮০ শতাংশ মানুষ কিন্তু অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। আপনার এবং আমার সাথে যাদের ওঠাবসা তাদের বেশিরভাগই সরকারি কর্মকর্তা, নাহলে খুব সংগঠিত ব্যক্তিখাতের কর্মকর্তা বা

কর্মচারীবৃন্দ। তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে, তাদের গ্র্যাচুয়িটি আছে, তাদের পেনশন আছে। কিন্তু এই যে ৮০ শতাংশ মানুষ তাদের কিন্তু এগুলো নেই।

সরকারের কিন্তু এখন সর্বজনীন পেনশনের কথা বলতে হচ্ছে, এ কারণেই বলতে হচ্ছে। কারণ পেনশন আছে মাত্র ২০ শতাংশ মানুষের তাও সরকারি কর্মকর্তাদের। সুতরাং এই জিনিসগুলো আগামী দিনে বাংলাদেশের নতুন উত্তরণে এই যে মধ্যম আয়ের দেশের কথা বলি সেখানে কোনো মানুষের সেই অভাববোধটা, অর্থনৈতিক অসহায়ত্বটা থাকেনা। ঐটা এখন পূরণ করার ব্যাপার আছে। কিন্তু বৈষম্য যদি আপনার সংগঠিত হবার অধিকার না থাকে, কথা বলার অধিকার না থাকে, দাবিদাওয়া যদি প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন তাহলে ঐ বৈষম্যের যে চিত্রটা আছে তা ভাঙতে পারবেন না। সুতরাং, এর ভেতরে উন্নয়ন এবং জবাবদিহিতা একে অপরের পরিপূরক হিসেবে আসে। এখানে আগে বলেছি আমি যারা গণতন্ত্রের কথা বলেন, উন্নয়নের কথা বলেন, গণতন্ত্রকে প্রয়োজন মনে করেন না তারা অনেক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র বা উন্নয়নের সংজ্ঞার সাথে অবহত না। অমর্ত্য সেনের কথা হলো 'Development is the biggest freedom'। আর এই স্বাধীনতা পেতে হলে সব থেকে বেশি দরকার 'ভয়েজ' অর্থাৎ আপনার কণ্ঠস্বরকে প্রকাশ করা, রাষ্ট্রের সাথে আপনার যে দেয়া নেয়ার সম্পর্কটা আছে সে দাবিকে আপনি প্রকাশে আনতে পারেন কিনা সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের উন্নয়নের যে আলেখ্য রচনা করা হয়েছে, সে গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের একটা দ্বন্দ্বাত্তিক সম্পর্ক আছে এটাকে অনুধাবনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সঞ্চালক: আপনি সরাসরি বলেছেন বৈষম্যের কথা। তো বৈষম্য এমনই দেখছি আমরা বিশ হাজার টাকায় জিলাপি বিক্রি হচ্ছে। এক কেজি জিলাপির দাম বিশ হাজার টাকা এবং বলা হচ্ছে এটা নাকি সোনার জিলাপি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটাতে আমার কাছে দুটো পর্যবেক্ষণ আছে। এক নম্বর হলো সোনার জিলাপি কেনার মতো বাংলাদেশে আছে। অর্থাৎ এমন সোনার মানুষ আছে, আমরা সৃষ্টি করেছি এমন সোনার মানুষ। এই যে ছয় বছরের হিসাব দিচ্ছেন এর ভেতরেই তো উনারা সৃষ্টি হয়েছে। আর দুই নাম্বার হলো আমাদের মধ্যে সামাজিক কুণ্ঠাবোধটাও চলে গেছে। আগে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত স্বাধীনতা পূর্বকালে ও উত্তরকালে এবং আপনি যদি বঙ্গবন্ধুর আশপাশের মানুষগুলোকে দেখতেন তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত পেশাজীবী ছিলো। তো সে মানুষগুলো এক ধরনের নীতিবোধ দিতো। ঐ নীতিবোধ দেয়ার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত যদি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে নীতিবোধ দেয়ার মানুষ কিন্তু থাকে না। শিক্ষক সম্প্রদায় যে নীতিবোধ দিতো, একজন উকিল যে নীতিবোধ দিতো, একজন পেশাজীবী ডাক্তার যে নীতিবোধ দিতো সেই নীতিবোধগুলো এখন তারা স্থাপন করতে পারে না। এখন

মূল্যবোধগুলো অন্য কেউ স্থাপন করছে যাদের সাথে সমাজের এই যে বিকাশ, এর যে ঐতিহ্য আমাদের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনার কথা আমরা বলি সেই চেতনাগুলোর সাথে কোথ থেকে তাদের যেন একটা বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে। যার ফলে ঐরকম একটি জিলাপি সে তৈরি করার কথা চিন্তা করতে পারে এবং তা বাজারে দেয়ার ক্ষেত্রে নৈতিকতার কোনো সমস্যা হয় না।

যারা ভোক্তা অধিকারকে রক্ষা করেন তারা এটাকে নজরে নেয়ার প্রয়োজনবোধ করে না যদি না মিডিয়া এটাকে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে দেয়। আপনি বলছেন আয়, বৈষম্য এগুলো ঠিক কিন্তু শেষ বিচারে একটা সমাজকে ধরে রাখে তার মূল্যবোধ এবং তার চেতনা। স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে বড় অবদান এখানেই ছিলো। এই জায়গাটাতে কষ্টটা একটু বেশি এবং তখনই জাফরউল্লাহ ভাইদের প্রজন্মের মানুষগুলোর কথা স্মরণ হয় যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে, দেশকে স্বাধীন করেছে, দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অবদান রেখেছে এবং আমাদের হাতে একটা অসম্পূর্ণ কাজ উনারা দিয়ে গেছে। সেই চেতনাটাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে আশা করি।

সঞ্চালক: অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

আজকের সংবাদপত্র, চ্যানেল আই
সঞ্চালনায়: জনাব মতিউর রহমান চৌধুরী
১৩ এপ্রিল, ২০২৩

প্রফেসর নুরুল ইসলামের চিন্তা চেতনাকে আমাদের এগিয়ে নিতে হবে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যাপক নুরুল ইসলামের অবদান মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বকে বিবেচনায় নিতে হবে। তবে, আমার বিশ্বাস, তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো আমাদের দেশের স্বাধীনতার পেছনে অর্থনৈতিক যুক্তিগুলোকে সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা এবং মুক্তিযুদ্ধে আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ। তিনি এবং তার সহকর্মীরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে এক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করেছিলেন। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তিনি একটি অর্থনৈতিক ইশতেহার তৈরি করেছিলেন, যা পাকিস্তান থেকে বাঙালি জাতির মুক্তির যৌক্তিকতা তুলে ধরে।

শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রচেষ্টাকে বিদেশের জনগণের কাছে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়ে যাওয়াই নয়, বরং বাংলাদেশি নাগরিকদের দুর্দশার কথা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রেও প্রফেসর ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তিনি শরণার্থী, মুক্তিযোদ্ধা এবং দখলকৃত এলাকা আটকে পড়া মানুষদের অবস্থাও তুলে ধরেছিলেন। তিনি আমাদের দেশের নাগরিক এবং রাজনৈতিক অভিজাতদের মধ্যে অন্যতম নক্ষত্রের প্রতীক। জাতির প্রতি এই উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য অধ্যাপক ইসলাম আগামীকালেও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আমরা জানি যে, অধ্যাপক ইসলাম বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বাধীন প্রথম পরিকল্পনা কমিশনে মন্ত্রীয় পদমর্যাদায় উপ-চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি এবং আরও তিনজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ; যথা অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন এবং অধ্যাপক আনিসুর রহমান, ১৯৭৩-৭৮ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনাকারী লেখকদের দলের

নেতৃত্ব দেন। অধ্যাপক ইসলামের নেতৃত্বে এই অসাধারণ দল বঙ্গবন্ধু এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের নীতি কাঠামো তৈরি করে। এই পরিকল্পনা কমিশনের দলিলটি রাজনৈতিক অর্থনীতির নীতিমালা প্রণয়নের একটি অসাধারণ উদাহরণ, বিশেষ করে এটি কীভাবে নীতি বিনির্ধারণ করা হয়েছিল, সেসময়ের রাজনৈতিক চাহিদাগুলোর সাথে টেকনোক্র্যাটিক বা অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির ভারসাম্য বজায় রেখে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি একটি সমৃদ্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায্য বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল।

অধ্যাপক নুরুল ইসলামের অবদানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তার প্রতিষ্ঠান নির্মাতার ভূমিকা। স্বাধীন বাংলাদেশের একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা যা পাকিস্তান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়, তা হলো পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স। এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বাংলাদেশ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিআইডিএস নামে পরিচিত, যেখানে আমি ১৬ বছর কাজ করেছি। এ প্রতিষ্ঠানটির সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তার লাইব্রেরি, যা স্বাধীনতার আগে অধ্যাপক ইসলামের নির্দেশনায় ইসলামাবাদ থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়।

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ড. স্বদেশ বসু এবং অধ্যাপক রেহমান সোবহানের মতো বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের সাথে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা এবং অগ্রসর করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিআইডিএস নতুন প্রজন্মের বাঙালি অর্থনীতিবিদদের জন্য একটি শিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে। গত কয়েক দশকে বিআইডিএস-এর প্রাক্তন কর্মকর্তারা দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম দীর্ঘদিন ইতালির রোমে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এর সহকারী মহাপরিচালক হিসেবে বিশ্বব্যপী বাংলাদেশী অর্থনীতিবিদদের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অবদান রাখার মধ্য দিয়ে তিনি তার কর্মজীবন শুরু করেন। তবে তার কর্মজীবনের শেষ পর্বে, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি'র আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা ইনস্টিটিউটে খাদ্য নীতি গবেষণায় তার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

অধ্যাপক ইসলামের মর্যাদা কেবল স্বাধীনতার অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরির শিল্পী হিসেবেই নয়, বরং উন্নয়ন দর্শনের পথপ্রদর্শক, কার্যকরী শিক্ষাবিদ এবং প্রতিষ্ঠান নির্মাতা হিসেবেও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অধ্যাপক ইসলামের কীর্তি তার আত্মজীবনী 'The Making of a Nation : An Economist's Tale' গ্রন্থে এবং ৭০ এর দশকের গোড়ার দিক থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত

পরিকল্পনা বিষয়ে তার ভাষণগুলোতে সুন্দরভাবে নথিবদ্ধ রয়েছে। আমি মনে করি, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং চিন্তার বিবর্তন সম্পর্কে জানার জন্য এগুলো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয় উপহার।

নিজের শেষ দিনগুলোতেও অধ্যাপক ইসলাম অত্যন্ত কৌতূহলী, তীক্ষ্ণ, কর্মঠ এবং বাংলাদেশের বাস্তবতার সাথে যুক্ত ছিলেন।

অনেকের মতোই, অধ্যাপক নুরুল ইসলামের সাথে অনেক মধুর স্মৃতি আমার রয়েছে। তাঁর প্রয়াণ জন্য অবশ্যই একটি ব্যক্তিগত ক্ষতি, অনেকের মতোই। নিঃসন্দেহে, আমি তার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী চিন্তার বিনিময় আজীবন স্মরণ করব।

অতএব, যে আদর্শের জন্য তিনি দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের যৌথ দায়িত্ব হবে সেগুলো এই জাতির বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

পরিশেষে বলতে চাই, দেশের কোনো সরকারই অধ্যাপক নুরুল ইসলামের অবদানকে স্বীকারোক্তি প্রদান করে স্বাধীনতা পুরস্কারের মাধ্যমে সম্মানিত না করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে আফসোস প্রকাশ করি।

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড থেকে অনুবাদিত
১০ মে, ২০২৩

রেহমান সোবহান: ইতিহাসে দায়বদ্ধ বুদ্ধিজীবী

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বিরল কিছু মানুষের জীবন দেশের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে ধারণ করে গড়ে ওঠে। অধ্যাপক রেহমান সোবহান এমনই একজন মানুষ। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতীয় বিকাশের ধারার সঙ্গে তাঁর জীবনের সিঁড়ি-ভাঙা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সীমিত পরিসরে এই মহতী জীবনের কতিপয় নির্বাচিত বৈশিষ্ট্য বিধৃত করছি।

আমরা অবগত যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের যৌক্তিক ও নৈতিক ভিত্তি দিয়েছিল দেশের শীর্ষ অর্থনীতিবিদদের দ্বারা প্রণীত ‘দুই অর্থনীতি তত্ত্ব’। রেহমান সোবহান শুধু যে এর ধারণাগত কাঠামো তৈরিতে যুক্ত ছিলেন, তা–ই না; তিনি দুই অর্থনীতি তত্ত্বকে বাঙ্ময় করে তোলা তথা বৃহত্তর সমাজে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রেও ছিলেন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানসহ পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে বিতর্ক করেছেন। পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনীতি সমিতিসহ বিভিন্ন পাটাতনে তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তিতর্ক দিয়ে পূর্বাঞ্চলের জন্য স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধিকারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা পরবর্তী সময়ে তাঁকে নিয়ে আসে বঙ্গবন্ধুর কাছে— ছয় দফা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় এবং ১৯৭০–এ নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের ইশতেহার প্রণয়নের কাজে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে মুজিবনগর সরকারের পক্ষে ভ্রাম্যমাণ রাষ্ট্রদূত হিসেবে রেহমান সোবহানের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়। বিরাট ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে তিনি ভারত হয়ে বিদেশে যান। ভারতে থাকাকালে, ১৯৭১–এর এপ্রিল মাসে, তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন প্রবাসী সরকারের প্রতি ভারত সরকারের আস্থা সৃষ্টিতে তিনি

তাঁর সহযোগীদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে এবং পাকিস্তানকে বৈদেশিক সাহায্য দেওয়া বন্ধের জন্য বিশ্বব্যাপী জনমত গড়ে তুলতে কৃতিত্বপূর্ণ তৎপরতা চালান।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে রেহমান সোবহানের সবিশেষ ভূমিকা সর্বজনবিদিত। একটি স্বাবলম্বী, বিকশিত ও ন্যায্যতাভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে রচিত হয় এই পরিকল্পনা। এসব লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অনুসৃত কোনো কোনো পদক্ষেপ নিয়ে ঘটনা-উত্তর বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু এসব পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নিয়ে দ্বিমত সামান্যই আছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার জগতে এই দলিল আজও একটি আকর। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভারতের সঙ্গে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলায় তিনি ছিলেন সক্রিয়।

এই সূত্রে, স্বাধীন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের বিভিন্ন সংকটকালে রেহমান সোবহানের ভূমিকা স্মর্তব্য। আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের কর্ণধার হয়েও তিনি আশির দশকের দ্বিতীয় ভাগে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে জুগিয়েছেন সুনির্দিষ্ট উপাদান। বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের (১৯৯০–৯১) সদস্য হিসেবে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ছিলেন যুক্ত। আবার ১৯৯৫–৯৬ সালে নির্বাচন নিয়ে দেশে পুনরায় যখন অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন আরও চার বিশিষ্ট ব্যক্তিকে (কথিত পঞ্চপাণ্ডব) নিয়ে দুই নেত্রীর মাঝে সমঝোতা সৃষ্টিরও চেষ্টা করেন। দেশে গণতন্ত্রের স্থিতিশীল প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং মৌল মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর সোচ্চার চেষ্টাটি আজও অব্যাহত আছে।

একজন সফল প্রতিষ্ঠান নির্মাতা হিসেবে রেহমান সোবহানের পরিচয়ও যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। এক্ষেত্রে উজ্জ্বলতম উদাহরণ হচ্ছে দুটো— বিআইডিএস ও সিপিডি। বিআইডিএসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রায় দুই দশক, যার মধ্যে মহাপরিচালকই ছিলেন ছয় বছর (১৯৮৩-৮৯)। তাঁর নেতৃত্বে বিকাশমান দেশগুলোর মাঝে উন্নয়ন অর্থনীতি চর্চার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় বিআইডিএস। তাঁর সময়ে পরিচালিত গবেষণাগুলো সে সময় অনুসৃত বিভিন্ন নীতি সংস্কারের উদ্যোগকে বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন করে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নীতি পর্যালোচনাগুলো হলো শিল্প খাতে বিরাষ্ট্রীকরণ, কৃষি উপকরণ বিতরণব্যবস্থা শিথিলকরণ, শিল্পঋণ বিতরণ উদ্যোগ ইত্যাদি।

তবে ১৯৯৩ সালে সিপিডির প্রতিষ্ঠায় রেহমান সোবহানের ভিন্ন চিন্তা কাজ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উপদেষ্টা থাকাকালে তিনি দেশের আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের এক

বিস্তৃত রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। বাংলাদেশের আড়াই শর ওপর কৃতবিদ্য পেশাজীবীকে নিয়ে ২৯টি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে তিনি এই বিরাট কর্মযজ্ঞে ব্যাপৃত হন। বাংলাদেশের উন্নয়নচিন্তাকে অনুধাবন করতে হলে চার খণ্ডে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনগুলো অবশ্যপাঠ্য। তবে সেই উদ্যোগের ফলাফল নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক নেতৃত্বকে খুব একটি আকর্ষণ করতে পারেনি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক সোবহান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে একটি উন্নত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার জন্য সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে ধারাবাহিক আলোচনার প্রয়োজন আর সে জন্য প্রয়োজন একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৩ সালে জন্ম লাভ করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। বিগত তিন দশকে রেহমান সোবহানের নেতৃত্বে ও প্রেরণায় সিপিডি স্বকীয় অবদানে জাতীয়ভাবে একটি মর্যাদাপূর্ণ আসন অর্জন করেছে। সিপিডিতে কর্মজীবন শুরু করা বহু পেশাজীবী এখন দেশ-বিদেশে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন।

বাংলাদেশে অর্থনীতিচর্চায় রাজনৈতিক-অর্থনীতি (পলিটিক্যাল ইকোনমি) বিশ্লেষণী কাঠামো সর্বোত্তম অনুশীলন করেছেন রেহমান সোবহান। রাজনীতি যে অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ— এই উপলব্ধিকে আত্মস্থ করেছেন তিনি গভীরভাবে। তাই প্রতিটি আলোচনার শেষে তিনি সর্বদা প্রশ্ন রেখেছেন, উন্নয়নের সুফল কি বঞ্চিত মানুষের পক্ষে গেল, নাকি ক্ষমতার প্রতিষ্ঠিত বিন্যাসকে আরও জোরদার করল? তাঁর মেধা ও জ্ঞানচর্চা বাংলাদেশের মনন গঠনে অনপনেয় ছাপ রেখেছে। তরুণ মুক্তিযোদ্ধা রেহমান সোবহান তাঁর ‘লড়ে যাওয়া’ মনোভাবটি সর্বদা অক্ষুণ্ন রেখেছেন। নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন যখন ‘তর্কপ্রিয় ভারতীয়’দের কথা লেখেন, তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু রেহমান সোবহানের ছবি ভেসে ওঠে।

বহু বিচারে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের প্রধান পরিচয় তিনি একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক। কেমব্রিজ প্রত্যাগত এক তরুণ প্রভাষকের যাত্রা শুরু ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে। তবে একজন শিক্ষকের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়কে অতিক্রম করে, প্রাচ্য প্রথায়, তিনি হয়ে ওঠেন একজন ‘গুরু’। বাংলাদেশের কয়েক প্রজন্মের অর্থনীতিবিদদের হাতে খড়ি হয়েছে তাঁর কাছে। পেশাগত উৎকর্ষের পাশাপাশি তিনি তাঁদের শিখিয়েছেন সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধ। উদ্বুদ্ধ করেছেন অর্জিত জ্ঞানকে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োগ করতে। তাই সচেতন জনমানুষের কাছে রেহমান সোবহান একজন নীতিনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে প্রতীয়মান।

রেহমান সোবহানের সবচেয়ে বড় পরিচয় মনে হয়, তিনি একজন জনসম্পৃক্ত বুদ্ধিজীবী (পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল)। একদিকে শিক্ষকতা, গবেষণা ও অর্থনীতি চর্চা

দিয়ে পারিপার্শ্বিকতাকে প্রভাবিত করতে চেয়েছেন, অপরদিকে চারপাশের ঘটমান বিষয়াবলিকে বিশেষ করে খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থকে জ্ঞানচর্চায় প্রতিফলিত করেছেন। তিনি তাই ভূমিসংস্কার, কৃষি খাতে সমবায় গঠন থেকে তৈরি পোশাকশিল্পে সামাজিক মালিকানা নিয়ে চিন্তিত থাকেন। সে অর্থে তিনি বনেদি বিত্তশীল পরিবারের সদস্য হয়েও মনোজগতে শ্রেণিচ্যুত (ডিক্লাসড)।

সার্বিক বিচারে অধ্যাপক রেহমান সোবহান একজন রেনেসাঁ ব্যক্তিত্ব। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর তিন খণ্ডের স্মৃতিকথা পাঠ করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে আমরা পাই তাঁর ঘটনাবহুল জীবনকে ছাড়িয়ে তৎকালীন বিষয়াবলির অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যাখ্যা। একই সঙ্গে উন্মোচিত হয় এই বহুমাত্রিক ব্যক্তিটির সাহিত্য, সংগীত ও কলাপ্রীতি। প্রকাশ পায় তাঁর রসবোধ এবং জীবনতৃষ্ণা।

আমার বিশ্বাস, এই ক্ষণজন্মা ব্যক্তির জীবন ও জগৎ থেকে উপলব্ধি সঞ্চয় করে বাংলাদেশের আগামী প্রজন্ম আরও আলোকিত ও অনুপ্রাণিত হবে।

প্রথম আলো
৭ নভেম্বর, ২০২৩

আব্দুর রাজ্জাক: শিক্ষক, গুরু, পথপ্রদর্শক

রওনক জাহান

জাতি হিসেবে আমাদের যে পরিচয় তৈরি হয়েছে, তার পেছনে আছে বহু মানুষের অবদান। স্বাধীনতার পর পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে কিছু মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিভায় রচিত হয়েছে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির অবয়ব। তাঁদের সৃষ্টি, চিন্তা ও কর্মে সহজ হয়েছে আমাদের জীবন; রূপ পেয়েছে আমাদের স্বপ্ন, ভাষা পেয়েছে আমাদের কল্পনা।

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক— সব সময় যাঁকে আমি 'স্যার' বলে সম্বোধন করতাম—প্রথম তাঁকে দেখি ১৯৬১ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন। স্যারের টিউটোরিয়াল গ্রুপেও আমি ছিলাম। স্যারের পড়ানোর ধরন ছিল অন্য শিক্ষকদের চেয়ে আলাদা। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রথমে প্রশ্ন করতেন, প্রশ্নোত্তরের পর লেকচার দিতেন। টিউটোরিয়াল ক্লাসে তিনি রচনা লিখতে দিতেন না। তিনি আশা করতেন, আমরা তাঁকে প্রশ্ন করব, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক হবে। তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু পরে যখন নিজে শিক্ষক হলাম, তাঁর পড়ানোর স্টাইলের মহত্ত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। বুঝতে পারলাম, কেন তিনি কতগুলো গড়পড়তা ছাত্রের শিক্ষক নন; বরং শিক্ষকেরও শিক্ষক। সব বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলতে এবং কোনো বিষয়কে নতুন আঙ্গিকে দেখতে শেখানোটাই ছিল তাঁর শিক্ষকতার প্রধান লক্ষ্য।

স্যারের সঙ্গে আলোচনার একটা প্রধান প্রাপ্তি ছিল তাঁর সুতীক্ষ্ণ পর্যালোচনা। সব বিষয়ে তাঁর একটা বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি ছিল, যেকোনো গবেষককে যা দিকনির্দেশনা দিতে পারত। মনে পড়ে, ১৯৬৮ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পিএইচডি থিসিসের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে যখন ঢাকায় আসি, তখন স্যার আমাকে বললেন যে কেবল ছয় দফা দিয়ে

বাঙালিকে আর সন্তুষ্ট করা যাবে না, দেশের লোক এখন চায় পাকিস্তানের বলয় থেকে মুক্তি। অন্য কেউ সে সময় কথাটা এমন স্পষ্ট করে বলেনি, তাই সেটা আমার মনে গেঁথে গেল। তাঁর সঙ্গে কথার পর আমার বিশ্বাস জন্মাল যে গবেষণার ক্ষেত্রে আমি ঠিক পথেই চলছি, পাকিস্তান আর বেশি দিন টিকবে না। তারপর আমি দ্রুতই ১৯৬৯ সালে পিএইচডি থিসিসটা শেষ করে ফেলি। পরে ১৯৭২ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস আমার গবেষণাটি বই আকারে প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিল পাকিস্তান : ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন। কী কারণে পাকিস্তান ভাঙল এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হলো—এ বিষয়ে এটিই ছিল প্রথম প্রকাশিত গবেষণা।

১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার পর থেকে স্যারের সঙ্গে আমার আলোচনার পরিধি আরও বাড়ল। কী কী বিষয়ে নতুন নতুন গবেষণা হতে পারে, মূলত এটাই ছিল আলোচনার বিষয়। স্যার আমাকে সামাজিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিষয় নিয়ে গবেষণার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু আমার উৎসাহ ছিল সমসাময়িক রাজনীতির বিষয়বস্তু নিয়ে। আমি ১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচন ও জাতীয় সংসদের সদস্যদের ওপর জরিপভিত্তিক গবেষণা শুরু করলাম। স্যারের পছন্দের বিষয় না হলেও আমার গবেষণার কাজে সমর্থন দিয়েছিলেন তিনি।

১৯৭৩ সালে হঠাৎই স্যার জানালেন, নতুন নিয়ম অনুসারে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হয়ে আর থাকবেন না। জ্যেষ্ঠ সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে আমাকেই সেই দায়িত্ব নিতে হবে। আমি তাঁকে অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যেতে অনুরোধ করি। তিনি রাজি হননি। জ্যেষ্ঠ প্রভাষক হিসেবেই থেকে গেলেন। অবশ্য অবসরে যাওয়ার পর সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছিল। আসলে ব্যক্তিগত কোনো জিনিসের প্রতি স্যারের কোনো দিন মোহ ছিল না, কোনোকালে কোনো পদের জন্যও আগ্রহ দেখাননি। তাঁর একমাত্র নেশা ছিল বই পড়া। তিনি আমার দেখা একমাত্র মানুষ, যিনি কেবল মনের আনন্দের জন্য বই পড়তেন, বই বা নিবন্ধ লেখার জন্য পড়তেন না। নিজে লেখালেখি না করলেও সব সময় স্যার অন্যদের গবেষণা করতে, লিখতে উৎসাহিত করতেন। অনেক নামীদামি গবেষক, লেখক স্যারের কাছ থেকে অনেক গবেষণা ও লেখার সূত্র পেয়েছেন। অনুপ্রাণিত হয়েছেন। অধ্যাপক খালিদ বিন সায়িদ ও আনিসুজ্জামান উভয়েই তাঁদের লেখায় স্বীকার করেছেন, যেসব বিষয় নিয়ে তাঁরা কাজ করেছেন, সেগুলোর বেশ কয়েকটির প্রাথমিক ধারণা পেয়েছিলেন রাজ্জাক স্যারের কাছ থেকে।

মনেপ্রাণে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক, সামরিক শাসনের ঘোর বিরোধী। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের সমস্যার সমাধান একমাত্র রাজনৈতিকভাবেই

করতে হবে; এবং তা করবেন রাজনীতিবিদেরা। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন তিনি। সমাজে উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে সম্ভব না, তা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর এসব চিন্তাধারা ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনের মূল চেতনাকে বিকশিত করতে সহায়তা করেছে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই নয়া রাষ্ট্র যে অগণতান্ত্রিক পন্থা নিয়েছিল, তার বিরোধিতা করা প্রথম ভিন্নমতাবলম্বীদের একজন ছিলেন স্যার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রগতিশীল অংশ হিসেবে পরিচিত যে দলটি ছিল, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন, যাঁরা স্বায়ত্তশাসন, স্বশাসন, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অর্থনৈতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বাঙালির দাবিকে সমর্থন করেছিল। মুসলিম লীগ–বিরোধী রাজনীতিকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৫৬–৫৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা বোর্ডের একজন সদস্য হিসেবে তাঁকে নিয়োগ দেয়। সেই একবারই তিনি সরকারি পদ গ্রহণ করেছিলেন। তারপর রাজনীতিকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, কিন্তু তিনি কোনো সরকারি বা রাজনৈতিক পদ পাওয়ার জন্য আগ্রহী হননি। উপদেশ-পরামর্শের জন্য রাজনীতিকেরা তাঁর কাছে আসতেন, কিন্তু তাঁকে কখনো স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক নেতাদের কাছে যেতে দেখিনি।

স্যার প্রচারবিমুখ ছিলেন। বক্তৃতা দিতে বা লিখতে তাঁর আগ্রহ ছিল না। তাঁর প্রধান শক্তি ছিল ঘরোয়া আলোচনার মাধ্যমে মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করা। অবশ্য যে কটি বই ও নিবন্ধ তিনি লিখেছেন, তাতে তাঁর চিন্তাধারার বলিষ্ঠ প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। ১৯৫০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর লেখা থিসিস, যা পরে ২০২২ সালে পলিটিক্যাল পার্টিস ইন ইন্ডিয়া (ভারতের রাজনৈতিক দল) শিরোনামে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয়, তাতে তিনি আমাদের দেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে অনেক সুদূরপ্রসারী মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছিলেন, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর তেমন কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক নীতি বা পরিকল্পনা নেই। এদের কর্মসূচি নেতিবাচক। তাই এদের আসলে রাজনৈতিক দল বলা যায় না; বরং এরা হলো রাজনৈতিক আন্দোলন। ৭০ বছর আগে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর যেসব দুর্বলতা তিনি চিহ্নিত করেছিলেন, আজও তা প্রযোজ্য।

১৯৫৯ সালে সামরিক শাসনের দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরে রাজ্জাক স্যার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নিবন্ধ লেখেন। সামরিক শাসনামলে সেই শাসনের এমন সমালোচনায় স্যারের নির্ভীক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখাটা পড়ার পর এক পাকিস্তানি আমলা খেপে গিয়ে আমাকে বলে ছিলেন, রাষ্ট্রদ্রোহের জন্য রাজ্জাক স্যারকে শাস্তি দেওয়া উচিত।

স্যারের শেষ লিখিত প্রকাশনা ১৯৮০ সালে দেওয়া একটি পাবলিক লেকচার, যা ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাদেশ: স্টেট অব দ্য নেশন নামে প্রকাশিত হয়। সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে লেখা এই লেকচারটিতেও নির্ভীকভাবে সামরিক শাসনের সমালোচনা করে স্যার বলেছেন, সামরিক শাসন হলো সর্বনাশা, এটা হলো নিজ দেশকে দখল করা। একই সঙ্গে এ লেখায় তিনি বঙ্গবন্ধুকে আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রতীক বলে উল্লেখ করেছেন। লেখাটিতে আবারও আমরা তাঁর গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, নাগরিক অধিকার, সমতা—এসব মূল্যবোধের পরিচয় পাই। তিনি বলেন, মাটি, পানি ও মানুষ বাংলাদেশের প্রধান সম্পদ। যদি দেশের উন্নয়ন করতে হয়, তাহলে সেই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রে থাকবে এই তিন সম্পদের উন্নয়ন।

চিরকাল বইয়ের পাতায় ডুবে থাকা অধ্যাপক রাজ্জাক অকৃতদার হলেও ছিলেন পুরোদস্তুর পরিবার–অন্তঃপ্রাণ। তাঁর ভাই ও ভাইয়ের পরিবার তাঁর সঙ্গে থাকতেন। তিনি বাজার করতে এবং লোকজন খাওয়াতে পছন্দ করতেন। তাঁর বাড়িতে বহু লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, পরে যাঁরা আমার আজীবনের বন্ধু হয়েছেন। কেবল খাবারের মান নয়, স্যারের খাবারের টেবিলে যে অতিথিরা থাকতেন, তাঁরাও শিক্ষা, চিন্তা, রুচি আর শিল্পবোধে ছিলেন অত্যন্ত উঁচু দরের মানুষ। তিনি যে কেবল কেতাবি মানুষদের নেমন্তন্ন করতেন, তা নয়। তাঁর খাবার টেবিলে কেউ সাহিত্যিক, কেউ চিত্রশিল্পী, কেউ আমলা, কেউ আবার ব্যাংকার বা ব্যবসায়ী। কেউ তরুণ, কেউবা বৃদ্ধ। স্যার সব সময় মেধাবী অল্প পরিচিত তরুণ মুখদের সমাজে প্রতিষ্ঠিতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পছন্দ করতেন। মানুষের দক্ষতা আর যোগ্যতার ভিন্নতাকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করতেন তিনি।

অনেক বিষয়ে আমাদের ভিন্নমত ছিল, কিন্তু স্যার আমাকে কখনো মত পরিবর্তনের জন্য চাপ দেননি। ভিন্নমত গ্রহণের একটা অসাধারণ মানসিকতা তাঁর ছিল। মানুষের জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাশীল।

স্যার এখন আর আমাদের মাঝে নেই। কেউ তাঁর শূন্যতা পূরণ করতে পারেনি। তিনি ছিলেন একজন প্রথাভাঙা চিন্তাবিদ, যিনি প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতিকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন; ছিলেন এমন একজন শিক্ষক, তুমুল আলোচনার জন্য যাঁর দুয়ার সব সময় ছিল খোলা, যিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন তরুণ মেধাবীদের চিহ্নিত করতে; এমন একজন বুদ্ধিজীবী, যিনি মনের খোরাক মেটানোর জন্য জ্ঞান আহরণ করতেন; ছিলেন সমানুভূতিশীল এক মানুষ, যিনি সবাইকে সমানভাবে অনুভব করতে জানতেন, এক উদার হৃদয়ের অধিকারী, যিনি মানুষের দুর্বলতাকে সহজেই ক্ষমা করে দিতে পারতেন।

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক তাঁর চিন্তাচেতনার উত্তরাধিকার আমাদের দিয়ে গেছেন। তাঁর প্রকাশিত কাজগুলো প্রতিনিয়ত তরুণ প্রজন্মকে বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন তোলার সাহস জোগাবে। স্যার শিখিয়েছেন, একজন সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ কখনো যাচাই না করে 'অফিশিয়াল' তথ্য বা প্রতিষ্ঠিত মতবাদকে মেনে নেবেন না। বৈষম্যমূলক সমাজ এবং অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কোনো জাতির জন্য মঙ্গল ডেকে আনবে না।

প্রথম আলো
৭ নভেম্বর, ২০২৩

মুক্তিযুদ্ধ, চার অধ্যাপক এবং আমাদের সময়

মোস্তাফিজুর রহমান

আওয়ার ডেট টু দ্য ফোর প্রফেসরস বইয়ের মাধ্যমে লেখক এস নজরুল ইসলাম নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্নভাবে পড়ার ও জানার একটি সুযোগ করে দিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী সময়কে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লেখা হয়েছে। এই বিপুল প্রয়াসের মধ্যে সদ্য প্রকাশিত আওয়ার ডেট টু দ্য ফোর প্রফেসরস একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন।

বইটির লেখক এস নজরুল ইসলাম নিজে একজন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ। তিনি ভিন্নতর কাঠামোর মাধ্যমে ইতিহাসের এ গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বকে হাজির করেছেন তুলনামূলক কাঠামোর আঙ্গিকে। আর কাঠামোটি লেখক বেছে নিয়েছেন বাংলাদেশের সে কালপর্বে অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন, এমন চারজন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদের উন্নয়নচিন্তা ও অবদানের নিরিখে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর পরিচালনাধীন সরকারের জাতি গঠন ও দেশ বিনির্মাণের প্রয়াসে বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যে চারজনের অবদান বহুলভাবে স্বীকৃত, তাঁরা হলেন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক আনিসুর রহমান ও অধ্যাপক রেহমান সোবহান।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম এই চার অর্থনীতিবিদকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। তাঁরা সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু এই সংগ্রাম একাডেমিক জগতের পরিসরকে অতিক্রম করে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের ঝুঁকি ও স্বপ্নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে। তাঁরা তাঁদের জ্ঞান ও মেধাকে উৎসর্গ করেছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বার্থে এবং পরে দেশ গঠনের প্রত্যয়ে।

সম্ভাব্য তরুণ পাঠকদের এ গ্রন্থে আলোচিত অনেক ঘটনার সময়ে জন্ম হয়নি। বাংলাদেশের ইতিহাসের তাৎপর্যপূর্ণ এসব পর্ব সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়ার আগ্রহ তাঁদের থাকার কথা। অন্যদিকে অনেকে এই চার অর্থনীতিবিদের গবেষণা, আত্মজীবনীমূলক বই, সাক্ষাৎকার ও কলাম পড়ে তাঁদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

এই দুই ধরনের পাঠকের জন্য এই বইয়ে লেখক নজরুল ইসলাম একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ও বিরল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রথমবারের মতো তিনি এই কীর্তিমান চার অর্থনীতিবিদের অবদানকে বিশদ বিশ্লেষণসহ এক জায়গায় জড়ো করেছেন। তাঁদের গড়ে ওঠা, শিক্ষা অর্জন ও প্রস্তুতি পর্বের আলোকে পরবর্তী জীবনের কর্মকাণ্ড ও জাতীয় জীবনে তাঁদের ভূমিকাকে বুঝতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের অর্থনৈতিক ভাবনা, উন্নয়ন-দর্শন, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁদের অবদান উপস্থাপন করেছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁদের তুলনামূলক অবস্থান তুলে ধরে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতভিন্নতার দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মধ্যষাটের দশকে উদীয়মান উন্নয়ন অর্থনীতির তত্ত্বে ‘উন্নয়ন’-এর ধারণাকে চার অর্থনীতিবিদ কীভাবে বুঝেছেন, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগও পাবেন পাঠক।

তাঁর ‘ঋণ স্বীকার’

বইটি যখন প্রকাশিত হলো তখন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ও অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন আর আমাদের মাঝে নেই। আমাদের সৌভাগ্য যে অধ্যাপক আনিসুর রহমান ও অধ্যাপক রেহমান সোবহান এখনো জীবিত। বইয়ের ভূমিকায় নজরুল ইসলাম লিখেছেন যে এই প্রকাশনা চার অর্থনীতিবিদের প্রতি তাঁর ‘ঋণ স্বীকার’। বইয়ের শিরোনামেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। যোগ্য ব্যক্তিদের জীবিত অবস্থায় ঋণ স্বীকার খুব একটা দেখা যায় না। এই গ্রন্থ তাঁদের সবার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন।

বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপূর্ব যুগসন্ধিক্ষণে বঙ্গবন্ধু একটি জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করছিলেন। সেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এই চার

অর্থনীতিবিদ ‘দুই অর্থনীতি তত্ত্ব’-এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনমানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশকে দিয়েছিলেন যুক্তিনির্ভরতা। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংগ্রামের অর্থনৈতিক কার্যকারণ মজবুত করার মাধ্যমে তাঁর দাবির যথার্থতাকে শাণিত করেছিলেন তাঁরা।

চার অর্থনীতিবিদ এ ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছিলেন, এখন পর্যন্ত তার সবচেয়ে বিশদ বিশ্লেষণ এই বইয়ে হাজির করেছেন নজরুল ইসলাম। তৎকালীন বিকাশমান রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আর্থসামাজিক বিভিন্ন বিষয় যেভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল, তাতে প্রভাবক হিসেবে চার অর্থনীতিবিদের ভূমিকা বিষয়ে এমন তুলনামূলক উপস্থাপন এই বইয়ের একটি বাড়তি আকর্ষণ।

মেধা নিযুক্ত হয়েছিল রাজনৈতিক আন্দোলনে

মুক্তিযুদ্ধের বিশাল পটভূমিতে স্বাধিকার আন্দোলন কীভাবে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে পরিণতি ও পূর্ণতা পেল, সে ইতিহাস তুলে এনেছেন নজরুল ইসলাম। লেখক যথার্থভাবেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের একটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে নাগরিক সমাজের অন্য অনেকের সঙ্গে এই চার অর্থনীতিবিদের মেধাকে কী করে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে নিযুক্ত করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়ে সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করে, ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়নে অবদান রেখে, ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা ফোরাম প্রকাশের মাধ্যমে ‘দুই অর্থনীতি তত্ত্বের’ ও স্বাধিকার আন্দোলনের যৌক্তিকতার ব্যাপক প্রচার করে এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত বিনিয়োগ, সম্পদ বণ্টন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষুরধার সমালোচনার মাধ্যমে এই চার অর্থনীতিবিদ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক আন্দোলনের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছেন।

চারজনই আন্দোলনে শামিল হয়েছেন, কখনো নিজস্ব অবস্থান থেকে, কখনো বা সম্মিলিতভাবে, আবার কখনো অন্যান্য অর্থনীতিবিদকে সঙ্গে নিয়ে (যেমন অধ্যাপক আজিজুর রহমান খান, স্বদেশ বসুসহ অন্যান্য বাঙালি অর্থনীতিবিদ)। এই চার অর্থনীতিবিদ কীভাবে ‘একাডেমিক অর্থনীতিবিদ’ থেকে ‘পাবলিক ইন্টেলেকচুয়ালে’ (জনবুদ্ধিজীবী) রূপান্তরিত হলেন, তা আজকের সময়ে এক গুরুত্বপূর্ণ নজির হাজির করেছে।

স্বাধীনতাযুদ্ধ ও পরবর্তীকাল

চার অর্থনীতিবিদই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রগতিশীল ও প্রতিভাবান শিক্ষক হিসেবে ছিলেন ব্যাপকভাবে পরিচিত। ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুও তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন বড় এক স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত হতে।

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুর রহমান ও অধ্যাপক রেহমান সোবহানের স্মৃতিচারণামূলক লেখা থেকে লেখক উদ্ধৃত করেছেন। দেখিয়েছেন কীভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধের একেবারে প্রথম দিকে পরিবার-পরিজন রেখে ঢাকা ছেড়ে তাঁরা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে আলিঙ্গন করেছেন। পাকিস্তানি সেনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে, পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বোমাবর্ষণ থেকে দৈবক্রমে জীবন বাঁচিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে গিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন মুক্তিযুদ্ধে। তাঁদের কেউ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য। কেউবা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রচার-প্রচারণায়, ভ্রাম্যমাণ দূতের ভূমিকায় বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে ছিলেন সক্রিয়।

এ প্রকাশনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারের সময়ে প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে এই চার অর্থনীতিবিদের উন্নয়ন-দর্শন, উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডের বিশদ বয়ান। পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু। স্বল্পতম সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন তাঁরা। স্বাধীন বাংলাদেশ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, অর্থনৈতিক পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাঁর দর্শন ও নানামুখী পদক্ষেপ—এসবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন চার অর্থনীতিবিদ। এসব বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, যুক্তি, পরামর্শ করতেন বঙ্গবন্ধু।

সেসব প্রসঙ্গ ধরে বইটিতে উঠে এসেছে বাংলাদেশের তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের ধারণা, জাতীয়করণ, আমদানি-প্রতিস্থাপন বনাম রপ্তানিমুখী উন্নয়ন, পরিকল্পনা বনাম বাজারের ভূমিকা, শ্রম বনাম পুঁজির প্রাধান্য ও বেসরকারি খাতের তুলনামূলক ভূমিকা, ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গ। 'সমাজতন্ত্র'-এর ধারণাকে বঙ্গবন্ধু কীভাবে দেখেছেন, চার অর্থনীতিবিদ সমাজতন্ত্রকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, মাঠপর্যায়ে সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ন বলতে তাঁরা কী বুঝেছেন— বাংলাদেশের গোড়ার ইতিহাসে সেসব আলোচনা আজকের সময়ে খুবই প্রাসঙ্গিক।

চার অর্থনীতিবিদ নিজেরা কী পরামর্শ বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছেন, কোনটা তিনি গ্রহণ করেছেন, কোনটা করেননি, বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গিকে তাঁরা কতটুকু প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কোন কোন বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনড়— এসব ইতিহাস তো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গোড়াপত্তনের সঙ্গে যুক্ত।

বিদ্যমান রাজনৈতিক পদ্ধতি পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু কেন একদলীয় শাসনের দিকে গেলেন, জেলাভিত্তিক গভর্নর পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কীভাবে স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন, সমবায়ী কৃষিব্যবস্থার প্রচলনের মাধ্যমে কীভাবে তিনি কৃষির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের পরিকল্পনা করেছিলেন— এসব বিষয়কে একটি কাঠামোর মধ্যে এনে লেখক বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কৌশল এবং এসব বিষয়ে চার অর্থনীতিবিদের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন।

লেখকের মূল্যায়ন

বইটির লেখক নজরুল ইসলাম প্রথিতযশা একজন অর্থনীতিবিদ। তিনি শুধু 'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার'-এর ভূমিকায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবেন, তা প্রত্যাশিত নয়। এই বইয়ে তেমনটা হনওনি। চার অর্থনীতিবিদের দর্শন ও কর্মকাণ্ড উপস্থাপনের সঙ্গে তাঁর বিশ্লেষণী সত্তা এই বইয়ের অন্যতম প্রাপ্তি হবে পাঠকের জন্য।

প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে চার অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গিগত ও দর্শনগত মতপার্থক্য নিয়ে লিখতে গিয়ে অধ্যাপক রেহমান সোবহান তাঁর আত্মজীবনী আনট্রাঙ্কুয়েল রিকালেকশনস-এ লিখেছেন যে তাঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন বাস্তববাদী, কেউ আদর্শবাদী। আর কারও অবস্থান ছিল মাঝামাঝি।

চার অর্থনীতিবিদের তুলনামূলক অবস্থান, মতপার্থক্য ও দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতা নিয়ে লেখকের মন্তব্য ও পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নজরুল ইসলাম নিজে অবশ্য এই গ্রন্থে আলোচিত বেশ কিছু বিষয় নিয়ে অন্যত্র লিখেছেন। যেমন তখনকার সমকালীন রাজনীতি, সমাজতন্ত্রের ভাবনা, বাংলাদেশের কৃষিখাত, গ্রামীণ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়। তবে এ গ্রন্থে নিজের মতামতকে চাপিয়ে দিয়ে নয়, বরং আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন নির্বাচিত বিষয় নিয়ে তখনকার বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে চার অর্থনীতিবিদ কী ভেবেছেন, তাকেই লেখক প্রাধান্য দিয়েছেন।

সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিত এবং বিপরীতমুখী ও বিভিন্ন চাপ ও প্রবণতাকে বিবেচনায় নিয়ে একটি দ্বান্দ্বিক অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে সে সময়ের ঘটনাপ্রবাহকে চার অর্থনীতিবিদের

প্রেক্ষিত থেকে বুঝতে চেয়েছেন, বোঝাতে চেয়েছেন। হয়তো পরে এই চার অর্থনীতিবিদের চিন্তার জগতের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ, কার্যকারণ ও পশ্চাৎ-দৃষ্টির সুবিধাজনক অবস্থানের আলোকে তার মূল্যায়ন আমরা নজরুল ইসলামের কাছে পাব, যা আমাদের আরও গভীরভাবে তখনকার সমসাময়িক ইস্যুকে (বিষয়) ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিত থেকে জানতে ও বুঝতে সাহায্য করবে। উৎসাহী পাঠকের জন্যও তা আগ্রহের বিষয় হবে বলে ধারণা করি। ভবিষ্যতে এসব বিষয়ে নিয়ে যাঁরা গবেষণায় আগ্রহী হবেন, তাঁদের জন্য নজরুল ইসলাম যে গবেষণাপদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন, তা কাজে লাগবে বলে ধারণা করি।

ইতিহাসকে ভিন্নভাবে জানার সুযোগ

লেখক নজরুল ইসলাম এই বইয়ের মাধ্যমে একটি বড় কাজ করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে এ চার অর্থনীতিবিদের অবদানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি নতুন প্রজন্মকে একটি সুযোগ করে দিলেন বাংলাদেশের ইতিহাসকে ভিন্নভাবে পড়ার ও জানার।

নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ববোধ, দেশপ্রেম ও একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের যে স্বপ্ন এ চার অর্থনীতিবিদকে তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় উৎসর্গ করতে ব্রতী করেছিল, পরবর্তী প্রজন্ম তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে আশা করা যায়। আর তা যদি হয়, তাহলে নজরুল ইসলামের ‘ঋণ স্বীকার’ শুধু ঋণ স্বীকারেই সীমিত থাকবে না, চার অর্থনীতিবিদের প্রতি সেটাই হবে প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি। গ্রন্থটি লেখার জন্য নজরুল ইসলাম ভালোবেসে যে শ্রম ও অভিনিবেশ দিয়েছেন, তার পেছনেও সম্ভবত এই প্রেরণাই কাজ করেছে।

প্রথম আলো
১৩ নভেম্বর, ২০২৩

উনি রাজনৈতিক চাপের কোনো তোয়াক্কা করেননি

ফাহমিদা খাতুন

ড. এ. বি. মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম। ওনার সঙ্গে আমার প্রায় ২০ বছরের পরিচয়। আমার পেশাগত ও ব্যক্তিগতভাবে ওনার সঙ্গে পরিচয়। বিশেষ করে পেশাগতভাবে আমরা সিপিডিতে বিভিন্ন গবেষণা যখন করি ওনার মতামত, সাজেশন বা সুপারিশ আমরা অনেক গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে এসেছি। আমাদের সিপিডির যে একটা গবেষণা, এটা যে একটা প্রকল্প, আমরা এটাকে ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম বলি— ইনডিপেনডেন্ট রিভিউ অব বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি স্বাধীন পর্যালোচনা। এর অধীনে আমরা সারাবছর বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা বিশ্লেষণ করি, বাজেট বিশ্লেষণ করে থাকি। তখন আমরা এ বিশ্লেষণগুলো তৈরি করার আগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে কথা বলি। তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসি, তাদের কাছে রিপোর্টটা আগে পাঠাই দেখার জন্য। মির্জ্জা আজিজ এ কাজগুলো খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে এবং সময় নিয়ে করতেন। প্রতিটি বিষয় তিনি খুব বিস্তারিতভাবে দেখতেন এবং সাজেশনগুলো দিতেন। যার কারণে আমাদের আইআরবিডির অর্থনৈতিক বিশ্লেষণগুলো এত উন্নত হয়েছে, আরো শক্তিশালী হয়েছে।

তারপর তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা হলেন, তখনো কিন্তু কোনো গবেষণাপত্র লিখলে বা ওনার কাছে পাঠালে উনি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। আমার মনে পড়ে, আমি নিজে একটা কাজ করেছিলাম, সেটা হলো বৈদেশিক সাহায্যের ইফেক্টিভনেস অর্থাৎ কার্যকারিতা। আমাদের মতো দেশে বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা কীভাবে বাড়ানো যায়। ডোনারদের পক্ষ থেকে কী কী করার আছে, নিজেদের পক্ষ

থেকে কী কী করার আছে, এটা নিয়ে একটা গবেষণাপত্র তৈরি করেছিলাম। তার আগে আমরা যখন ডায়লগ করি, ওনাকে কাজটা পাঠিয়েছিলাম। উনি খুব মনোযোগ দিয়ে পুরো গবেষণাটি পড়েছিলেন। আমাদের অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। উনি এ কাজের অনেক প্রশংসা করেছিলেন। তিনি তার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরও বলেছিলেন এটা কাজে লাগে কিনা দেখতে। আমি অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে ফোনও পেয়েছিলাম, তারা বসতে চেয়েছিল আর বিভিন্ন সময়ে তারা আলোচনা করেছিল যে বৈদেশিক সাহায্যের আলোচনার বিষয়ে যদি কিছু থাকত তাহলে তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করত। ওনার নিষ্ঠা ও সততা সবকিছু ওনার পেশাগত জীবনজুড়েই ছিল, সেটা তিনি যত বড় অবস্থানেই থাকেন না কেন।

তিনি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন, তখনো ওনার সততা দেখেছি। রাজনৈতিক চাপ সরিয়ে দিয়ে তিনি পেশাগত নিষ্ঠা ও নীতিমালাতে গুরুত্ব দিয়েছেন। উনি রাজনৈতিক চাপেরও কোনো তোয়াক্কা করেননি। যেটা ওনার নীতির সঙ্গে যায় না, সেটার তিনি তোয়াক্কা করেননি।

এমনকি রাজনৈতিক সরকারের আমলেও তিনি এ প্রতিষ্ঠানগুলোয় কাজ করেছেন। তারপর তিনি একজন শিক্ষক, তিনি একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। আমি শুনেছি তিনি তার শিক্ষার্থীদের অনেক জটিল বিষয় সহজভাবে বুঝিয়ে দেন। সবাই বলেছে তার ক্লাসে তারা অর্থনীতির মতো জটিল বিষয় খুব সহজেই বুঝতে পারে।

তিনি জাতিসংঘে অনেকদিন কাজ করেছেন। তারপর উনি যখন বাংলাদেশে চলে এলেন, বাংলাদেশে তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কাজ করেছেন। যেমন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের চেয়ারম্যান। পরবর্তী সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা, এগুলো সবই বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ পজিশন। সে কাজগুলো তিনি অনেক নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে করেছেন। সেখানে সাফল্যও দেখিয়েছেন। আমাদের বিভিন্ন ডায়ালগে তিনি আসেন। আমাদের জাতীয় ডায়ালগে এবং ইন্টারনাল যে আলোচনাগুলো হয় সেগুলোয়ও আসেন। উনি সবসময় তথ্য ও বিশ্লেষণ দুটোর সমন্বয় করেন। উনি তথ্য ছাড়া কখনই কথা বলেন না। তথ্য দিয়ে উনি ওনার বিশ্লেষণকে আরো শক্ত করেন। উনি যখনই কথা বলেন এত বছর পরও মনে হয় শিখছি— কীভাবে অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়কে দেখতে হয়, বিশ্লেষণ করতে হয়। সেদিক থেকে আমি বলব তিনি পেশাগত জীবনে, শিক্ষক হিসেবে, নীতিনির্ধারক হিসেবে একজন অত্যন্ত সফল ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি একজন সহজ মনের মানুষ। খুব ধীরস্থির, কখনই কারো সঙ্গে উচ্চস্বরে কথা বলেননি। রাগ

হওয়া বা ওই রকম ব্যবহার ওনার কাছ থেকে দেখিনি। আমি ওনাকে পেশাগত ও ব্যক্তিগতভাবেও দেখেছি। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যখন কোনো বড় একটা অবস্থানে পৌঁছান, তখন তাদের আচার-ব্যবহারে সেটার একটা প্রতিফলন থাকে। কিন্তু উনি অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র একজন মানুষ।

বণিক বার্তা
২০ নভেম্বর, ২০২৩

একই সঙ্গে বিদ্বান, গবেষক ও প্রাজ্ঞ অর্থনীতিবিদ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ড. মসিউর রহমান একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি। একজন সফল প্রশাসক ও উজ্জ্বল নীতি প্রণেতা। একই সঙ্গে একজন বিদ্বান, গবেষক ও প্রাজ্ঞ অর্থনীতিবিদ। তবে সাম্প্রতিককালে উনার পরিচয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে। ড. মসিউর রহমানের কাছে আসার প্রথম সুযোগ হয় ১৯৯৬ সালে। তিনি তখন বহিঃসম্পদ বিভাগে সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। বিশ্বব্যাপী বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রণীত কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে প্রচুর আলোচনা ও সমালোচনা চলছিল। সে সময় বৈশ্বিক মূল্যায়ন সূচিত হয়। সেখানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে গবেষকরা কাজ করেন, সেটার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য উনি আমার নাম প্রস্তাব করেন। সে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি, নীতি সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞানকে তিনি পরবর্তী সময়ে নীতি সংস্কারের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন। নীতি সংস্কারের প্রশ্ন উঠলেই অন্তত চারটি ক্ষেত্রে তার অবদান উল্লেখ করা যায়। প্রথমটি অবশ্যই বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উনার প্রচুর অভিজ্ঞতা ও সম্পৃক্ততা। দ্বিতীয়ত, অবদান রেখেছেন জ্বালানি খাতের বিকাশে। তৃতীয়ত, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং চতুর্থত, ভারতের ট্রেন শিপমেন্টের ক্ষেত্রে। এসব ক্ষেত্রে উনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে সুনির্দিষ্ট চেহারা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। সুনির্দিষ্ট প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হয়েছে। বিকল্প যে হয়নি, তা না।

ড. মসিউর রহমানকে আমরা অবশ্যই একজন প্রাজ্ঞ অর্থনীতিবিদ এবং বিদ্বান গবেষক হিসেবেও চিহ্নিত করতে পারি। সেখানে উনার যে বহুবিধ লেখা আছে। তার ভেতর থেকে গুরুত্বপূর্ণ উনার অভিসন্দর্ভটি, যার বিষয় ছিল শ্রীলংকার আয় বণ্টন এবং তার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। এটি পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয়। এটি উনার প্রথম

দিককার লেখার ভেতরে অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য ও আকর্ষণীয় রচনা ছিল। এর পরও উনি প্রচুর লেখা লিখেছেন। সেই লেখাগুলো বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। হয়তো সংগ্রহ করে দুয়েকটি ভলিউমে নিয়ে আসতে পারলে ভালো হবে। ড. মসিউর রহমানের যে সম্মাননা বণিক বার্তা থেকে দেয়া হচ্ছে, সেটা যথোপযুক্ত ও সময়োপযোগী। আমি তাকে সে জন্য অভিনন্দন জানাই। তার সুস্বাস্থ্য ও কর্মময় জীবন কামনা করি।

বণিক বার্তা
২০ নভেম্বর, ২০২৩

সে যা ছিল এবং যা হয়েছে তার জন্য আমি গর্বিত

রেহমান সোবহান

দেশের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা দিতে যাচ্ছে বণিক বার্তা। খবরটা শুনে আমি আনন্দিত। সম্মাননা পেতে যাওয়া দুজনকে দীর্ঘ সময় ধরে চিনি। বিশেষ করে মির্জ্জা আজিজুল ইসলামের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৭ সালে শিক্ষকতা শুরু করি, সে ছিল প্রথম ছাত্রদের একজন। আমাকে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকার অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে একটা কোর্স পড়ানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রথম ব্যাচে ছিল ফখরুদ্দীন আহমদ, সাইদ আহমদ, মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম ও মুহাম্মদ ইউনূস। তারাও তখন প্রথম বর্ষে ছিল। ফখরুদ্দীন আহমদ, সাইদ আহমদ ও মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম ছিলেন ক্লাসের সব থেকে ভালো ছাত্র। তিনজনেই অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। যদিও জানতাম না মির্জ্জা আজিজ কোন ক্যারিয়ার বেছে নিতে যাচ্ছে। কিন্তু এটা ঠিক জানতাম, তার একটা ভালো ক্যারিয়ার হবে। কেবল ভালো ছাত্র ছিল না, ছিল সব দিক থেকে গোছানো। সে ফজলুল হক হলের ভিপি হয়েছিল। তার মানে সামাজিকভাবেও ছিল সক্রিয়। সব ভালো ছাত্রেরা এটা করতে পারে না।

সে সময় অর্থনীতি বিভাগ ভালো কিছু ছাত্র তৈরি করেছে, যারা সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবেও সচেতন। ছাত্র রাজনীতিতেও ভালো নেতৃত্বের একটা সুবিধা ছিল, ভিন্ন ধরনের মানুষ ও ভিন্ন রাজনৈতিক চেতনা। মির্জ্জা আজিজ ছিল সেটারই প্রতিনিধিত্বকারী। তার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া হয়েছিল বুদ্ধিমত্তা, দায়বদ্ধতা ও সামাজিক সচেতনতার।

ভালো ছাত্রদের নিয়ে সাধারণত আশা থাকে, তারা শিক্ষকতায় আসুক। মির্জ্জা আজিজকে নিয়েও সেটা চেয়েছিলাম। কিন্তু তাদের দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। তখন অধিকাংশ ভালো ছাত্ররা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করত। বেছে নিত পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে। ফখরুদ্দীন, আজিজ ও সাইদ আহমদ—তিনজনই সিভিল সার্ভিসে যোগ দেয়। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে পেশা জীবনে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে। যতদূর মনে পড়ে মির্জ্জা আজিজ অল্প সময়ের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়েও কাজ করেছে।

স্বাধীনতার পর মির্জ্জা আজিজ বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে চলে যায় পিএইচডি করতে। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ হিসেবে। তারপর কিছু ট্রান্সন্যাশনাল কো-অপারেশনের হয়ে কাজ করে। এ সময় তার প্রকাশিত কিছু পেপার আমাকে মুগ্ধ করেছে। কাজের সূত্র ধরেই সে জাতিসংঘের হয়ে ব্যাংককে যায়। কাজ করে এসক্যাপের (দি ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক) ডেভেলপমেন্ট পলিসি ডিভিশনে। এ সময় তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ফের বাড়ে। সময়ে সময়ে সে বিভিন্ন সভায় আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে কিছু প্রকল্পের সূত্রে।

আমি অবাক হয়ে লক্ষ করেছি তার পরিণত হয়ে ওঠা। কেবল একাডেমিক জায়গা থেকেই সে অর্থনীবিদ হয়ে থাকেনি। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি নিয়ে তার বোঝাপড়া ছিল স্পষ্ট। আন্তর্জাতিকভাবেই স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হিসেবে। কাজের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেকে।

বাংলাদেশে এসে মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম অল্প সময়ের জন্য সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। সম্ভবত কিছুদিন সোনালি ব্যাংকের দায়িত্বেও ছিলেন। দেশে আসার পর আমাদের যোগাযোগ বাড়তে থাকে। সে নিয়মিত আসতে থাকে সিপিডির (সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ) বৈঠকগুলোয়, দারুণভাবে আলোচনা এগিয়ে নিতে থাকে। সে সত্যিকার অর্থেই কাজের মানুষ। ম্যাক্রোইকোনমিকসে তার দখল অসাধারণ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা রাখে। প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন ফখরুদ্দীন আহমদ। দক্ষতার সঙ্গে সে দায়িত্ব সামাল দিয়েছে। একাডেমিক মানুষ থেকে পুরোদস্তুর নীতিনির্ধারক পর্যায়ে গেল। কিন্তু কোনো রকম ঘাটতি দেখা যায়নি প্রচেষ্টা আর মনোযোগের। হয়তো রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অনেক কিছুই সম্ভব হয়নি।

অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব দক্ষতার সঙ্গে বলতে পারত। গুরুত্বপূর্ণ পদে দাঁড়িয়ে নিজের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিল। সাধারণত মানুষ দায়িত্ব না থাকার সময় যা বলে এবং

দায়িত্বশীল অবস্থানে গিয়ে যা করে, তার মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। কিন্তু এদিক থেকে আমি মনে করি তার ঘাটতি নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফল আসেনি, তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ সেগুলো তার প্রচেষ্টা ছাড়াও অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। সে অন্তত যা বিশ্বাস করেছে এবং যা লিখেছে, সে অনুযায়ী কাজ করেছে।

সবশেষে এটাই বলতে চাই, মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম একটা সফল ক্যারিয়ার তৈরি করেছেন। তাকে দায়িত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তি হিসেবেই দেখেছি। একটা প্রতিভাবান, সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য ক্যারিয়ার তৈরি করেছে। সে যা ছিল এবং যা হয়েছে, তার জন্য আমি গর্বিত।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অর্থনীতিবিদ ও বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র চেয়ারম্যান।

বণিক বার্তা
২০ নভেম্বর, ২০২৩

দেশে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে, তাতে ড. মসিউর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন

রওনক জাহান

ড. মসিউর রহমান এবং আমি, আমরা দুজনেই ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ অনার্স ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম। সহপাঠী হলেও সে সময় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কথা বলা কিংবা তর্ক-বিতর্ক করার তেমন সুযোগ ছিল না। প্রায় সময়ই আমরা মেয়েরা থাকতাম মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট কমনরুমে। কেবল ক্লাসের সময় বাইরে আসতাম। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম থাকায় আমরা সবাই একজন আরেকজনকে চিনতাম। ড. মসিউর রহমান ছিলেন ইংরেজি বিভাগে এবং আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। এমএ পরীক্ষার পর ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সরকারের স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে আমি হার্ভার্ডে পড়তে যাই। পূর্ব পাকিস্তান থেকে তখন আমরা মাত্র পাঁচজন নির্বাচিত হই। আমার যতদূর মনে পড়ে ড. মসিউর রহমানও সেখানে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে সিএসপি হয়ে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন।

তারপর তার সঙ্গে দেখা হয় ১৯৭৮ সালে। তখন ড. মসিউর রহমান টাফটস ইউনিভার্সিটি এবং হার্ভার্ডে পড়াশোনা করছিলেন। আর ১৯৭৮ সালে একটা গবেষণার জন্য আমি কিছুদিন বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম। সে সময় ড. মসিউর রহমান ও তার পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। বলা যায় আমাদের মধ্যে প্রথম কথাবার্তা তখনই হয়েছে। তারপর তাকে চিনেছি প্রধানত লেখার মাধ্যমে এবং আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে আয়োজিত বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে।

ড. মসিউর রহমান সারা জীবনই একজন দক্ষ আমলা হিসেবে কাজ করেছেন। অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগে তিনি কাজ করেছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি অবদান রেখেছেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্য রিপোর্টও তৈরি করেছেন।

তবে তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি গুণ হচ্ছে যে তিনি একই সঙ্গে সরকারি আমলার কাজ ও একাডেমিক কাজ করেছেন। খুব কমসংখ্যক মানুষই দুটো কাজ একসঙ্গে চালিয়ে যেতে পারেন। অনেকেই পিএইচডি ডিগ্রি করার পর আর লেখালেখি করেন না। কিন্তু ড. মসিউর রহমান সারা জীবনই লেখালেখির কাজ অব্যাহত রেখেছেন তার বেশির ভাগ লেখা অর্থনীতির ওপরে। ১৯৮৭ ও ১৯৯৪ সালে ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে অর্থনীতির ওপর তার দুটি বই প্রকাশিত হয়। অবশ্য আমার সঙ্গে তার আলোচনা হয়েছে মূলত তার রাজনীতির ওপর লেখা বই নিয়ে। ২০০৮ সালে তার লেখা ডেমোক্রেসি ইন ক্রাইসিস বইটি প্রকাশ করে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। বইটি প্রকাশনা উৎসবে তিনি আমাকে আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বইটিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা ও সংস্কার নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এসব বিতর্কিত বিষয়বস্তু ছাড়াও তিনি কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা সংযুক্ত করেছেন। এ বইটির বিষয়গুলো নিয়ে আরো আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হতে পারে বলে আমি মনে করি।

ড. মসিউর রহমান সবসময়ই সহপাঠীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পছন্দ করেন। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা একসঙ্গে পড়েছিলাম তাদের মধ্যে আমরা মেয়েরা প্রথমে একটা চা-চক্রের নিয়মিত আয়োজন শুরু করেছিলাম। পরে আমাদের সঙ্গে সহপাঠী ছাত্রদেরও যুক্ত করি। সেই সুবাদে ড. মসিউর রহমান, ড. সামাদ, ড. আহবাব, ড. মিজানুর রহমান শেলী, মাহবুব তালুকদার, ওয়ালিউল ইসলাম, জাহাঙ্গীর জসিম এবং অন্যদের সঙ্গেও আমাদের সামাজিক যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। ড. মসিউর রহমান প্রায় ১৫ বছর আগে আমেরিকান অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এখনো সভাপতি হিসেবে সেই অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন।

সাধারণত যখন কোনো ব্যক্তি আমলা হন কিংবা সারাজীবন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন তখন তাদের মধ্যে একটা অহমিকা দেখা যায়, কিন্তু ড. মসিউর রহমানের ব্যবহারে কখনো আমি অহমিকার বহিঃপ্রকাশ দেখিনি। মনে পড়ে বণিক বার্তার একটি অনুষ্ঠানে তিনি যখন লম্বা সময় নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করছিলেন দর্শকরা হাততালি দিয়ে তাকে থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল। বিষয়টিকে তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন তিনি থামবেন না, আলোচনা চালিয়ে যাবেন। ড. মসিউর রহমানকে সবসময় দেখেছি অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে। তার ব্যবহার সবার সঙ্গে অত্যন্ত চমৎকার।

২০০9 সাল থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে ড. মসিউর রহমান প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। একসময় তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। নতুন নীতি প্রণীত হয়েছে, চুক্তি হয়েছে; যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ভারত ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের অনেক উন্নতি হয়েছে। কথা প্রসঙ্গে একদিন ড. মসিউর রহমান আমাকে বলেছিলেন যে ভারত ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব অংশের সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক গতিশীল করাটাকে দেখতে হবে বাংলাদেশের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে। আমরা কী দিচ্ছি এবং ভারত কী দিচ্ছে, এভাবে ছোটখাটো বিষয়ে দরকষাকষির চেয়ে দেখতে হবে আমাদের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি লাভ অর্জিত হচ্ছে কিনা। এতদিন ধরে তিনি প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে নিশ্চয়ই অনেক ভালো উপদেশ দিয়েছেন। গত ১৫ বছরে দেশের যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে, তাতে ড. মসিউর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আমি তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

বণিক বার্তা
২০ নভেম্বর, ২০২৩

সেই বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখে আমি চমৎকৃত হই

মোস্তাফিজুর রহমান

ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলামকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। সময়টা ছিল দেশের অর্থনীতির জন্য ক্রান্তিকাল। সময়টাতে বিশ্বজুড়েই অর্থনৈতিক সংকট ছিল। তার অভিঘাত পড়েছিল আমাদের দেশেও। উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্য দিয়ে সময় পার করেছি আমরা। নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল জীবনযাত্রার মানের ওপর। প্রভাব পড়েছিল অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রেও। এমন সময় তিনি শক্ত হাতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। অর্থনীতির যে মন্দা ভাব দেখা যাচ্ছিল, সেটা থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার বিশ্লেষণী সত্তা এবং প্রায়োগিক দিকের সমন্বয় করে পদক্ষেপ নিয়েছেন। অগ্রাধিকার দিয়েছেন দেশ ও মানুষের কল্যাণকে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল সেটা তার জীবন ও বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য। সে সময়টায় তার গৃহীত নীতিমালার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে পরবর্তী সময়ে আসা সরকার।

মির্জ্জা আজিজকে আমি অনেক দিন থেকেই চিনি। প্রথম তার সঙ্গে দেখা হয় তিনি যখন ইউএনএসক্যাপের রিসার্চ অ্যানালাইসিস ডিভিশনের পরিচালক ছিলেন। ব্যাংককে একটা সেমিনারে আমি তার প্রবন্ধ শোনার সুযোগ পাই। প্রবন্ধে তিনি এ অঞ্চলের আর্থিক বিভিন্ন নীতিমালার বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। সেই বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখে আমি চমৎকৃত হই। দেশে ফিরে এসে অনেকের সঙ্গেই আলোচনা করি তার সম্পর্কে। তখন অধ্যাপক রেহমান সোবহান আমাকে বলেছিলেন, তিনি ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলামের সরাসরি শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে আমরা স্যারের সঙ্গে আলাপের সময় জিজ্ঞাসা

করি, 'আপনার ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী কে?' তখন তিনি বলেছিলেন, 'অনেকের অনেক গুণ আছে। কিন্তু যদি বিশ্লেষণী ক্ষমতার কথা বলা হয়, তাহলে সেখানে মির্জ্জা আজিজকে প্রথমে স্থান দেব।'

তার অনেক লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। বিশেষ করে বাণিজ্য নীতি নিয়ে তার যেসব লেখা। নব্বই দশকে বিভিন্ন দেশে যে বাণিজ্যিকীকরণ নীতি গৃহীত হয়, সেখানে তার বাণিজ্য নীতি বড় ভূমিকা রেখেছে।

দেশে ফিরে তিনি বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যাংকের বোর্ড ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে চেয়ারম্যান হিসেবে এবং পরবর্তী সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন ধীরস্থির ও নির্মোহ। তিনি সূক্ষ্মভাবে কোনো বিষয়ের বিশ্লেষণ করেন, তারপর সেটার সঙ্গে কী নীতিমালা গ্রহণ করা যায়, সেটা দেখেন। বাস্তবায়নে কী কী প্রতিবন্ধকতা হতে পারে, সেক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে, সেটাও বিবেচনা করেন।

তিনি এসক্যাপে থাকার সময়ই বিশ্বজুড়ে আর্থিক সংকট হয়। সেটা ১৯৯৭ সালে। এসক্যাপের গবেষণা পরিচালক হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দিয়েছিলেন নীতি ও পরামর্শ। সেগুলো সংকট থেকে উত্তরণে বিভিন্ন দেশকে সহায়তা করেছে। একইভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ছিলেন। তখনো কিন্তু বিশ্বে অর্থনৈতিক সংকট চলছিল। বাংলাদেশেও সে সংকটের অভিঘাত পড়ে। এ সময়ে তিনি সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। দুই ক্রান্তিলগ্নেই তিনি বিশেষত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সামাল দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তার যে মেধা ও ধীশক্তি, সেটার একটা প্রায়োগিক দিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এ সময়ই।

মির্জ্জা আজিজ সবসময় গবেষণাধর্মী লেখা লিখেছেন। বণিক বার্তায়ও কলাম লিখেছেন। সবক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের প্রতি তার সহানুভূতিশীল মননের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চেয়েছেন, রাজস্ব নীতিকে সাধারণ মানুষের কাজে লাগাতে। আর্থিক নীতিমালাকে গণমুখী করতে। ঋণখেলাপি থেকে মুক্তি পেতে কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, কীভাবে নির্মোহভাবে কাজ করতে হবে দায়িত্বে থাকা মানুষদের, এসব কিছু নিয়েই তিনি লিখেছেন। উদাহরণও তৈরি করেছেন। তিনি যখন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন, সে সময় অযৌক্তিকভাবে বিভিন্ন চাপ আসে। তখন তিনি সেখান থেকে সরে যান। তার পরও আপস করেননি। সেই দিকটাও দেখার বিষয়। গবেষক হিসেবে সবসময় চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশের উন্নয়নে আর্থসামাজিক সমস্যাকে অতিক্রম করতে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অনুসন্ধানের মতো বিষয়গুলো কিন্তু সবসময় তাকে নাড়া দিয়েছে।

তার গবেষণা, কলাম বা মিডিয়ায় বলা কথায় দেখা যায় জনমনস্কতা এবং সাধারণ মানুষের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের মনোভাব।

আমার মনে হয় তাকে যে গুণীজন সম্মাননা দেয়া হচ্ছে, সেটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কারণ এ ধরনের গুণীজনকে যদি সম্মানিত করা হয়, তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম জানতে পারবে। অনুপ্রাণিত হতে পারবে। বর্তমানে এটা গুরুত্বপূর্ণ। এক্সচেঞ্জ রেট, মনিটারি পলিসি, রাজস্ব নীতি নিয়ে তার বলা কথাগুলোর দিকে আরেকবার তাকানো দরকার। বিশেষ করে ২০০৩ সালে এক্সচেঞ্জ রেট পলিসি নিয়ে সিপিডিতে তিনি যে প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেছিলেন, সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখনকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সে লেখাগুলো আমাদের সাহস দেবে। ফলে আমি মনে করি, খুবই যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে তিনি এ সম্মাননা পেতে যাচ্ছেন।

বণিক বার্তা
২০ নভেম্বর, ২০২৩

অধ্যায় ৬

জেন্ডার ও নারী সমতা

নারীর কাজের ক্ষেত্র

ফাহমিদা খাতুন

জেন্ডার বাজেট নারীর জন্য আলাদা কোনো বাজেট নয়; বরং এটি একটি বিশেষ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় হিসাবনিকাশের সাহায্যে জাতীয় বাজেটের জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করা যায়। নারীর ক্ষমতায়ন ও বাজেটে জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে কেমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে— এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন। গ্রন্থনা শাহেরীন আরাফাত

গত বছরের তুলনায় জেন্ডার বাজেটে বরাদ্দ কিছুই বাড়েনি। এটি একদমই অপ্রতুল। বাজেটের হিসাবটাই ঠিক নেই। এর মধ্যে কোনো স্বচ্ছতা নেই। মন্ত্রণালয় হিসেবে দেখা যায়, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বাজেটের মাত্র ১ শতাংশের মতো বরাদ্দ রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চালানো হয়। তবে এর ফলে প্রকৃতপক্ষে বেকারত্ব কতটা কাটল, সেই হিসাব নেই। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দে যে হিসাব নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাকে দেখা হয় নারী উন্নয়নে বরাদ্দ হিসেবে।

বাজেটে বরাদ্দ দেওয়ার পর তা কীভাবে খরচ হচ্ছে, সেই হিসাব প্রতিবেদনে দেওয়া হয় না। আবার আরেক বিষয় হলো খাত বরাদ্দের বিষয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ সবার জন্যই সমান। এটিকে নারীর উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ বলার সুযোগ নেই। যদি জেন্ডার বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে একই বরাদ্দকে দুইবার গোনা হবে।

শ্রমবাজারে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে তাদের অংশগ্রহণ বেশি। এখাতে আয় কম, কাজের নিরাপত্তা কম। যে কারণে কোনো সংকট দেখা দিলেই তাদের চাকরি চলে যায়। করোনাকালে আমরা যেমনটা দেখেছি, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে

সবার আগে শ্রমিকদের ছাঁটাই শুরু হয়। আমরা ভালো বেতনের প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ চাইছি। সে জন্য যে পরিমাণ শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করা দরকার, তা কিন্তু নেই। গতানুগতিকভাবে বাজেটে বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবে তা নারীর প্রকৃত উন্নয়নে কতটা প্রভাব রাখছে, সেই হিসাব করা হয়নি। যে গতিতে নারীকে শ্রমবাজারে সম্পৃক্ত করার কথা ছিল, তা খুবই ধীরগতির।

নারীর উন্নয়নের জন্য আমাদের তাদের প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সম্পৃক্ত করতে হবে। এ জন্য শিক্ষা খাত ও দক্ষতা বাড়ানোর পদক্ষেপ নিতে হবে। বিনিয়োগ করতে হবে। যে মেয়েরা চাকরিতে আসতে পারছে না, তাদের জন্য আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা দিতে হবে। শ্রমবাজারে নারীদের টেনে আনার জন্য, তাদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য সরকারকে ডে-কেয়ার সেন্টার, স্কুল-কলেজ, মেয়েদের জন্য ট্রান্সপোর্ট— এইসব ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তা না হলে মেয়েদের শ্রমবাজারে আনা যাবে না।

আমাদের রক্ষণশীল মানসিকতায় সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এখনও আছে। অচিরেই এ থেকে আমরা মুক্তি পাচ্ছি না। এটি সব পর্যায়েই আছে। নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকে শুরু করে ঘরে-বাইরে, সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে সব জায়গায় প্রকটভাবে এ রক্ষণশীলতা রয়ে গেছে।

নারীর সচেতনতা বাড়লেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসচেতনতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষার অভাবই দায়ী। নারীদের সচেতন করা, তাদের শিক্ষা দেওয়া সরকারের কাজ। তাদের জন্য যদি সুযোগ সৃষ্টি না করা হয়, অনুকূল পরিবেশ না করে দেওয়া হয়, তাহলে নারীরা শ্রমবাজারে আসবে না।

সমকাল
১১ জুন, ২০২৩

বদলাতে হবে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি

রওনক জাহান

বায়ান্ন বছর আগে আমরা যখন স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, তখন পুরুষদের তুলনায় নারীদের অবস্থান অনেক ক্ষেত্রেই ছিল পিছিয়ে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, রাজনীতি সবখানেই নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য ছিল চরমভাবে দৃশ্যমান। যেমন ৭০-এর দশকে নারীর গড় আয়ু ছিল ৪০, সেখানে পুরুষের ছিল ৪৪।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েরা ছিল ৩৬ শতাংশ, মাধ্যমিকে মাত্র ১০ শতাংশ। শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৪ শতাংশের মতো। প্রশাসন, পররাষ্ট্র দপ্তরসহ অনেক চাকরিতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করলেও নারীদের নেওয়া হতো না। শিক্ষকতা ও চিকিৎসা এই দুটি চাকরিতেই তখন নারীদের দেখা যেত। সেই যুগে বিচারিক আদালতে নারী আইনজীবী খুঁজে পাওয়া যেত না। মিডিয়াতে তেমন কোনো নারী সাংবাদিক ছিলেন না। ঘরের বাইরে রাস্তাঘাটে, বাজারে, খুবসংখ্যক নারীকে দেখা যেত।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে তাই আমাদের প্রধান প্রচেষ্টা ছিল নারীদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে যুক্ত করা। স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নতি, শিক্ষার হার বাড়ানো, শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বাড়ানো ইত্যাদি বিষয়ে আমরা সচেষ্ট ছিলাম। এসব ব্যাপারে গত পাঁচ দশকে আমাদের ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, নারীদের সার্বিকভাবে অনেক উন্নতিও হয়েছে। যেমন– এখন নারীদের গড় আয়ু ৭৬ যা পুরুষদের, যাদের গড় আয়ু ৭১, তার তুলনায় বেশি। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের সংখ্যা প্রায় সমান। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ প্রায় ৩৮ শতাংশ। গার্মেন্টকর্মীই শুধু নয়; এখন পুলিশ, সামরিক বাহিনী, প্রশাসন, সাংবাদিকতা, আইন

পেশা– সব জায়গায় নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাপক পরিমাণে বেড়েছে। এখন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বহু নারীকে ঘরের বাইরে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত দেখা যায়।

তবে নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন পুরোপুরি সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়নি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান– এসব ব্যাপারে নারীর অবস্থানের অনেক উন্নতি হয়েছে। কিছুটা ক্ষমতায়নও হয়েছে; কিন্তু উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এই দুই ধারণা একেবারে এক রকম নয়। উন্নয়ন হলেই যে ক্ষমতায়ন হবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে আমরা বুঝি তার নিজের জীবনের, পরিবারের, সমাজের এবং রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তগুলোর ব্যাপরে তার স্বাধীনতা ও সক্ষমতা। এখনও পুরুষের নিয়ন্ত্রণে আছে? আমরা দেখছি, নারীরা আগের তুলনায় এখন বেশি শিক্ষিত হচ্ছে, অর্থ উপার্জন করছে। কিন্তু অনেক সময়ই শিক্ষিত নারীরাও নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে পুরুষনির্ভর। নিজের উপার্জনের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নারীরা রাখতে পারছে না। অনেক পরিবারের জন্য নারীদের আয় দরকার। তাই তাদের চাকরি করতে দিচ্ছে। কিন্তু নারীরা যে আয় করছে, সেটি তারা কতটা নিজের পছন্দমতো খরচ করছে? বহু শিক্ষিত ও অর্থ উপার্জনকারী নারীও ঘরে-বাইরে সহিংসতার শিকার হচ্ছে। বেশির ভাগ নারীই এসব অবিচার, অত্যাচার নীরবে মেনে নিয়ে দিনযাপন করছে।

বাংলাদেশে এবং সারা পৃথিবীতেই গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে নারীর উন্নয়ন অনেক হয়েছে। কিন্তু তিনটি বিষয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জন করা কঠিন হচ্ছে। প্রথমটি আয় এবং সম্পত্তি, দ্বিতীয়টি নেতৃত্ব এবং তৃতীয়টি সমাজের রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি। প্রথমত, আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়ে যাচ্ছে; কিন্তু আয় সেই তুলনায় বাড়ছে না। তার কারণ নারীরা এখনও নিম্নস্তরে কাজ করছে। আমাদের দেশে পোশাকশিল্পের নারী কর্মীরাই কর্মজীবী নারীদের বহুলাংশ। সম্পত্তির ক্ষেত্রেও নারীরা পিছিয়ে আছে। কারণ নারীরা বাবা ও স্বামীর সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার পাচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, নেতৃত্বের জায়গাটা; তা কর্ম জগতেই হোক বা রাজনীতিতেই হোক— নেতৃত্ব এখনও পুরুষদের দখলে। খুব সমসংখ্যক নারী সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিতে পারছে। রাজনীতিতে— দুই প্রধান দলে শীর্ষ নেতৃত্ব ব্যতীত সাধারণভাবে নারী নেতৃত্বের উপস্থিতি কম। উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ কিংবা সংসদে নারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করছে সংরক্ষিত মহিলা আসন। সরাসরি নির্বাচন করে খুব কমসংখ্যক নারীই নেতৃত্বের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে।

যে জায়গায় নারী-পুরুষের বৈষম্য থেকেই যাচ্ছে তা হলো সমাজের রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। কোনটা পুরুষের কাজ, কোনটা নারীর, পুরুষ কেমন ব্যবহার করবে, নারী

কেমন করবে— এসব সামাজিক রীতিনীতি এখনও খুব বেশি পাল্টায়নি। এই জায়গায় পরিবর্তন আনা কঠিন হচ্ছে। যেমন— পরিসংখ্যান বলছে বাংলাদেশে নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থকরী উপার্জনের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে; কিন্তু এখনও বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের হার এবং নারীর প্রতি সহিংসতার হার দক্ষিণ এশিয়া এবং পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় অনেক বেশি। বাল্যবিয়ে এবং নারীর প্রতি সহিংসতার হার এই দুটি পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, সমাজের রীতিনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি এখনও তেমন বদলায়নি। কভিডের সময়ই আমরা দেখেছি, অনেক পরিবার মেয়েদের আর শিক্ষায় উৎসাহিত করছে না। তাদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ছেলেদের পড়াচ্ছে। করোনাকালে মেয়েদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া এবং বাল্যবিয়ে দুটিই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, আমাদের দেশে নারীর ক্ষমতায়নের অবস্থা কতটা ভঙ্গুর

নারীর ক্ষমতায়নের পথে মূল প্রতিবন্ধকতা এখনও সমাজের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কাজটা নারী-পুরুষ উভয়কেই করতে হবে। বিশেষ করে রাষ্ট্রকে এর দায়িত্ব নিতে হবে। আমাদের দেশে রাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করে; কিন্তু সেসব নীতি অনেক সময় বাস্তবে প্রয়োগ হয় না, কিংবা নীতি অমান্যকারীরা তেমন শাস্তির মুখোমুখি হয় না। পৃথিবীর যেসব দেশে গত পঞ্চাশ বছরে নারীর অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে, যেমন নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক এসব দেশে নারীবান্ধব সরকারি/বেসরকারি নীতির প্রয়োগ এবং নারীদের অবস্থানের ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে কিনা, সেই লক্ষ্যের উপার্জনের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। যেমন— সুইডেনে নিয়ম আছে, সংসদে নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে নারীদের ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ মনোনয়ন দিতে বাধ্য থাকতে হবে। এই নিয়মটা সে দেশে মানা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলো এই ধরনের বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকতে চায় না। আমরা যদি সর্বস্তরে নারী নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তাহলে আমাদের সব প্রতিষ্ঠানকেই একটা পরিকল্পনা করতে হবে কীভাবে আগামী ১০–১৫ বছরে আমরা নারীদের ৩০–৪০ শতাংশ নেতৃত্বের স্থানে উন্নীত করতে পারব। অবশ্য শুধু সংখ্যার টার্গেট দিয়েই নারী নেতৃত্ব বাড়ানো যাবে না। তার জন্য অন্যান্য নারীবান্ধব নীতি, কাজকর্ম ও পরিবেশ প্রয়োজন। নারীর প্রয়োজন সময়ের। এখনও ঘরের বেশির ভাগ কাজ নারীদেরই করতে হয়। ঘরের কাজ, অর্থকরী কাজ করার পর নারীদের হাতে খুব কম সময় থাকে অন্য কাজে অংশগ্রহণ করার। যেমন– সমাজসেবা, রাজনীতি বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। অনেক ক্ষেত্রে কাজের পরিবেশ নারীবান্ধব নয়। যেমন— আমাদের রাজনীতির জগতের প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থ এবং পেশিশক্তি। বহু নারীর জন্য এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। রাজনীতির জগতের পরিবেশ নারীবান্ধব হতে হবে। অনেক কর্মস্থলে নারীরা যৌন হয়রানি বা সহিংসতার শিকার হচ্ছে। কর্মস্থলে নারীর প্রতি হয়রানি বা সহিংসতার ব্যাপারে জিরো টলারেন্স পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

নারীর প্রতি সহিংসতা এবং এ সহিংসতার হাত থেকে মুক্তির উপায়— এই দুটি বিষয়ই আমাদের সমাজের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির আর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। নারীশিক্ষা, নারীর অর্থ উপার্জনের অনেক উন্নতি হলেও ঘরে-বাইরে নারীর প্রতি সহিংসতার হার কমছে না। এই সহিংসতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পন্থা একজন নারীকে বা তার পরিবারকেই নিতে হচ্ছে। পুরুষ সমাজ যারা সাধারণত সমাজে কর্তৃত্ব করছে, তারা নারীকে সহিংসতার হাত থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে তেমন ভূমিকা রাখছে না। নারী মুক্তির আন্দোলন নিশ্চয়ই নারীরাই করবে; কিন্তু নারীর প্রতি সহিংসতা করছে সাধারণত পুরুষরা। তাই এই সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, এই সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দায়িত্ব যেসব পুরুষ এসব সহিংসতায় লিপ্ত নয় তাদেরই নিতে হবে। এ দায়িত্বটা শুধু নারী, তার পরিবার বা নারী সংঘটনের ওপর ফেলে রাখা চলবে না।

সমকাল
১২ *অক্টোবর*, ২০২৩

অধ্যায় ৭

অন্যান্য

আমরা মুক্তিযুদ্ধকে সম্মান দিচ্ছি, অথচ দায় শোধ করছি না

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অনেকের ধারণা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অবধারিত একটি বিষয় ছিল। ইতিহাসে অবধারিত কিছু হয় না। স্বাধীনতা-পরবর্তী পরিস্থিতিকেও ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। মুক্তিযুদ্ধকে আমরা কী দিয়েছি— এই প্রশ্নের উত্তরে বলব, আমরা টেকসইভাবে একটি রাষ্ট্রকাঠামো দাঁড় করাতে পেরেছি। আমাদের এখানে সে সময় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় কোনো প্রতিষ্ঠানই ছিল না। আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছি। স্বাধীনতা-পরবর্তী তিন থেকে সাড়ে তিন বছরের পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে ফেরত পাঠালেন, সেটা অন্যতম স্মরণীয় একটি ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপের দিকে তাকালে আমরা এর মূল্য অনুভব করব।

স্বাধীনতার পরের ৫০ বছরে আমরা একটি আর্থসামাজিক বিকাশের মধ্য দিয়ে গিয়েছি। তার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য কমেছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে, অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে, খাদ্যনিরাপত্তা এসেছে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এসেছে, নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। এগুলো রাতারাতি হয়নি, বিভিন্ন সময়ে তৈরি সোপানের মধ্য দিয়ে হয়েছে। আমরা যারা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করেছি, তারা জানি যে বিভিন্ন দেশে এ ধরনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার আগেই বাংলাদেশে সেগুলো গৃহীত হয়েছিল। বাংলাদেশের মূল উন্নয়নের ধারার পথে একধরনের ঐকমত্য আছে। এ নিয়ে একসময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে যে পার্থক্য আমরা ভাবতাম, তা এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে কম।

প্রতিষ্ঠান হিসেবে সবচেয়ে বেশি দুর্বল হয়েছে আমাদের রাজনীতি। সে জন্য এর মধ্যকার সমস্যাগুলো রাষ্ট্রীয় সমস্যায় পর্যবসিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত খাদ্যনিরাপত্তার সংকটের সময় আমরা একদলীয় ব্যবস্থায় গিয়েছিলাম। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে প্রথম ধাক্কা বাকশাল থেকে এসেছে। এর পরে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর আগমন কিংবা বিভিন্ন দল থেকে দলছুটদের নিয়ে করা দল প্রভৃতিকে রাজনৈতিক শক্তির বিকৃতি বলা যেতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে ভিন্ন দলের লোকজনের কেনাবেচাও আমরা দেখেছি। রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতান্ত্রিক মনোভাব থাকবে না, অথচ দলগুলো প্রতিষ্ঠান ঠিক রাখবে— এটা একটা অসম্ভব বিষয়।

তাই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার বিষয়টি চলে আসে। যে দলগুলো এসবের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠেনি, তারাও আজকাল এসব আয়ত্ত করে নিচ্ছে। আগামী দিনে এরা প্রতিযোগী অবস্থানে যাবে, তেমন সুযোগ আমি দেখছি না। ২০০৬-০৭ সালে আন্দোলন করে আমরা বলেছিলাম, বাণিজ্য করতে ট্রেড লাইসেন্স লাগে, অথচ রাজনৈতিক দল করতে কোনো লাইসেন্স লাগে না। পরে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে এটি করা গেছে। দলগুলোকে এখন টাকা-পয়সার হিসাব অন্তত দিতে হয়। এগুলো নাগরিক সমাজেরই অবদান।

আরেকটা বিষয় হলো বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করা। কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ার মধ্য দিয়েই শুধু নয়, মানবিক দিক থেকেও বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে আমরা স্থাপন করেছি। এর বড় উদাহরণ হলো শরণার্থী হিসেবে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া।

আমি বলব, বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের উদ্ভব ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে। নাগরিক সমাজ ভাষা আন্দোলনে এবং ছয় দফা ও উনসত্তরের আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। ১৯৭১ সালে নাগরিক সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রাণ হারিয়েছেন। স্বাধীনতার পরেও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে বা জাহানারা ইমামের আন্দোলনে নাগরিক সমাজ অংশ নিয়েছিল। ২০০৪ থেকে ২০০৫ সালের সৎ ও যোগ্য প্রার্থী আন্দোলনের কথাও স্মরণ করার মতো। বাংলাদেশের ইতিহাসে যখনই রাজনৈতিক উচ্চবর্গ আর নাগরিক সমাজের উচ্চবর্গেরা একত্রে কাজ করেছে, তখনই এ দেশে প্রগতির ধারা অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশের মূলধারার নাগরিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের, অসাম্প্রদায়িক চেতনার এবং প্রগতিশীল শক্তি। রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে প্রগতিশীল ধারার সম্মিলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যেমন এসেছে, তেমনই স্বৈরাচার হটিয়ে গণতন্ত্রেও উত্তরণ ঘটেছে; পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির ক্ষেত্রে এই দুই ধারা একসঙ্গে কাজ করেছে।

সমস্যাটা হয়েছে অন্যত্র। আমরা দুই ধরনের রাজনৈতিক উচ্চবর্গীয় শ্রেণি দেখতে পাচ্ছি। প্রথমত, ক্ষমতায়িত রাজনৈতিক উচ্চবর্গীয় শ্রেণি; দ্বিতীয়ত, ক্ষমতার বাইরের রাজনৈতিক উচ্চবর্গীয় শ্রেণি। ক্ষমতার বাইরে থাকলে রাজনৈতিক উচ্চবর্গীয়রা নাগরিক সমাজকে তার সহায়ক মনে করেছে, কিন্তু ক্ষমতায় থাকলে মনে করছে প্রতিপক্ষ। এই দুর্বলতা থেকেই সহায়ক শক্তিকে তারা প্রতিপক্ষ বানিয়েছে। তার ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা থাকলে সহায়ক শক্তিকে সে প্রতিপক্ষ বানাত না।

এখন তো আবার বিকল্প নাগরিক সমাজও আছে। হেফাজতে ইসলামের মতো গোষ্ঠীকে আমি বিকল্প নাগরিক সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করি। মূলধারার নাগরিক সমাজ প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের মূল্যবোধ লালন করে। সংখ্যার দিক থেকে ভাবলে কিন্তু বিষয়টি ভিন্ন। একদিকে সংখ্যার প্রভাব, আরেক দিকে নৈতিক প্রভাব। নাগরিক সমাজের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে প্রগতিশীল উচ্চবর্গীয়দের দ্বন্দ্ব নিরসন করা না গেলে নতুন কোনো রাজনৈতিক বোঝাপড়া হবে না। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসেছে। সেটা একটা বাজে নির্বাচন ছিল, তবে তাতেও একধরনের সমঝোতা ছিল। তথাকথিত এক-এগারোর ঘটনায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক উচ্চবর্গীয়দের সঙ্গে নাগরিক সমাজের সমঝোতা হয়নি। এ কারণে একধরনের রাজনৈতিক বিকৃতি ঘটেছে।

আমরা মুক্তিযুদ্ধকে সম্মান দিয়েছি, কিন্তু এর দায় শোধ করিনি। এ প্রসঙ্গে আমি তিনটি বিষয় নিয়ে বলব। প্রথমত, ইতিহাস। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো হীন উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত ও বিতর্কিত করেছে। আমরা বিভিন্ন লোকের অবদান অস্বীকার করি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে জাতীয় মতৈক্য থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চেতনা বৈষম্য দূর করা, যা হয়নি। আয়, ভোগ, সম্পদ, নিরাপত্তার অধিকার— এসব ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয়ত, গণতন্ত্রের দুর্বলতা। নাগরিকেরা যদি ভোট দিয়ে নিজেদের ক্ষমতায় নিজেদের পছন্দের প্রার্থী বসাতে না পারে, তা হলে তো কিছুই হলো না। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা তো গণতন্ত্রের চেতনা। আমরা মুক্তিযুদ্ধকে সম্মান দিচ্ছি, অথচ দায় শোধ করছি না। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এ ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে।

প্রথম আলো
২৬ মার্চ, ২০২৩

বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কে নষ্ট করছে

রওনক জাহান

প্রথম আলোর সাংবাদিক শামসুজ্জামানের গ্রেপ্তার, জামিন নামঞ্জুর করা এবং তাকে কারাগারে পাঠানোকে কেন্দ্র করে অতি দ্রুত এবং অদ্ভুত যেসব ঘটনা ঘটছে, তা আমাকে হতবাক ও বর্ণনাতীতভাবে ভারাক্রান্ত করেছে। নিজেকে প্রশ্ন করেছি, এটা কীভাবে হতে পারে? একটি উক্তি ও ভ্রমক্রমে প্রকাশ করা একটি ছবির কারণে (ভুল-বোঝাবুঝি হতে পারে ভেবে যা দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সংশোধনী দেওয়া হয়েছে) একজন তরুণ সাংবাদিকের এমন পরিণতি কীভাবে হতে পারে?

শামসুজ্জামান নিজে এবং তিনি যে সংবাদপত্রে কাজ করেন, সেটা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে বলে এই তরুণ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে করা মামলায় প্রাথমিকভাবে অভিযোগ করা হয়েছে। আরেকটি মামলায় তার এবং অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনের সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমানকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। পরে একই অভিযোগ করেছেন সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন দলের নেতা। যদিও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাজ করা সাংবাদিক, তাদের সংগঠন ও বৈশ্বিক মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর পক্ষ থেকে দ্রুত এ ঘটনার নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়া ও সাংবাদিক শামসুজ্জামানকে কারাগারে পাঠানোর ঘটনা আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছে, কে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করছে?

প্রথম আলোর অনলাইনের একটি প্রতিবেদন ফেসবুকে শেয়ারের সময় 'গ্রাফিক কার্ডে' একটি সাধারণ উদ্ধৃতি ও ছবির অমিলের পর সেই পোস্ট প্রত্যাহার করা হয়। এ বিষয়ে অনলাইনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে সংশোধনী প্রকাশের পর তা উপেক্ষা করাই বাঞ্ছনীয় ছিল। এ ঘটনায় কোনো ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী 'আঘাত' পেয়ে থাকলে তারা অনলাইনে,

ছাপামাধ্যমে বা টেলিভিশনের টক শোতে এটা নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক করতে পারতেন। প্রেস কাউন্সিলে যেতে পারতেন।

একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমরা বাংলাদেশেও বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য নিয়ে বিতর্ক আশা করি। কিন্তু কেন শামসুজ্জামানকে রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে যেতে হবে? জামিন আবেদন খারিজ করে কেন কারাগারে পাঠাতে হবে? ছোট একটি সংবাদ যা বেশির ভাগ পাঠকের নজর এড়াতে পারত, সেটাই এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সবার মনোযোগ কেড়েছে। বিশ্বজুড়ে এখন তা বাংলাদেশের গণতন্ত্রচর্চার অবক্ষয়ের আরেকটি নজির হয়ে উঠেছে।

এসব কর্মকাণ্ড কি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নত করছে? সাংবাদিক শামসুজ্জামানকে এভাবে শাস্তি দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে এখন বাংলাদেশের কী ধরনের ভাবমূর্তি তুলে ধরা হচ্ছে?

এই উদ্ধৃতি ও ছবি আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিতে পারে, এমন অভিযোগই বরং বাংলাদেশের ভাবমূর্তির জন্য আরও বেশি ক্ষতিকর। আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তি অসম্ভব দৃঢ়। স্বাধীনতার ৫২ বছরে এসে তা আরও আরও দৃঢ়তর হয়েছে। একটি উদ্ধৃতি কিংবা একটি সংবাদপত্রের পক্ষে মহান স্বাধীনতার এই দৃঢ় ভিত্তিকে দুর্বল করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের ভাবমূর্তির স্বনিয়োজিত পাহারাদারদের বুঝতে হবে, তাদের অতি উৎসাহী ও চিন্তাহীন কর্মকাণ্ড ও কথা কেবল বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নয়, বরং দেশের অনেক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্তার ভাবমূর্তির ক্ষতির কারণ হতে পারে।

আলোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করা হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে আটকে রাখা হচ্ছে— সে উদাহরণ আমরা বারবার দেখেছি। এসব উদাহরণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে আর বিলম্ব না করে এ আইন বাতিল করা উচিত। আইনটি বাতিল করার মাধ্যমে আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করতে পারব।

বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে, এ বিতর্ক করতে গিয়ে আমাদের শামসুজ্জামান, তাঁর মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মানবিক অবস্থার কথা ভুলে গেলে চলবে না। এই পবিত্র রমজান মাসে তাঁদের কষ্টের মুখোমুখি করাটাও অনুচিত হবে।

প্রথম আলো
০১ এপ্রিল ২০২৩

বায়ুদূষণ শুধু পরিবেশগত দুর্ভাবনা নয়

ফাহমিদা খাতুন
কাশফিয়া আশরাফ
মরিয়ম বিনতে ইসলাম

২০২২ সালের আইকিউএয়ার সূচকে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান ছিল পঞ্চম। ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, উচ্চমাত্রার বায়ুদূষণ মৃত্যু ও প্রতিবন্ধিতার অন্যতম প্রধান কারণ। নিম্নমানের ও দূষিত বাতাসের সংস্পর্শ অল্প সময়ের জন্য হলেও তা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। নিশ্বাসের সঙ্গে দূষিত বাতাস গ্রহণের কারণে টাইপ-২ ডায়াবেটিস, শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ, ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমানো, ক্যানসার, হৃদ্‌যন্ত্রের অসুখসহ স্বাস্থ্যগত নানা ধরনের জটিলতা তৈরি হতে পারে।

কণাসদৃশ বস্তুর উপস্থিতিকে ঢাকার বায়ুদূষণের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব কণা এত ছোট যে এমন কয়েক কোটি কণা একটিমাত্র লাল রক্তকণিকায় জায়গা নিয়ে নিতে সক্ষম, যা শ্বসনতন্ত্র বা হৃদ্‌যন্ত্রের রোগ বা অন্য কোনো রোগের মাধ্যমে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। ওজোন, দূষণ সৃষ্টিকারী কণা ও ধুলার কারণে কম বয়সীদের মধ্যে ১ থেকে ৪ বছর বয়সী শিশু এবং বয়স্কদের মধ্যে ৬০ থেকে ৯৫ বা এর বেশি বয়সীদের মৃত্যুঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। গ্লোবাল বার্ডেন অব ডিজিজের (জিবিডি) মতে, বাংলাদেশে বায়ুদূষণজনিত রোগে মৃত্যুর হার ২০১৯ সালে আগের ২০ বছরের তুলনায় ৯ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্সের (একিউএলআই) মতে, বায়ুদূষণের কারণে ঢাকার বাসিন্দারা গড়ে আট বছরের আয়ু হারাচ্ছেন।

শহরাঞ্চলের বাতাস পরিচ্ছন্ন রাখাসহ সার্বিকভাবে বায়ুদূষণের নেতিবাচক প্রভাব কমাতে হলে বাস্তবায়নযোগ্য ও কার্যকর নীতিমালা তৈরি করতে হবে। এ লক্ষ্যে সম্ভাব্য কিছু সমাধান হতে পারে, আমদানি খরচ কমিয়ে হাইব্রিড প্রযুক্তির গাড়ির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা, নিয়মিতভাবে যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষা, কার্বন নিঃসরণ কমাতে কার্বন ট্যাক্স আরোপ করা এবং নির্মাণকাজের সময় ব্যবহৃত সামগ্রী রাখা ও পরিবহনের বিষয়টি সঠিক নিয়মের আওতায় আনা।

বিশ্বব্যাংকের মতে, বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তির বার্ষিক গড় খরচ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নাটকীয়ভাবে বেড়েছে, ২০২০ সালে যা ৭৪ শতাংশে পৌঁছেছে। দরিদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ব্যয় বড় এক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দূষণের কারণে স্বাস্থ্য খাতে ব্যক্তির আর্থিক চাপ তো বাড়ছেই, এর পাশাপাশি আবার দূষণের কারণে রোগব্যাধির জন্য কর্মক্ষেত্রে মানুষের উৎপাদনশীলতা কমছে, যা আবার নতুন করে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, নগরায়ণ ও শিল্পায়ন বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশসহ আশপাশের দেশগুলোতে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ বাড়ছে। বাংলাদেশে বায়ুদূষণের প্রধান উৎস বা কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে গাড়ির ব্যবহার, কয়লানির্ভর শক্তিকেন্দ্র, ইটভাটা, শিল্পকারখানা, সড়কের ধুলা এবং ভবন নির্মাণ। বাংলাদেশে গাড়ির ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় গাড়ি থেকে নির্গত কার্বনের পরিমাণও বেড়েছে। মূলত গাড়ির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, ভেজাল জ্বালানির ব্যবহার, ট্রাফিক-ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং পার্কিংয়ের জন্য যথেষ্ট জায়গা না থাকার মতো কারণে এমনটি ঘটছে।

ইটভাটা এ দূষণের আরেকটি বড় কারণ। ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নির্মাণসামগ্রীর চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, ২০১৮ সালে সারাদেশে ৮ হাজার ইটভাটা সচল ছিল, যেখানে বছরে ১ হাজার ৫০০ কোটি ইট তৈরি হতো। বাংলাদেশে এখনো পুরোনো পদ্ধতিতে ইট তৈরি করা হয়, যা পরিবেশকে দারুণভাবে দূষিত করছে।

নির্মাণকাজ চলাকালে নির্মাণসামগ্রী রাখা বা পরিবহনের সুনির্দিষ্ট কোনো বিধিমালা না থাকায় নির্মাণস্থলগুলোতে প্রচুর ধুলা থাকে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, শীতকালে ঢাকায় প্রতিদিন ৫০০ মেট্রিক টন ধুলা সড়কে পড়ে এবং ২ হাজার মেট্রিক টন ধুলা বাতাসে ওড়ে। এছাড়া আন্তসীমান্ত বায়ুদূষণের প্রভাবও বাংলাদেশের বাতাসে

দূষণ বাড়ানোর পেছনে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের দূষণের ৪০ শতাংশই ঘটে ভারতের মতো প্রতিবেশী দেশগুলোর কারণে। জাতীয় পর্যায়ে এ ধরনের দূষণ মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের শহরগুলোতে বায়ুদূষণের অবস্থা প্রতিমুহূর্তে খারাপের দিকে যাচ্ছে। সবুজ পরিবেশ ও পরিচ্ছন্ন বাতাসকে জাতীয় অগ্রাধিকার ঘোষণা করা দরকার। বায়ুদূষণ মোকাবিলায় বাতাসের গুণগত মানের সঙ্গে স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও পরিবেশগত বিষয়গুলোর সম্পর্কের বিষয়টি কার্যকর সরকারি নীতিমালার মধ্যে আনতে হবে। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে বাতাসের মান বাড়াতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলেও কার্যকর নজরদারি ও সুশাসনের অভাবে এসবের বাস্তবায়ন পুরোপুরি সফল হয়নি।

শহরাঞ্চলের বাতাস পরিচ্ছন্ন রাখাসহ সার্বিকভাবে বায়ুদূষণের নেতিবাচক প্রভাব কমাতে হলে বাস্তবায়নযোগ্য ও কার্যকর নীতিমালা তৈরি করতে হবে। এ লক্ষ্যে সম্ভাব্য কিছু সমাধান হতে পারে, আমদানি খরচ কমিয়ে হাইব্রিড প্রযুক্তির গাড়ির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা, নিয়মিতভাবে যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষা, কার্বন নিঃসরণ কমাতে কার্বন ট্যাক্স আরোপ করা এবং নির্মাণকাজের সময় ব্যবহৃত সামগ্রী রাখা ও পরিবহনের বিষয়টি সঠিক নিয়মের আওতায় আনা।

এছাড়া আরও কিছু বিষয় বাস্তবায়নে সরকারের কঠোর হওয়া দরকার। যেমন অবৈধভাবে চালু থাকা ইটভাটাগুলো বন্ধ করা এবং ২০ বছরের বেশি পুরোনো বাস ও ২৫ বছরের বেশি পুরোনো ট্রাক নিষিদ্ধ করা। সবশেষে কয়লানির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করতে হবে। নবায়নযোগ্য শক্তি ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির পেছনে বিনিয়োগ করলে বায়ুদূষণ কমবে, জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি প্রশমিত হবে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে। রাজনীতিবিদ, গবেষক, বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের মধ্যে এ ব্যাপারে জোর অঙ্গীকার নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশে বায়ুদূষণ প্রশমনের জন্য কার্যকর একটি রূপরেখা তৈরি করা সম্ভব হবে।

প্রথম আলো
২৬ আগস্ট ২০২৩

গণতান্ত্রিক চর্চা এবং জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া সচল রাখতে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর এই জবাবদিহিমূলক উন্নয়নের সঙ্গে নীতি গবেষণার রয়েছে এক অপ্রতিম সংযোগ। নীতি গবেষণার ফলাফলের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন অংশীজনের কণ্ঠস্বরকে বিস্তৃত পরিসরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক অনন্য বাহক হচ্ছে গণমাধ্যম। সেই সূত্রেই সিপিডি'র গবেষকরা গণমাধ্যমে সমকালীন নানান বিষয়ে কলাম লেখার পাশাপাশি মন্তব্য, সাক্ষাৎকার ও মতামত দেওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ ও অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলোকে সহজবোধ্যভাবে সাধারণ জনগণের কাছে উপস্থাপন করে থাকেন। 'সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ৮' ২০২৩ সালের বিভিন্ন সময়ে দেশের বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় দেওয়া নির্বাচিত কিছুসংখ্যক মতামতের একটি সংকলন।

মূল্যস্ফীতি, রাজস্ব ঘাটতি, ডলার সঙ্কট এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি ২০২৩ সালে চাপের মধ্যে ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে জাতীয় বাজেট এবং সামষ্টিক অর্থনীতির মূল্যায়ন, বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীন সংকটের নানামুখী প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বইটির প্রথম অধ্যায়ে। সিপিডি'র ত্রিশ বছরের কাজের ধারাবাহিকতা হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই বাজেট সম্পর্কিত বিশ্লেষণও উঠে এসেছে এই অধ্যায়ে।

রাজনৈতিক বিবেচনায় ২০২৩ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসেবে বিবেচিত হবে। গণতান্ত্রিক উত্তরণ, নির্বাচন, রাজনৈতিক টানাপোড়েন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সারা বছরই আলাপ-আলোচনা চলেছে। সেই প্রেক্ষিতে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সুশাসন নিয়ে বেশকিছু লেখা সংকলিত হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

শিল্প, বাণিজ্য ও বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা চলমান ছিল। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ নিয়ে মূল্যায়ন প্রতিফলিত হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ের লেখাগুলোতে। এছাড়াও পোশাকখাত এবং রপ্তানি নিয়ে বেশকয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই অংশে।

২০২৩ সাল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসেবে চিহ্নিত হবে। এসব বিষয়ের নানাদিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে চতুর্থ অধ্যায়ের লেখাগুলোতে।

বইয়ের শেষ অধ্যায়ে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বদের স্মরণ করে লেখাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। তাদের বর্ণাঢ্য জীবনের অংশবিশেষ জানা যাবে এই লেখাগুলো থেকে।

বস্তুনিষ্ঠ নীতি গবেষণা এবং সমসাময়িক উন্নয়নমূলক বিষয়ে আলোকপাতের মাধ্যমে সিপিডি'র গবেষকরা সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তারই প্রতিফলন এই প্রবন্ধ-সংকলন। নানামুখী বিষয় নিয়ে অনন্য এই সংকলনটি এবারও উৎসুক পাঠকদের আগ্রহ পূরণে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন)
ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৫০০১৯৯০, ৫৮১৫৬৯৮৩
ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮১
ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

978-984-98096-7-8

978-984-98096-7-8